প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

পঞ্চম পুনমুর্দ্রণ ঃ আগস্ট, 2013

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the
Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক সমাজতত্ত্ব **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম ঃ পর্যায়

ESO - 03 : 9-12

	রচনা	**সম্পাদনা**
পর্যায় 9	অধ্যাপক অমৃতাভ ব্যানার্জী	
পর্যায় 10	অধ্যাপক শান্তনু ঘোষ	অধ্যাপক অমৃতাভ ব্যানার্জী
পর্যায় 11	অধ্যাপক দেবপ্রসাদ চ্যাটার্জী	অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্তা
পর্যায় 12	অধ্যাপিকা গায়ত্রী ভট্টাচার্য	অধ্যাপক অমৃতাভ ব্যানার্জী

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ESO – 03

সমাজতত্ত্বের ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায়
9

একক 1	সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব (ইউরোপে শিল্পবিপ্লব ও নানাবিধ সামাজিক-বৌদ্ধিক বিপ্লব)	7-19
একক 2	সমাজতত্ত্বের রাজনৈতিক-দার্শনিক ভিত্তি (মন্তেস্ক্যুর অবদান)	20-31
একক 3	সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার অগ্রদূত (সাঁ সিমঁ ও আগস্ত কঁত)	32-47
একক 4	সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার ইতিহাসে মার্ক্সীয় সন্ধিক্ষণ	48-61

পর্যায়
10

একক 5	হার্বার্ট স্পেনসার ও জর্জ সিমেল	62-78
একক 6	এমিল-ডুর্খাইম	79-96
একক 7	ম্যাক্স হ্বেবার এবং ভিলফ্রেডো প্যারেটো	97-129
একক 8	র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন ও ম্যালিনোউস্কি	130-149

পর্যায়

11

একক 9	আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিকদের অবদান ঃ ভেবলেন, কুলে, মীড, পার্ক, সোরোকিন	**150-173**
একক 10	মহাদেশীয় (ইউরোপীয়) সমাজতাত্ত্বিকদের অবদান ঃ মস্কা, মিশেল্‌স্‌, ম্যানহাইম, থমাস, জ্ঞ্যানেইস্কি	**174-196**
একক 11	আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকদের অবদান ঃ ট্যালকট পারসনস্‌, মার্টন, সি. রাইট মিলস্‌	**197-214**

পর্যায়

12

একক 12	রাজা রামমোহন রায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	**215-241**
একক 13	বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ	**242-263**
একক 14	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	**264-280**
একক 15	জি. এস. ঘুরিয়ে, বিনয় সরকার, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়	**281-308**

একক ১ ❐ সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য
১.১ প্রস্তাবনা
১.৩ পশ্চিম ইউরোপের সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন
১.৩.১ শিল্পবিপ্লব
১.৩.২ ফরাসী দেশের বৌদ্ধিক বিপ্লব ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব
১.৪ বিশ্ববিদ্যালয় বিপ্লব
১.৫ অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের কতিপয় বিশিষ্ট সমাজ চিন্তানায়ক / সমাজ দার্শনিক
১.৬ সারাংশ
১.৭ অনুশীলনী
১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার সূত্রপাত সম্পর্কে যথাসম্ভব স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যাবে।
- কিভাবে সমাজতত্ত্বের জন্মকাল ইউরোপের একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল তা জানা যাবে।
- জানা যাবে যে প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, অর্থশাস্ত্র বিশারদ, সমাজ দার্শনিক প্রমুখ বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত পণ্ডিতগণ সমাজতত্ত্ব নির্মাণে সহায়তা করেছে।
- অষ্টাদশ শতকের নানাবিধ সমাজবিপ্লবের সঙ্গেও যে সমাজতত্ত্ব গঠন প্রক্রিয়ার সম্পর্ক ছিল সেটা বুঝতে পারা যাবে।
- এটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যাবে যে সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা চিন্তা গড়ে ওঠার মূলে ছিল পশ্চিম ইউরোপের শিল্পবিপ্লবজাত সামাজিক ভাঙন ও সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া।

১.২ প্রস্তাবনা

সামাজিক মানুষ সমাজ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে এটা বলা বাহুল্য মনে হয়। মানুষ তার জীবন যাপনের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে সমাজ প্রসঙ্গ নিয়েও ব্যস্ত থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। প্রাচীনকালে প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্যে যেখানেই মানুষ উন্নত জীবনমান প্রদর্শন করেছে সেখানেই তার সমাজ ভাবনার ও পরিচয় মিলবে। তবে কিনা ঐ সময়ে সমাজভাবনা বা সমাজদর্শন কোনো বিজ্ঞানসম্পত পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গড়ে ওঠেনি।

উপরন্তু, প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে সমাজসংক্রান্ত যে সব চিন্তার খোঁজ পাওয়া যায় সেগুলি রাষ্ট্র, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে মিলিতভাবে উপস্থাপিত। একেবারে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে 'সমাজ' নিয়ে আলোচনা একান্তই আধুনিক কালের ঘটনা। তাই আধুনিক পৃথিবীর শিল্পবিপ্লবের ঐতিহাসিক পর্যায়টিকেই আমরা সমাজতত্ত্বের উৎপত্তির কাল হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। রাষ্ট্র ও সমাজের পার্থক্য নির্দেশ করে ইউরোপের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়কগণ যখন 'civil society' বা সমাজের স্বতন্ত্র সত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন, তখন থেকেই সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার সূত্রপাত।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ও উনবিংশ শতকের গোড়ায় যে সব মানুষ সমাজ সংক্রান্ত দার্শনিক, বিজ্ঞানসম্মত, চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন তারা ছিলেন প্রধানতঃ ফরাসী দেশের মানুষ। সমাজতত্ত্বের গোড়াপত্তনে ফরাসী দেশকেই অগ্রগণ্য বলা যায়। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড ও জার্মানির চিন্তানায়করাও এই বিষয়ে তাঁদের মূল্যবান অবদান রেখেছেন। বর্তমান এককটিতে প্রথমে আমরা অষ্টাদশ শতকের নানাবিধ বিপ্লবের পরিণতির কথা নির্দেশ করে সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করব। অতঃপর ফ্রান্স, জার্মানি ও ইংল্যান্ডের বৌদ্ধিক বিপ্লবের উল্লেখ করে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার আবির্ভাবের স্থান-কাল সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারনা অর্জনের চেষ্টা করব।

১.৩ পশ্চিম ইউরোপের সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশ এর দশকে সমাজতত্ত্ব নামটি চয়ন করেন বিশিষ্ট ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী **আগস্ত কঁত্**। আনুষ্ঠানিকভাবে ওই সময়টাই সমাজতত্ত্বের জন্মকাল বলে নির্দেশ করা হলেও তার পটভূমির খোঁজে আরোও অন্তত একশ বছর পিছিয়ে যেতে হবে। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়টাকেই অর্থাৎ শিল্পবিপ্লবের প্রথম পর্বকেই সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব-কাল বলে চিহ্নিত করা সঠিক। ঐ সময়ে পশ্চিম ইউরোপে কিছু যুগান্তকারী পরিবর্তন প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাবে। ঐ সব বৈপ্লবিক পরিবর্তন অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের সমাজকে যেন আগাগোড়া পাল্টে দিয়েছিল। ইউরোপের মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। ওইসব যুগান্তকারী পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অন্যতম উৎস হল শিল্পবিপ্লব যা ইউরোপের সামন্তযুগের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের সূচনা করে।

পঞ্চদশ শতকের রেনেসাঁস ইউরোপীয় সমাজে আধুনিকতার সঞ্চার করলেও তখনই ইউরোপীয় সামন্তবাদ নিশ্চহ্ন হয়ে যায়নি। আরোও প্রায় তিনশত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি যখন শিল্পবিপ্লব শুরু হল তখনই সামন্ত সমাজের অন্তিমলগ্ন প্রকট হ'ল বলা যায়। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের পাশাপাশি জার্মানিতে সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং ফ্রান্সে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজচিন্তার উপোযোগী নিত্যনূতন রসদের যোগান দিয়েছে। ধীরে ধীরে স্বতন্ত্রভাবে পৌরসমাজের চেহারা-চরিত্র বিশ্লেষন, সমাজের পরিবর্তনশীল অবস্থার অনুধাবনা, সমাজের ভারসাম্য বিনষ্টকারী প্রক্রিয়া ও তার ফলাফল ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে সমাজচিন্তা বিশ্লেষণ এর সূত্রপাত হতে থাকে। সমস্ত সমাজ এর ধারাগুলো অতিক্রম করে কিভাবে আধুনিক পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সমাজ জীবনধারা গড়ে উঠেছে তার রূপরেখা প্রকাশ পেতে থাকে।

সাধারণভাবে যে কোন সমাজই হ'ল এক বহমানতা, আন্তঃমানবিক সম্পর্কের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এই প্রবাহ-প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও কালে ভিন্ন গতিসম্পন্ন হবে। উপরন্তু এই প্রবাহ-প্রক্রিয়া দেশ-কাল ভেদে ভিন্নতর ও বিবিধ সমস্যার প্রকাশ ঘটাবে। শিল্পবিপ্লব চলাকালীন পশ্চিম ইউরোপের চিন্তাশীল মানুষেরা নানাবিধ

নতুন সমস্যা ও তাদের গুরুত্ব স্বতন্ত্রভাবে উপলিব্ধ করে তাদের বিচার বিশ্লেষণে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেছিলেন। স্বভাবতই সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার প্রাথমিক গঠন ও প্রকৃতি বুঝতে হলে প্রথমেই শিল্পবিপ্লব নামক ঘটনাটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বাস্তবিকপক্ষে কি অবস্থায়, কি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হল সেইসব বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই তো এক ধরনের সমাজতত্ত্ব। অতঃপর সেই বিপ্লবের পরিণতিগুলোর ব্যাখ্যাও সুসংবদ্ধ সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনাকে নির্দেশ করবে।

১.৩.১ শিল্পবিপ্লব

সাধারণ মানুষ শিল্পবিপ্লব বলতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নতুন যন্ত্রপাতি, নতুন প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগকে নির্দেশ করে। সন্দেহ নেই যে অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডে নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার এবং নতুন উৎপাদন প্রযুক্তির ব্যবহার শিল্পায়নের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধনে সহায়তা করেছে। কিন্তু শিল্পবিপ্লব-এর 'বৈপ্লবিক' চোহারাটি প্রকাশ পেয়েছে প্রধানতঃ শিল্পকর্মের "পদ্ধতিগত" পরিবর্তনের মধ্যে। সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে 'কারখানা ব্যবস্থার' (Factory System) প্রবর্তনই হ'ল শিল্পকর্মে বিপ্লব। অর্থাৎ শিল্পবিপ্লবের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াটি প্রকাশ পেয়েছে ক্রমবর্দ্ধমান কারখানা ভিত্তিক উৎপাদনকর্ম পরিচালনার মধ্য দিয়ে।

অতীতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বা অল্প কিছু মানুষের শ্রম নির্ভর যে ক্ষুদ্র মাপের উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল তাকে অতিক্রম করে কল-কারখানা ভিত্তিক বৃহদায়তন শিল্প-পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হল। স্থানীয় কোন জুতা-প্রস্তুতকারী মুচির সঙ্গে বাটা স্যু কম্পানীর তুলনা করলেই শিল্পবিপ্লব বলতে কি বোঝায় তা জানা যাবে। একাধিক দিন শ্রম দিয়ে একজন ব্যক্তি এক জোড়া উন্নতমানের জুতা প্রস্তুত করতে পারে। অপর দিকে বাটা কারখানায় বহুসংখ্যক উন্নতমানের জুতা-জোড়া প্রস্তুত হচ্ছে ঘন্টায় ঘন্টায়। উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে এবং 'শ্রম-বিভাজন' ও 'কর্মের বিশেষীকরণ' পদ্ধতির মাধ্যমে বহু শ্রমজীবী মিলিতভাবে পণ্য উৎপাদনে যে পরিমানগত ও গুণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব। শিল্পের বিপ্লব হ'ল মানুষের এই যৌথ প্রচেষ্টার সংগঠন ; কারখানা ভিত্তিক উৎপাদন কর্ম পরিচালনা করে পণ্যের উৎকর্ষ এবং পণ্যের পরিমান বৃদ্ধিতে অভাবনীয় উন্নতিসাধন।

শিল্পবিপ্লবের সুদূরপ্রসারী ফলাফলের দরুণ মানুষ সমাজকে স্বতন্ত্রভাবে অনুধাবন করার, সামাজিক বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। প্রধান যে বিষয়টি সকলের নজর কেড়েছিল তা হ'ল শিল্প-উৎপাদনকে কেন্দ্র করে অসংখ্য মানুষের সমাবেশ। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক অ্যান্থনী গিডেনস্ (Anthony Giddens) সঠিকই বলেছেন, শিল্পবিপ্লবের পরিচয় সামান্যই নিহিত রয়েছে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মধ্যে ; তাঁর মতে শিল্পবিপ্লবের মূল পরিচয় পাওয়া যাবে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কল-কারখানা এলাকায় অবিরাম অসংখ্য মানুষের অভিবাসন (migration) প্রক্রিয়ায়।

সহযোগিতার ভিত্তিতে, সমবেতভাবে, কাজে নিযুক্ত থাকার ফলে কর্মস্থলের কাছাকছি বাসস্থানের প্রয়োজনীতা দেখা যায়। তাই কারখানা এলাকায় দ্রুত বসতি গড়ে উঠতে থাকে। শিল্পাঞ্চলগুলি ক্রমেই শিল্পনগরীতে রূপান্তরিত হতে থাকে। শিল্পায়ন ও নগরায়ন-এর এক যুগপৎ প্রক্রিয়া নতুন সমাজজীবনধারা বিস্তার করে। এই নতুন সমাজ ও নতুন জীবনধারা সঙ্গে নিয়ে আসে নতুন নতুন প্রশ্ন, নতুন সমস্যা ও নানাবিধ সরল ও জটিল আন্তঃমানবিক সম্পর্ক। শিল্পায়ন ও নগরায়নের সঙ্গে আধুনিককরণেরও প্রসার ঘটে। সামগ্রিকভাবে সমাজের কাঠামোতে, সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন প্রক্রিয়া প্রকট হয়।

শিল্পের প্রসারের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা উল্লেখ করা হল তাতে গ্রাম থেকে শহরে এক নিরবচ্ছিন্ন অভিবাসন প্রক্রিয়া নির্দেশিত। গ্রামাঞ্চল ও শহরতলী থেকে কর্মপ্রাপ্তির আশায় মানুষ জড়ো হয়েছে শহরে, নগরে, শিল্পাঞ্চলগুলিতে। এর ফলে দু'দিকে দু'ধরনের প্রবণতা ও সমাজিক সম্পর্কগত সমস্যা তৈরী হয়েছে। গ্রামে ও শহরতলী থেকে মানুষের চাপ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, শহরাঞ্চলে সেই চাপ বেড়েই চলেছে। ফলে উভয় দিকেই ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। পুরানো পরিবার ব্যবস্থা, পুরানো সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং পুরানো বিশ্বাস ও মূল্যবোধ পাল্টে গিয়ে নতুন জীবনধারার সূত্রপাত হয়েছে। আর এই সব পরিবর্তন প্রক্রিয়া অনধাবন করেই সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, সমাজচিন্তা বিকশিত হয়েছে।

শিল্পবিপ্লবের গুরুত্বের কথা মনে রেখেই আগস্ত কঁত্ আধুনিক সমাজকে শিল্পসমাজ (Industrial Society) এবং সদর্থক, বিজ্ঞানবাদী, (Positive Soceity) সমাজ নামে অভিহিত করেছেন। এই শিল্পসমাজে শিল্পের কর্ণধারগণই নেতৃত্ব দেবেন বলে তিনি মনে করেন। ভিন্ন চিন্তার, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ কার্ল মার্ক্সও বলেন, শিল্পবিপ্লব প্রাথমিকভাবে এক বিরাট সাজিক প্রগতির সূচনা করেছিল সামন্তসমাজে কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে (যদিও তাঁর মতে পরবর্তীকালে শিল্পের কর্ণধার বুর্জোয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী শ্রমজীবীদের নির্মমভাবে শোষণ করে সমাজব্যবস্থার অমানবিক দিকটাই প্রকট করে তুলেছিল)।

কঁত্ ও মার্ক্স এর অনেক আগে শিল্প বিপ্লবের জোয়ারে অর্থনীতি (Economics) নামে আর একটি নতুন শাস্ত্রের আবির্ভাব হয়েছিল। অ্যাডাম স্মিথ্ (Adam Smith), জেমস্ মিল (James Mill), ডেভিড্ রিকার্ডো (David Ricardo) প্রমুখ সেই শাস্ত্রের আদি, ক্লাসিকাল (Classical), চিন্তানায়কগণ সম্পদ সৃষ্টি, বন্টন ও বিনিময় সংক্রান্তে যে সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হাজির করেছেন সেগুলিও নানাভাবে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার বিকাশে সহায়তা করেছে। সর্বোপরি ফরাসী দেশের ১৭৮৯ সালের বিপ্লবপ্রক্রিয়া যে নতুন গণতান্ত্রিক আদর্শের উদ্বোধন ঘটিয়েছিল তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণ-এর প্রবাহ সমাজচিন্তাকে সমৃদ্ধ করেছে।

শিল্পাঞ্চলগুলিতে প্রায় শুরু থেকেই সামাজিক অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে। সামাজিক সম্পর্কগুলো নতুন রূপ নিয়েছে। পুরানো মূল্যবোধের উপর আঘাত নেমেছে। কারখানার মালিক ও কারখানার শ্রমিকদের পারস্পরিক সম্পর্কে দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রাধান্য লাভ করেছে। উৎপাদন ব্যবস্থার সংগঠন ও মালিকগণ প্রথম থেকেই তাদের লভ্যাংশ বৃদ্ধির প্রয়াসে শ্রমিকদের প্রয়োজনের / দাবীর কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। তার ফলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক শুরু থেকেই বৈরীভাবমূলক। পরবর্তীকালে কার্ল মার্ক্স শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার অমানবিক চরিত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বুর্জোয়া মালিক গোষ্ঠী কিভাবে শ্রমিকদের উপর নিপীড়ন / শোষণ চালিয়েছে তার বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার আবির্ভাবকালে শিল্পবিপ্লব ও শিল্পায়ন প্রক্রিয়াজাত এই সব দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সমস্যাই ছিল প্রধান রসদ।

নিউটন থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইংল্যান্ডে যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আবিষ্কার উদ্ভাবনের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল তারই পরিণতি হিসাবে ১৭৬০ সাল নাগাদ ঐ দেশেই শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত হয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ইংল্যান্ড এমনিতেই শিল্পকর্মে অনেক অগ্রসর ছিল। তদপুরি ইংল্যান্ড যেভাবে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল তাতে তার পক্ষে শিল্পায়নের গতি বাড়ানো অনেক সহজ হয়েছিল। যেটা লক্ষণীয় বিষয় তা হল এই যে শিল্পে প্রযুক্তির বিস্তার এবং নতুন যন্ত্রপাতি ও শিল্পসংগঠন পদ্ধতির প্রয়োগ যারা করেছিলেন তারা নিজেরা কিন্তু বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। যাঁরা এই বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা প্রধানতঃ জিন নিজ পেশায় যুক্ত থাকার সুবাদেই, অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে, নানা যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সক্ষম

হয়েছিলেন। এঁদের বিজ্ঞানী না বলে প্রযুক্তিবিদ্ বলে অভিহিত করাই সঙ্গত। যাই হোক্ এঁরা এবং শিল্পোদ্যোগীরা মিলে ইংল্যান্ডের শিল্প-সংগঠনে যে ব্যাপক পরিবর্তন আনলেন তা একই সঙ্গে অর্থনৈতিক সংগঠন এবং সামাজিক সংগঠনকে বিপুলভাবে নাড়া দিল। শিল্পবিপ্লব একপ্রকার সমাজবিপ্লবের রূপ পরিগ্রহণ করল। চিন্তাশীল মানুষেরা সেই সমাজবিপ্লবের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বিশ্লেষণে উদ্যোগী হলেন। আমরা আগেই জেনেছি অ্যাডাম স্মিথ্ প্রমুখরা অর্থনৈতিক সংগঠনগত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অর্থশাস্ত্র নামক প্রথম সমাজ বিজ্ঞানটির সূত্রপাত করলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজতত্ত্ব নামক সমাজ বিজ্ঞানটির আবির্ভাব হতে আরও কিছু সময় লেগেছিল ; কিন্তু শিল্পবিপ্লব যে সমাজ পরিবর্তনের ধারা প্রবাহিত করেছিল তাকে বুঝতে গিয়ে, তার তাৎপর্য বিবেচনা করতে গিয়ে, নানা ধরনের লেখক ও চিন্তানায়াক সমাজতত্ত্বের প্রাথমিক ভিত্তিগুলো তৈরী করে দিচ্ছিলেন

শিল্প বিপ্লবের প্রধান বিষয়টা কি ? ১৭৬০ সাল থেকে ১৮২০ সাল পর্য্যন্ত শিল্পবিপ্লবের প্রথম অধ্যায়টির দিকে লক্ষ্য রাখলেই বিষয়টি অনুধাবন করা যাবে। ১৭৬০ সালের আগে শিল্প উৎপাদনে এটাই রীতি ছিল যে গ্রামে বসবাসকারী শিল্পকর্মীদের কাছেই কাঁচা মাল পৌঁছে দেওয়া হবে এবং উৎপাদিত পণ্যটি সেখান থেকে বাজারে নিয়ে যাওয়া হবে। ১৮২০ সালের পর চিত্রটি পাল্টে গেল ; যাবতীয় উৎপাদন কর্ম হবে ফ্যাক্টরী বা কারখানায়। কাঁচামাল যাবে কারখানায় ; আবার কারখানা থেকেই বিক্রয়যোগ্য পণ্য নিয়ে যেতে হবে বাজারে। ১৭৬০ থেকে ১৮২০ এই ষাট বছরে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এই যে পরিবর্তন হ'ল তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল আজ আমরা অনেকেই অবগত আছি। সমাজ-কাঠামো এবং সামাজিক সম্পর্কের দিক্ থেকে এই পরিবর্তনের ফলাফল ছিল ব্যাপক। সাধারণভাবে বৃহত্তর সমাজে গ্রাম ও শহরতলীর প্রাধান্য হ্রাস পেতে থাকল ; গ্রাম-সমাজের, গ্রামীণ পরিবার ব্যবস্থার কাঠামোগুলো ভাঙতে আরম্ভ করল। শহরের, শিল্পাঞ্চলগুলির, কারখানা প্রধান এলাকার গুরুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকল। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন সম্পদ ও সভ্যতার প্রসার ঘটল, তেমনি অপরদিকে নতুন সভ্যতার অন্ধকার দিক্গুলো (যেমন অপরাধপ্রবণতা, শোষণ- অত্যাচার,বৈষম্যজনিত সমস্যা ইত্যাদি) উত্তরোত্তর প্রট হয়ে পড়ল। শিল্পবিপ্লবোত্তর এই সব পরিবর্তনখীল সমাজ জীবনধারার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়েই বিকশিত হতে থাকল সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনা। তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি ক্ষেত্রসমীক্ষা (Sruvey work) ভিত্তিক সমাজতত্ত্বেরও বিস্তার ঘটল নানা দেশের গবেষণা-সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে।

১.৩.২ ফরাসী দেশের বৌদ্ধিক বিপ্লব ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব

ফরাসী দেশের এন্লাইটেন্মেন্ট (Enllightenment) বা জ্ঞানদীপ্ত ধারা নামক বৌদ্ধিক আন্দোলনকেই সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার প্রথম স্তর বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দেশের এই জ্ঞানদীপ্ত ধারার প্রবর্তকগণ আগেকার চিন্তানায়কদের তুলনায় অনেক রীতিমাফিক এবং সুসংবদ্ধভাবে মানুষের অবস্থান ও অবস্থার আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু করেছিলেন। এঁরাই প্রথম সচেনতভাবে বৈজ্ঞানিক নীতি প্রয়োগ করে মানুষের সমাজ এবং মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণের প্রয়াস নিয়েছিলেন।

জ্ঞানদীপ্ত ধারাকে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার প্রারম্ভিক পর্ব বলে নির্দেশ করার প্রধান কারণ হ'ল এই যে, ঐ সময় থেকেই সামাজিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলো যুক্তি-বুদ্ধির নিরিখে বিবেচিত ও বিশ্লেষিত হতে থাকে। মানুষ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীব। যুক্তি বিচারই মানুষকে প্রকৃত মুক্তির ও স্বাধীনতার পথ দেখাতে পারে। এই ধরনের প্রত্যয় প্রকাশ করে এবং সর্বদাই এক সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি তথা 'যাচাই করে গ্রহণ করার' মানসিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে এন্লাইটেন্মেন্ট এর মানুষেরা বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণকে সমাজ-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও আবশ্যিক করে তুলল। মানুষের বিচারবুদ্ধি আছে এবং মানুষ নিজেকে আরও উন্নত, আরও পরিপূর্ণ করে তুলতে

পারে— এই ধরনের জ্ঞানদীপ্তপ্রত্যয় অল্পকাল পরে ফরাসী দেশের অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যায়ের বিপ্লবীদেরও উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৭৮৯ সালের ফরাসী দেশের ঐ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উৎস যেমন সেই দেশের জ্ঞানদীপ্ত ধারা, তেমনি সেই বিপ্লবের অন্যতম প্রভাব পরিণতি হ'ল সমাজ ও সামাজিক পরিবর্তনকে সনিষ্ঠভানে অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করার তাগিদ অনুভব করা।

জ্ঞানদীপ্ত ধারা খুব জোরালভাবে এই প্রত্যয়টি উপস্থাপিত করে যে মানুষই বিশ্বপ্রকৃতি অনুধাবনে, বিশ্বরহস্য উন্মোচনে, সক্ষম। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে বিশ্বপ্রকৃতিকে, প্রাকৃতিক সম্পদকে, ব্যবহার করতে পারে। মানুষের এই ক্ষমতার ভিত্তি হল তার যুক্তি-বুদ্ধি। Reason বা যুক্তি-বুদ্ধির অধিকারী হওয়াতে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির গতি-প্রকৃতি সংক্রান্ত নিয়মগুলো আবিষ্কার করে সেই মত তার জীবনযাত্রা পরিচালনায় সক্ষম হয়েছে, তার সমাজ ও সংস্কৃতিকে নতুন করে সংগঠিত করতে পেরেছে। আসলে পঞ্চদশ শতকের রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণ ইউরোপে যে আধুনিকতা ও নব্যবিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। তার উপর অগাধ আস্থা নিয়েই অষ্টাদশ শতকের এই জ্ঞানদীপ্ত ধারার প্রবর্তকগণ যুক্তি-বিচার এবং পর্যবেক্ষণ পরীক্ষাকেই সত্যানুসন্ধানের দুটি মূল স্তম্ভ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

ভৌত জগৎ কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়। সমাজ জগৎ ও সাংস্কৃতিক জগতেও কিছু নিয়ম বিধি থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। বিজ্ঞান ও যুক্তি বিদ্যায় আস্থাশীল জ্ঞানদীপ্ত মানুষেরা তাই সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যুক্তি-বিচার এর নিরিখে বিশ্লেষণ করে যা গ্রহণযোগ্য বা যুক্তিগ্রাহ্য নয় সেগুলি বর্জন করার প্রস্তাব হাজির করেছেন। এইভাবে এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট ইউরোপীয় সমাজে পরিবর্তন ও প্রগতির সন্ধান দিয়েছে। এঁদের প্রধান অস্ত্র ছিল সমালোচনা (Criticism)। সন্দেহ নিরসনের মধ্য দিয়ে সত্যে উপনীত হওয়ার যে পদ্ধতির সন্ধান দিয়েছিলেন রেনে দেকার্ত সেটা জ্ঞানদীপ্ত চিন্তানায়কদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই কোন কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস বা বদ্ধমূল ধারনার ভিত্তিতে পরিচালিত না হয়ে কেবলমাত্র যুক্তি-বুদ্ধি আশ্রয় করে সমাজজীবন যাপন করার কথা তাঁরা বলেছেন। মানুষের স্বাধীন চিন্তার অধিকারের দাবীও তাঁরা জানিয়েছিএলন। তাঁদের মতে সামন্ত প্রভূতের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা অযৌক্তিক এবং অনৈতিক। তাঁরা আবার নৈতিকতার প্রশ্নে ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থক। দেকার্ত-এর দর্শন তাঁদের আকৃষ্ট করলেও তাঁরা কিন্তু নিউটনীর কর্মপদ্ধতির প্রতি অনেক বেশী শ্রদ্ধাবান ছিলেন। অবরোহ পদ্ধতির তুলনায় নিউটনীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি জ্ঞানদীপ্ত চিন্তানায়কদের অনেক বেশী প্রভাবিত করেছিল। তথা অনুসন্ধান, অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ এক কথায় ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জ্ঞান-এর ভিত্তিতেই তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক নীতি নির্দ্ধারণের চেষ্টা করেছেন। বস্তুজগৎ সর্বজনীন বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—এরূপ বৈজ্ঞানিক অনুমান-এর ভিত্তিতেই নিউটন দেখিয়েছেন বিশ্বের ঘটনাবলী, পার্থিব জগৎ-এর উপাদানগুলি, কোন এলোমেলো অসংলগ্ন ব্যাপার নয়। কন্‌ডিলাক (Condillac), ডি এলেমবার্ট (D Alembert) প্রমুখ জ্ঞানদীপ্ত চিন্তানায়কগণ এই নিউটনীয় বিজ্ঞানের সামাজিক ও বৌদ্ধিক প্রগতির শর্তগুলি বিচার করেছেন। সমালোচনামূলক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সদর্থক বিজ্ঞানবাদকে যুক্ত করে জ্ঞানদীপ্ত চিন্তানায়কগণ যে বিচার বিশ্লেষণ শুরু করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার প্রথম স্তর বলে অভিহিত হতে পারে। যুক্তি এবং পর্যবেক্ষণ (Reason and observation) উভয়ের মিলনেই কেবল সত্যে উপনীত হওয়া যায়। এই নিউটনীয় বৈজ্ঞানিক দর্শন যেমন এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট্-এর প্রত্যয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি এটাই অষ্টাদশ শতকের সমাজদর্শন তথা সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনারও ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল।

নিউটনের পাশাপাশি ইংরেজ দার্শনিক ও রাষ্ট্রচিন্তানায়ক জন লক্-এর কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

লক্-এর অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন কন্ডিলাক (Condillac) আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে আরও প্রসারিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তথ্য ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্তি-বুদ্ধি মিলিয়ে পার্থিব জগৎ ও সমাজজগৎকে অনুধাবন করার এই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা নিউটন ও লক্ উভয়ের দ্বারাই প্রভাবিত। জ্ঞানদীপ্ত চিন্তানায়কগণ সমাজতত্ত্ব নির্মাণে অসামান্য অবদান রেখে গেলেন এই নতুন বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা-পদ্ধতি হাজির করে। পশ্চিমী সমাজতত্ত্ব পরবর্তীকালে যে কেবল জ্ঞানদীপ্ত ধারাকেই আঁকড়ে ধরেছিল তা বলা যাবে না। তবে যাঁরা তাঁদের বর্জন করেছেন তারাও প্রাথমিকভাবে জ্ঞানদীপ্ত ধারার প্রস্তাবগুলোকে বিবেচনা করেই তাঁদের নতুন সমাজতত্ত্ব রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। Arving M. Zeitlin সঠিকই বলেছেন, ''Much of Western sociology developed as a reaction to Enlightenment.''

১.৪ বিশ্ববিদ্যালয় বিপ্লব

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেই সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব। প্রাচীন যুগ বা মধ্যযুগে সমাজ নিয়ে কোন ভাবনা চিন্তা হয়নি এমন নয়। আমরা প্লেটো বা এ্যারিস্টটল-এর লেখায় কিংবা প্রাচীন ভারতে কৌটিল্যকৃত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে নানা সামাজিক প্রশ্নের উপস্থাপনা দেখব। তবে কিনা এঁরা কেউই স্বতন্ত্রভাবে কেবল সমাজচর্চায় নিজেদের যুক্ত রাখেন নি। তেমনি বলা যায় মধ্যযুগের পন্ডিত মানুষেরাও নানাভাবে সমাজচিন্তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কিন্তু তাঁদের সমাজভাবনা ছিল ভীষণভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস ও গোঁড়ামির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তথাপি অন্য আর একটি কারণে আধুনিক সমাজচিন্তা ও সমাজতত্ত্ব গঠনে মধ্যযুগের বিশিষ্ট অবদান লক্ষ্য করা যাবে। এই কারণটি হল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সংগঠন—বিশ্ববিদ্যালয়ের আগমন।

বিশিষ্ট লেখক Randall Colling বলেন, ''The major contribution of the Middle Ages to subsequent thought was not an idea, but an institution : the rise of the Univerisity.'' অর্থাৎ উত্তরকালীন চিন্তার জগতে মধ্যযুগের প্রধান অবদান খুঁজে পাওয়া যাবে কোন ভাব বা ধারণা সংগঠনের মধ্যে নয়। 'বিশ্ববিদ্যালয়' নামক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সংগঠনের মধ্যেই সেই অবদান লক্ষ্য করা যাবে।

রেনেসাঁস-এর কিছু আগে একাদশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন শহরে (যেমন পারী, বলোনা, অক্সফোর্ড) ছাত্র-শিক্ষকদের সংগঠিত সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এই সমাবেশগুলি ক্রমে ক্রমে চার্চ এবং রাষ্ট্রের সমর্থন নিয়ে স্বশাসিত শিক্ষা-ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে উঠতে থাকে। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বশাসনের অধিকারী হওয়ার পর শিক্ষিত মানুষদের একাংশের কাছে উপার্জন ও জীবনধারণের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছাত্র ও শিক্ষকদের সংখ্যা যেমন বাড়ল তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে একপ্রকার প্রতিযোগীতাও দেখা দিল। তার ফলে শিক্ষক, বিজ্ঞানী, গবেষক, দার্শনিক এদের মধ্যে নতুন ভাবনা, নতুন বিজ্ঞান চিন্তা ও নতুন দার্শনিক ধারণার প্রকাশ ঘটতে থাকল। ইউরোপের মধ্যযুগে উদ্ভূত এই বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে চিন্তাশীল মানুষ তথা বুদ্ধিজীবীদের কাঙ্খিত ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরাসরি আধুনিক বৌদ্ধিক ধারাটি গড়ে ওঠে নি। কেননা, পঞ্চদশ শতক তথা রেনেসাঁস-এর শতকে দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়-এর মর্যাদা হ্রাস পাচ্ছে, ছাত্রসংখ্যাও কমে আসছে। সৃজনশীল লেখকও দার্শনিকগণ বিশ্ববিদ্যালয়-এর আশ্রয় ছেড়ে কোন রাজা বা ভূস্বামীর পৃষ্ঠপোষকতায় জীবন যাপন শুরু করেন।

চার্চ-এর সামগ্রিক নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-এর মধ্যেই মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিকশিত হচ্ছিল। রেনেসাঁস-এর সূত্রপাতে দেখা গেল চার্চ এবং তার অধীনস্থ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির বাইরেও বুদ্ধিজীবীরা তাদের জীবিকার সংস্থান করতে পারে। এবং এর ফলে চিন্তাশীল মানুষেরা সেক্যুলর (বা ধর্মনিরপেক্ষ) মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও দর্শন-এর প্রসারে অগ্রসর হতে পারলেন। বিভিন্ন অঞ্চলের বিজ্ঞান মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের নানাবিধ সৃজনশীল কাজ চলতে লাগল। এই সময়ে বিজ্ঞানচর্চা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আবার নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার আগমন লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, তথ্য আহরণভিত্তিক, সংশ্লেষাত্মক গবেষণা কর্মের সঙ্গে তাত্ত্বিক সাধারণীকরণ-এর (Generalization) প্রবণতাকে যুক্ত করা হয়। আধুনিক দর্শনেরও সূত্রপাত হয় এই সময়ে— বেকন, দেকার্ত, লাইবনিৎস প্রমুখ চিন্তানায়কদের অবদানের মধ্য দিয়ে। সমাজবিজ্ঞান এর পক্ষে অবশ্য বিকাশ-প্রক্রিয়াটি মোটেই সহজ ছিল না। ধর্মসংস্কার আন্দোলন, প্রোটেস্টান্ট মতবাদ, পিউরিটান বিপ্লব ইত্যাদি ঘটনা ইউরোপীয় সমাজের আদর্শগত ভিত্তি নির্ণয়ে জটিলতা এনে দিল। মনে রাখতে হবে প্রকৃতি বিজ্ঞান যদিও বা ভাবাদর্শ-নিরপেক্ষ হতে পারে সমাজবিজ্ঞান কোনমতেই অনুরূপ নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে না। যে কারণে দেখা যায় ঐ সময়ে যে সমাজবিদ্যাটি মোটামুটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সেই ইতিহাসশাস্ত্র কোন ক্ষেত্রে ক্যাথলিকদের পক্ষে আবার কোন পণ্ডিতের লেখনীতে প্রোটেষ্টান্টদের পক্ষে ওকালতি করেছে।

চার্চ ব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বন্দ্ব এই সময়কার বৌদ্ধিক প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ক্রমশই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। জার্মানীতে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের অধীনেই বৌদ্ধিক ক্রিয়াকলাপ সংগঠিত হয়েছে। Randall Collins লিখেছেন, ''social science when it appeared in germany was part of the official interest in developing information and technique for Government purposes.'' অর্থাৎ জার্মানীতে যখন সমাজবিজ্ঞান এল তখন তা মূলতঃ সরকারী প্রয়োজনে, তথ্য ও কৌশল ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই কাজে লাগান হয়েছিল। এজন্য প্রথম দিকে এই সমাজবিদ্যাকে জার্মানীতে রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান (State Science বা staats wissenschaft) বলা হত।

ঐ সমাজবিজ্ঞান ছিল জনপ্রশাসন এবং বর্ণনামূলক পরিসংখ্যানের এক বিচিত্র মিশ্রণ। তবুও একেই আমরা ইউরোপীয় সমাজতত্ত্ব চর্চার উৎস বলে নির্দেশ করতে পারি। ফ্রান্সে সৃষ্টি হ'ল এক ধরনের আমলাতান্ত্রিক অভিজাতগোষ্ঠী। এই নতুন অভিজাতগোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত সেক্যুলর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের উপস্থিতি ঘোষণা করেছিল এই গোষ্ঠী থেকেই এসেছিলেন মন্তেস্কু (Montesquicu), তুর্গো (Turgot) কন্দরসে (Condorcat) বা পরবর্তী সময়ে তকেভিল (Tocqueville)-এর মত চিন্তানায়কগণ।

ইংল্যান্ডের অবস্থা ছিল কিছুটা ভিন্ন। সেখানে প্রোটেস্টান্ট বিপ্লবের সাফল্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রোমান চার্চ-এর নিয়ন্ত্রণ থেকে যেমন মুক্ত হল, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পন্ডিতদের যথাসম্ভব স্বাধীন ভাবনা চিন্তার সুযোগ হওয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ সহজ হয়ে উঠল। তবে নানা কারণে সেখানে ফ্রান্স বা জার্মানীতে যেমন হয়েছিল, দীর্ঘদিন সেরূপ কোন সমাজতাত্ত্বিক চিন্তক গোষ্ঠী (School of thought) গড়ে ওঠেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক নির্ণয় করতে শেষ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে অষ্টাদশ শতকের জার্মানীতেই আসতে হবে। ফ্রান্সে যখন জ্ঞানদীপ্ত ধারা (Enlightenment) প্রধান হয়ে উঠেছে তখন জার্মানীতে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা নীরব বিপ্লব ঘটছিল। প্রুশিয়া ও তার চারপাশে (তখনও সমগ্র অঞ্চল জার্মানী নামে স্বীকৃতি

পায়নি) অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই যে উদ্যোক্তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি সকলের আনুগত্য নিশ্চিত করা। উচ্চশিক্ষা লাভ করে অনেকে শিক্ষকতার পেশায় যেমন নিযুক্ত হতে পেরেছে তেমনি কোন কোন স্নাতক চার্চের লোভনীয় পদেও নিযুক্ত হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উচ্চাকাঙ্খা নিয়ে ক্রম বর্দ্ধমান মানুষ যেমন উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে তেমনি তার চাপে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কলাবিভাগের প্রসার ঘটেছে, নতুন নতুন প্রফেসর-এর পদ তৈরী হয়েছে। নতুন নতুন বিষয় নিয়ে গবেষক মহলে আলোচনা উঠেছে। ভাষাতত্ত্ব নিয়ে চর্চা হয়েছে। ভাষাতত্ত্ব বিভাগের কাজ পরবর্তীকালে ইতিহাস এবং নৃতত্ত্ববিদ্যার উন্নতির প্রভূত সাহায্য করেছে। এই সময়েই জার্মানীতে ঘটেছে সেই বৌদ্ধিক বিপ্লব যার কর্ণধার ছিলেন কান্ট (Kant), ফিখ্‌টে (Fichte), শেলিঙ্ (Schelling), হেগেল (Hegel), শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) প্রমুখ চিন্তানায়কগণ। এই সব উচ্চমানের দার্শনিকদের অবদান এবং সাধারণভাবে জার্মানীর প্রায় দুই ডজনের মত বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যস্ত কার্যকলাপ জার্মানীকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর জগতে নেতৃস্থানীয় করে তুলল। তাই R. Collins লিখেছেন, ''The German University revolution was to be imitated eventually around the world.'' উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সমাজতত্ত্বের অন্যতম রূপকার এমিল দুরখাইম (Emile Durkhaim) তাঁর প্রথম জীবনে জার্মানীতে গিয়ে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছেই প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলেই গড়ে তোলা হচ্ছে। ইংল্যান্ডে জার্মান বৌদ্ধিক বিপ্লবের প্রভাত ছিল সুদূরপ্রসারী। ইংরেজি ভাববাদী দার্শনিকগণ ছাড়াও বারট্রান্ত রাসেল-এর মত মানুষকেও দেখা যাচ্ছে দর্শনের জগতে সর্বাধুনিক প্রবণতাগুলো জানবার জন্য জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশুনা করছেন। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লব আমেরিকাতেও প্রবলভাবে চাপ সৃষ্টি করেছিল। ১৮৭৬ সালে জন হপকিন্‌স বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হল একেবারেই জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেল অনুসরণে।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাত-প্রতিঘাত এর মধ্য দিয়ে সমাজবিজ্ঞানমূলক নতুন নতুন ধ্যানধারণার বিকাশ ঘটেছে। সংগঠিত ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে সুসংবদ্ধ জ্ঞানের বিকাশে সহায়তা করতে পারে এবং জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেভাবে এই শিক্ষা-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করেছিলেন তা এখন ইতিহাস। আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজতত্ত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে উনবিংশ শতকের শেষের দিকে। কিন্তু রাজনীতি চিন্তার সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাজকাঠামো / সমাজপ্রবাহ অনুশীলন যেমন ফ্রান্সের জ্ঞানদীপ্ত ধারার মধ্যে লক্ষ্য করা যাবে তেমনি অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা যে বৌদ্ধিক বিপ্লব সংগঠিত করেছিল তার অন্যতম ফল হিসাবে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা-বিশ্লেষণ-এর উল্লেখ করা যাবে।

১.৫ অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের কতিপয় বিশিষ্ট সমাজ চিন্তানায়ক / সমাজ দার্শনিক

সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বিচ্ছিন্নতা, সামাজিক সংহতি, সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়েই সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার সূত্রপাত হয়। শিল্পবিপ্লবের ফলে এই সমস্যাগুলি যে নতুন মাত্রা ও চরিত্র পরিগ্রহণ করেছিল তার সঠিক অনুধাবনা ও বিশ্লেষণ ছিল প্রথম যুগের সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্র। পৌর সমাজকে রাষ্ট্রীয় সমাজ থেকে (Civil Soceity and Political Society) স্বতন্ত্র করে নিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করেন এই প্রথম যুগের চিন্তানায়কগণ। ইতালীর ভিকো (Vico) ও ফ্রান্সের মন্তেস্ক্যু (Montesquieu) এবং স্কটল্যান্ডের ফারগুসন্ (Ferguson) ও মিলার (Millar) সমাজতত্ত্বের এই প্রস্তুতি পর্বের লেখক। এই পর্যায়ের দ্বিতীয় এককে মন্তেস্কু

সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে। এখানে অন্য তিনজন লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হ'ল।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে **গিয়ামবাতিস্তা ভিকো** (১৬৬৮-১৭৭৪) দি নিউ সায়েন্স (The New Science) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সমাজচিন্তামূলক এই গ্রন্থে মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে তুলনামূলক বিশ্লেষণের সাহায্যে বলা হয়েছে ধর্ম, সম্পত্তি, ভাষা ও শিল্প-সাহিত্যের উত্থানের কথা। ১৭৪৮ সালে মন্তেস্ক্যুর "The Spirit of the Laws" প্রকাশ পাওয়ার অল্পকাল আগে ১৭৪৪ সালে ভিকোর গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ্যালান সুইন্‌জউড্-এর মতে (Alan Swingewood) ভিকো ও মন্তেস্ক্যুর এই দুটি গ্রন্থই সর্বপ্রথম সমাজকে সংগঠিত ব্যবস্থা হিসাবে উপস্থাপিত করেছে এবং নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গে সমাজের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলোর সম্পর্ক নির্দেশ করেছে।

পৃথিবীর ইতিহাস সকলের বোধগম্য করার প্রয়াসে ইতিহাসের ত্রিবিধ স্তর বা তিনটি স্বতন্ত্র পর্য্যায়ের কথা বলেন—প্রথমতঃ দৈব পর্যায় (age of the Gods), দ্বিতীয়তঃ বীরপুরুষদের পর্য্যায় (age of the Heroes) এবং সর্বশেষে মানুষের পর্যায় (age of Men)। নবতম পর্যায়ে ভিকো মানুষের সৃজনশীল সক্রিয়, ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। পৌরসমাজ মানুষেরই সৃষ্টি— সমাজের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক স্তর রয়েছে—সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো এবং মানবিক সম্পর্কগুলো মানুষেরই সচেতন ক্রিয়াকলাপের ফল এই সব আধুনিক প্রত্যয়গুলো ভিকো জোরালভাবে হাজির করেন। হবস্, লক্ প্রমুখ **চুক্তিবাদীদের অনৈতাসিক** দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধাচরণ করে ভিকো পরিবর্তনশীল মানবপ্রকৃতির কথা বলেন এবং মানুষের বিচিত্র ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উল্লেখ করেন। সমাজবিজ্ঞান-এর ক্ষেত্রে তিনি এক অসাধারণ নীতি নির্দেশ করেন—তিনি বলেন, মানুষ কেবল সেই সব বিষয়ই জানতে পারে যা মানুষেরই তথা সমাজেরই সৃষ্টি। ভিকোর মানবতাবাদী ইতিহাস দর্শনকে হেগেল ও মার্ক্স-এর ইতিহাস দর্শনের পূর্বসূচক বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। অনুবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (atomic individualism) বর্জন করে তিনি যে সামগ্রিক গঠনগত নীতির (organic whole) ভিত্তিতে সমাজকে অনুধাবন করার কথা বলেছেন তা ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজতত্ত্বের কর্ণধারদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে স্কট্‌ল্যান্ডে এক নতুন জ্ঞানদীপ্ত ধারার প্রকাশ ঘটে। দার্শনিক ডেভিড্ হিউম, (David Hume) এই ধারার অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচনায় সমাজতত্ত্ব পাওয়া যাবে না ঠিকই ; কিন্তু স্কট্‌ল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ্ এ্যাডাম স্মিথ বা স্কট্‌ল্যান্ডের দার্শনিক ফারগুসন্-এর উপর তাঁর গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। আবার ফারগুসন ছাড়াও জন্ মিলার (John Millar) নামে অপর এক ব্যক্তিত্ব সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

হিউম ছিলেন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক (Empiricist)। অভিজ্ঞতা, ঘটনা, তথ্যাবলী, উপযোগিতা এ সবই ছিল তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব ও সমাজ দর্শনের ভিত্তি। মানবচরিত্র গঠনে বাস্তব অবস্থা, পরিবেশ তথা সামাজিক উপাদানের গুরুত্ব সর্বাধিক বলে তিনি মনে করতেন। এই হিসাবে বলা যায় দার্শনিক হলেও তাঁর মধ্যে সমাজতত্ত্ব ছিল।

এটা ঠিকই যে অষ্টাদশ শতক শেষ না হওয়া পর্যন্ত অর্থশাস্ত্র ও ইতিহাস থেকে সমাজতত্ত্বকে পৃথক করে নেওয়ার অবস্থা তৈরী হয় নি। যেমন, এ্যাডাম স্মিথ্-এর মধ্যে অর্থনীতি, দর্শন ও সমাজচিন্তার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। তবে সাধারণভাবে স্কটল্যান্ডের বুদ্ধিজীবীরা মনে করতেন সমাজ হ'ল ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের বিষয়। সব কিছুর ঊর্দ্ধে তাঁরা সমাজ পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে এবং এক ধরনের সমাজ থেকে আর এক ধরনের সমাজে উত্তরণ-এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। মিলার (Millar) যেমন মনে করতেন মানব সমাজের পরিবর্তন হচ্ছে অমার্জিত, অনুন্নত স্তর থেকে উন্নত, পরিশীলিত স্তরে। **ফারগুসন** (Ferguson)

উল্লেখ করেছেন অসভ্য, বর্বর ও উন্নত সমাজের ক্রমোচ্চ স্তরের কথা। ফারগুসন ও মিলার উভয়েই সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। স্তরবিন্যাসের সঙ্গে শ্রমবিভাজন ব্যবস্থার সম্পর্ক নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে সমাজের সংস্কৃতিগত প্রগতির উৎস হ'ল শিল্পায়নগত পরিবর্তন। স্কট বুদ্ধিজীবীরা সমাজ পরিবর্তন, প্রক্রিয়াগত দ্বন্দ্ব এবং স্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজের বিকাশের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মানুষের ক্ষমতা এবং তৎপরতার প্রতি ফারগুসন বিশেষ আস্থা রাখতেন। তিনি লিখেছেন, "...the most animating occasions of human life, are calls to danger and hardship, not invitations to safety and ease." অর্থাৎ তাঁর মতে মানুষের মূল পরিচয় নিহিত থাকে আমার-আলস্যের জীবনে নয়, বরং বিপদ সামলানো এবং কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে। মন্তেস্ক্যুর অব্যবহিত পরের ফরাসী জ্ঞানদীপ্ত ধারায় যে অনুবাদী (atomic) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রকাশ পেয়েছিল তাতে সমাজতাত্ত্বিক ধারাটি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে ফারগুসন পৌর সমাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারে সাহায্য করেন। বলা যেতে পারে ভিকোর মতই ফারগুসন ও মিলার মানবসমাজ বিজ্ঞানের ভিতি রচনা করেছিলেন এবং ঐ বিজ্ঞানের মূল প্রশ্ন ও সমস্যাবলীর ইঙ্গিত দানে সক্ষম হয়েছিলেন।

১.৬ সারাংশ

সমাজ তথা সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাস-প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে চর্চা করা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ঘটনা। সাধারণভাবে শিল্পবিপ্লবের ঐতিহাসিক পর্যায়টিকেই সমাজতত্ত্বের আবির্ভাবকাল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। পৌর সমাজের ধারণা গড়ে ওঠা এবং রাষ্ট্রীয় সমাজের সঙ্গে তার পার্থক্য নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব।

১৮৩০-এর দশকে সমাজতত্ত্ব নামটি চয়ন করেছিলেন আগস্ত কঁত্। কিন্তু ঐ আনুষ্ঠানিক নামকরণের বহু আগেই শাস্ত্রটির জন্ম হয়েছিল শিল্পবিপ্লব ও অন্যান্য সমাজ বিপ্লবের পরিণতি স্বরূপ। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের পাশাপাশি ফ্রান্স ও জার্মানীতে নানাধরনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং অষ্টাদশ শতকের শেষে ১৭৮৯ সালের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা-চিন্তার প্রসারে সাহায্য করেছে।

শিল্পোৎপাদনে পদ্ধতিগত পরিবর্তন অর্থাৎ 'কারখানা ব্যবস্থার' প্রবর্তন মানুষের অতীত ও বর্তমান অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে যেমন সমুদ্রসম ব্যবধান এনেছে, তেমনি তার সমাজজীবনেও এনেছে ব্যাপক পরিবর্তন। শহর ও শিল্পাঞ্চলে বিপুল সংখ্যায় মানুষ জড় হয়েছে। ফলে গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রেই পরিবার কাঠামো ও সমাজ-কাঠামোতে নতুনত্ত্ব, পরিবর্তন, দেখা গেছে। আর এই সব পরিবর্তন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার বিকাশ ঘটেছে। কঁত আধুনিক সমাজকে শিল্প-সমাজ বলে অভিহিত করেছেন। কার্ল মার্ক্স শিল্পবিপ্লবের পরিণতিস্বরূপ সামন্তব্যবস্থার ভাঙনকে যেমন প্রগতির নির্দেশক বলেছেন, তেমনি আবার নতুন বুর্জোয়া শ্রেণী যেভাবে ধীরে ধীরে শোষণের মাত্রা বাড়িয়েছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য শ্রমজীবীদের উৎসাহিত করেছেন, সমাজজীবনধারার এই নতুন বিচার ভিন্ন ধরনের সমাজতত্ত্ব (মার্ক্সীয়-সমাজতত্ত্ব) গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। তবে সাধারণভাবেও বলা যায়—শিল্পায়নজাত শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব সংঘাতই ছিল সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার প্রধান রসদ।

ফরাসী দেশের এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট (Enlightenment) বা জ্ঞানদীপ্ত ধারা সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনার অন্যতম

ভিত্তি রচনা করেছিল। এই ধারার প্রভাবেই সামাজিক কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলো যুক্তি-বুদ্ধির সাহায্যে বিবেচিত ও বিশ্লেষিত হতে থাকে। ১৭৮৯ সালের বিপ্লবীরা অনেকেই এই জ্ঞানদীপ্ত ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। এই ধারা ইউরোপীয় সমাজে প্রগতি ও পরিবর্তনের সন্ধান দিয়েছিল। দেকার্ত-এর দর্শন ও নিউটনের বিজ্ঞান এই জ্ঞানদীপ্ত ধারার দুটি স্তম্ভ। পরবর্তীকালের লক্-এর অভিজ্ঞতাবাদ সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আর একটি প্রধান ধাপ হিসাবে কাজ করেছে। জার্মানীতে বিশেষভাবে সংগঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (যেমন বিশ্ববিদ্যালয়) সমাজতত্ত্ব গঠনে সহায়তা করেছে। সেক্যুলর শিক্ষাব্যবস্থা সমাজতত্ত্ব নির্মাণে সহায়তা করেছে।

ইতালীর ভিকো, ফ্রান্সের মন্তেস্ক্যু, ইংল্যান্ড তথা স্কটল্যান্ডের একগুচ্ছ বুদ্ধিজীবী (যেমন **স্মিথ্ ফার্গুসন**) এঁদের মিলিত অবদান সমাজতত্ত্বের বিকাশে সহায়তা করেছে।

১.৭ অনুশীলনী

(ক) **নিম্নোক্ত তিনটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন**

(১) শিল্পবিপ্লব বলতে কি বোঝায় সংক্ষেপে লিখুন।

(২) শিল্পবিপ্লব কিভাবে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা গঠনে সহায়তা করেছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(৩) জ্ঞানদীপ্ত ধারা (Enlightenment) কি হিসাবে সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা চিন্তার প্রাথমিক পর্ব বলে চিহ্নিত হবে তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

(খ) **নিম্নোক্ত তিনটি প্রশ্ন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন**

(১) বিশ্ববিদ্যালয় বিপ্লব বলতে কি বোঝায় ? কিভাবে এই বিপ্লব সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার আবির্ভাবে সহায়তা করেছে তার বিশদ আলোচনা করুন।

(২) সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা-চিন্তার বিকাশে ভিকো, ফারগুসন ও মিলারের অবদান আলোচনা করুন।

(৩) সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা-চিন্তার বিকাশে ফ্রান্স, জার্মানী ও ইংল্যান্ড-স্কট্ল্যান্ডের বিশিষ্ট অবদানের কথা বিবৃত করুন।

(গ) **শূন্যস্থান পূরণ করুন**

(১) সমাজতত্ত্বের গোড়াপত্তনের —— দেশকেই অগ্রগণ্য বলা যায়।

(২) সমাজতত্ত্বের নামটি চয়ন করেন বিশিষ্ট ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী ——।

(৩) —— ব্যবস্থার প্রবর্তনই হ'ল শিল্পকর্মে বিপ্লব।

(৪) —— সাল নাগাদ শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত হয়।

(৫) সমাজতত্ত্বের অন্যতম রূপকার —— তাঁর প্রথম জীবনে জার্মানীতে ... পাঠ নিয়েছিলেন।

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Anthony Giddens — *Sociology — A Critical Introduction.*

(২) Randall Colling — *Three Sociological Tradition.*

(৩) Aaln Swingewood — *A Short History of Sociological Thought.*

(৪) Irving Zeitlin — *Ideology and the Development of Sociological Theory.*

একক ২ ❐ সমাজতত্ত্বের রাজনৈতিক-দার্শনিক ভিত্তি (মন্তেস্ক্যুর অবদান)

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ প্রস্তাবনা
২.৩ দর্শন, রাষ্টবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব
২.৩.১ মন্তেস্ক্যুর ইতিহাস দর্শন
২.৩.২ মন্তেস্ক্যুর রাষ্ট্রচিন্তা
২.৪ **The Spirit of the Laws :** রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব
২.৫ বৈচিত্র-বিশৃঙ্খলা থেকে সংহতি : মন্তেস্ক্যুর সমাজতত্ত্বের মূলকথা
২.৬ সারাংশ
২.৭ অনুশীলনী
২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে রাজনীতি-বিজ্ঞান ও দর্শনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা অনুধাবন করা যাবে।
- যাঁকে প্রথম সমাজতাত্ত্বিক বলা সম্ভব সেই ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী মন্তেস্ক্যুর কিছু তত্ত্ব চিন্তা উপলব্ধি করা যাবে।
- জানা যাবে মন্তেস্ক্যুর সমাজতত্ত্বের মূল বক্তব্য কি।
- এটাও জানা যাবে যে সাম্প্রতিককালে যে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের (Political Sociology) অনুশীলন হয় তার উৎস নিহিত রয়েছে মন্তেস্ক্যুর রচনায়।

২.২ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতকের ইউরোপেই সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা-চিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল। ইতালী, ফ্রান্স ও স্কটল্যান্ডের জ্ঞানদীপ্ত ধারার সঙ্গে যুক্ত কিছু অগ্রণী মানুষ এই "প্রারম্ভিক" ভূমিকা পালন করেছিলেন। আর এদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন ফ্রান্সের বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী মন্তেস্ক্যু (Montesquieu)। ফারগুসন, মিলার প্রমুখ স্কটল্যান্ডের লেখকগণ মন্তেস্ক্যুর চিন্তার দ্বারাই প্রভাবিত হন। অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের জ্ঞানদীপ্ত ধারার প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক হিসাবেই মন্তেস্ক্যু চিহ্নিত। ''The Spirit of the Laws'' নামক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে মন্তেস্ক্যু জানিয়েছেন যে তিনি কোন সংস্কারবশতঃ নয়, বরং বিষয়ের প্রকৃতির ভিত্তিতেই সমাজ ও রাষ্ট্রের বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তাঁর নীতিগুলো নির্দ্ধারণ করেছিলেন (I have not drawn my principles from my prejudices but

from the nature of things)। সমাজকে তিনি একটি কাঠামোগত সমগ্র (Structural whole) হিসাবে গণ্য করেছেন। তাই দেখা যায় তাঁর মূল যে 'শ্রেণী বিভাজনের তত্ত্ব' সেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপ বা ধরনগুলি সমাজব্যবস্থার চরিত্রের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে মিলিয়েই উপস্থাপিত করা হয়েছে। মন্তেস্ক্যু মনে করতেন সমগ্র সমাজব্যবস্থার চরিত্রের সঙ্গে নির্দিষ্ট আদর্শগত সাংবিধানিক দাবীর একটা ভারসাম্য গড়ে তুলতে হয় এবং তার জন্য আইন প্রণেতাদের সনিষ্ঠ প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

মন্তেস্ক্যু মানবসমাজের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের উপর আস্থা রাখতেন। সমাজ-প্রবাহ এবং সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলোকে তিনি নির্দিষ্ট বস্তুগত অবস্থার ফল বলে মনে করতেন। তাঁর এরূপ প্রত্যয় ছিল যে, ঐ বস্তুগত শর্ত বা অবস্থাগুলো অভিজ্ঞতাবাদী ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আবিষ্কার করা যাবে। অথচ এটাও লক্ষণীয় বিষয় যে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের উপর এতটা আস্থা থাকলেও মন্তেস্ক্যু সমাজের পরিবর্তন (Social Change) সংক্রান্ত কোন তত্ত্ব বা ব্যাখ্যা হাজির করেন নি। এখানে যে পাঠ হাজির করা হল তাতে এই সব বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে জানান হবে।

২.৩ দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব

সমাজতত্ত্বের সঙ্গে সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের কত গভীর সম্পর্ক তা মন্তেস্ক্যুর রচনাবলী থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। মানুষের মূল প্রকৃতি ও চরিত্রের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় বলে তিনি মনে করতেন না। বরং মনুষ্য প্রকৃতির, মানুষের ভাবাবেগ ও অনুভূতির, ধারাবাহিকতা সম্পর্কে তিনি আস্থাশীল ছিলেন। এই মনুষ্যপ্রকৃতি-দর্শন তাঁর মনুষ্য সমাজ-দর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এতে পরিবর্তনশীলতার নীতি অগ্রাহ্য হয়েছে, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গতি বিনষ্ট হয় নি।

মন্তেস্ক্যুর দর্শন অনুযায়ী অতীত বর্তমানকে শিক্ষা দিতে পারে ; কেননা, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অতীতে যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনই আছে। মানুষের সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলো চরিত্রগতভাবে একই রকম রয়েছে—সুদূর অতীত থেকে সেগুলি একইভাবে তাদের ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই সব দার্শনিক অবস্থান যাঁরা চিন্তার ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে তাঁর সমাজতত্ত্বে কেন সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব অনুপস্থিত সেটা আমাদের বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

সামাজিক পরিবর্তনের দর্শন অনুপস্থিত হলেও মানব প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তেস্ক্যু যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। যেমন তিনি বলেছেন, কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা জীবনের মূল লক্ষ্য হতে পারে না ; বরং সদ্‌গুণসম্পন্ন জীবনই হ'ল শ্রেষ্ঠ জীবন (the best life is the virtuous one)। সদ্‌গুণ যেখানে প্রাধান্য পায় না সেখানে স্বাধীনতা অন্তর্হিত হয়। এটাও লক্ষণীয় যে তাঁর প্রথম রচনা Persian Letters (১৭২১) এবং শেষ রচনা "The Spirit of the Laws" (১৭৮৪) উভয়েরই প্রধান বিষয় হল 'সদ্‌গুণ (Virtue) ও স্বাধীনতা' (Liberty)।

'Considerations on the grandeur and decadence of the Romans' নামে তিনি আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ লেখেন। ১৭৩০-এর দশকের গোড়ায় ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পর ঐ গ্রন্থ রচিত হয়। ১৭২৮ থেকে ১৭৩১ সাল পর্যন্ত ৩/৪ বছর তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যান যার বেশীর ভাগ তিনি ইংল্যান্ডেই কাটিয়েছিলেন। ইংরেজ অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনধারা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বলা হয়ে থাকে, রোম সংক্রান্ত তাঁর

গ্রন্থটি আসলে পরোক্ষভাবে তাঁর নিজের দেশ ফ্রান্সের মানুষদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য লেখা। তিনি ফ্রান্সকে সংস্কারের পথে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলোর উত্থান-পতনের প্রক্রিয়া তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। তাঁর দর্শন অনুযায়ী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের পতন এড়াতে বা পতন-প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার প্রয়াসে প্রথমেই পতনের কারণ জানা প্রয়োজন। রোমানদের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলোর ক্ষেত্রে তিনি এই জন্যই "কারণ" (causes) অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন। এবং এখানেই তিনি মানবপ্রকৃতির অচঞ্চল ধারার ও মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর সমরূপতার দর্শন হাজির করেন।

২.৩.১ মন্তেস্ক্যুর ইতিহাস দর্শন

সাধারণভাবে অষ্টাদশ শতকের ইউরোপে দর্শন চিন্তায় কার্য-কারণ (causality) সম্পর্কের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল মন্তেস্ক্যু তার সমর্থক ছিলেন। উপরন্তু মন্তেস্ক্যু সেই কার্য্য-কারণ সম্পর্ককে ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তাঁর বিশিষ্ট ইতিহাস দর্শন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি সংক্রান্ত বিধি রচনায় তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন মূলত এই আশা নিয়ে যে অনুরূপ বিধি উপস্থাপন করা গেলে ফরাসী সমাজ ও রাষ্ট্রে কিছু সংস্কার করা যেতে পারে।

আমরা আগে জেনেছি মন্তেস্ক্যু 'সদ্‌গুণ' ও 'স্বাধীনতা'র উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। রোমের ইতিহাস পাঠে তিনি রোমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলোর 'সদগুণ'-এর (virtue) প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিশেষ গুণসম্পন্ন ছিল রোমের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রোমানদের মধ্যে জমির সমবন্টন নীতি প্রচলিত ছিল।এক সময়ে ঐ নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল ; রোমে বৈষম্য, অনৈক্য প্রকট হয়ে পড়ল। কিছু মানুষের লোভ, কিছু গোষ্ঠীর উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এবং মুষ্টিমেয়দের হাতে সম্পদের কেন্দ্রীভবন এই সব মিলে রোমের সংস্কৃতিতে সদ্‌গুণের অভাব দেখা দিল।

ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতে প্রতিফলিত হয় নানাভাবে। মন্তেস্ক্যু অবশ্য এই ব্যবধানকে শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিরূপে গণ্য করেন নি। তাই তিনি বলেন, রোমের অধঃপতন হয়েছিল প্রধানতঃ তার আগ্রাসী, সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, কোন শ্রেণী সংগ্রামের জন্য নয়। তিনি বরং অভিজাত গোষ্ঠী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-প্রতিযোগিতাকে সমাজের সুস্থ সংস্কৃতির পরিচায়ক বলে মনে করেছেন।

জঙ্গী মনোভাব, প্রতিযোগিতার মানসিকতা কিংবা সামাজিক-আর্থিক ব্যবধান এই সব বিষয় কোন সমাজের (যেমন প্রাচীন রোমের) পতন ডেকে আনে না। কিন্তু যখন জঙ্গী, আক্রমণাত্মক ক্রিয়ার আড়ালে দুর্নীতি, অসাধুতা প্রসারিত হয় তখনই পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এরূপই হয়েছিল প্রাচীন রোমের ক্ষেত্রে। উত্থান-পতনের এই ইতিহাস-দর্শন মন্তেস্ক্যুর সমাজচিন্তা, সমাজতত্ত্বকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

রাষ্ট্র ও সমাজের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর পূর্বসূরী ভিকো (Vico) বা আরও কিছুকাল আগের হবস্ কিংবা ম্যাকিয়াভেলীর তুলনায় মন্তেস্ক্যু কতটা নতুনত্ব ও স্বকীয়তার দাবী রাখতে পারেন তা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু তিনি যে ইতিহাস দর্শন ভিত্তিক সমাজ ও রাজনীতির আলোচনায় প্রবৃত্তি হয়েছিলেন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিচার বিশ্লেষণে যে ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রয়োগ এনেছিলেন তার তাৎপর্য নিয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।

যে দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি মন্তেস্ক্যুর ইতিহাস চিন্তাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে তা হ'ল এইরূপ

প্রত্যেক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উত্থান-পতন এর একটি প্রক্রিয়া থাকে ;

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মূল্যায়ন করতে হয় নির্দিষ্ট 'পর্য্যবেক্ষণ-কাল' এর ভিত্তিতে। অবশ্য মন্তেস্ক্যুর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ হ'ল তিনি নিজে এই ঐতিহাসিক পদ্ধতি সর্বত্র মানেন নি। তাঁর 'The Spirit of the Laws' গ্রন্থে তাত্ত্বিক বর্গগুলো (Categories) কাল-নিরপেক্ষ আদর্শ-বর্গ হিসাবেই তুলনামূলক বিচারে এসেছে। তবে নিজে পদ্ধতি থেকে এই বিচ্যুতি যেমন তাঁর ইতিহাস-দর্শনকে দুর্বল করেছে, তেমনি এই দুর্বলতার মধ্য দিয়েই (তাঁর অজান্তে) সমাজতত্ত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরী হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

এমিল ডুর্খাইম বলেছেন, মন্তেস্ক্যুর রচনা পাঠ করলে সমাজতত্ত্বের বিষয়গুলো কী হতে পারে তা জানা যাবে। এমনকি কিরূপ পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করলে ঐ সব বিষয় ঠিকমত আলোচিত বিশ্লেষিত হতে পারে সেইসব রাস্তাও মন্তেস্ক্যুর রচনাতে নির্দেশ করা আছে বলে ডুর্খাইম মনে করতেন। ডুর্খাইম যাকে সামাজিক বস্তুসত্য (Social facts) বলেছেন মন্তেস্ক্যুর রচনায় সেই বাস্তব ঘটনা / অবস্থান / প্রবণতাগুলোই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসাবে ঘোষিত। অন্য যে কোন সত্যের মত সামাজিক বস্তুসত্যও কিছু সাধারণ নিয়মের অধীন। দেখা যাবে বস্তুসত্যের অংশগুলো একে অপরের সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত এবং সকলে মিলে তারা তৈরী করেছে এক সামগ্রিক বস্তুসত্য। সেটা একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান (যেমন, সরকার) এর ক্ষেত্রে যেমন দেখা যাবে তেমনি কোন ভৌগলিক পরিবেশ (যেমন ঘনবসতি অঞ্চল) বা ঐতিহাসিক পর্বের (যেমন, গুপ্তযুগের সংস্কৃতি) ক্ষেত্রেও আবিষ্কার করা যাবে।

বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে মন্তেস্ক্যু জানিয়েছেন, তুলনামূলক আলোচনা এবং শ্রেণী বিভাজন পদ্ধতির সাহায্যেই সঠিকভাবে সমাজবিজ্ঞান চর্চা হতে পারে। শ্রেণী বিভাজন পদ্ধতি প্রসঙ্গে Ideal types বা 'নিদর্শ প্রকরণ' এর কথা উল্লেখ করতে হয়। মন্তেস্ক্যুকৃত typology বা প্রকরণ বিন্যাস পরবর্তীকালে মার্ক্স হ্বেবরকৃত 'নিদর্শ প্রকরণ' (Ideal types)-এর বিন্যাসকে প্রভাতি করেছে বলা যায়। ইতিহাসের দর্শন থেকে বিচার করলে হয়ত এই ধরনের 'নিদর্শ-প্রকরণ'-এর ধারণাকে (তাত্ত্বিকের খেয়াল খুশীমত শ্রেণী বিভাজনের প্রচেষ্টাকে) অনুন্নত চিন্তার ফসল মনে হবে। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এ এক অনবদ্য এবং অত্যন্ত উপযোগী পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃতি। তাই অনেকেই মনে করেন মন্তেস্ক্যুর অবদান যতটা না ইতিহাস-দর্শন-এর ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাবে, তুলনায় তা অনেক বেশী প্রাধান্য পাবে সমাজতত্ত্বে / সমাজবিজ্ঞানে।

২.৩.২ মন্তেস্ক্যুর রাষ্ট্রচিন্তা

'পারস্যের চিঠিপত্র' (Persian Letters) শীর্ষক রচনায় মন্তেস্ক্যু তাঁর সমকালীন প্রতিষ্ঠিত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমালোচনা করেছেন। যেভাবে সংস্থাগুলি পরিচালিত হচ্ছিল তাকে বর্জন করে তিনি 'স্বাধীনতা ও সদ্‌গুণ' প্রসারের জন্য আবেদন রাখেন। 'The Spirit of Laws' গ্রন্থে তিনি পুরানো রাষ্ট্রব্যবস্থার সমালোচনা করে মানুষের স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলার কথা বলেন।

মন্তেস্ক্যুর মতে প্রকৃত স্বাধীনতা ও সদ্‌গুণ একসঙ্গেই যুক্ত থাকে। সমাজ ও ব্যক্তি যদি সদ্‌গুণ (virtue) ভ্রষ্ট হয় তবে দেখা যাবে স্বাধীনতাও অন্তর্হিত হয়েছে। আইনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি (spirit) আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তাদের পরিচালিকা নীতির কথা বলেন। সদ্‌গুণ, সম্মান ও ভীতি এই তিন প্রকার

নীতি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। নীতিগুলির দূষণ প্রকট হলে ব্যবস্থাগুলির অধঃপতনের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাবে।

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা মন্তেস্ক্যুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ইংরেজরা যেরূপ ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা উপভোগ করে চলেছে মন্তেস্ক্যুর মতে সেটা সকলের কাছে উদাহরণস্বরূপ। মন্তেস্ক্যু স্বাধীনতার নিম্নরূপ সংজ্ঞা হাজির করেন ঃ "the right to do that which the laws permit, and if a citizen can do that which they forbid, he would no longer have it, because the others also have this power." অর্থাৎ স্বাধীনতা হ'ল, আইন যে সব কাজ অনুমোদন করছে সেই সব কাজে ব্যক্তির অধিকার থাকা। যদি কোন নাগরিক আইন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এমন কিছু কাজে অগ্রসর হয়, তবে সে অচিরেই জানবে যে তা সম্ভব নয় ; কেননা অন্যরাও তার মতই নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারে (আইন-লঙ্ঘন এর ক্ষমতা তার একচেটিয়া এটা মনে করা ভুল)। ক্ষমতার ব্যবহারে ভারসাম্য বজায় রাখা স্বাধীনতা বজায় রাখার প্রধান শর্ত।

মন্তেস্ক্যুর রাষ্ট্রচিন্তার আকর্ষণীয় বিষয়টি হ'ল ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্ব (theory of separation of powers)। তিনি মনে করেছেন স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করতে হ'লে ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকারের ধারণাকে নির্মূল করতে হবে। ক্ষমতার ভারসাম্য প্রয়োজন। নির্দিষ্ট এক ব্যক্তি বা একটি সংস্থা-সংগঠনের হাতে যাবতীয় শাসন-ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে স্বাধীনতার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তবে মন্তেস্ক্যু যখন বলেন অভিজাততন্ত্র বা নরমপন্থী (aristocratic or moderate) সরকারই স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে পারে তখন এটা মনে রাখতে হবে যে, তিনি নিজেই অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তিনি যখন লিখছেন তখনও ইউরোপে আধুনিক সমাজ বিপ্লবগুলো সংঘটিত হয় নি।

মন্তেস্ক্যুর তত্ত্ব হ'ল 'Power stops power', কোন গোষ্ঠীর তরফে একচেটিয়া ক্ষমতা ব্যবহারের প্রবণতা রুখতে হ'লে তার বিপরীতে আর এক গোষ্ঠীর ক্ষমতা সংগঠিত করতে হয়। ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে হয়। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় সমাজে তিনটি স্বতন্ত্র (এবং অপরিবর্তনীয়) স্তরের কথা উল্লেখ করেন। এই স্তরগুলি হ'ল রাজা (রাজপরিবার), মধ্যস্বত্বভোগী অভিজাতগণ এবং জনগণ। উত্তরাধিকার সূত্রে অভিজাতগণ সরকারের একটি বিশেষ সংস্থা (যেমন ইংল্যান্ডে লর্ডসভা) দখলে রাখেন। সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিরা পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ দখলে রাখতে পারে। অতএব জনপ্রতিনিধিরা একদিকে এবং অভিজাতরা আর একদিকে—এই ভাবে দুই বিপরীত শক্তি একে অপরের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। পরিণতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি হতে পারে। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা এইভাবেই প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিতে পেরেছে বলে মন্তেস্ক্যুর মনে অগাধ বিশ্বাস জন্মেছিল। এই দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব যদি দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্ব বলে গণ্য করা হয় তাহলেও তা গণতন্ত্র বা স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মন্তেস্ক্যু মনে করতেন না। অভিজাত শ্রেণী ও জনগণের দ্বন্দ্বকে তিনি ভারসাম্য সৃষ্টিকারী প্রক্রিয়া বলেই গণ্য করেছেন। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে মন্তেস্ক্যু ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত উপরিউক্ত যে ধারণা উপস্থাপিত করেছেন তাতে তাঁর চিন্তার মধ্যেই একটা ভারসাম্য আনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাবে—রক্ষণশীলতার সঙ্গে উদারনীতির ভারসাম্য।

'রক্ষণশীল উদারনৈতিক' বা 'উদারনৈতিক রক্ষণশীল'—যে ভাবেই তাঁকে অভিহিত করি না কেন মন্তেস্ক্যু যে প্রধানত ব্রিটিশ মডেল অনুযায়ী একটা সাংবিধানিক, সসীম ও সুষম শাসনব্যবস্থার প্রস্তাব করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ইচ্ছার মধ্যে তাঁর বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। বোঝা যায় যে তিনি সমাজে বিপ্লব সংগঠনের কোন প্রয়োজন না দেখলেও সমাজের (বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় সমাজের) সংস্কার সাধনে খুবই আগ্রহী ছিলেন।

মন্তেস্ক্যুর মতে এমন কোন সরকার বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নেই যা সর্বত্র সমানভাবে উপযোগী বলে ঘোষিত হতে পারে। আসলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলো তখনই উপযোগী হয় যখন সেগুলি নির্দিষ্ট সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে। একই কারণে বলা যায় এমন কোন আইনবিদ্ বা শাস্ত্রকার নেই যাঁর তৈরী বিধি বা নির্দেশ সর্বজনীন স্বীকৃতি পেতে পারে।

মন্তেস্ক্যুর রাষ্ট্রচিন্তায় ক্ষমতা (Power) ও স্বাধীনতার সম্পর্কের বিষয়টি লক্ষণীয়। তাঁর মতে সর্বাধিক স্বাধীনতা অর্জন তখনই সম্ভব যখন ব্যক্তিমানুষ ও মনুষ্যগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ক্ষমতার বন্টন হবে। তথাকথিত প্রাকৃতিক অধিকারের ভিত্তিতে কোন স্বাধীনতা অর্জিত হয় না, কিংবা অত্যাচারিত হলেই মানুষ বিদ্রোহে লিপ্ত হয় না। ক্ষমতার সুষম বন্টন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ—এই দুইয়ের ভিত্তিতেই মানুষ মুক্ত ও স্বাধীন পরিবেশ উপভোগ করতে পারে। মন্তেস্ক্যু বিভিন্ন প্রসঙ্গে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার গুরুত্বের কথা বলেছেন। তিনি সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন যে, কোন স্তরেই ক্ষমতার একচেটিয়া কেন্দ্রীভবন স্বাধীনতার সহায়ক হবে না। তাই তিনি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যেমন ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের কথা বলেছেন তেমনি তিনি জানিয়েছেন যে বিভিন্ন স্বার্থবাহী গোষ্ঠীর মধ্যে এবং স্বার্থবাহী গোষ্ঠী ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন।

মন্তেস্ক্যু যাবতীয় বিধি ও আইনকে ঐতিহাসিক অবস্থান ও বাস্তব সম্পর্কের ভিত্তিতে বিচার করেছেন। যেমন বলা যায়, শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় আইনের উৎস নিহিত। আবার নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো পৌর আইনের ভিত্তি। সরকারের শ্রেণীবিভাগ নির্দেশ করার ক্ষেত্রেও তাই এই বাস্তব সম্পর্ক তথা আইন ব্যবস্থার গুরুত্ব লক্ষ্য করা যাবে। যেখানে সুনির্দিষ্ট বিধি ব্যতিরেকেই কোন ব্যক্তি শাসন চালায় তাকে একনায়কতন্ত্র despotism বলা যাবে। অপরদিকে ব্যক্তি যখন আইন অনুযায়ী শাসন করে তাকে বলা হবে রাজতন্ত্র বা monarchy। এছাড়া রয়েছে প্রজাতন্ত্র যেখানে জনগণের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে। মন্তেস্ক্যু প্রজাতন্ত্রের দ্বিবিধ রূপের কথা বলেছেন—গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং অভিজাততান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। বলা বাহুল্য দ্বিতীয় ধরনের প্রজাতন্ত্রটিই তাঁর পছন্দের (তাঁর নিজস্ব অভিজাত পটভূমির কারণে)।

মন্তেস্ক্যু বলেন, কোন সরকার যদি তার মৌলিক সমাজগত চরিত্র থেকে বিচ্যুত হয় তবে সেখানে অশান্তি এবং বিদ্রোহ দেখা দেবে। যেমন বলা যায় গণতন্ত্র অচল হবে যদি রাজনৈতিক সদ্‌গুণ এবং সাম্যের ভাব অন্তর্হিত হয়। অভিজাততন্ত্রও বেঁচে থাকতে পারে না যদি শাসক শ্রেণীর মধ্যে পরিমিতি বোধের, সংযমের, অভাব দেখা যায়। আবার রাজতন্ত্র বিনষ্ট হবে যদি শাসকের মধ্যে মর্যাদা-সম্মানের অভাব দেখা দেয়।

রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি আলোচনায় মন্তেস্ক্যুর ভৌগলিক এলাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমন, তাঁর মতে খুব বৃহদায়তন রাষ্ট্রে একনায়কতন্ত্রই স্বাভাবিক ব্যবস্থা। মাঝারি আয়তনের রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র এবং ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রে প্রজাতন্ত্রই উপযোগী ব্যবস্থা। অবশ্য ব্যবস্থা যাই হোক তা যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকে তবে মানুষের কাঙ্খিত স্বাধীনতা উপভোগ সম্ভব হয় না। আর এই নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার প্রসঙ্গেই মন্তেস্ক্যু তাঁর বিখ্যাত 'ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্ব' হাজির করেন। মন্তেস্ক্যু বলেন স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান রক্ষাকবচ হিসাবে এবং স্বাধীনতার প্রধান শর্ত হিসাবে সরকারের প্রশাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতার পৃথকীকরণ প্রয়োজন। সরকারের বিভাগগুলোর মধ্যে একপ্রকার 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি' প্রতিষ্ঠিত হলেই উপরোক্ত উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। কোন একটি বিভাগকে সর্বোচ্চ ঘোষণা করা যাবে না ; কোন একজন ব্যক্তি একাধিক বিভাগের কাজে অংশগ্রহণ করবে না এবং কোন বিভাগই অন্য কোন বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। এই ভাবেই

স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব এবং বিভাগগুলির পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একপ্রকার ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব। ঐ ভারসাম্যাবস্থা স্বাধীনতার প্রধানতম শর্ত বলে মন্তেস্ক্যু মনে করেতন।

২.৪ The Spirit of the Laws : রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব

আগস্ত কঁত্ সমাজতত্ত্ব শব্দটি চয়ন করেন ১৮৩০-এর দশকের শেষে। এর প্রায় নয় দশক আগে ১৭৪৮ সালে মন্তেস্ক্যুর ''The Sprit of the Laws'' গ্রন্থটি প্রকাশ পায়। মন্তেস্ক্যুর এই গ্রন্থে সমাজকে, সমাজ ও রাষ্ট্রিক, নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পর্কগুলো বিশেষভাবে বোধগম্য করানোর চেষ্টা হয়েছে। এককথায় সমাজতত্ত্বের যা উদ্দেশ্য তা এই গ্রন্থে খুবই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই কারণে বিশিষ্ট ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী রেমন্ড অ্যারন (Raymond Aron) মন্তেস্কুকে কেবলমাত্র সমাজতত্ত্বের পূর্বসূরী না বলে প্রকৃত সমাজতাত্ত্বিক হিসাবেই চিহ্নত করতে চান। আমরা মনে করি 'The Sprit of the Laws' গ্রন্থে যেভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের নিদর্শ-প্রকরণ (Ideal types), মানুষের স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় আইনের প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলো উপস্থাপিত হয়েছে তাতে তাঁকে নিঃসন্দেহে আধুনিক রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের (Political Sociology) অগ্রদূত বলে নির্দেশ করা যায়।

মন্তেস্ক্যু সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সত্যগুলো অনুধাবন করতে চেয়েছেন। আর তা করতে গিয়ে সত্যের বৈচিত্রের প্রতি তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি মনে করেন সামাজিক মানুষের ভাব-ভাবনা, প্রথা, বিশ্বাস, নৈতিকতা, বিধি-ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সীমাহীন বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই ঐতিহাসিক সত্যের প্রকাশ ঘটেছে। আবার এই অসংলগ্ন বৈচিত্র কিভাবে শৃঙ্খলা আনে সেটা আবিষ্কার করা তাঁর সমাজতত্ত্বের অন্যতম উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, যা আপাতদৃষ্টিতে এলোমেলো অসংলগ্ন ঘটনা, দেখা যাবে তার গভীরে সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। তেমনি বলা যায় বাহ্যত যে সীমাহীন বৈচিত্র দেখছি তাকে বোধগম্য করার প্রয়াসে ধারণাগত শৃঙ্খলা (Conceptual order) নির্মাণ করা যেতে পারে। বিশৃঙ্খল, অরাজক, অবস্থাকে মন্তেস্ক্যু কখনও চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে চাননি। তাই দেখা যায় The Spirit of the Laws-এর ভূমিকাতেই তিনি বলেছেন ''I have first of all considered mankind, and the result of my thoughts has been, that amidst such an infinite diversity of laws and manners, they were not solely conducted by the caprice of fancy.'' অর্থাৎ মানব সমাজে যতই যা বৈচিত্র থাকে না কেন, সবই খেয়ালখুশী নিয়মবহির্ভূত এলোমেলো ব্যাপার এটা মনে করা ঠিক হবে না। 'বৈচিত্র' থাকার অর্থ এমন নয় যে তা ব্যাখ্যার অযোগ্য। বরং দেখা যাবে সব সম্পর্ক, সর্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত আছে কোন না কোন ভাবে, কিংবা একে অপরের উপর নির্ভর করে আছে বিশিষ্ট এবং সাধারণ বা সামান্য ধর্মীতার সম্পর্ক নিয়ে।

রেমন্ড অ্যাবনের মতে আলোচ্য গ্রন্থটিতে রাষ্ট্র ও সমাজ প্রসঙ্গে দু'ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। একদিকে দেখা যাবে একজন রাষ্ট্রতাত্ত্বিকের (Politcal theorist) দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে প্রাচীন ধ্রুপদী গ্রীক্ দার্শনিকদের প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। মন্তেস্ক্যু সরকারের শ্রেণীবিভাগের যে তত্ত্ব হাজির করেছেন তার সঙ্গে অবশ্যই অ্যারিস্টটলীয় তত্ত্বের পার্থক্য রয়েছে। তথাপি এ কথা বলা ভুল হবে না যে সাধারণভাবে ঐ ধ্রুপদী দার্শনিকদের তৈরী ঐতিহ্য অনুসরণ করেই মন্তেস্ক্যু তাঁর শ্রেণীবিভাজনের মডেলটি উপস্থাপিত করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি মন্তেস্ক্যু আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছেন এই গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে। এই দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি হ'ল সমাজতাত্ত্বিক

(Sociological) দৃষ্টিভঙ্গি যার যাহায্যে তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন কিভাবে ধর্ম, জলবায়ু, মৃত্তিকার প্রকৃতি, জনসংখ্যার আয়তন, ইত্যাদি উপাদানগুলো সমষ্টিগত জীবনের বিভিন্ন দিক্‌গুলোকে প্রভাবিত করে। একই গ্রন্থকারের এই দ্বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে গ্রন্থটির মধ্যে কিছু অসঙ্গতি ও অসংলগ্ন ভাব এনেছে। এই দ্বৈত ভাবের কথা স্বরণে রেখে প্রথমে আমরা তাঁর শ্রেণীবিভাজনের তত্ত্বটি আলোচনা করতে পারি।

মন্তেস্ক্যু সরকারের ত্রিবিধ রূপের কথা বলেছেন ঃ প্রজাতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র। এর প্রত্যেকটি তিনি আবার ব্যাখ্যা করেছেন বিশিষ্ট পরিচালিকা নীতি (Principle) ও প্রকৃতি (nature) অনুযায়ী। Principle বা নীতি বলতে তিনি বিশিষ্ট ভাবানুভূতিকে বুঝিয়েছেন যা নির্দিষ্ট সরকারের অন্তর্গত মানুষদের মধ্যে প্রবলভাবে বিরাজ করবে। যেমন ধরা যাক প্রজাতন্ত্র। এই ব্যবস্থার পরিচালিকা নীতি হ'ল Virtue বা সদ্‌গুণ। এর অর্থ এই নয় যে প্রজাতন্ত্রের সকল মানুষই সদ্‌গুণের অধিকারী। এর অর্থ হ'ল প্রজাতন্ত্র তখনই উন্নত ও বিকাশশীল হবে যখন ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় মানুষের মধ্যে সদ্‌গুণ-এর ভাব প্রাধান্য পেতে থাকবে। Nature বা প্রকৃতি বলতে সেই বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করা হচ্ছে যার সাহায্যে নির্দিষ্ট সরকারের ধরনটি চিহ্নিত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ কারা বা কতজন মানুষ রাষ্ট্রক্ষমতা তথা সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করছে তার উল্লেখ করতে হয়। যেমন, প্রজাতন্ত্র হল সেই সরকার যেখানে জনগণ সমষ্টিগতভাবে (গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) কিংবা জনগণের নির্দিষ্ট অংশ/গোষ্ঠী (অভিজাততান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) ক্ষমতা ব্যবহার করছে। তেমনি রাজতন্ত্র হ'ল সেই ব্যবস্থা যেখানে সুনির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী একজন শাসন ক্ষমতা ব্যবহার করবে। একনায়কতন্ত্রে যিনি ক্ষমতা ব্যবহার করেন তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কোন বিধি নেই—একনায়ক শাসন করে নিজ মর্জি অনুযায়ী। প্রজাতন্ত্রে নীতি (Principle) হ'ল সদ্‌গুণ সেকথা আগেই বলা হয়েছে। রাজতন্ত্রের পরিচালিকা নীতি সম্মান-মর্য্যাদা। আর একনায়কতন্ত্রে যে ভাবানুভূতি জনগণের মধ্যে প্রবলভাবে বিরাজ করে তা হ'ল ভয়-ভীতি (fear)।

রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে মন্তেস্ক্যু নীতিগুলির (Principles) অর্থ নিরূপণ করেছেন। প্রজাতন্ত্রে যে সদগুণের কথা বলা হচ্ছে তা নিতান্তই নৈতিকতার (morals) বিষ নয় ; সদ্‌গুণ হ'ল রাজনৈতিক সদ্‌গুণ—আইন ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম প্রদর্শন এবং ব্যক্তির তরফে তার নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কল্যাণ কামনা ও সেইমত দায়িত্ব পালন। রাজতন্ত্রে যে সম্মান ও মর্য্যাদার নীতির কথা বলা হচ্ছে তা হ'ল সমাজে ব্যক্তির নির্দিষ্ট স্তর বা অবস্থানের প্রতি সম্মান / শ্রদ্ধা প্রদর্শন। একনায়কতন্ত্রে যে ভয়-ভীতির ভাবের উল্লেখ করা হয়েছে তা হ'ল মানুষের এক আদিম ও মৌলিক আবেগের বিষয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রায় সকলেই এই মৌলিক ভাবটির উল্লেখ করেন। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী টমাস হবস ভয়-ভীতিকে অত্যন্ত মৌলিক, মানবিক, ভাবাবেগ বলে নির্দেশ করেছেন। হবস্‌-এর মতে ঐ ভাবাবেগই রাষ্ট্রগঠনের মূলে কাজ করেছে। মন্তেস্ক্যু অবশ্য হবস্‌-এর মত হতাশাবাদী ছিলেন না। যেই কারণে ভয়-ভীতির নীতিকে পরিচালিত একনায়কতন্ত্রকে তিনি কখনই সুস্থ, স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলতে পারেন নি। বরং তিনি বলেছেন, একনায়কতন্ত্র অচিরেই দুর্নীতিগ্রস্ত হয় এবং এই সরকার বেশী দিন তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না।

মন্তেস্ক্যু সমাজ ও রাষ্ট্রের যে শ্রেণীবিভাজন করেছেন তার পৃথক পৃথক মডেলগুলো এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রজাতন্ত্রের ধরণটি উপস্থাপিত হয়েছে প্রাচীন রোমের প্রজাতন্ত্রের আদলে ; রাজতন্ত্রের মডেল হ'ল তাঁর সমকালীন ইউরোপীয়— বিশেষতঃ ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্র ; আর একনায়কতন্ত্রের ধরণটি হাজির করা হয়েছে এশিয়া মহাদেশের শাসনব্যবস্থাগুলি নির্দেশ করে। লক্ষ্য করা দরকার প্রাচ্যবেত্তা পশ্চিমী পন্ডিতবর্গ (Western Orientalists) গত দু'শ / আড়াইশ বছর ধরে ভারতবর্ষ তথা এশিয়া মহাদেশের দেশগুলি সম্পর্কে যে সব ধারণা

যে তত্ত্ব, প্রচার করে এসেছেন মন্তেস্ক্যুকে তাঁদের এবং তাঁদের তত্ত্বের পূর্বসূরী বললে অত্যুক্তি হবে না। অর্থাৎ অন্যান্যদের মত তিনিও এশিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক অবগত না হয়েই কিছু বদ্ধমূলক ধারণা হাজির করেছেন। তিনি ধরেই নিয়েছেন যে এশিয়ার দেশগুলিতে ন্যায়নীতি বা আইনব্যবস্থা বলে কিছু ছিল না ; শাসক তার খেয়ালখুশীমত ক্ষমতা ব্যবহার (অপব্যবহার) করেন।

মন্তেস্ক্যুকৃত রাষ্ট্রীয় সমাজরে শ্রেণীবিভাজন তত্ত্বের আর একটি ত্রুটি হ'ল তার নিয়তিবাদ। কেননা তিনি যেভাবে আয়তন, জলবায়ু ইত্যাদির ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থাগুলোর প্রকৃতি নির্দেশ করেছেন তাতে এটাই প্রকট হয় যে সরকার বা শাসনব্যবস্থা সংগঠনের ক্ষেত্রে মানুষের কোন পরিকল্পনার / প্রচেষ্টার অবকাশ নেই। এলাকা বৃহদায়তন হলেই যেন অনিবার্যভাবে সেখানে despotism বা একনায়কতন্ত্র দেখা দেবে। Raymond Aron তাই বলেছেন, ''In so far as it porits a relation between the dimension of the territory and the form of Government, Montequieu's theory of Government risks leading to a sort of fatalism.''

মন্তেস্ক্যুর রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা'। এক্ষেত্রে ইংল্যান্ডই তাঁর মডেল। আর এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হ'ল নির্বাচিত সংস্থা, প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা, ইংল্যান্ডেরই অবদান। উপরন্তু সেই দেশে প্রশাসনিক ক্ষমতাকে আইনবিভাগীয় ক্ষমতায় থেকে পৃথক রেখে স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। মনে রাখতে হবে মন্তেস্ক্যু ঠিক আইনশাস্ত্রের নিরিখে (বা বিচারে) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের কথা বলেন নি। ক্ষমতা হ্রাস করে নয়, ক্ষমতার ভারসাম্য করেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে— এরূপই ছিল মন্তেস্ক্যুর ভাবনা। রাষ্ট্র ও সমাজ তখনই স্বাধীন যখন একটি ক্ষমতার কেন্দ্র অপর একটি ক্ষমতার কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখছে, কোন ক্ষমতার কেন্দ্রই চূড়ান্ত বলে দাবী জানাতে পারছে না।

মন্তেস্ক্যুর রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে ব্রিটিশ সাংবিধানিক ব্যবস্থার এক কেন্দ্রীয় অবস্থান ও মর্যাদা রয়েছে। কেবল সংস্থাগত ক্ষমতার ভারসাম্য নয়, মন্তেস্ক্যু লক্ষ্য করেছেন ইংল্যান্ডে সামাজিক শ্রেণীগুলোর মধ্যেও ক্ষমতার ভারসাম্য রয়েছে। আর তার জন্যই ঐ দেশে এক স্বাধীন ও নরমপন্থী শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। মন্তেস্ক্যুর মতে সুশাসন অবশ্যই moderate বা নরমপন্থী শাসন। এই প্রকার শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের মনে ভয়-ভীতি প্রাধান্য পাবে না এবং কোন স্তরেই একচেটিয়া ক্ষমতার প্রবল প্রকাশ ঘটবে না। রেমন্ড অ্যারনের মতে এই সামাজিক ভারসাম্য ভিত্তিক শাসনব্যবস্থার মডেলটি উপস্থাপিত করতে গিয়ে মন্তেস্ক্যু বস্তুতপক্ষে অভিজাততান্ত্রিক প্রজতন্ত্রের কথাই প্রচার করেছেন (ইংল্যান্ডের শাসন ব্যবস্থাতেও তিনি অভিজাততন্ত্রের প্রাধান্য দেখেছেন)। তবে অভিজাততন্ত্রের প্রতি তাঁর যতই দুর্বলতা থাক্ না কেন নাগরিকের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা এবং আইনব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম এই সব কিছুর শর্ত হিসাবে তিনি যে কোন ক্ষেত্রেরই সীমাহীন ক্ষমতার (unlimited power) অবস্থান বিলুপ্ত করে সকল প্রকার ক্ষমতা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত রাখার কথা বলেন।

সমালোচকগণ মন্তেস্ক্যুর সমাজতত্ত্বে কিছু স্ববিরোধী অবস্থান লক্ষ্য করেছেন। শাসনব্যবস্থার শ্রেণী বিভাজন করতে গিয়ে তিনি despotism বা একনায়কতন্ত্রকে মানুষের প্রকৃতি-বিরোধী ব্যবস্থা (contrary to human nature) বলে চিহ্নিত করেছেন। অথচ তিনি এই একই পুস্তকে লিখছেন বিস্তৃত এলাকা, বৃহৎ সমষ্টি এবং কিছু বাহ্যিক উপাদানের জন্য অনিবার্য ভাবেই একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। রেমন্ড অ্যারন তাই প্রশ্ন তুলেছেন, ''can a sociologist maintain that a form of government which under certain conditions is inevitable is contrary to human nature?''

বাহ্যিক উপাদান বলতে মন্তেস্ক্যু বিশেষভাবে জলবায়ুর (climate) কথা উল্লেখ করেন। মানুষের মেজাজ-মর্জি

ও ভাব-অনুভূতি জলবায়ুর দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়। মন্তেস্ক্যু বলেন, যতই উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় ততই মানুষের ভাব-অনুভূতিগুলো প্রখর হয়, আকর্ষণীয় হয়। অবশ্য জলবায়ুর প্রভাবকে তিনি কোন নিয়ন্ত্রণবাদী (determinist) দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পেশ করেন নি। বরং জাতীয় জনসমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি এই গ্রন্থের অন্যত্র একপ্রকার বহুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হাজির করেছেন। মন্তেস্ক্যু লিখেছেন, ''Mankind is influenced by various causes : by climate, by religion, by laws, by maxims of government, by precedents, morals and customs; whence is formed a general spirit of nations.'' (অর্থাৎ কোন জাতি-রাষ্ট্রের চরিত্র গঠনে যেমন প্রথা, নৈতিকতা, চিরাচরিত ভাবধারা ইত্যাদির অবদান থাকে তেমনি জলবায়ু, ধর্ম, আইন এই সব উপাদানও সক্রিয় থাকে)।

২.৫ বৈচিত্র-বিশৃঙ্খলা থেকে সংহতি ঃ মন্তেস্ক্যুর সমাজতত্ত্বের মূল কথা

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী রেমন্ড অ্যারন মন্তেস্ক্যু সম্পর্কে বলেন ঃ ...Montesquieu the sociologist was first and foremost intensely aware of human and social deversity. For him, the problem was to create order in an apparent chaos.'' অর্থাৎ সমাজতাত্ত্বিক মন্তেস্ক্যুর প্রথম এবং সর্বপ্রধান পরিচয় হ'ল মানবিক তথা সামাজিক বৈচিত্র সম্পর্কে গভীর সচেতনা। মন্তেস্ক্যুর কাছে মূল সমস্যা ছিল আপাত বিশৃঙ্খলার মধ্যে সংহতি সৃষ্টি করা। সমাজ ও রাষ্টব্যবস্থার (শাসনব্যবস্থার) নানাবিধ শ্রেণী-প্রকরণের ভাবনা ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তিনি সেই সংহতি নির্মাণের কাজে সফল হয়েছিলেন বলা যায়। তিনি তাঁর সমাজতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ শুরু করেছিলেন বৈচিত্র ও বিশৃঙ্খলার উল্লেখ করে। অতঃপর সরকারের শ্রেণীবিভাজন তত্ত্ব, বিভিন্ন জনসমষ্টির উপর প্রভাববিস্তারকারী উপাদানের নির্দেশ, সর্বজনীন কিছু নীতির উপস্থাপনা ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি মানবসমাজের ঐক্যসাধনকারী প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মন্তেস্ক্যুর রচনায় যেভাবে বিশুদ্ধ সমাজতত্ত্বের তুলনায় রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব প্রাধান্য পেয়েছে তাতে পূর্বোক্ত ঐক্যসাধন প্রক্রিয়ার প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহকেই নির্দেশ করা যায়। মন্তেস্ক্যু তাঁর সমাজদর্শনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মানুষের স্বাধীনতার প্রসঙ্গটিকে। স্বাধীনতা অর্জন ও উপভোগের মধ্য দিয়ে সামাজিক ঐক্য প্রকাশ পায়। আর সেই কাজে শাসনব্যবস্থার ভূমিকাই প্রধান। তিনি দেখিয়েছেন কি বিশেষ বিশেষ নীতির ভিত্তিতে এক একটি শাসনব্যবস্থা কার্যকরীভাবে পরিচালিত হতে পারে এবং সামাজিক ভারসাম্য ও ঐক্য সাধনে সক্ষম হতে পারে। রাষ্ট্রীয় সমাজে যাবতীয় বিশৃঙ্খলার জন্য মন্তেস্ক্যু দায়ী করেছেন ক্ষমতা-কেন্দ্রীভবনের প্রবণতাকে। স্বাধীনতা অর্জনের পথেও প্রধান প্রতিবন্ধকতা হ'ল ক্ষমতার কেন্দ্রীভভন। আর এই কারণেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের কথা বললেন মন্তেস্ক্যু। সরকারের বিভিন্ন সংস্থা / বিভাগের ক্ষমতা (ও দায়িত্বের) পৃথকীকরণ এবং তার মধ্য দিয়ে সামাজিক শ্রেণীগুলোর শক্তির ভারসাম্য তৈরী করা—এরূপই ছিল মন্তেস্ক্যুর প্রস্তাব। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল ঐ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন মানুষের স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকবে, তেমনি অপরিদেক রাষ্ট্রীয় সমাজে শ্রেণীগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ধ্বংসাত্মক আক্রমণের বদলে একটি সংহতি আনয়নকারী প্রবনতা জোরদার হতে থাকবে। সমাজে বাহ্যত যে সীমাহীন এবং অর্থহীন, অসংলগ্ন, বৈচিত্রের প্রকাশ ঘটে সেটাই সমাজের প্রকৃত চেহারা নয়। একজন সমাজতাত্ত্বিকের কাজ হ'ল যে সম্পর্কগুলো, যে প্রক্রিয়াগুলো আপাত অসংলগ্ন সেগুলোকে বোধগম্য করে তোলা। মন্তেস্ক্যু এই করেছেন। আর সেটা সুসম্পন্ন করতে গিয়ে তিনি সামাজিক ও মানবিক ঐক্য/সংহতির প্রক্রিয়াকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

'The Spirit of the Laws' গ্রন্থে 'Spirit' বলতে মন্তেস্ক্যু বুঝিয়েছেন যে কোন আইন ব্যবস্থা বা বিধিব্যবস্থার নির্দিষ্ট চরিত্রকে। বিধিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন নির্দেশ এবং সমগ্র বিধিব্যবস্থার ভিত্তিতে একটি সমাজের সঙ্গে অপর কোন সমাজের পার্থক্য নির্দেশ এই দ্বিবিধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্রও প্রকট হবে। অধুনা আমরা যাকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি (বা Political culture) বলি এক হিসাবে মন্তেস্ক্যু 'Spirit' বলতে সেটাই বুঝিয়েছেন। মন্তেস্ক্যুর সমাজতত্ত্বে সেই 'Spirit' বা সংস্কৃতিকে (ব্যবস্থার চরিত্রগত ধারাটিকে) সম্যক উপলব্ধি করে এবং সেখানে সামাজিক ও রাষ্ট্রব্যবস্থাগত ভারসাম্য সৃষ্টি করে সঠিক সংহতি সাধনের কথা বলা হয়েছে।

২.৬ সারাংশ

সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক যেমন নিবিড় তেমনি সমাজতত্ত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্কও গভীর। আর এই গভীর ও নিবিড় সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যাবে বিশিষ্ট ফরাসী পন্ডিত মন্তেস্ক্যুর রচনায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসাবেই অধিকতর পরিচিত থাকলেও মন্তেস্ক্যুকে প্রথম সমাজতাত্ত্বিক হিসাবেও গণ্য করা যেতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। তাঁর 'The Spirit of the Laws' গ্রন্থটিকে অনায়াসে "রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব" সংক্রান্ত প্রথম রচনা বলা যেতে পারে।

মন্তেস্ক্যু সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তবে মানুষের সাধারণ প্রকৃতি ও চরিত্রের এক ধারাবাহিকতায় তিনি আস্থাশীল ছিলেন। তাই দেখা যায় ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও সমাজ পরিবর্তনের কোন তত্ত্ব তাঁর রচনায় নেই।

মন্তেস্ক্যুর মতে সদ্‌গুণসম্পন্ন জীবনই হল শ্রেষ্ঠ জীবন। প্রাচীন রোমের উত্থান পতনের প্রক্রিয়াটি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন সদ্‌গুণের অভাবই রোমের পতন প্রক্রিয়া নির্দেশ করছে। এই ইতিহাস দর্শন মন্তেস্ক্যু নানা প্রশ্নে প্রয়োগ করেছেন। তবে তাঁর "The Spirit of the Laws" গ্রন্থে রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন ধরন বা শ্রেণীর প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর পূর্বপরিকল্পনা মত উত্থান-পতন প্রক্রিয়া নির্দেশকারী ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন নি। পরিবর্তে কিছু আদর্শ বর্গের (Categories) ভিত্তিতে তিনি তুলনামূলক আলোচনা বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু এর মাধ্যমে তিনি সমাজতত্ত্ব চর্চার সূত্রপাত করেছেন নিজের অজান্তেই।

পরবর্তীকালে ডুর্খাইম যাকে সামাজিক বস্তুসত্য (Social fact) বলেছেন মন্তেস্ক্যুর রচনায় সেই সব বাস্তব ঘটনা ও অবস্থানকে সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রেণীবিভাজন এবং তুলনামূলক আলোচনাকে মন্তেস্ক্যু সঠিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বলে গ্রহণ করেছিলেন। মন্তেস্ক্যুর typology বা প্রকরণ-বিন্যাস পরবর্তীকালে মার্ক্স হ্বেবরের নিদর্শ-প্রকরণ (Ideal type) গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে এ কথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না।

আইনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি (Spirit) আলোচনা করতে গিয়ে মন্তেস্ক্যু সদ্‌গুণ, সম্মান-মর্য্যাদা ও ভীতি এই ত্রিবিধ নীতির উল্লেখ করেন। পরিচালিকা নীতি হিসাবে এগুলি এক এক ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নির্দেশ করবে। রাষ্ট্রব্যস্থার প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষের স্বাধীনতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। প্রজাতন্ত্র স্বাধীন পরিবেশ আনে। একনায়কতন্ত্রে স্বাধীনতার বিলুপ্তি হয়। স্বাধীনতার প্রসঙ্গে মন্তেস্ক্যু ইংল্যান্ডের শাসনব্যবস্থার উল্লেখ করেন। শাসনব্যবস্থায় একচেটিয়া

ক্ষমতার আবির্ভাব ঘটলে স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয়। ক্ষমতার ব্যবহারে ভারসাম্য বজায় থাকলে স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। এই প্রসঙ্গে মন্তেস্ক্যুর "ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্বটি" বিবেচনা করা যায়। এক বিভাগের ক্ষমতা অপর এক বিভাগের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এরূপ ক্ষমতার ভারসাম্য রাষ্ট্রীয় সমাজের উৎকর্ষকে নির্দেশ করবে।

মন্তেস্ক্যুর রাষ্ট্রতত্ত্বে ভৌগলিক উপাদানের গুরুত্ব লক্ষ্য করার মত। রাষ্ট্রীয় এলাকার আয়তন এবং জনসংখ্যার ঘনত্বের সঙ্গে শাসনব্যবস্থার প্রকৃতির যোগাযোগ রয়েছে। তাঁর মতে সুশাসন, স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্র এ সবকিছু ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে মন্তেস্ক্যু সদ্‌গুণ, মর্য্যাদা ইত্যাদি নীতির অর্থ নিরূপণে সচেষ্ট হয়েছেন। এখানে মন্তেস্ক্যুর চিন্তায় কিছু স্ববিরোধী অবস্থানের উল্লেখ করা যেতে পারে। এক ধরনের নিয়তিবাদ (determinism) আশ্রয় নিয়েছে তাঁর তত্ত্বের। তিনি প্রাথমিকভাবে সদ্‌গুণ, মর্য্যাদা, ভয় ইত্যাদি কয়েকটি নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন করেছিলেন। অথচ অন্যত্র আবার আয়তন, জলবায়ু ইত্যাদির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কিছু ব্যবস্থার অনিবার্য্য তার কথা বলেছেন।

মন্তেস্ক্যুর সমাজতত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক্ হ'ল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। এই ব্যাপারে রেমন্ড অ্যারন বলেছেন সামাজিক সংহতি সাধনের প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান মন্তেস্ক্যুকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। মন্তেস্ক্যুর শুরু করেছিলেন বৈচিত্রের উল্লেখ করে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ঐক্যের পথ খোঁজা। বৈচিত্রের মধ্যে সংহতি আবিষ্কারের প্রচেষ্টা— এই দৃষ্টিভঙ্গি মন্তেস্ক্যুর সমাজতত্ত্বকে অনন্যসাধারণ চরিত্র দান করেছে।

২.৭ অনুশীলনী

(ক) নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

(১) মন্তেস্ক্যুর সমাজদর্শনের প্রধান বক্তব্যটি আলোচনা করুন।

(২) মন্তেস্ক্যুর ইতিহাস দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করুন।

(৩) মন্তেস্ক্যুর রাষ্ট্রচিন্তায় স্বাধীনতার প্রসঙ্গটির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(খ) নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির বিস্তারিতভাবে উত্তর দিন

(১) মন্তেস্ক্যুর রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের (প্রধান) প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করুন।

(২) মন্তেস্ক্যু কৃত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

(৩) মন্তেস্ক্যুর সমাজতত্ত্বের যে এক স্ব-বিরোধী অবস্থানের কথা সমালোচকগণ উল্লেখ করে থাকেন তার সমালোচনামূলক আলোচনা করুন।

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(১) R. G. Gettell— *History of Political Thought.*

(২) Raymond Aron— *Main Currents in Sociological Thought.* (Vol.I)

(৩) Irving M. Zeitlin— *Ideology and the Development of Sociological Theory.*

একক ৩ ❐ সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার অগ্রদূত (সাঁ সিমঁ 'আগস্ত কঁত্)

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ প্রস্তাবনা
৩.৩ সাঁ সিমঁ (Saint Simon) ঃ ১৭৬০—১৮২৫
৩.৩.১ বিজ্ঞানবাদ (Positivism)
৩.৩.২ সমাজ-কাঠামো ও সমাজতন্ত্র
৩.৩.৩ ইতিহাস দর্শন, আন্তর্জাতিকবাদ ও ধর্ম
৩.৪ আগস্ত কঁত্ (Auguste Comte) ঃ ১৭৯৮—১৮৫৭
৩.৪.১ বিজ্ঞানবাদী দর্শন (Positive Philosophy)
৩.৪.২ সামাজিক-বৌদ্ধিক বিবর্তনের তত্ত্ব ঃ ত্রিস্তর প্রগতির বিধি
৩.৪.৩ বিজ্ঞানগুলোর ক্রমপর্য্যায়
৩.৪.৪ সামাজিক স্থিতিবিদ্যা ও সামাজিক গতিবিদ্যা
৩.৪.৫ সদর্থক মানবতাবাদ ও ধর্ম
৩.৫ সারাংশ
৩.৬ অনুশীলনী
৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- যাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজতত্ত্বের গোড়াপত্তন করলেন তাঁদে সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে ;
- সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার অন্যতম অগ্রদূত সাঁ সিমঁ কিভাবে মন্তেস্ক্যুর মতই রাষ্ট্রচিন্তা ও সমাজ চিন্তার মিলন ঘটিয়েছেন তা বুঝতে পারা যাবে ;
- আপনি জানতে পারবেন কেন সাঁ সিমঁকে একইসঙ্গে 'সমাজতত্ত্ব' ও 'সমাজতন্ত্র'-এর (Sociology and Socialims) জনক বলা হয় ;
- Positivism বা বিজ্ঞানবিদ্ সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে ;
- আগস্ত কঁত্-এর 'সদর্থক সমাজদর্শন' সম্পর্কে ধারণা করা যাবে ;
- কঁত-এর বিভিন্ন তত্ত্বের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা পাওয়া যাবে এবং
- সর্বোপরি কিভাবে শিল্পসমাজকে ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে সমাজতত্ত্বের ও সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়েছে তা উপলব্ধি করা যাবে

[দেখা যাবে যে, সাঁ সিমঁ ও আগস্ত কঁত্ উভয়েই শিল্প-সমাজ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা জরুরী বলে মনে করেছেন।]

৩.২ প্রস্তাবনা

ফরাসী চিন্তানায়কগণই সমাজতত্ত্বের আদিপুরুষ এ কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। মন্তেস্ক্যুর কথা আমরা আগেই বলেছি। এবার আমরা আরো দু'জন ফরাসী পন্ডিতের কথা আলোচনা করব। এদের মধ্যে একজন আগস্ত কঁত্ যিনি 'সমাজতত্ত্ব' নামটাই প্রথম চয়ন করেন। অপরজন সাঁ সিমঁ যিনি একাধারে সমাজতাত্ত্বিক এবং সমাজতন্ত্রী।

শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপে যে শিল্প সমাজ গড়ে উঠছিল এঁরা দু'জনই তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। অবশ্য দু'ভাবে। কঁত্ শিল্পসমাজকে আধুনিক যুগের অনিবার্য এবং সদর্থক ব্যবস্থা হিসাবে অভিনন্দিত করেছেন। অপরদিকে সাঁ সিমঁ (যাঁকে সকল অর্থেই কঁত্-এর গুরু বলা যায়) আধুনিক বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে পুরাতন সামন্তব্যবস্থার তুলনায় অনেক অগ্রসর বলে ঘোষণা করেন। উপরন্তু সাঁ সিমঁ দাবী জানিয়েছিলেন যেন শিল্পসমাজে মেহনতী মানুষের মর্য্যাদা ও কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি এই সহানুভূতির জন্য সাঁ সিমঁ উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সমাজতন্ত্রী কার্ল মার্ক্স-এর প্রশংসা অর্জন করেছেন। কার্ল মার্ক্স তাঁকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার অগ্রদূত তথা কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের (Utopain Socialists) মধ্যে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন।

শিল্পসমাজকে ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে উভয়ে মিলে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সূচনা করেছিলেন। সমাজের সদর্থক, বিজ্ঞানবাদী (পজিটিভিষ্ট) আলোচনা-পর্য্যালোচনা যে সম্ভব এবং জরুরী এ কথা এঁরা দু'জনেই প্রথম জোরালভাবে হাজির করেন। শিল্পায়নের ধারায় এঁরা নতুন এবং উন্নত সমাজব্যবস্থা গঠনের কথা আলোচনা করেছেন। অবশ্য এখানেও আমরা উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করব। কেননা সমাজ গঠনে সাঁ সিমঁ যেখানে সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন, কঁত্-এর ক্ষেত্রে সেখানে দেখা যাবে অপেক্ষাকৃত এলিটবাদী (Elitist) দৃষ্টিভঙ্গি।

উভয় চিন্তানায়কই সঙ্গত কারণে ধর্ম এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রসঙ্গে এনেছেন তাঁদের নানা রচনায়। নতুন সমাজ গঠনে প্রসঙ্গগুলো বিশেষ গুরুত্ব পাবে বলেই তাঁরা মনে করেছেন। বর্তমান এককের বিভিন্ন অংশে এই সব বিষয়গুলো আলোচিত হবে। সর্বোপরি আগস্ত কঁত্ যে সব তত্ত্ব ও ধারণার (Theory and Concept) সাহায্যে সমাজতত্ত্বের উদ্বোধন করেছেন সেগুলি সবই পৃথক পৃথক ভাবে সংক্ষেপে উপস্থাপিত হবে।

৩.৪ সাঁ সিমঁ (Saint Simon) ঃ ১৭৬০—১৮২৫

সাঁ সিমঁ ছিলেন সেই ধরনের মানুষ যাঁরা সমাজ পরিবর্তনের স্বাভাবিক ধারাকে মেনে নিয়ে কাম্য ও কাঙ্খিত পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় অংশীদার হতে চান, কিন্তু পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডগুলোর সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখতে পারেন না। কিশোর বয়সে আমেরিকার স্বাধীনতা বিপ্লব তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু যুবক বয়সে যখন তাঁর নিজের দেশেই সেই অসাধারণ বিপ্লবটি সংঘটিত হচ্ছে (১৭৮৯ সাল থেকে) তখন কিন্তু জঙ্গী, আক্রমণাত্মক কর্মকান্ড দেখে তিনি কিছুটা নিরুৎসাহী হয়ে পড়েন। তিনি অবশ্য পরিবর্তনের পক্ষেই ছিলেন। মধ্যবয়সে আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে সাঁ সিমঁ বলেন, ''...I was convinced that the 'Ancient Regime'

could not be prolonged, and on the other, I had an aversion to destruction.'' অর্থাৎ তাঁর এই দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে ফ্রান্সের পুরনো জমানার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, অথচ এটাও ঠিক যে ধ্বংসাত্মক কর্মে তাঁর তীব্র অনীহা। যাই হোক শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ফ্রান্সের জ্ঞানদীপ্ত ধারা রোমান্টিক বিপ্লবের ধারা উভয়ের মিলিত প্রভাবেই তৈরী হয়েছিল সাঁ সিমঁ-এর সমাজ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

সাঁ সিমঁ মনে করেন পুরনো সমাজের জঠরে সৃষ্টি হয়েছে এমন কিছু শক্তি যা ইউরোপীয় সমাজে ঐতিহাসিক পরিবর্তনের কারণস্বরূপ। নতুন যে শক্তিগুলো প্রকাশ পাচ্ছিল তার মধ্যে সাঁ সিমঁ বিশেষভাবে উল্লেখ করেন বিজ্ঞানের উন্নতি, শিল্পপতি বুর্জোয়া ও বণিক বুর্জোয়ার আগমন, প্রোটেস্টান্ট আন্দোলন, জ্ঞানদীপ্ত আন্দোলন ইত্যাদি শক্তিকে। এদের মধ্যে তিনি জ্ঞানদীপ্ত ধারার কর্মকান্ডকে নেতিবাচক এবং ধ্বংসাত্মক বলে গণ্য করেছেন। তাঁর মতে পুরনো সমাজ ভেঙ্গে দিতে সাহায্য করলেও এই জ্ঞানদীপ্ত ধারা সমাজ পুনর্গঠনে তথা নতুন সমাজ গড়ে তোলার ব্যাপারে কোন সদর্থক সহায়তা করে না। নতুন (উনবিংশ) শতাব্দীতে সাঁ সিমঁ তাঁর সমসাময়িকদের স্মরণ করিয়ে দেন গঠনমূলক দায়িত্ব পালনের কথা, বিদ্রোহ-বিপ্লব বর্জন করে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্রিয়ায় নিজেদের নিযুক্ত রাখার কথা।

৩.৩.১ বিজ্ঞানবাদ (Positivism)

সাঁ সিমঁ বলেন উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ এক বিজ্ঞানবাদী স্তরের মুখোমুখী। এই স্তর যেমন সামাজিক স্তর, শিল্পসমাজের স্তর, তেমনি এই বিজ্ঞানবাদী স্তর হল মানুষের জ্ঞানের আধুনিকতম স্তর। মানুষের সমাজকে, মানুষের সামাজিক জীবন ও আচরণকে বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বুঝতে হবে, বিচার করতে হবে। ধর্মীয় মতান্ধতার বদলে বিজ্ঞানসম্মত বক্তব্য মেনে চলতে হবে। ফলতঃ মধ্যযুগে যে পুরোহিত শ্রেণী ও অভিজাত গোষ্ঠী ক্ষমতাসীন ছিল তাদের বদলে বিজ্ঞানী ও শিল্পপতিরা নতুন যুগের স্বাভাবিক নেতৃত্বের মর্য্যাদা পাবে। নতুন নেতৃত্বের বিশিষ্টতা হ'ল প্রাকৃতিক/পার্থিব বিষয়ের সকল ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি মানবিক প্রসঙ্গগুলিতেও বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা।

ধর্মের জায়গায় স্থান পাবে বিজ্ঞান। সাঁ সিমঁ যে ভবিষ্যৎ সমাজের ছবি এঁকেছেন তাতে এই পরিবর্তনটাই প্রধান। একসময় ধর্মই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছিল। আধুনিক মানুষকে সংঘবদ্ধ রাখবে বিজ্ঞান। সমাজগঠন ও নিয়ন্ত্রণে পুরোহিতদের বদলে আসবে বিজ্ঞানীদের, আর সামন্তপ্রভুদের জায়গায় আসবে শিল্পপতিরা। এটা মনে হতেই পারে যে সাঁ সিমঁ আসলে সম্পত্তির মালিকদের সঙ্গে (শিল্পপতিদের সঙ্গে) বুদ্দিজীবীদের সুসম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজে স্থিতি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিল। সাঁ সিমঁ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এমিল ডুর্খাইম বলেছেন, ''...the idea, the word, and even the outline of positivist philosophy are all found in Saint Simon.'' অর্থাৎ দৃষ্টবাদী (বিজ্ঞানবাদী) দর্শনের যা কিছু সবই সাঁ সিমঁ-এর অবদান। অতএব যে কৃতিত্ব আগস্ত কঁত্‌কে দেওয়া হয় তার প্রায় সবটাই সাঁ সিমঁ-এর প্রাপ্য এ কথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না। যেমন, কঁত্-এর নামে প্রচলিত ইতিহাসের ত্রিস্তর বিধির যে তত্ত্ব, যেখানে তৃতীয় বা আধুনিক স্তরটিকে positive বা সদর্থক (বিজ্ঞানবাদী) বলা হচ্ছে সেটাও খুঁজে পাওয়া যাবে সাঁ সিমঁ-এর 'Letters from an Inhabitant of Geneva' নামক রচনায়।

আধুনিক দৃষ্টবাদী, সদর্থক, বিজ্ঞান-এর স্তরে এক উন্নত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব বলে সাঁ সিঁম মনে করতেন। বাস্তবিকপক্ষে পুরনো সামন্তমধ্যযুগীয় ব্যবস্থার একটি দিক্ তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল।

সেটা হ'ল চার্চ ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে ওঠা মধ্যযুগের এক ধরনের আন্তর্জাতিকতা। অবশ্যই তিনি আন্তর্জাতিকতার আকর্ষণে পিছনে ফিরতে চান নি। তিনি জানিয়েছেন, আধুনিক বিজ্ঞানবাদী পর্যায়ে নতুন কোন নীতির উপর দাঁড়িয়েই নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরী করতে হবে। তাঁর মতে বিজ্ঞান ও দৃষ্টিবাদী দর্শন একটা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা তৈরী করে ইউরোপের জাতি রাষ্টগুলোকে সংহত রাখতে পারবে। তাঁর এরূপ ধারণা ছিল যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে ইউকোপের সমাজগুলিতে কোন স্থিতি আসবে না।

সাঁ সিমঁ-এর মতে ইউরোপীয় সমাজগুলির পরিবর্তনের মূলে রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর অগ্রগতি। নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োগে সমাজগুলো নতুন করে গঠিত এবং সংহত হয় এবং আধুনিককালে সেই সংহতি জোরদার হয় কেবলমাত্র দৃষ্টিবাদী (বিজ্ঞানবাদী) দর্শনের প্রয়োগে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনেক শাখা-প্রাশাখা সমাজে বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিজ্ঞান, যা কিনা 'মানব-বিজ্ঞান', সেটাই এখনও ঠিকমত গড়ে ওঠেনি—এই বলে সাঁ সিমঁ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অর্থাৎ প্রকৃতি বিজ্ঞানগুলোর আদলে এই মানবিজ্ঞান তৈরী করতে হবে। সমাজ বিকাশ, সমাজ বিবর্তন ও সমাজ প্রগতির বিধি আবিষ্কার করাই হবে এই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। এই সব বিধি আবিষ্কৃত হলে অতীত ও বর্তমানের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ সম্ভব হবে।

৩.৩.২ সমাজ-কাঠামো ও সমাজতন্ত্র

সাঁ সিমঁ বলেন সমাজে দু'ধরনের মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। এক, যারা উৎপাদন কর্মে নিযুক্ত (Producers), দুই, যারা অলস এবং ভবঘুরে (Idlers)। প্রথম শ্রেণীর মানুষদের তিনি আবার অনেক উপগোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন, যেমন—ব্যাঙ্ককর্মী, শিল্পপতি, বিজ্ঞানী, পরিচালনবিদ্, কায়িক শ্রমদানকারী কর্মী ইত্যাদি। বলা বাহুল্য পরবর্তীকালে কার্ল মার্ক্স সমাজতন্ত্রের পূর্বসূরীদের মধ্যে সাঁ সিমঁ সম্পর্কে বলতে গিয়ে উপরিউক্ত শ্রেণী বিভাজনকে নিতান্তই নিম্নমানের চিন্তা বলে চিহ্নিত করেছেন। মার্ক্স বলেন, শিল্প সমাজের শ্রেণী-কাঠামো তথা সমাজ-কাঠামোর বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমাজের সম্পত্তির কাঠামোর কথা এবং মানুষের তৈরী বৈষম্যের বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে। সাঁ সিমঁ সম্পত্তি ব্যবস্থার তথা বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের শ্লোগান তোলেন নি। সাম্যের আদর্শ নিয়েও তিনি পৃথক কোন বক্তব্য রাখেন নি। তিনি কেবল মনে করেছিলেন উৎপাদনের যুক্তিযুক্ত পরিকল্পনার সাহায্যেই সমাজ জীবনের উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তার অন্যতম পুর্বসূরী হিসাবে চিহ্নিত হলেও সাঁ সিমঁ মেহনতী মানুষের স্বার্থকে তাঁর রাষ্ট্রদর্শন বা সমাজদর্শনে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এমন কথা নির্দ্বিধায় বলা যাবে না। কার্ল মার্ক্স জানাচ্ছেন, একমাত্র 'New Christianity' নামক সাঁ সিমঁ-এর সর্বশেষ রচনায় মেহনতী মানুষের মুক্তির কথা ঘোষিত হতে দেখা যায়। অন্যান্য গ্রন্থে বুর্জোয়ার অগ্রগতিকেই স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। সময়ের হিসাবে তিনি হয়ত ঠিকই বলেছিলেন কারণ সাঁ সিমঁ-এর সময়েও বুর্জোয়ার প্রগতিশীল চরিত্র লক্ষ্য করা যেতে পারে। অন্ততঃ তখনও পর্য্যন্ত প্রলেতারীয় বিপ্লবের ধারণা গড়ে ওঠার অবস্থা তৈরী হয় নি।

সাঁ সিমঁ যেভাবে রাজনীতি ও অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা বলেছেন সেটা মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রকে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। সাঁ সিমঁই প্রথম বুঝেছিলেন উৎপাদন প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধানের কাজটাই রাষ্ট্র ও রাজনীতির আসল কাজ। তিনি বলেন, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে অভিন্নরূপ ভাবতে হবে—কেননা, রাজনীতি

হ'ল উৎপাদন কর্মের বিজ্ঞান। এঙ্গেলস সাঁ সিমঁ-এর এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করে সাঁ সিমঁ-এর কাছে তাঁর এবং তাঁর বন্ধু কার্ল মার্ক্সের ঋণ স্বীকার করেন।

৩.৩.৩ ইতিহাস দর্শন, আন্তর্জাতিকতাবাদ ও ধর্ম

হেগেল ইতিহাসকে যুক্তির বিকাশ বলে নির্দেশ করেছেন। সাঁ সিমঁ 'যুক্তি'র বদলে 'বৈজ্ঞানিক চিন্তা'র উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় হেগেলের মতই তিনিও বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের বিকাশের কথা বলেছেন। আবার হেগেলের মতই সাঁ সিমঁ বিকাশ ও প্রগতির ধারাকে বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাত-এর পরিণতি বলে চিহ্নিত করেছেন।

প্রত্যেক সমাজব্যবস্থা অগ্রগতির একটা পর্য্যায়ে পরিণত (nature) অবস্থান প্রদর্শন করে। আর ঐ পরিণত পর্য্যায়টাই হল তার পতন বা অবনয়নের প্রথম ধাপ। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন দশম শতাব্দী নাগাদ ইউরোপের সামন্তবাদ একটা পরিণত পর্য্যায়ে পৌঁছায়। এবং তার থেকেই সামন্ত ব্যবস্থার ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যায় ; সেই পতন প্রক্রিয়া অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে অর্থাৎ নতুন বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক পর্য্যায়ের জন্ম দিয়েছে। সামন্ত সমাজের জঠরেই বিজ্ঞান ও শিল্পব্যবস্থার উদ্ভব এবং সেই শক্তির বিকাশের ফলেই পুরনো সামন্তকাঠামো ভেঙ্গে নতুন ধনতান্ত্রিক কাঠামোর আগমন। বলা বাহুল্য সাঁ সিমঁ-এর এই ইতিহাসতত্ত্ব কার্ল মার্ক্স কৃত সমাজ পরিবর্তনের ব্যাখ্যাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

সাঁ সিমঁ বিপ্লবকে প্রয়োজনীয় ও অনিবার্য্য বলেছেন ; আবার একইসঙ্গে তিনি বিপ্লবীদের সমালোচনাও করেছেন। তাঁর মতে নতুন ব্যবস্থা কি হবে তা সঠিক নির্দ্ধারণ না করে পুরনো ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেওয়াটা অস্থিরতা এবং অযৌক্তিকতার প্রকাশমাত্র। তিনি বিপ্লবের বিরোধী নন ; বিপ্লবীরা যে অবস্থায় যেভাবে জঙ্গী আক্রমণাত্মক ক্রিয়ায় মেতেছিলেন তিনি তারই বিরোধিতা করেছেন মাত্র। তাঁর মতে ঐ প্রস্তুতির অভাবের জন্যই বিপ্লব সাফল্য পেল না, একটা সদর্থক পর্য্যায়ে তা উন্নীত হ'ল না। বিপ্লবীরা তাদের ধ্বংসাত্মক, সমালোচনামূলক ও নেতিবাচক অবস্থান অতিক্রম করে সদর্থক, বিজ্ঞানবাদী স্তরটির সন্ধান পেল না। তাই নতুন যুগে নতুন সমাজ গঠনের জন্য নতুন মানুষের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বলে সাঁ সিমঁ মনে করেছেন। বিজ্ঞানবাদী দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে, সদর্থক ও গঠনমূলক ক্রিয়ায় উদ্যোগী হওয়ার জন্য তিনি আবেদন জানান।

নতুন সমাজ গঠনের প্রসঙ্গেই সাঁ সিমঁ তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রস্তাবটি হাজির করেন। তিনি বলেন একটিমাত্র দেশে পৃথকভাবে নতুন সমাজে উত্তরণ সম্ভব হবে না। বিশেষতঃ ইউরোপে সমাজগুলো নানাভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত তাই সেখানে জাতিগুলোর এক অভিন্ন সংস্থা / সংগঠন তৈরী করা একান্তই জরুরী। নিরাপত্তার কারণে উৎপাদন কর্মে নিরাপত্তা— এবং মুক্ত বিনিময় ব্যবস্থার স্বার্থে ইউরোপের দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অধুনা আমরা যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সংগঠিত হতে দেখছি তাতে যেন দু'শ বছর আগেকার সাঁ সিমঁ উল্লিখিত ইউরোপীয় আন্তর্জাতিকতাবাদেরই প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। সাঁ সিমঁ ইউরোপীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য বলেছিলেন, ''The producers of all ands are...essentially friends'' তিনি অবশ্যই 'এক জাতি একরাষ্ট্র' ধরনের শ্লোগানের সম্ভাবনা বিচার করে দেখেন নি, হিটলার, মুসোলিনীর মত উগ্র জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ট নেতৃত্ব কিভাবে আন্তর্জাতিকতাবাদের যাবতীয় ভাবনা আদর্শকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে তাও নিশ্চিত তাঁর কল্পনায় আসে নি। তবে যে কথা আমরা একটু আগেই জানিয়েছি, এই একবিংশ শতকের প্রারম্ভে নতুন করে আবার সাঁ সিমঁ-এর আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন"-এর মত প্রচেষ্টাগুলি।

সাঁ সিমঁ বিজ্ঞানকে, বিজ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতিকে, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রতিষেধক মনে করেছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল আধুনিক গবেষকগণ ও বিজ্ঞানীরা এমন এক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তুলতে পারবেন যেখানে সমাজের ঐক্যবিরোধী শক্তিগুলো দুর্বল হয়ে পড়বে এবং একটা আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা পাবে।

'Industrial System' এবং 'The New Christianity' নামক গ্রন্থগুলিতে সাঁ সিমঁ ঈশ্বরের প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর মনে হয়েছে শান্তিস্থাপন কিংবা ঐক্য সৃষ্টির জন্য শেষ পর্য্যন্ত নৈতিক ভাবানুভূতির (moral sentiments) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। এই হিসাবে তাঁর সমকালীন হিতবাদী (utilitarian) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি ভিন্ন অবস্থান নিয়েছিলেন। নৈতিক সংহতির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সাঁ সিমঁ-এর ঈশ্বর নৈর্ব্যক্তিক এবং সর্বব্যাপী। এক ধরনের সর্বেশ্বরবাদ তিনি উপস্থাপিত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন যেখানে বস্তু এবং ভাব মিলে একাকার। আর নৈতিকতার প্রসঙ্গে তিনি অবশ্যই সেক্যুলর (Seculer) বা অনাধ্যাত্মিক বিষয়গুলোই নির্দেশ করেছেন। মনে হয় উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় চার্চের শিক্ষা ও পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি যেভাবে নতুন ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করছিল তারই এক ধরনের প্রকাশ ঘটেছিল সাঁ সিমঁ-এর সর্বশেষ রচনাগুলিতে।

আমরা লক্ষ্য করব সমাজতত্ত্বের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধক আগস্ত কঁত্-এর রচনায় উপরিউক্ত সাঁ সিমঁ কৃত তত্ত্ব ও ধারণাগুলো আরও বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ভাষ্যকারগণ অনেকেই বলেন, কঁত্ বিশেষ কোন ঋণ স্বীকার না করেই সা সিমঁ-এর ধারণাগুলো নিজের নামেই প্রকাশ করেছেন। অন্যতম অগ্রদূত হিসাবে সেই কুম্বিলক আগস্ত কঁত্-এর তত্তচিন্তা আলোচনা করেই আমরা সমাজতত্ত্বের গোড়ার কথা জানবার চেষ্টা করব।

৩.৪ আগস্ত কঁত্ (Auguste Comte) ১৭৯৮-১৮৫৭

আগস্ত কঁত্-এর নাম সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর অবদানগুলির অন্যতম হ'ল সমাজচর্চাকে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক চর্চা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দানের জন্য উদ্যোগী হওয়া। সমাজতত্ত্ব কথাটি যেমন তিনিই প্রথম চয়ন করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন, তেমনি সমাজব্যবস্থা নিয়ে প্রকৃত বিজ্ঞানবাদী বিদ্যাচর্চা গড়ে তোলা যায় কিনা তা নিয়েও তিনিই প্রথম সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি দাবী করেছেন যে সমাজতত্ত্বকে Positive Science বা সদর্থক বিজ্ঞান হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি মানব-সমাজের ত্রিবিধ পর্য্যায়ভিত্তিক বিবর্তনের যে তত্ত্ব হাজির করেছেন তাতে আধুনিকতম পর্য্যায়টির নামই হ'ল Positive stage বা বিজ্ঞানবাদী পর্য্যায়। এছাড়া তাঁর বিজ্ঞানের ক্রমপর্যায় (Hierarchy of Sciences)-এর তত্ত্ব, সামাজিক বলবিদ্যা ও স্থিতিবিদ্যার তত্ত্ব (Social Dynamics and Social Statics) ইত্যাদি তাত্ত্বিক আলোচনাতেও দৃষ্টিবাদী বা বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকট হয়েছে।

সাঁ সিমঁ-এর মতই আগস্ত কঁত্ ও ফরাসী দেশের বৈপ্লবিক আক্রমণাত্মক কর্মকান্ডগুলো সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি তাই বলেন, বিপ্লবীদের রোমান্টিক, জঙ্গী ও ধ্বংসাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানবাদী ও গঠনমূলক মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। বিপ্লবের পর্য্যায়টি ছিল নঞর্থক পর্য্যায়। কঁত বলেন, ঐ নঞর্থক পর্য্যায়কে অতিক্রম করে আধুনিক শিল্প সমাজের Positive বা বিজ্ঞানবাদী স্তরে সদর্থক শাস্ত্র হিসাবে সমাজতত্ত্বকে আহ্বান করা যাবে।

৩.৪.১ বিজ্ঞানবাদী দর্শন (Positive Philosophy)

বিশিষ্ট ভাষ্যকার লেসজেক্ কোলাকয়স্কি (Leszek Kolakowski) বলেন, গত দু'শ বছর ধরে বিজ্ঞানবাদ (দৃষ্টবাদ) এত বিচিত্র এবং বিভিন্ন ধারায় বিকাশ লাভ করেছে যে নির্দিষ্ট একটি কোন বিজ্ঞানবাদী (বা দৃষ্টিবাদী) দার্শনিক ঐতিহ্যের কথা না বলাই শ্রেয়। তবে আমরা একথা বলতে পারি যে, কোন দার্শনিক তত্ত্ব বা বিশ্লেষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয় (thing), প্রস্তাব (propositions) এবং সিদ্ধান্ত (generalizations) থাকে যা সেই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক ও সমালোচকদের কাছে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত ও স্বীকৃত। বিজ্ঞানবাদের ক্ষেত্রেও আমরা এরূপ কিছু স্বীকৃতি ধারণা ও সিদ্ধান্তের উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমতঃ বিজ্ঞানবাদ (পজিটিভিজম্) সত্তা এবং তার বাহ্যমূর্তির (বা আকৃতির) মধ্যে কোন পার্থক্য করতে চায় না। তাই এটা একপ্রকার প্রপঞ্চবাদ বা Phenomenalism-এর মত। প্রপঞ্চ এবং সত্তার মধ্যে প্রকৃত প্রভেদ নেই (no real difference between phenomenal apperanance and essence)।

বিজ্ঞানবাদীরা বলবেন, অভিজ্ঞতায় যা প্রতিভাত, যা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ কেবল সেটাই আমরা লিপিবদ্ধ করতে পারি, কেবল তারই বিচার বিশ্লেষণ চলতে পারে। এই হিসাবে পজিটিভিজম্ বা বিজ্ঞানবাদ যাবতীয় অধিবিদ্যামূলক (Metaphysical) ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। অবশ্য সত্তা ও প্রপঞ্চের মধ্যে প্রভেদ না করলেও বিজ্ঞানবাদীরা এটা মানেন যে প্রকাশিত বিষয় এবং তার অন্তর্নিহিত কারণের মধ্যে পার্থক্য থাকবে। যেমন বলা যেতে পারে কোন রোগের ক্ষেত্রে দ্রুত কারণ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা চালান। তবে ইন্দ্রিয়াতীত, অতিপ্রাকৃত, রহস্যপূর্ণ, সাধারণের অজ্ঞাত, বিশেষ গূঢ় কোন কারণ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টাকে বিজ্ঞানীদের সমর্থন করেন না।

বিজ্ঞানবাদীরা যেমন সবকিছুর মূলে কোন Spirit বা মহাচৈতন্যের উপস্থিতি মানবেন না, তেমনি কোন Essential Matter বা তথাকথিত বিশুদ্ধ অজেয় বস্তুসত্তাকেও তাঁরা সবকিছুর মূল বলে গ্রহণ করেন নি। বরং তাঁরা গোঁড়া ভাববাদের মত গোঁড়া বস্তুবাদ এর মধ্যেও অধিবিদ্যাশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গি লুকিয়ে আছে বলে মনে করেন।

দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানবাদীরা একপ্রকার Nominalism বা সংজ্ঞাবাদ মেনে চলেন। সংজ্ঞাবাদ বলে, আমাদের সাধারণ ধারণাগুলি নামপদ বা শব্দমাত্র। সংজ্ঞাবাদ অনুসরণে বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, কোন নির্দিষ্ট মূর্ত (concrete) বাস্তব ব্যাপারে ভিন্ন অন্য কিছুর প্রসঙ্গে কোন ধারণা বা উপলব্ধিকে সাধারণ জ্ঞানের আকারে (General proposition) সূত্রবদ্ধ করা সম্ভব নয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় বিজ্ঞানবাদীরা প্লেটোর 'ন্যায়নীতি' (Justice) সংক্রান্ত তত্ত্বকে গুরুত্ব দেবেন না, যেহেতু কোন নির্দিষ্ট, মূর্ত, সমাজব্যবস্থার কথা না বলে একটি বিমূর্ত সাধারণ তত্ত্ব হিসাবে তাকে হাজির করা হয়েছে। তাই বলে বিজ্ঞানবাদীরা কোন Abstraction বা বিমূর্তায়ন প্রক্রিয়াকে মানেন না এমন বলা যাবে না। তারা কেবল বলবেন ওটা যেন বৈজ্ঞানিক বিমূর্তায়ন (Scientific abstraction) হয়। বৈজ্ঞানিক বিমূর্তায়নের অর্থ হ'ল অভিজ্ঞতায় হাজির বা প্রত্যক্ষকরণে ফসল স্বরূপ বিষয় ও ঘটনাগুলোকে সুসংবদ্ধরূপে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিমূর্ত ধারণা (abstract concept) তৈরী করা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ঐ বিমূর্ত ধারণাগুলোর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তারা কেবল বাস্তব বিষয়ের গবেষণার সাহায্যকারী মাধ্যম (means) মাত্র।

তৃতীয়তঃ, পজিটিভিজম্ বা বিজ্ঞানবাদ কোন গবেষণা কর্মে পছন্দ-অপছন্দের, ভাল মন্দের বা মূল্যবোধভিত্তিক ধারণাকে প্রাধান্য দেয় না। কোন বস্তু বা কোন ঘটনা সম্পর্কে 'মহান', 'সুন্দর', 'কুৎসিৎ', 'ভালো' ইত্যাদি যে সব বিশেষণ বা গুণাবলী সচরাচর জুড়ে দেওয়া হয়, বিজ্ঞানবাদ অনুযায়ী বাস্তবে তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। এগুলি নিতান্তই বিষয়ীগত (Subjective) প্রবণতা।

সর্বশেষে, বিজ্ঞানবাদী দর্শনের একটি মৌলিক অবস্থান হ'ল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলোর ঐক্যসাধন (The essential unity of scientific methods)। কঁত্ আশা করেছিলেন যে কালক্রমে এমন একটি ঐক্যবদ্ধ Positive Science গড়ে উঠতে পারে যা জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সংঘবদ্ধ করবে। (অনেকে বলেন, অনুরূপ ঐক্যবদ্ধ বিজ্ঞান গড়ে তোলার কোন সম্ভাবনা না দেখে কঁত্ শেষ পর্যন্ত তাঁর Positive Science কে প্রসারিত করেছিলেন Positive Humanism নামক এক সমন্বয়বাদী ধর্মীয় দর্শনে।)

উপরিউক্ত প্রত্যয়গুলির ভিত্তিতে কঁত্ যে সমাজতাত্ত্বিক বিজ্ঞানবাদ (Sociological Positivism)-এর প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন তা আজও নানাভাবে সমাজতত্ত্বের গবেষক-পন্ডিত মহলে আলোড়ন তুলে চলেছে। কঁত্ কেবল সাঁ সিমঁ-এর ধারণাগুলো নিজের নামে চালিয়েছেন, নাকি সমাজতাত্ত্বিক বিজ্ঞানবাদ তাঁর স্বকীয়তা বহন করছে এই বিতর্ক চলতেই পারে। কিন্তু ইতিহাসগতভাবে এখনও আমরা কঁত্কেই সমাজতাত্ত্বিক বিজ্ঞানবাদের আনুষ্ঠানিক পুরোহিত বলেই গণ্য করব।

৩.৪.২ সামাজিক-বৌদ্ধিক বিবর্তনের তত্ত্ব ঃ ত্রিস্তর প্রগতির বিধি

জ্ঞানদীপ্ত যুগের দার্শনিকগণ প্রগতির ধারণাকে উপস্থাপিত করে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন সেটা কঁত্ স্বীকার করেছেন। কিন্তু জ্ঞানদীপ্ত দার্শনিকগণ যেভাবে প্রাক্-শিল্পযুগের সমাজের সমগ্র পর্য্যায়টিকে অন্ধকারের স্তর বলে অভিহিত করেছিলেন সেটা কঁত্ গ্রহণ করতে পারেন নি। কঁত্-এর মতে সঠিক বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুকরণ করলে দেখা যাবে যে মানবসমাজ ও সভ্যতার বিকাশের প্রতিটি স্তর বা পর্য্যায়েই কিছু বিশিষ্টতা ছিল। সমাজ-ইতিহাসের প্রগতির ধারাটিকে ঐসব বিভিন্ন পর্যায়ের ক্রম অনুসারে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

Positive Science বা সদর্থক বিজ্ঞানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কঁত্ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমতঃ স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতিগুলো অবলম্বন। যেমন পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, তুলনামূলক আলোচনা ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, আলোচ্য বিষয়সংক্রান্ত কিছু বিধি বা নিয়মের সন্ধান দান। এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বলা যায় সদর্থক বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা দানের জন্য কঁত্ সমাজ বিকাশের কথা মানুষের বৌদ্ধিক বিবর্তনের একটি ত্রিস্তর বিধির কথা উল্লেখ করেছেন ঃ (ক) আধ্যাত্মিক বা কাল্পনিক স্তর (Theological / Fictitious stage); (খ) অধিবিদ্যামূলক বা বিমূর্ত স্তর (Metaphysical / Abstract Stage); (গ) বৈজ্ঞানিক / সদর্থক স্তর (Scientific / Positive stage)।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বলা যায় প্রথমাবস্থায় শৈশবের নানা ভয়-ভীতি সংস্কারের মধ্য দিয়ে, মধ্যবর্তী অবস্থায় কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে বিশ্বজগৎ সংক্রান্ত নানা ধারণার মধ্য দিয়ে এবং সর্বশেষে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে ওঠার পর বাস্তববাদী এবং বিজ্ঞানবাদী মনোভাবের সাহায্য নিয়ে মনুষ্য-ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। অনুরূপভাবে সমাজের বিবর্তনের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যাবে, প্রথমাবস্থায় আদিম ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক স্তর, মধ্যবর্তী অবস্থায় দার্শনিক বিবর্তনের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যাবে, প্রথমাবস্থায় আদিম ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক স্তর, মধ্যবর্তী অবস্থায় দার্শনিক ভাববাদী ধারা এবং আধুনিক পর্য্যায়ে হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ। এক্ষণে ত্রিস্তর বিধিটির বিশদ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হল।

(ক) (The Theological or Fictitious stage) ঃ আধ্যাত্মিক বা কাল্পনিক স্তর

আগস্ত কঁত্ বলেন, অতীতের তথা মানুষের প্রাচীন যুগের এই স্তরটিতে সমাজ জীবন-ধারায় পুরোহিত সম্প্রদায় ও সামরিক গোষ্ঠীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাবে। এই পর্য্যায়ে অলৌকিক এবং আধিভৌতিক শক্তিগুলো বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনার ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। ফলতঃ মানুষের চিন্তাভাবনা এবং জ্ঞানশৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও অপ্রাকৃত এবং অলৌকিক শক্তিনির্ভর ধারণা এবং তত্ত্বগুলো প্রাধান্য পায়। এই স্তরে মানুষ নানা ধরনের দেবদেবীর কল্পনা করে। এই সময় দেবতাদের উপর মানবিক প্রকৃতি আরোপ করা হয়।

আধ্যাত্মিক স্তরটি আবার তিনটি উপস্তরে (sub-stage) বিভক্ত। এগুলি হল ঃ (১) Fetishism—অচেতন বস্তু বা বিষয়কে ঈশ্বরজ্ঞান করা। (২) Polytheism বা বহু ঈশ্বরবাদ এবং (৩) তৃতীয় ও শেষ উপস্তরটি হল Monotheism বা একেশ্বরবাদ।

(খ) (The Metaphysical or Abstract stage) ঃ অধিবিদ্যামূলক / বিমূর্ত স্তর

এই স্তরটিতেও চার্চ কর্তৃপক্ষের কিছুটা প্রভাব বিদ্যমান থাকে। এছাড়া ধর্মীয় ব্যবস্থাদির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন আইনবিদ এবং শাস্ত্রকারগণও এই স্তরে গুরুত্ব পেয়ে থাকেন। তবে ক্রমশই এই স্তরে বিমূর্তশক্তি ও যুক্তির প্রাধান্য বাড়তে থাকে। Augusta Comte মনে করেন যে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক থেকে অর্থাৎ ইউরোপীয় রেনেসাঁসের এর অব্যবহিত পূর্বের শতাব্দী থেকে এই অধিবিদ্যাগত স্তরের সূত্রপাত হয়েছে। বলা বাহুল্য এই স্তরের আয়ুষ্কাল খুবই কম। কঁত্ বলেন, শিল্পবিপ্লব এবং ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়েই এই স্তর নিঃশেষিত হয়েছে। এই স্তরের পরিণত পর্য্যায়ে যেমন জ্ঞানদীপ্ত দার্শনিকদের যুক্তিবাদীতার আবির্ভাব ঘটে তেমনি এই পর্য্যায়ে একপ্রকার রোম্যান্টিক প্রতিক্রিয়াও দেখা যায় (যেমন রুশোর মধ্যে)। উপরন্তু কঁত্-এর মতে এই অধিবিদ্যার স্তরে বুদ্ধিবাদ, রোমান্টিকতা ইত্যাদি সব কিছুরই শেষ ফসল হল এক নঞর্থক এবং ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া বা নানা গণবিদ্রোহ এবং সমাজবিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই নঞর্থক প্রকৃতি সত্ত্বেও কঁত্ এই পর্য্যায়টির মূল্য স্বীকার করতে ভোলেন নি। কঁত এই স্তরটিকে— এই অধিবিদ্যাগত পর্য্যায়কে এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণের স্তর বলে গণ্য করেছেন।

পূর্বেকার আধ্যাত্মিক স্তরটিকে বর্জন করে আধুনিক বিজ্ঞানবাদী স্তরের ভিত্তি রচনা করতেই যেন এই মধ্যবর্তী অধিবিদ্যাগত স্তরের আবির্ভাব। কঁত মনে করেন, এই মধ্যবর্তী পর্য্যায়ে ধ্বংসাত্মক এবং নঞর্থক প্রকৃতিটি এতই প্রকট বলেই মানুষ তার আধুনিক শিল্পসমাজের পর্য্যায়ে সদর্থক বিজ্ঞানবাদী এবং গঠনমূলক (constructive) ক্রিয়াকেই সবিশেষ গুরুত্ব দিতে পারছে।

(গ) (The Positive or Scientific Stage) ঃ সদর্থক বিজ্ঞানবাদী পর্য্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই সদর্থক বিজ্ঞানবাদী পর্য্যায়ের সূচনা হয়েছে এ কথা বলা যেতে পারে। এই সময় থেকেই তাত্ত্বিক ধারণাগুলো সদর্থক ধারণা হিসাবে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। এই পর্য্যায়কে বিজ্ঞানবাদী বলার কারণ হ'ল এই যে এই সময় থেকে কল্পনাশ্রয়ী বক্তব্য উপস্থাপিত করার বদলে মানুষ নানাপ্রকার পর্যবেক্ষণও পরীক্ষা ভিত্তিক বক্তব্য হাজির করার চেষ্টা করেছে।

আধুনিক পর্য্যায়টিকে আগস্ত কঁত্ কেবল বিজ্ঞানবাদী পর্য্যায় বলেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি মনে করেছেন এটাই হ'ল মানবসমাজের বিবর্তনের সর্বোন্নত এবং সর্বশেষ পর্য্যায়। সদর্থক নামে অভিহিত করলেও তিনি পর্য্যায়টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের কোন সদর্থক ভূমিকার কথা বলেন নি। বলা বাহুল্য এটা কঁত্-এর এলিটবাদী

(Elitist) মনোভাবেরই অনিবার্য ফল। ফরাসীরা যেভাবে জঙ্গী-বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিল কঁত্ তা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য মনে করেন নি। তাঁর বরং এরূপ ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে জনগণ বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করলে কেবল ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াই সম্পন্ন হতে পারে। অগণিত মানুষ নিয়ে কখনও গঠনমূলক কাজ হয় না।

সদর্থক পর্য্যায়ে সমাজজীবন ও শিল্পকর্ম নিয়ন্ত্রণ করবে বিজ্ঞানীরা। কঁত্ অবশ্য বিজ্ঞানী বলতে বিচিত্র কর্ম ও পেশায় নিযুক্ত সমাজের উপর তলার শ্রেষ্ঠাংশকেই বুঝিয়েছেন। এই শ্রেষ্ঠাংশ বা Elite গণ অবশ্যই সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং কঁত্-এর মতে এরাই প্রকৃত গঠনমূলক কাজের উপযুক্ত। এঁদের মধ্যে যেমন গবেষক বিজ্ঞানীরা রয়েছেন, তেমনি এই গোষ্ঠীতে থাকবেন ম্যানেজারগণ, দক্ষ-কারিগরগণ এবং পরামর্শদাতা আমলাগণ। বিমূর্ত রোম্যান্টিক পর্য্যায়ে যে সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল তাকেই পুনর্গঠিত করার কাজে এই শ্রেষ্ঠাংশ বা এলিট গোষ্ঠী নিজেদের নিযুক্ত রাখবেন।

সমাজ বিবর্তনের উপরিউক্ত তিনটি স্তরের সঙ্গে সমতা রেখে মানবিক মূল্যবোধগুলোরও পরিবর্তন হয়েছে লক্ষ্য করা যাবে। কঁত্ বলেছেন আধ্যাত্মিক স্তরে তো বটেই, বিমূর্ত অধিবিদ্যার স্তরেও সাধারণভাবে জঙ্গী সামরিক গোষ্ঠীর মূল্যবোধগুলোই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তবে কিনা আধ্যাত্মিক স্তরে সামরিক গোষ্ঠীর মূল্যবেধ যেরূপ আগ্রাসী ধরনের ছিল সে তুলনায় বিমূর্ত স্তরে সামরিক মূল্যবোধগুলো অপেক্ষাকৃত স্থিতাবস্থাকামী।

কঁত্ এরূপই অনুভব করেছেন যে তিনি যেন তাঁর চোখের সামনে একটি ব্যবস্থার অবসান এবং অপর একটি ব্যবস্থার আবির্ভাব লক্ষ্য করছেন। তিনি দেখছেন যে আধ্যাত্মিক এবং সামরিক ব্যবস্থাপুষ্ট সমাজগুলো মৃতপ্রায় (Theological Military society was dying)। অন্যদিকে তাঁরই সামনে বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্পসমাজ সূর্য্যোদয়ের মত আবির্ভূত। কঁত্ এই আধুনিক সমাজকেই স্বাগত অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এই ভেবে যে পুরোহিত সম্প্রদায় এবং ধর্মপ্রচারকদের সরিয়ে দিয়ে বিজ্ঞানী এবং শিল্পগোষ্ঠীর মানুষেরাই সমাজে কর্তৃত্ব কায়েম করেছে। এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আধুনিক যুগের এলিট্ গোষ্ঠীর মধ্যে Captains of Industry বা শিল্পের কর্ণধারগণই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকবেন বলে কঁত্ নির্দেশ দিয়েছেন। মার্কসবাদীগণ এই কারণেই হয়ত কঁত্-এর সমাজতত্ত্বকে একাধারে রক্ষণশীল এবং বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থপুষ্ট Ideology বলে অভিহিত করেছেন।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে কঁত্ কৃত সমাজবিবর্তন তথা মানবপ্রগতির তত্ত্বটি Unilinear theory বা একরৈখিক তত্ত্বের দোষেদুষ্ট। মানবসমাজ সর্বত্র যেন একটিমাত্র ছক অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। উপরন্তু সব সমাজই যেন অনিবার্যভাবে Positive বা বিজ্ঞানবাদী স্তরের দিকে ধাবিত। এই হিসাবে মানুষের ইতিহাস যেন এক অভিন্ন জনগোষ্ঠীর ইতিহাস। এরূপভাবে বিশ্বের মানুষের সমাজ ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে এক সর্বাত্মক ঐক্য বা Unity সন্ধানের যে প্রচেষ্টা আগস্ত কঁত্ করেছেন তাকে পরবর্তীকালে সমাজতাত্ত্বিক ও সমালোচকগণ deterministic বা নিয়ন্ত্রণবাদীতার দোষে দুষ্ট বলে ঘোষণা করেছেন।

৩.৪.৩ বিজ্ঞানগুলোর ক্রমপর্য্যায় (Hierarchy of the Science)

সমাজবিবর্তন এবং মানুষের বৌদ্ধিক ও মূল্যবোধগত বিবর্তনের মতই আগস্ত কঁত্ মানবিক জ্ঞানশৃঙ্খলাগুলোর বিবর্তনসংক্রান্ত একইরূপ বিধি বা ধারার কথা বলেছন। কঁত এর মতে মানুষ যেমন তার আদি পর্য্যায়ে

বিজ্ঞানবাদীতা অর্জন করে নি তেমনি তখন মানুষের বিদ্যাচর্চাও ছিল অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের। কোন কোন জ্ঞানশৃঙ্খলার তখন জন্মই হয় নি। বলা যেতে পারে মানববিদ্যাগুলো তাদের প্রকৃতি ও গুরুত্ব অনুযায়ী এক একটি স্তরে প্রকাশ পেয়েছে।

মানবসমাজের প্রাথমিক স্তরে যে বিদ্যার বিকাশ ঘটেছিল তা হ'ল Astronomy বা জ্যোতির্বিদা। এর কারণ হ'ল, ঐ আদি পর্য্যায়ে মানুষ ছিল কল্পনাশ্রয়ী। রহস্য এবং মোহমায়াজাল বিস্তার করে যে ধরনের কল্পচিত্র এবং অবৈজ্ঞানিক দার্শনিক সিদ্ধান্ত হাজির করা হ'ত তাতে জ্যোতির্বিদ্যার মত শাস্ত্রের আবির্ভাব স্বাভাবিক বলে মনে হয়। প্রাচীনকালে আরও একটি শাস্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল তাহ'ল Mathematics বা গণিতশাস্ত্র। জ্ঞানশৃঙ্খলাগুলোর ক্রমপর্য্যায়ের প্রাথমিক ভিত্তিভূমি হিসাবে গণিতশাস্ত্রের উৎপত্তি। অধুনা যে বিজ্ঞানবাদী পদ্ধতি মানুষ সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করছে তার প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে গণিতের উল্লেখ করতে হয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রের পর ক্রমপর্যায়ে যে শাস্ত্রগুলো ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছে সেগুলি হ'ল যথাক্রমে Mechanics (বলবিদ্যা), Physics (পদার্থবিদ্যা), এবং Chemistry (রসায়নবিদ্যা)। প্রতিটি বিজ্ঞানই তার পূর্ববর্তী শাস্ত্রটির অগ্রগতির ভিত্তিতেই বিকাশ লাভ করে। এই হিসাবেই জ্ঞানশৃঙ্খলাগুলোর একটি Hierarchy বা ক্রমপর্য্যায় তৈরী হয়েছে।

অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্য্যায়ে যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি হ'ল জীববিদ্যা এবং শারীরবিদ্যা (biology and physiology)। অতঃপর ঐ দু'টি শাস্ত্রকে অতিক্রম করে সর্বাধুনিক এবং সর্বোন্নত শাস্ত্র হিসাবে সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে বলে কঁত্ দাবী করেন। অর্থাৎ কঁত্-এর মতে আধুনিক সমাজ যেমন সদর্থক (positive) বা বিজ্ঞানবাদী সমাজ, তেমনি সেই সমাজেরই উপযুক্ত জ্ঞান শৃঙ্খলা হিসাবে সমাজতত্ত্ব একটি Positive science বা সদর্থক বিজ্ঞান।

লক্ষ্য করার বিষয় যে কঁত্ সমাজতত্ত্বের অব্যবহিত পূর্বে biology বা জীববিদ্যার আবির্ভাবের কথা বলেছেন। কঁতীয় সমাজতত্ত্বে জীবনবিদ্যামূলক ধারণাগুলোর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাবে। অনেকে বলেন, Anatomy ও Physiology-এর মধ্যে যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়, সেটা অনুকরণ করেই যেন কঁত্ সমাজ কাঠামো (Structure) এবং সামাজিক ক্রিয়ার (Function) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। এছাড়া কঁতীয় তত্ত্বে Statics বা স্থিতিবিদ্যার সঙ্গে Dynamics বা গতিবিদ্যার পার্থক্য এবং Social order বা সামাজিক স্থিতাবস্থার সঙ্গে Social progress বা সামাজিক প্রগতির যে ব্যবধান নির্দিষ্ট হয়েছে সে সবই ঐ জীববিদ্যামুলক সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই উপস্থাপিত।

কঁত্-এর মতে আধুনিক শিল্পসমাজের ভিত্তি রচনার ক্ষেত্রে যেমন পূর্ববর্তী অধিবিদ্যাগত নঞর্থক স্তরের অবদান রয়েছে তেমনি আধুনিক শাস্ত্র সমাজতত্ত্বের মত বিজ্ঞানবাদী সদর্থক বিদ্যাটির পটভূমি রচিত হয়েছে পূর্বোল্লিখিত জ্ঞানশৃঙ্খলাগুলোর ক্রমপর্যায়ের মধ্য দিয়ে—বিশেষতঃ এক উন্নত পর্যায়ে Biology বা জীববিদ্যার আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে।

পদ্ধতির কথা বিবেচনা করেও জ্ঞানশৃঙ্খলাগুলোর ক্রমপর্যায় উপলব্ধি করা যায়। লক্ষ্য করা যাবে Biology-র পর থেকে Sociology বা সমাজতত্ত্ব পর্যন্ত একটি সমগ্রতাবাদী বা Holistic দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটেছে। আগের বিজ্ঞানগুলো ছিল মূলতঃ বিশ্লেষণাত্মক বা Analytical। উন্নততর পর্যায়ে Synthetic বা সংশ্লেষনাত্মক পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটেছে। এই সংশ্লেষনাত্মক পদ্ধতি গড়ে ওঠার পর্যায়ে Holistic Approach বা সমগ্রতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। জীবদেহকে যেরূপ পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্ব হিসাবে বিচার করা প্রয়োজন, সেইভাবে মানবসমাজকেও

একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা হিসাবে উপলব্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। জীববিদ্যার শিক্ষার ভিত্তিতেই প্রথম কঁত্ এবং পরবর্তীকালে স্পেনসার (Spencer) এই সিদ্ধান্ত উপনীত হন যে সমাজদেহটিও একটি organic unity বা গঠনতান্ত্রিক সংহতি। এই গঠনতান্ত্রিক (বা জীবদেহমূলক) সংহতির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে কঁত্-স্পেনসার (অন্য এক অর্থে ডুর্খাইমও) বোঝতে চেয়েছেন যে সমাজের কোন অংশকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বিচার করতে যাওয়া অনুচিত ও অযৌক্তিক। কঁত্ এর ভাষায়, ''There can be no scientific study of society...if it is separated into portions.'' এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে প্রগতিমূলক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ এবং মানবিক বিদ্যাগুলোর বিকাশের যে তত্ত্ব আগস্ত কঁত্ হাজির করেছেন তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এক উচ্চ পর্যায়ের মানবিক ঐক্যের কথা ঘোষণা করা। বিশষ্ট লেখক রেমন্ড অ্যারন তাই বলেছেন, ''Auguste Comte may be considered as, first and foremost, the sociologist of human and social unity'' বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে, বিশেষতঃ সমাজবিকাশের স্তর এবং বিজ্ঞানগুলোর বিকাশ সংক্রান্ত তত্ত্বের সাহায্যে, তিনি মানুষের এই সার্বিক সামাজিক ঐক্যের পথনির্দেশ করতে চেয়েছেন।

৩.৪.৪ সামাজিক স্থিতিবিদ্যা ও সামাজিক গতিবিদ্যা

মনুষ্য সমাজের বিকাশ তথা সমাজপ্রগতির কথা বলতে গিয়ে আস্ত কঁত্ দুটি বিশ্লেষণ ধারার উল্লেখ করেন। একটি হ'ল সামাজিক স্থিতিবিদ্যা (Social Statics), অপরটি হ'ল সামাজিক গতিবিদ্যা (Social Dynamics)। সামাজিক ভারসাম্য এবং সামাজিক স্থিতাবস্থার (Social order) প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে যখন নির্দিষ্ট একটি সময় বা কালের নিরিখে সমাজের অস্তিত্বের শর্তাবলী উল্লিখিত ও আলোচিত হয় তখনই তাকে সামাজিক স্থিতিবিদ্যা বলে। একটি সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিধি এবং তার অনুসন্ধান কর্মকেই সামাজিক স্থিতিবিদ্যা বলা হয়ে থাকে।

বিপরীতভাবে সামাজিক গতিবিদ্যা বলতে বোঝান হবে সামাজিক ঘটনাবলীর অবিরাম বিচলন সংক্রান্ত, সামাজিক বস্তুসত্যের গতিময়তা সংক্রান্ত, বিচার বিশ্লেষণ। এক অর্থে বলা যায় গতিবিদ্যা হ'ল সমাজ প্রগতি সংক্রান্ত তত্ত্বালোচনা। কঁত্ বলেন, মাবসমাজের যে প্রকৃত বিজ্ঞান অর্থাৎ সমাজতাত্ত্বিক সমাজবিজ্ঞান তার প্রধান লক্ষ্য হবে সামাজিক স্থিতি ও সমাজ-প্রগতি সংক্রান্ত বিধিগুলো আবিষ্কার করা। স্থিতি ও প্রগতি উভয়ে মিলেই সমাজ জীবনধারা। সামাজিক স্থিতাবস্থার আলোচনা করে সমাজতাত্ত্বিকগণ সমাজের অস্তিত্ববজায়কারী নানা উপাদান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারেন। আবার সামাজিক প্রগতির আলোচনা করে সমাজজীবনের নানা আন্দোলন এবং পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়। তাই এই দু'ধরনের আলোচনা-অধ্যায়নই সমাজ-জীবনধারা অনুধাবন করার জন্য জরুরী।

প্রগতি হ'ল সমাজ বিকাশের পরিচয় বহনকারী। আবার স্থিতাবস্থা হ'ল সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলোর মধ্যে একটা স্থায়ী সঙ্গতি। প্রগতির সন্ধান দেয় যে সামাজিক গতিবিদ্যা সেটা অবশ্য সামাজিক স্থিতিবিদ্যার অধীনস্থ বিষয়। যাই হোক্ সমাজতত্ত্ব বিকাশ লাভ করবে এ দু'ধরনের বিদ্যারই সফল প্রয়োগে।

সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের বিধি আবিষ্কার ও বিশ্লেষণই হ'ল সমাজতত্ত্বের লক্ষ্য। কঁত্ বলেছেন পর্যবেক্ষণ এবং তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যেই বিশ্লেষণ পরিচালিত হবে। আবার উক্ত পদ্ধতি দুটি নিয়ন্ত্রিত হবে স্থিতিবিদ্যা ও গতিবিদ্যার প্রয়োজন অনুযায়ী। অ্যারন বলেন, কঁত এখানে স্থিতিবিদ্যা বলতে নির্দিষ্ট একটি

সমাজের কাঠামো অনুধাবন করার কথা বলেছেন। আর গতিবিদ্যা বলতে বোঝান হয়েছে ইতিহাসের প্রধান রূপরেখাগুলো উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টাকে। উভয় ক্ষেত্রেই সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকে, ইতিহাসের সামগ্রিক ধারাকে প্রাথমিক গুরুত্ব প্রদান করেই আংশিক পর্যবেক্ষণগুলো বিশ্লেষণ করা হবে। কঁত্ যাকে সামাজিক মতৈক্য বলেছেন সেই অবস্থাটি, সেই স্থানটি, ব্যাখ্যা করার কাজকেই Statics বা স্থিতিবিদ্যা বলা হচ্ছে। মতৈক্য, সঙ্গতি (Consensus, harmony) ইত্যাদি কথাগুলির মধ্যে দিয়ে কঁত্ সমাজের মৌলিক ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার কাজকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। তাই সামাজিক স্থিতিবিদ্যা বলতে যেমন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের কাঠামোটি বিচার-বিশ্লেষণ করার কাজকে বোঝান হবে তেমনি আবার সংহতি গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার সহায়ক উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করার দায়িত্বকেও নির্দেশ করা হবে।

গতিবিদ্যা বলতে প্রধানতঃ বোঝান হয়েছে মানবসমাজের বিকাশের স্তর পরম্পরার ব্যাখ্যা বর্ণনাকে। এটা কেবল কেতাবী ইতিহাস রচনার কাজ নয়, সমাজতাত্ত্বিক যখন সামাজিক গতিবিদ্যার চর্চায় নিযুক্ত তখন তাঁর দায়িত্ব ঐতিহাসিকের তুলনায় কিছুটা বেশী এবং ভিন্ন। কেননা সমাজতাত্ত্বিককে প্রতিটি স্তর পৃথকভাবে বিচার করে দেখতে হবে, জানতে হবে নানা জটিলতা এবং সমস্যাসঙ্কুল সমাজ প্রবাহের মধ্য দিয়ে কিভাবে মানুষের মন এবং মানুষের সামাজিক সম্পর্কগুলির বিকাশ ঘটেছে।

গতিবিদ্যা থাকবে স্থিতিবিদ্যার অধীনস্থ হয়ে। কারণ সব সমাজেই একটা মৌলিক স্থিতি (order) বজায় রাখার কাজ থাকে। স্থিতি বজায় রাখার মধ্য দিয়েই প্রগতি সুনিশ্চিত করা যায়। স্থিতি ও প্রগতির এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিজ্ঞানবাদীদের (Positivists) অন্যতম প্রতিজ্ঞা (motto) হিসাবেই বিবেচিত হবে। স্থিতির বিকাশ প্রক্রিয়াই হল প্রগতি (Progress is the development of order)। কঁত্ মনে করেছিলেন, একপ্রকার অনিবার্য গতি নিয়েই মানবসমাজ ঐক্য ও সংহতিমূলক প্রগতির দিকে ধাবমান।

৩.৪.৫ সদর্থক মানবতাবাদ ও ধর্ম

আগস্ত কঁত্ মানবতাবাদ ও মানবিক ঐক্যের সমাজতত্ত্ববিদ্। অ্যারন বলেছেন, তিনি ছিলেন দার্শনিকদের মধ্যে সমাজতত্ত্ববিদ এবং সমাজতত্ত্ববিদ্দের মধ্যে দার্শনিক। তাঁর দর্শন সদর্থক মানবতাবাদী দর্শন। শেষ জীবনে তাঁর সমাজদর্শন এক ধরনের মানবধর্মপ্রচারের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি আহ্বান জানিয়েছেন সমাজের বিশেষজ্ঞদের, প্রযুক্তিবিদ্, শিল্পবিশেষজ্ঞ, শিক্ষণপ্রাপ্ত পরিচালন বিশেষজ্ঞ এবং সমাজতত্ত্ববিদ্দের। এঁরা সকলে সমাজগঠনের কাজে এগিয়ে আসবেন এরূপই ছিল তাঁর প্রত্যয়। উপরন্তু কঁত্ মনে করেছেন ওই গঠন কর্মটি হবে তাঁর সদর্থক মানবতাবাদী দর্শনেরই প্রকাশ। তাঁর মানবতাবাদী দর্শন মানবিক ঐক্যের কথা বলে। আর এই ঐক্যের প্রসঙ্গটি কঁত্-এর রচনায় দর্শন ও সমাজতত্ত্বের মিলন ঘটিয়েছে।

সমাজের সঙ্কট মোকাবিলায় বিপ্লব বা গৃহযুদ্ধ কোন সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারে বলে কঁত্ বিশ্বাস করতেন না। দ্রুত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বদলে তিনি ধীরগতিতে সমাজ-সংস্কারের সাহায্যে পরিবর্তন সাধনের কথা ভেবেছেন। উপরন্তু কঁত্ এক ধরনের ধর্মতাত্ত্বিক প্রত্যয় নিয়ে বলেন মানুষ বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই অনেক বেশী অগ্রসর হতে পারবে। সন্দেহ প্রকাশের মধ্য দিয়ে নয়, বিশ্বাস রাখার মধ্য দিয়েই মানবিক ঐক্যের পথ প্রশস্ত হবে। যাই হোক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখাগুলির সংশ্লেষাত্মক প্রক্রিয়া চালু রাখার মাধ্যমে যেমন তিনি সর্বোচ্চ মানববিজ্ঞানে পৌঁছতে চেয়েছেন, তেমনি তিনি চেয়েছিলেন নিজেকে এক মানবধর্মের (religion of humanity)

প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে উপস্থাপিত করতে। অ্যারন জানিয়েছেন, কঁত্-এর মতে আজকের দিনের ধর্ম হবে সদর্থক (বিজ্ঞানবাদী) উদ্দীপনায় বিশিষ্টতাপ্রাপ্ত।

মনে রাখতে হবে কঁত্ যে মানবধর্মের উপস্থাপনা করেছেন তাতে একটা মৌলিক মানবতার (Essential humanity) কথা উচ্চারিত হয়েছে। আর এই মৌলিক মানবতার অবশ্যই কোন লোকায়ত চরিত্র তিনি নির্দেশ করেন নি। বরং তিনি বিভিন্ন যুগের শ্রেষ্ঠ কিছু মানুষের আদর্শ তুলে ধরতে চেয়েছেন, যাদের কাজ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে উদাহরণস্বরূপ মনে হয়েছে। এইসব মানুষের জীবন ও কর্মের মধ্যে ঐ মৌলিক মানবতার হদিস পাওয়া যাবে। এরূপ বক্তব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পাচ্ছে ঠিকই ; কিন্তু এটাও ঠিক যে তাতে সঙ্কীর্ণতাবাদ নেই। কঁত্-এর বিশেষত্ব এবং বিশেষ ঔদার্য্য এখানেই যে তিনি ফরাসী দেশ বা অন্য কোন দেশ তথা সমাজকে পৃথকভাবে নির্দেশ করে কেবল তাকেই ভালবাসতে বা অনুকরণ করতে বলেন নি। তিনি বরং সর্বকালের সব দেশেরই পূর্বোক্ত সদর্থক মানবধর্ম শেষ বিচারে যতই অস্পষ্ট এবং ভাবাবেগপূর্ণ বিষয় বলে প্রতিপন্ন হউক না কেন, তাঁর সমাজতত্ত্বে যে দেশ কাল নিরপেক্ষ মানবিক ঐক্যের আহ্বান রয়েছে তা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

৩.৫ সারাংশ

ফরাসী পন্ডিত মন্তেস্ক্যুকে যদি সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার আদিপুরুষ বলা যায় তবে অপর দুই ফরাসী চিন্তানায়ক সাঁ সিমঁ এবং আগস্ত কঁত্কে সমাজতাত্ত্বিক চর্চার অগ্রদূত বলা যাবে। শিল্পবিপ্লবের পটভূমিতে শিল্পসমাজকে ব্যাখ্যার মধ্য দিয়েই এঁরা দু'জনে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার সূচনা করেন। এদের মধ্যে আবার ১৮৩৮ সালে "সমাজতত্ত্ব" নামটি চয়ন করার কারণে আগস্ত কঁত্ 'সমাজতত্ত্বের জনক' বলে অভিহিত হন।

ফরাসী দেশের জ্ঞানদীপ্ত ধারা এবং রোমান্টিক বিপ্লবের দর্শন— উভয়ের প্রভাবেই তৈরী হয়েছিল সাঁ সিমঁ-এর সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। বিদ্রোহ-বিপ্লব বর্জন করে সমাজগঠনের জন্যই মানুষের প্রস্তুত হওয়া উচিত বলে সাঁ সিমঁ মনে করতেন। সাঁ সিমঁ ভবিষ্যৎ সমাজের যে ছবি এঁকেছেন তাতে ধর্মের স্থান দখল করবে বিজ্ঞান। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানবাদী (Positivist) দর্শনের কথা বলেন। উপরন্তু তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী। সাঁ সিমঁ কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদেরও (Utopian socialists) অন্যতম। মেহনতী মানুষের সংগঠিত বৈপ্লবিক আন্দোলনের কোন ধারণা তাঁর লেখায় পাওয়া যাবে না। কিন্তু তাঁর শেষ জীবনের দু-একটি রচনায় মেহনতী মানুষের মুক্তির কথা বলা হয়েছে দেখা যায়। সাঁ সিমঁই প্রথম বুঝেছিলেন উৎপাদন প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধানের কাজটাই রাষ্ট্র ও রাজনীতির আসল কাজ।

সাঁ সিমঁ ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিকাশ হিসাবে দেখেছিলেন। সাঁ সিমঁ-এর ইতিহাসতত্ত্ব কাল মার্ক্সকে প্রভাবিত করেছিল। সাঁ সিমঁ বলেন, প্রত্যেক সমাজের পরিণতি পর্যায়টি তার অবনয়নের প্রথম ধাপকে নির্দেশ করে। যেমন, দশম শতাব্দী নাগাদ সামন্ত ব্যবস্থা একটা পরিণত পর্যায়ে পৌঁছায়। আবার তার পর থেকেই ঐ ব্যবস্থার ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যায়। ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ব্যবস্থাটির চূড়ান্ত অধঃপতন প্রকট হয় এবং নতুন সমাজব্যবস্থার (বুর্জোয়া ব্যবস্থা) আগমন হয়।

বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক দিক্টি তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

গ্রহণ করে সদর্থক সমাজগঠনমূলক ক্রিয়ায় উদ্যোগী হতে। আর এই প্রসঙ্গেই তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা বলেন। বিশেষ করে ইউরোপের জাতি-রাষ্ট্রগুলোর তরফে একটি অভিন্ন সংগঠন তৈরী করা খুবই জুররী বলে তিনি মনে করতেন।

সাঁ সিমঁ নৈতিক সংহতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি এক ধরনের সর্বেস্বরবাদের কথা বলেছেন যেখানে বস্তু ও ভাব মিলে একাকার।

আগস্ত কঁত্ সম্পর্কে অনেকে বলেছেন তিনি নাকি সাঁ সিমঁ-এর যাবতীয় তত্ত্বচিন্তাকে নিজের বলেই উপস্থাপিত করেছেন গুরুর প্রতি বিন্দুমাত্র ঋণ স্বীকার না করে। কঁত্ কতটা কুম্ভিলক বৃত্তির দোষে দুষ্ট সেই সম্পর্কে আমরা কোন বিতর্ক তুলব না। তবে সাঁ সিমঁ-এর বিজ্ঞানবাদ এবং শিল্পসমাজের প্রকৃতি ব্যাখ্যা যে কঁত্-এর অনরূপ তা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। এতদ্সত্ত্বেও সমাজতত্ত্বের জনক হিসাবে কেতাব মহলে কঁত্-এর কথাই উল্লেখ করা হচ্ছে। বিজ্ঞানবাদ, সমাজ ও মানবমনের বিবর্তনের ত্রিস্তর, সামাজিক স্থিতিবিদ্যা ও সামাজিক গতিবিদ্যা, বিজ্ঞানগুলোর ক্রমপর্যায়, সদর্থক মানবধর্ম ইত্যাদি বিবিধ তত্ত্ব ও ধারণা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে আগস্ত কঁত্ সমাজ তত্ত্বের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন।

কঁত্ত আশা করেছিলেন ভবিষ্যতে এমন একটি Positive Science বা সদর্থক বিজ্ঞান গড়ে উঠবে যা জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সংঘবদ্ধ করতে পারবে। এই ভাবনাকে প্রসারিত করে তিনি Positive Humanism বা সদর্থক মানবতাবাদ নামে একটি সমন্বয়বাদী ধর্মীয় দর্শনও উপস্থাপিত করেন।

আধ্যাত্মিক, অধিবিদ্যামূলক এবং বৈজ্ঞানিক— এই ত্রিস্তর বিবর্তনের তত্ত্ব হাজির করে কঁত্ সমাজ প্রগতির প্রতি তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা ঘোষণা করেছেন। আবার তিনি যে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রগতির পথ সুগম করতে আগ্রহী নন তা একদিকে যেমন তাঁর সদর্থক ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে অপরদিকে তা প্রত্যয়িত হয়েছে তাঁর সামাজিক স্থিতিবিদ্যার (Social Statics) ধারণার সাহায্যে।

বিজ্ঞানগুলোর ক্রমপর্যায়ের তত্ত্বে তিনি সমাজতত্ত্বকে সর্বাধুনিক এবং সর্বোন্নত শাস্ত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন। পদ্ধতির বিচারে সংশ্লেষাণাত্মক পদ্ধতির প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে। এতে একটা Holistic বা সমগ্রতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকট হবে। কঁত্ এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষপাতী কেননা তিনি শেষ পর্যন্ত সমগ্র মানবসমাজের জন্যই একটি সদর্থক ধর্ম প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন।

৩.৬ অনুশীলনী

(ক) নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

(১) পজিটিভিজম্ বা বিজ্ঞানবাদ বলতে কি বোঝায় ?

(২) 'সামাজিক স্থিতিবিদ্যা' কথাটির অর্থ কি ?

(৩) 'সামাজিক গতিবিদ্যা' কথাটি ব্যাখ্যা করুন।

(৪) 'সদর্থক মানবতাবাদ' বলতে কি বোঝায় ?

(খ) নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত আলোচনা করুন

(১) সাঁ সিমঁ-এর বিজ্ঞানবাদ (Positivism) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

(২) সাঁ সিমঁ-এর আন্তর্জাতিক ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

(৩) সাঁ সিমঁকে কি অর্থে সমাজতন্ত্রী বলা যায় তা বিশদভাবে লিখুন।

(৪) আগস্ত কঁত্-এর বিজ্ঞানবাদী দর্শনটি ব্যাখ্যা করুন।

(৫) আগস্ত কঁত্ কৃত সমাজবিকাশের ত্রিস্তর প্রগতির বিধিটি ব্যাখ্যা করুন।

(৬) সামাজিক স্থিতিবিদ্যা ও সামাজিক গতিবিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

(গ) টীকা লিখুন

(১) বিজ্ঞানগুলোর ক্রমপর্যায়।

(২) মৌলিক মানবতা।

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Raymond Aron—*Main Currents in Sociological Thought.* (Vol.I)

(২) Irving M. Zeitlin—*Ideology and the Development of Sociological Theory.*

(৩) Lewis Coser—*Masters of Sociological Thought.*

(৪) F. Abraham and J. H. Morgan—*Sociological Thought.*

একক ৪ ❐ সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার ইতিহাসে মার্ক্সীয় সন্ধিক্ষণ

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ প্রস্তাবনা
৪.৩ কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) ঃ সমাজচর্চায় মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি
৪.৩.১ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ
৪.৩.২ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ
৪.৪ মার্ক্সীয় ইতিহাস দর্শন
৪.৪.১ শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব
৪.৪.২ মূল-কাঠামো এবং উপরি-কাঠামো
৪.৫ মার্ক্সীয় তত্ত্বে উপরিকাঠামো ঃ
৪.৫.১ রাষ্ট্র
৪.৫.২ ধর্ম ও সমাজ
৪.৬ সামাজিক পরিবর্তন ঃ মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা
৪.৭ অনুশীলনী
৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- সমাজচর্চায় তথা সমাজচিন্তায় কার্ল মার্ক্স যে এক সম্পূর্ণ নতুন ও ভিন্ন ধারা প্রবর্তন করেছেন সেটা জানা যাবে।
- মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি বলতে যে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে বোঝান হয় সেই সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।
- সমাজপ্রবাহকে প্রধানতঃ শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যাখ্যা করলেই তার জটিলতা ভেদ করে তাকে ঠিকমত অনুধাবন করা যাবে— এই মার্ক্সীয় প্রত্যয়টির তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাবে।
- মার্ক্সীয় তত্ত্বে মূল কাঠামো উপরি কাঠামোর হিসাবে রাষ্ট্র, আমলাতন্ত্র, ধর্ম ইত্যাদির প্রকৃতি মার্ক্স কিরূপ নির্ণয় করেছেন তা বুঝতে পারা যাবে।
- সর্বোপরি মার্ক্স কিভাবে সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সমাজ বিকাশের উচ্চতর স্তর হিসাবে সমাজতন্ত্রকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেই সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে সমাজতত্ত্বের মার্ক্সীয় ধারাটির মূল লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।

৪.২ প্রস্তাবনা

১৮১৮ থেকে ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত মোট ৬৫ বছরের নাতিবৃহৎ জীবনে এক অতিবৃহৎ কর্মকান্ডের অধিকারী কার্ল মার্ক্স। গত দেড়শ বছরের অধিককাল তাঁর চিন্তা ও কর্ম পৃথিবীর সর্বত্র যেভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, যেভাবে মানুষকে (বিশেষতঃ নিপীড়িত জনগণকে) উদ্বুদ্ধ করেছে, তা অন্য কোন চিন্তানায়কের ক্ষেত্রে হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থাগুলো যে অমানবিক শোষণের পরিচয় বহন করছে তাকে মেনে না নিয়ে তার আমূল পরিবর্তনের কথা ভাবা উচিত বলে এবং তার জন্য মানুষকে সংগঠিত করা উচিত বলে মার্ক্স মনে করতেন। মানব ইতিহাসের এক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা হাজির করে তিনি দেখিয়েছেন যে প্রত্যেক যুগেই সম্পত্তির মালিক শোষক শ্রেণী মেহনতী মানুষদের উপর শোষণ-নিপীড়ন চালিয়েছে। মার্ক্সকে মনে করেন সমাজচর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে সমাজবিবর্তনের বিধিটি আবিষ্কার করে শোষণ-নিপীড়নের প্রকৃতিটি অনুধাবন করা যা সমাজ পরিবর্তনের, সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের, যুক্তি ও পদ্ধতি নির্দেশ করবে। সমাজজগৎ ও জীবনকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করার তুলনায় তাকে পালটে দেওয়াটাই অনেক জরুরী কাজ বলে মনে করতেন। তাই মার্ক্সকে আর পাঁচজন কেতাবী সমাজতাত্ত্বিকের মত মনে করলে ভুল হবে। বাস্তবিক মার্ক্স নিজেকে কখনও সমাজতাত্ত্বিক বলে পরিচয় দেননি। তিনি ছিলেন মূলতঃ বিপ্লবী। তবে বিপ্লবের প্রয়োজন তিনি যে সমাজদর্শন ও ইতিহাস দর্শন হাজির করেছেন এবং যেভাবে তাঁর সময়কার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন তাতে একটি ভিন্ন ধরনের সমাজতত্ত্বও প্রকট হয়েছে।

সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে কার্ল মার্ক্স-এর চিন্তা-ভাবনা এক সম্পূর্ণ নতুন ধারার সূচনা করেছে। সা সিমঁ বা আগস্ত কঁত্ যেভাবে তাদের বিজ্ঞানবাদী (positivist) দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানশৃঙ্খলার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন সেখানে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি এক নতুন সন্ধিক্ষণ নির্দেশ করে। এই সন্ধিক্ষণের বৈশিষ্ট্যটি অনুধাবন প্রয়াসে বর্তমান এককে কার্ল মার্ক্স ও তাঁর অনুগামীদের রচনা অনুসরণে আমরা কিছু তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করব। দেখা যাবে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার বিকাশে এই মার্ক্সীয় তত্ত্ব ও ধারণাগুলো অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছে।

৪.৩ কার্ল মার্ক্স (K. Marx) ঃ সমাজচর্চায় মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি

সমাজতত্ত্বের 'জনক' আগস্ত কঁত্ তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু বড় হলেও মার্ক্স ওঁর সমসাময়িক বললে ভুল হবে না। কঁত্-এর লেখার সঙ্গে মার্ক্স কিছুটা পরিচিত হয়েছিলেন, যদিও সমাজতত্ত্ব নামে নতুন একটি জ্ঞানশৃঙ্খলার যে সূত্রপাত হয়েছে এরূপ কোন ধারণা তাঁর ছিল বলে জানা যায় না। কেবল তাই নয়, মার্ক্স কঁত্ সম্পর্কে কোন উচ্চ ধারণাই পোষণ করতেন না। তিনি হেগেলীয় বৌদ্ধিক পরিমন্ডলে গড়ে উঠেছিলেন এবং ঐ জর্মন বৌদ্ধিক পরিবেশের সঙ্গে তুলনা করে কঁতীয় ভাবনা-চিন্তাকে তাঁর খুবই নিম্নমানের বলে মনে হয়েছিল। কঁত্ যে দৃষ্টবাদী (বিজ্ঞানবাদী) দৃষ্টিভঙ্গিটি উপস্থাপিত করেছিলেন তা মার্ক্স এর আদৌ বিজ্ঞানসম্মত কিছু বলে মনে হয় নি। বিদ্রূপ করেই মার্ক্স বলেছেন, ''Come's positivisms has nothing psoitive in it'') (অর্থাৎ কঁত্-এর বিজ্ঞানবাদের মধ্যে সদর্থ কিছুই নেই)। এছাড়া কঁত্কে রাজনৈতিক সুবিধাবাদী বলেও অভিহিত করেছেন কার্ল মার্ক্স। তিনি অভিযোগ করেছেন ঐ সময়ে কঁত্-এর অনুগামীরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নানাপ্রকার বিকৃতি আমদানী করেছেন।

কঁত্ এর মতই মার্ক্স তাঁর ইতিহাস দর্শনের ভিত্তিতে মানবসমাজের বিবর্তনের কথা বলেছেন। বলা যেতে পারে, একটা বিষয়ে উভয়ে অভিজ্ঞ ধারণা পোষণ করতেন। উভয়েই বলেছেন, ইতিহাসের গতিবিধি ব্যক্তি মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ ব্যাপার। এছাড়া অন্য কোন বিষয়ে মার্ক্স-এর সঙ্গে কঁত্ বা তাঁর উত্তরসূরীদের সঙ্গে কোনও মিল নেই। বস্তুতপক্ষে কঁত্, স্পেনসার, ডুর্খাইম, হ্বেবার প্রমুখদের রচনার মধ্য দিয়ে যে সমাজতত্ত্ব বিকাশ লাভ করেছে তার সাথে মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বের কোনও সংযোগসূত্রে আবিষ্কার করা যাবে না। বরং এটাই বলা সঠিক হবে যে মার্ক্সীয় চিন্তা ও দর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবেই পূর্বোক্ত পশ্চিমী চিন্তানায়কদের সমাজতত্ত্ব তৈরী হয়েছে। এই কারণেই বোধ হয় বলা হয়েছে, ''The whole of Western sociology is a long debate with the ghost of Karl Markx.'' (সমগ্র পশ্চিমী সমাজতত্ত্বই হল মার্ক্স-এর প্রেতাত্মার সঙ্গে এক দীর্ঘ বিতর্ক)।

মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে এক কথায় দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নামে অভিহিত করা হয়। দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, একটি সামগ্রিক তত্ত্বচিন্তা (a broad system of thogh) যাকে আলাদা করে কেবল অর্থনীতি, রাজনীতি বা দর্শনের তত্ত্ব বলে বিচার করা ঠিক হবে না। যে কোনও মানবিক জ্ঞানশৃঙ্খলাতেই এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করা যাবে। সমাজচর্চার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সহজবোধ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে আমরা পৃথকভাবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ-এর ব্যাখ্যা হাজির করব।

মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জগৎ ও জীবনের গতিপ্রকৃতি দ্বান্দ্বিক সূত্রে বাঁধা। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু, তা কোনও জড় বস্তুই হোক্ বা কোন মনুষ্য বা মনুষ্যেতর প্রাণী হোক্, কিংবা মানুষের সমাজের কোন চিন্তা-ভাবনা বা ব্যবস্থা হোক্— এ সব কিছুর মধ্যেই একটা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান। দ্বন্দ্বই জীবন, দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রকাশ। আর এই দ্বান্দ্বিকতার অর্থ হ'ল সংঘাত ও মিলনের এক বিরামহীন প্রক্রিয়া। উপরন্তু মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এই দ্বান্দ্বিক অস্তিত্ব বস্তুগত অস্তিত্ব হিসাবেই প্রকাশমান। এমন কি চিন্তা-ভাবনার বা আচার-ব্যবস্থার যে দ্বান্দ্বিকতা তারও মূল রয়েছে রক্ত-মাংসের মানুষের অস্তিত্বে। চিন্তা-চেতনা অবলম্বনহীন নয়। মার্ক্স বলেন, সত্তা চেতনাকে নির্দ্ধারিত করে (Being determines consciousness। এই বস্তুগত অস্তিত্বের উপর জোর দেওয়ার জন্যই মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বলা হয়।

৪.৩.১ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

মার্ক্সীয় সমাজদর্শনের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নামে অভিহিত করা হয়। অনেকে আবার মার্কসীয় চিন্তাধারাকে অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে বোঝাবার জন্য ''দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'' নামটি ব্যবহার করে থাকেন। দ্বান্দ্বিকতা, ঐতিহাসিকতা ও বস্তুবাদীতা এ সবই একসঙ্গে মিলে মার্ক্সবাদকে এক অনন্য বিশিষ্টতা দিয়েছে। প্রথমেই দ্বান্দ্বিকতার কথা বলা যেতে পারে।

মার্ক্স নিজে তাঁর কোন গ্রন্থে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কথাটি প্রয়োগ করেন নি। রুশ চিন্তানায়ক জর্জ প্লেখানভই (George Plekhanov) প্রথম মার্ক্সীয় চিন্তাভাবনাকে 'Dialectical Materialism' বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ আখ্যায় ভূষিত করেন। অবশ্য মার্ক্স ''Dialectical Materialism'' কথাটি একসঙ্গে কোথাও ব্যবহার না করলেও তার নানা লেখায় শব্দ দুটি পৃথক পৃথক ভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

Dialectics বা দ্বান্দ্বিকতা বলতে বোঝায় দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘাতজনিত প্রক্রিয়া। জার্মান ভাববাদী দার্শনিক হেগেল তাঁর ইতিহাস দর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনে এক কল্পিত মহাচৈতন্যের দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের কথা বলেছিলেন।

হেগেলের মতে, যে কোনও কিছুর বিকাশ ঘটে তার অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিকতার ফলে। রাষ্ট্রের কথা আলোচনা করতে গিয়ে যেমন তিনি বলেছেন, তাঁর আদর্শ (প্রুশীয় রাষ্ট্র) রাষ্ট্র ঐ আদি মহাভাব (Giest)-এর দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াগত বিবর্তনের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ ফসল। কার্ল মার্ক্স এক অর্থে হেগেলের অনুকরণেই তাঁর দ্বন্দ্ববাদ গড়ে তুলেছেন। কিন্তু মার্ক্স-এর সমাজদর্শন যে বস্তুবাদী কাঠামোতে উপস্থাপিত তা হেগেলীয় ভাববাদী দর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী ও বিপরীত। তাই মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ববাদকে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ-এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি বললে ভুল ববে না। কার্ল মার্ক্স নিজেই তাঁর Das Kapital গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন, ''My Dialectic is the opposite of Hegel's'' মার্ক্সীয় বস্তুবাদ-এর তাৎপর্য অনুধাবন করলে এই বৈপরীত্যটি বোঝা যাবে।

বস্তুবাদ বলতে এমন একটি দার্শনিক মূল কাঠামো বোঝান হয় যেখানে জগৎ ও জীবনের বস্তুময়তাই মূল সত্য। বস্তুময়তা সমস্ত প্রাণ ও ভূতির নির্দশন। মন, চেতনা, ভাবনা, অনুভূতি, আকাঙ্খা, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি মানবিক ও জাগতিক বৈশিষ্ট্যাবলী বস্তুময়তারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। একেবারে বিপরীতভাবে হেগেল বলেছেন এই পার্থিব জগৎকে ছাপিয়ে যে শাশ্বত চেতনা (Geist) ও মহাভাবের জগৎ রয়েছে সেই জগৎই হ'ল মূল সত্য। চেতনারই বিভিন্ন প্রকাশ হ'ল পার্থিব জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন রূপ। কার্ল মার্ক্স এই ভাববাদকে সম্পূর্ণ বর্জন করে বস্তুজগতের প্রাথমিক অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ ছিল মূলতঃ নেতিবাচক দ্বন্দ্ববাদ (Negative Dialectics)। হেগেলের মতে যে মহাচৈতন্য বা মহাভাবের দ্বান্দ্বিক বিকাশের ফলে এই পার্থিব জগৎ ও জীবনের পরিবর্তনশীল নানাবিধ রূপ প্রকাশ পায়, সেই বিকাশ প্রক্রিয়ার প্রকৃতি হ'ল নেতিকরণের মাধ্যমে পরিবর্তন ও উন্নতি (Development by Negation)। হেগেলের মতে যে কোনও বিদ্যমান জীবনের (ও জগতের) স্তর হ'ল তার অব্যবহিত পূর্বেকার স্তরের অস্বীকৃতি বা নেতিকরণ। পরদিকে কার্ল মার্ক্স মনে করেন কেবলমাত্র নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি নিয়ে পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যায় না। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক চরিত্র সম্পর্কে অবগত হয়েও হেগেলের ইতিহাস দর্শন শেষ বিচারে অর্থহীন কেননা তা ভাববাদের খোলস এবং নেতিকরণ প্রক্রিয়ার অবাস্তবতা বর্জন করতে অপারগ।

কার্ল মার্ক্স ইতিহাসকে মানুষের নানা কর্মকান্ডের ইতিহাস হিসাবে বিচার করে বলেছেন সমাজবদ্ধ মানুষের প্রধান কর্মকান্ড হ'ল উৎপাদন ক্রিয়া। উৎপাদন কর্মের অনিবার্য দ্বান্দ্বিক রূপটি হল শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শ্রেণী সংঘাত [পরবর্তী পাঠ্যাংশ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ-এর আলোচনায় বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে]। তাই মার্ক্স ও তাঁর বন্ধু এঙ্গেলস তাঁদের কমিউনিস্ট ইস্তেহারের শুরুতেই বলেছেন, ''এযাবৎ মানব সমাজের যত ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেছে তাদের সকলেরই ইতিহাস হ'ল শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ইতিহাস''। এই দ্বন্দ্ব কেবল নেতিকরণ প্রক্রিয় নয়। দ্বন্দ্ব-সংঘাত চললে বাহ্যত মনে হবে একটি শ্রেণী সম্পূর্ণ ধ্বংস হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যে কোন জয়লাভের পর্য্যায় হ'ল পুরনো স্তরের দ্বন্দ্বগুলোর সম্বলিত ফলস্বরূপ। নতুন স্তরে বিজয়ী শক্তির প্রাধান্য থাকলেও বিজিতদের সারাংশ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকে।

মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ববাদ ইংরাজী 'Conflict' অর্থে ব্যবহৃত হবে না। দ্বন্দ্ববাদ এর একটি নীতি যেমন— পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় প্রকার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা। আর একটি নীতি হ'ল প্রতিটি বিষয় ও বস্তুতে অন্তর্নিহিত স্ববিরোধীতা। তৃতীয় নীতিটি হেগেলীয় অর্থাৎ পূর্ববর্তী অবস্থানকে অস্বীকার করা বা অতিক্রম করার নীতি। সর্বশেষ বিরোধী শক্তিগুলোর মিলন প্রক্রিয়া। মাও-জে-দঙ্ যাকে Struggle and Unity of opposite (বিপরীত শক্তির সংঘাতও মিলন প্রবাহ) বলেছেন সেই নীতিটাই মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসাবে গণ্য।

একক ৫ ❐ হার্বার্ট স্পেনসার ও জর্জ সিমেল

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য
৫.২ প্রস্তাবনা
৫.৩ হার্বার্ট স্পেনসার ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী
৫.৩.১ জৈবিক সাদৃশ্যবাদ
৫.৩.২ সামাজিক বিবর্তনবাদ
৫.৪ জর্জ সিমেল ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী
৫.৪.১ আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ব
৫.৪.২ সামাজিকতার ধরন
৫.৫ সারাংশ
৫.৬ অনুশীলনী
৫.৭ উত্তরমালা
৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে সমাজতত্ত্বের পুরোধাদের অন্যতম হার্বার্ট স্পেনসার এবং পরবর্তীকালে সমাজতত্ত্বের আর একজন প্রাণপুরুষ জর্জ সিমেলের চিন্তাধারা সম্পর্কে পাঠকদের মনে কিছু ধারণা জন্মাবে। স্পেনসারের জৈববাদ ও বিবর্তনবাদ এবং সিমেলের আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ব আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার তিনটি প্রধান ধার (trend)-কে সূচিত করে। বর্তমান অধ্যায় এই ধারাগুলি সম্পর্কে পাঠকদের কিছুটা প্রাথমিক জ্ঞান যোগাতে পারে। এছাড়াও স্পেনসারের বৃহদাকার তত্ত্ব (grand theory)-এর বিপরীতে সিমেলের ক্ষুদ্রাকার সমাজতত্ত্ব প্রথম যুগের সমাজতাত্ত্বিকদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরবর্তী যুগের সমাজতত্ত্ববিদদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বোঝাতে সহায়ক হতে পারে।

৫.২ প্রস্তাবনা

সমাজতত্ত্বের জনক অগাস্ত কোঁত তাঁর তাত্ত্বিক আলোচনায় মানবমন ও মানবসমাজের বিবর্তন ও প্রগতির একটা ছক কেটেছিলেন। একটু ভিন্ন পথের পথিক হার্বার্ট স্পেনসার বলেন যে, জড়জগতে, প্রাণীজগতে ও সমাজ জীবনে বিবর্তনের একই প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল। সামাজিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার স্পেনসার যে সময়-নির্ভর ও শিল্পনির্ভর সমাজের আবির্ভাবের কথা বলেছেন তা অবশ্য অনেকাংশে কোঁতের মতামতের অনুরূপ। তাঁর বিবর্তনতত্ত্বের ভূমিকা হিসাবে স্পেনসার প্রাণীদেহ ও সমাজের মধ্যে সাদৃস্য প্রতিপন্ন করেছেন। বর্তমান এককে স্পেনসারের জৈবিক সাদৃশ্যবাদ (জীবদেহ ও সমাজের সাদৃশ্যের তত্ত্ব) ও সামাজিক বিবর্তনবাদ আলোচিত হ'ল।

সিমেলের আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ব হ'ল মূলত একটি জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ধারা যা বিভিন্ন রকমের মিথষ্ক্রিয়ার আকৃতি (form) ও বিষয়বস্তু (content)-র মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে এবং সেগুলির শ্রেণীবিন্যাস ও বিশ্লেষণ করে। সিমেল কোঁত এবং স্পেনসারের বিবর্তনবাদী ও জৈবিক তত্ত্বসমূহ খারিজ করে দেন। তাঁর মতে, সমাজ হ'ল অজস্র প্রণালীবদ্ধ মিথষ্ক্রিয়ার তন্তুজাল। সমাজতত্ত্বের কাজ হল বিভিন্ন স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে যেসব মিথষ্ক্রিয়া বারবার ঘটে চলেছে, সেগুলিকে তিনি একত্রে 'সামাজিকতা' (Sociation) বলেছেন, সেগুলির আকৃতির অনুসন্ধান করা। সিমেলের আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ব এবং সামাজিকতার বিভিন্ন ধরন সম্পর্কিত তত্ত্বও এই এককের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৫.৩ হার্বার্ট স্পেনসার ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী

হার্বার্ট স্পেনসারের জীবৎকাল হ'ল ১৮২০ থেকে ১৯০৩ সাল অবধি। শৈশবে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না লাভ করলেও তিনি তাঁর কাকার কাছে উগ্রবাদী দর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গণিতে শিক্ষালাভ করেন। যৌবনে কিছুকাল যন্ত্রবিদ (engineer) হিসাবে কাজ করার পর তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে লেখালিখিতে ব্যাপৃত হন। তিনি কিছুকাল লন্ডনের বিখ্যাত সাময়িকপত্র 'দ্য ইকনমিস্ট'-এর সহসম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। প্রথমদিকে স্পেনসার বিভিন্ন উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী লেখা লেখেন। ১৮৫০ সাল থেকে তিনি সামাজিক বিবর্তনের ব্যাপারে বিভিন্ন গ্রন্থাদি লিখতে থাকেন। ১৮৫২ সালে 'লিডার'-এ 'দ্য ডেভেলপমেন্ট হাইপোথিসিস' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন তাতে দেখা যাচ্ছে ডারউইনের আগেই তিনি ঐশ্বরিক সৃষ্টির তত্ত্ব নাকচ করেন এবং জৈব বিবর্তনের কথা বলেন। মানবপ্রজাতির বিবর্তনের ব্যাখ্যাকার হিসাবে ডারউইন ও ওয়ালেসের সাথে সাথে স্পেনসারের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। অবশ্য তাঁর সামাজিক তত্ত্বসমূহ বেশ কিছুটা বিরূপ সমালোচনারও সম্মুখীন হয়। স্পেনসার স্নায়বিক দৌর্বল্যে আক্রান্ত হন এবং বার্দ্ধক্যে তাঁর এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী মহলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিল, জর্জ ইলিয়ট, টমাস হাক্সলি প্রমুখ প্রথিতযশা ব্যক্তিদের সাহচর্য তিনি লাভ করেন। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলির আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে প্রচুর চাহিদা ছিল এবং এগুলি বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। তাঁর গ্রন্থগুলি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গৃহীত হয়। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ইংল্যান্ডে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলের সাথে সাথে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদও মুক্ত অর্থনীতির তত্ত্ব অবহেলিত হয়। এছাড়া বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদের অগ্রগতির সাথে সাথে তাঁর বিবর্তনবাদের প্রাসঙ্গিকতা অনেকটা নষ্ট হয়।

স্পেনসার সারাজীবনে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বিরচিত কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সমাজতাত্ত্বিক গ্রন্থ হ'ল— ১) দ্য ফার্স্ট প্রিন্সিপ্লস্, ২) দ্য স্টাডি অব সোসিওলজি, ৩) ডেসক্রিপটিজ সোসিওলজি, ৪) দ্য প্রিন্সিপ্লস্ অব সোসিওলজি, ৫) দ্য ম্যান ভার্সাস দ্য স্টেট।

অনুশীলনী-১

১) **নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল? ✓ অথবা চিহ্ন × দিয়ে উত্তর দিন।**

ক) ডারউইনের পরে স্পেনসার জৈব বিবর্তনের কথা বলেন।

খ) স্পেনসারের সামাজিক তত্ত্বসমূহ বেশ কিছুটা বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

গ) স্পেনসার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কোন লেখা লেখেননি।

ঘ) শৈশবে স্পেনসার উচ্চমানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেন।

ঙ) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ইংল্যান্ডে তাঁর তত্ত্বগুলি অবহেলিত ও অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয়।

৫.৩.১ জৈবিক সাদৃশ্যবাদ

স্পেনসারের মতে, জীবদেহের সাথে সমাজের লক্ষণীয় সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি সমাজ ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্যের অনুধাবনকে বিবর্তনতত্ত্ব গড়ে তোলার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, "সমাজ এতটাই সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিশরীরের মতো সংগঠিত যে এদের মধ্যে আমরা সাদৃশ্যের চেয়ে বেশি কিছু লক্ষ্য করি।" স্পেনসার বলেছিলেন যে, জীবদেহে যেমন বিকাশ, পরিণতি ও ক্ষয়—এসকল বিভিন্ন স্তর দেখা যায়, সমাজও তেমনি বিবর্তনের নিয়মানুসারে বিকশিত হ'তে হ'তে একটা স্তর অবধি পরিণতি লাভ করে এবং তারপর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

স্পেনসারের মতে, জীবদেহ ও সমাজ উভয়েরই ক্রমবিকাশ ঘটেছে এবং এর ফলে উভয়ই সরল থেকে জটিল আকার লাভ করেছে। বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে জীবদেহ ছিল এককোষী এবং সহজ সরল দৈহিকগঠন বিশিষ্ট। তেমনি সভ্যতার আদি পর্যায়ে মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থেকে সহজ জীবনযাপন করত। বিবর্তনের ধারায় যেমন প্রাণীদের জৈবিক ও দৈহিক আকৃতি ও কার্যক্রমের জটিলতা বৃদ্ধি পেল, তেমনই মানবসমাজেও দেখা দিল জটিলতা ও বিভাজন। বিবর্তনের যে পদ্ধতিতে এককোষী প্রাণী থেকে উন্নত মানবপ্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে, সেই একই পদ্ধতিতে আদিম সমাজে পরিবর্তিত হ'তে হ'তে আধুনিক শিল্পনির্ভর সমাজে উপনীত হয়েছে।

বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে স্পেনসার সমাজ জীবদেহের মধ্যে তুলনা করেছেন। তিনি নিম্নস্তরের জীব ও আদিম সমাজ উভয়েরই ক্ষেত্রে কাঠামোগত সরলতা এবং বিভাজন ও শ্রমবিভাগের অনুপস্থিতির কথা বলেছেন। নিম্নস্তরের প্রাণীদের ক্ষেত্রে গোটা শরীরটাই পাকস্থলী, শ্বাসতন্ত্র ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ করে। তেমনি আদিম সমাজের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সকলেই যোদ্ধা, সকলেই শিকারী, সকলেই বাস্তুকার। সকলেই নিজের চাহিদা মেটাতে সবরকম কাজই করে থাকে। জৈবিক ক্রমবিকাশের সর্বশেষ প্রকাশ মানবদেহের সাথে স্পেনসার সামাজিক ক্রমবিকাশের সর্বাধুনিক প্রকাশ শিল্পপ্রধান সমাজব্যবস্থার তুলনা করেছেন। তিনি মানবদেহের স্নায়ুতন্ত্রের সাথে শিল্পপ্রধান সমাজের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার, মানবদেহে ধমনী ও শিরার মাধ্যমে রক্ত-সঞ্চালনের সাথে শিল্পপ্রধান সমাজের বন্টন ব্যবস্থার এবং মানবদেহের মস্তিষ্কের সাথে আধুনিক সমাজের সরকার-কেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাদৃশ্যের কথা বিশদভাবে বলেছেন।

স্পেনসার যেমন বিবর্তনবাদী, তেমনি তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীও ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বুঝতে পারেন যে সমাজকে জীব হিসাবে গণ্য করার অর্থ হ'লো ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিসত্তাকে নস্যাৎ করে সমাজের সার্বিক একতার উপর জোর দেওয়া। এই স্ববিরোধিতার কারণে পরিণত বয়সে স্পেনসার বার বার বলেছেন যে, সমাজ একটি জীব নয়, তা জীবদেহের অনুরূপ মাত্র। এ কারণে তাঁর তত্ত্বকে 'জৈববাদ' না বলে 'জৈবিক সাদৃশ্যবাদ' বলাই ঠিক হবে। জীবদেহ ও সমাজের মধ্যে সাদৃশ্যের কথা বলতে গিয়ে যে সব বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য নেই সেগুলিরও কথা তিনি বলেছেন। তাঁর মতে, জীবদেহ ও সমাজের মধ্যে তিন ধরনের বৈসাদৃশ্য রয়েছে ঃ

১) জীবদেহে সুসমঞ্জস, সমাজ অসমঞ্জস। জীবদেহে বিভিন্ন অঙ্গগুলির বিন্যাস নির্দিষ্ট এবং অন্যান্য অঙ্গগুলির সাথে অবস্থান, আয়তন ও সংখ্যার দিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু সমাজের অঙ্গগুলির, অর্থাৎ বিভিন্ন গোষ্ঠী, সমিতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিন্যাস এরকম নির্দিষ্ট নয় অথবা অন্যান্য গোষ্ঠী, সমিতি ও প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থান, আয়তন সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

২) জীবদেহ বিভিন্ন অঙ্গের ঘনবদ্ধ সমাহার ; কিন্তু সমাজ অসংলগ্ন। জীবদেহের বিভিন্ন অংশগুলি এমন দৃঢ় ও ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সাথে সংলগ্ন যে গোটা জীবদেহটি একটি একক হিসাবে দেখা দেয়। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন অংশগুলি বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত।

৩) জীবদেহে চেতনা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রে কেন্দ্রীভূত। সমাজে চেতনা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। নির্দিষ্ট কোন সামাজিক চেতনা কেন্দ্র নেই। শরীরের বিভিন্ন অংশের আলাদাভাবে সুখ-দুঃখের কোন অনুভূতি নেই। কিন্তু সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের আলাদাভাবে সুখ-দুঃখের অনুভূতি রয়েছে।

পরিশেষে স্পেনসার মন্তব্য করেছেন যে জীবদেহের মতো সমাজকেও পরস্পর নির্ভরশীল অংশসমূহের দ্বারা গঠিত একটি কাঠামো হিসাবে গ্রহণ করা যায় এবং এ দু'য়ের মধ্যে আর কোনও সাদৃশ্য নেই। তাঁর এ জাতীয় চিন্তায় পরবর্তীকালের সামাজিক কাঠামো ও তৎসম্পর্কিত কর্মনির্বাহী তত্ত্ব (Structural functional theory)-এর সূচনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জৈবিক সাদৃশ্যবাদকে তিনি তাঁর বিবর্তনতত্ত্বের মুখবন্ধরূপে ব্যবহার করেছেন। জৈবিক সাদৃশ্যবাদে জীবদেহ ও সমাজের উদ্ভব, বিকাশ, পরিণতি ও ক্ষয়ের যে প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে তাতেই বিবর্তনবাদের বীজ লুকিয়ে আছে।

অনুশীলনী-২

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

ক) সমাজ ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য অনুধাবনের স্পেনসার —— গড়ে তোলার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

খ) স্পেনসারের মতে, ——— -এর ফলে জীবদেহ ও সমাজ উভয়ই সরল থেকে জটিল আকার ধারণ করেছে।

গ) স্পেনসার জৈবিক ক্রমবিকাশের সর্বশেষ প্রকাশ —— -এর সাথে সামাজিক ক্রমবিকাশের সর্বাধুনিক প্রকাশ শিল্পপ্রধান সমাজব্যবস্থার তুলনা করেছেন।

ঘ) স্পেনসার মানবদেহের ——— -এর সাথে আধুনিক সমাজের সরকার-কেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাদৃশ্যের কথা বলেছেন।

ঙ) স্পেনসারের তত্ত্বকে '———' না বলে 'জৈবিক সাদৃশ্যবাদ' বলাই ঠিক হবে।

চ) স্পেনসার যেমন বিবর্তনবাদী, তেমনি —— ও ছিলেন।

ছ) স্পেনসারের মতে জীবদেহ বিভিন অঙ্গের ঘনবদ্ধ সমাহার ; কিন্তু সমাজ ———।

৫.৩.২ সামাজিক বিবর্তনবাদ

স্পেনসার জৈবিক সাদৃশ্যবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে জৈব বিবর্তন ও সামাজিক বিবর্তনের মধ্যে তুলনা করেছেন। তিনি বিশ্বজাগতিক বিবর্তন তত্ত্বের নির্মাতা। তাঁর মতে, অজৈব প্রকৃতিকে বা বস্তুজগতে, জৈব প্রকৃতিতে বা জীবজগতে এবং অতিজৈব সত্তায় বা সমাজজগতে নিরন্তর বিবর্তন ঘটে চলেছে। তার বিবর্তন তত্ত্বের মুখ্য উপপাদ্য হল দু'টি ঃ—

(১) আদিকালে খুব অল্প সংখ্যক রূপ বা গঠনাকৃতির অস্তিত্ব ছিল। এদের থেকেই বিভাজন ও বিভিন্নকরণের মাধ্যমে পরবর্তীকালে বহু সংখ্যক বস্তুরূপ, প্রাণীরূপ ও সমাজরূপ বা গঠনাকৃতির উদ্ভব হয়। (২) আদিকালে সরল ধরনের রূপ বা ঘটনাকৃতি থেকে পরবর্তীকালে জটিল বস্তু, জীব ও সমাজে পরিণত হয় এবং তাদের কার্যকলাপে বৈচিত্র্য ও সংখ্যাধিক্য দেখা দেয়। স্পেনসারের মতে, সামাজিক বিবর্তনও বিশ্বজাগতিক বিবর্তনের নিয়মগুলির অধীন হওয়ায় তা অজৈব বা জৈব প্রকৃতিতে বিবর্তনের ধরনের থেকে আলাদা কিছু নয়। সামাজিক এককগুলির আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের কাঠামোগত জটিলতা বৃদ্ধি পায়। জৈব এককগুলির মতই সামাজিক এককগুলি প্রথমে এমন একটা ভেদাভেদহীন অবস্থায় থাকে যেখানে তাদের অংশগুলির চেহারা হয় একে অপরের অনুরূপ। পরে এই সামাজিক এককগুলির মধ্যে প্রভেদ দেখা দেয় এবং তাদের অংশগুলি আর একরকম থাকে না। যত ব্যক্তিদের ভূমিকাগুলি ভিন্ন হয়ে যায় তত সামাজিক প্রভেদকরণের গতিবেগ বেড়ে যায়।

স্পেনসারের বিবর্তনের তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজ বিভিন্ন স্তরে উপনীত হয়। বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর অনুসারে চার ধরনের সমাজের আবির্ভাব হয়। প্রত্যেকটি স্তর তার আগের স্তর অপেক্ষা সামাজিক কাঠামো ও কার্যাবলীর দিক দিয়ে জটিলতর আকার ধারণ করেছে। এই পদ্ধতিতে সমরূপ সমাজ বিষমরূপ হয়ে ওঠে এবং এক ধরনের সমাজ বিভন্ন ধরনের রূপ পরিগ্রহ করে।

১) স্পেনসারের বিবর্তনের তত্ত্ব অনুসারে প্রথমে ছিল সরল সমাজ (simple society)। এই সমাজ শুধু কিছু সংখ্যক পরিবার নিয়ে গঠিত ছিল।

২) এর পরে দেখা দিল যৌগিক সমাজ (compund society)। বহুসংখ্য পরিবার পরবর্তী পর্যয়ে কিছু সংখ্যক গোষ্ঠী (clan)-তে বিভক্ত হয়। এই গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজই—যা কিনা কতকগুলি সরল সমাজের সমাহার—হ'ল যৌগিক সমাজ।

৩) বিবর্তনের পরের ধাপে জনসংখ্যা আরও বাড়ল এবং বহু সংখ্যক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হ'ল। এই সকল গোষ্ঠীগুলি কতকগুলি উপজাতি (tribe)-তে ভাগ হয়ে গেল। এই সমাজকে স্পেনসার বললেন 'দ্বিগুণ যৌগিকসমাজ' (doubly compund society)। এ হ'ল কতকগুলি যৌগিক সমাজের সমাহার।

৪) এর পরের ধাপে উপজাতিগুলি মিলিতভাবে জাতিরাষ্ট্র (nation state)-এর সূচনা করল। এই স্তরে কতকগুলি দ্বিগুণ যৌগিক সমাজের মিলনে 'ত্রিগুণ যৌগিক সমাজ' (triply compund soceity)-এর উদ্ভব ঘটল। ত্রিগুণ যৌগিক সমাজ বলতে স্পেনসার ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রের পাশাপাশি প্রাচীন মেক্সিকো আসিরীয় সাম্রাজ্য, মিশরের সভ্যতা, রোম সাম্রাজ্য প্রভৃতিকেও বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, এই ত্রিগুণ যৌগিক সমাজই হ'ল সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিভূ।

এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক কাঠামোগুলির আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি পেল এবং তারই সঙ্গে সমাজে কর্মগত বিশেষীকরণ দেখা দিল। যে সমাজ এক ধরনের ছিল তা বহু ধরনের হয়ে গেল বটে, কিন্তু তার ফলে সমাজে ঐক্য ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বৃদ্ধি পেল। গোড়ার দিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি মিশ্রিত অবস্থায় ছিল। পরে সেগুলি ধীরে ধীরে আলাদা হল এবং তাদের কাঠামো ও কার্যাবলী আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। এভাবে আয়তনবৃদ্ধি, বহুরূপতা, নির্দিষ্টতা, ও সামঞ্জস্যের অভিমুখে সামাজিক বিবর্তনের অগ্রগতি ঘটে।

স্পেনসার আরও একভাবে সমাজের শ্রেণীবিভাগ করে দু'রকম সমাজের কথা বলেছেন— সমরনির্ভর সমাজ

(military society) এবং শিল্পনির্ভর সমাজ (industrial society)। বিবর্তনের প্রথম দিকে সমরনির্ভর সমাজের প্রাধান্য ছিল। পরে এই সমাজ শিল্পনির্ভর সমাজে পরিণত হয়।

সমরনির্ভর সমাজ মূলত যুদ্ধবিগ্রহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এই সমাজে প্রত্যেকে কড়া নিয়মকানুনে আবদ্ধ থেকে সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হ'ত। এই সমাজে সরকার ও ধর্ম এই দুটি উপাদানই সামাজিক জীবনের মূল নিয়ন্তা হিসাবে কাজ করত এবং ব্যক্তিগত জীবনধারা জনজীবনে কোন গুরুত্ব পেত না। কিন্তু শান্তি স্থাপনই হল শিল্পনির্ভর সমাজব্যবস্থার মূল নীতি। এখানে শিল্পের বিস্তৃতি অনেক বেশি হয় এবং তা রাষ্ট্র কর্তৃক সরাসরি নিয়ন্ত্রিত হয় না। বরং রাষ্ট্র শিল্পের উন্নতির জন্য সব সময়েই সহযোগিতা করে। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ এবং বিভিন্ন ধরনের চিন্তাধারা ও বিশ্বাস এখানে গুরুত্ব লাভ করে। ব্যক্তিগত জীবনধারাকে নস্যাৎ করে জনজীবনের কথা ভাবা হয় না।

সমরনির্ভর সমাজে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়— কঠোর স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য, কেন্দ্রীভূত সরকার এবং সব রকম সামাজিক সংগঠনের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। আর শিল্পনির্ভর সমাজে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়— উন্মুক্ত স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা, মুক্ত বাণিজ্য, অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের হ্রাস, অকেন্দ্রীভূত সরকার এবং স্বাধীন স্বেচ্ছামূলক সামাজিক সংগঠন। সমরনির্ভর সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল বাধ্যতামূলক সহযোগিতার উপর। আর শিল্প নির্ভর সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা ও চুক্তির উপর। সমরনির্ভর সমাজে রাষ্ট্রের সুবিধার জন্যই ব্যক্তির অস্তিত্ব। আর শিল্প-নির্ভর সমাজে ব্যক্তির মঙ্গলসাধনের জন্য রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। সমরনির্ভর সমাজ থেকে শিল্পনির্ভর সমাজে বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে স্পেনসার 'status to contract' বা মর্যাদা অনুযায়ী অবস্থান থেকে চুক্তিভিত্তিক অবস্থান-এ উন্নীত হওয়ার প্রক্রিয়া বলে গণ্য করেছেন।

অনুশীলনী-৩

১) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

ক) স্পেনসারের মতে, সামাজিক বিবর্তন অজৈব বা জৈব প্রকৃতিতে বিবর্তনের থেকে আলাদা।

খ) স্পেনসারের মতে, গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজই হ'ল যৌগিক সমাজ।

গ) ত্রিগুণ যৌগিক সমাজ বলতে স্পেনসার শুধুমাত্র আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির কথাই বলেছেন।

ঘ) স্পেনসারের মতে, শিল্পনির্ভর সমাজে ব্যক্তিগত জীবনধারাকে নস্যাৎ করে জনজীবনের কথা ভাবা হয়।

২) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

ক) স্পেনসারের মতে, বিভাজন ও বিভিন্নকরণের মাধ্যমে আদিযুগের স্বল্পসংখ্যক রূপ বা গঠনাকৃতি থেকে পরবর্তীকালে বহুসংখ্যক বস্তুরূপ, প্রাণীরূপ ও ———— বা গঠনাকৃতির উদ্ভব হয়।

খ) স্পেনসারের মতে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় সমরূপ সমাজ ———— হয়ে ওঠে।

গ) স্পেনসারের মতে, গোষ্ঠীগুলি যখন উপজাতিতে ভাগ হয়ে গেল তখন ———— -এর আবির্ভাব ঘটল।

ঘ) স্পেনসারের মতে সমরনির্ভর সমাজে সরকার ও ———— এই দুটি উপাদানই সামাজিক জীবনের মূল নিয়ন্তা হিসাবে কাজ করত।

ঙ) সমরনির্ভর সমাজে কঠোর স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা, অর্থনৈতি স্বাতন্ত্র্য, ———— এবং সবরকম সামাজিক সংগঠনের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়।

৫.৪ জর্জ সিমেল (Georg Simmel) ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী

জর্জ সিমেলের জীবৎকাল ১৫৫৮ সাল থেকে ১৯১৮ সাল অবধি বিস্তৃত। ছাত্র হিসাবে সিমেল সাংস্কৃতিক ইতিহাস, লোক-মনস্তত্ব (folk psychology), শিল্পের ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৮১ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। ছাত্রজীবনেই সিমেল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর সম্পত্তি পান এবং ফলত স্বাধীনভাবে সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার সুযোগ লাভ করেন। ১৮৮৫ সালে তিনি একজন অবৈতনিক লেকচারার ও টিউটর হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি একজন অসাধারণ বক্তা ছিলেন বলে তাঁর বক্তৃতার বিপুলসংখ্যক শ্রোতাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাশাপাশি থাকত অধ্যাপককুল এবং বার্লিনের সংস্কৃতিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু তৎকালীন ইহুদীবিরোধী (সিমেল একজন ইহুদী ছিলেন) মনোভাবের ফলে তাঁর পদোন্নতিতে বিলম্ব ঘটে। প্রাইভেট টিউটরের পদ থেকে উচ্চতর পদে উন্নীত হ'তে তাঁর ষোল বছর সময় লেগেছিল। চাকুরিজীবনে এই বিড়ম্বনা সত্ত্বেও অসংখ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করে সিমেল বিদ্বৎ সমাজে খ্যাতি অর্জন করেন। সারাজীবনে তিনি মোট একত্রিশটি বই এবং আড়াইশোর অধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি ম্যাক্স হ্বেবার ও ফার্ডিনান্ড টনিসের সাথে একত্রে 'জার্মান সোসিওলজিকাল সোসাইটি' গড়ে তোলেন। শিক্ষক জীবনের গোড়ার দিকে তিনি দর্শন ও নীতিবিদ্যার অধ্যাপনা করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি সম্পূর্ণভাবে সমাজতত্ত্বে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপকদের মধ্যে সে সময়ে একমাত্র তিনিই সমাজতত্ত্বের অধ্যাপনা করতেন। সিমেলের গৃহ বার্লিনের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের মিলনকেন্দ্র ছিল। তিনি এইসব জ্ঞানীগুণীদের সান্নিধ্যে তাঁর সমাজতাত্ত্বিক ভাবধারাগুলি প্রচার করতে থাকেন। ১৯১৪ সালে সিমেল স্ট্রসবোর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রফেসর' পদে বৃত হন।

সিমেল বিরচিত কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হ'ল ঃ (১) কনফ্লিক্ট অ্যান্ড দ্য ওয়েব অব গ্রুপ অ্যাফিলিয়েশন্‌স্, (২) দ্য মেট্রোপলিস অ্যান্ড মেন্টাল লাইফ ; (৩) কাস্টম ঃ অ্যান এসে অন সোস্যাল কোডস্ ; (৪) দ্য সোসিওলজি অব সোসিয়েবিলিটি ; (৫) হাউ ইজ সোসাইটি পসিব্‌ল্ ?

অনুশীলনী - ৪

১) শূনস্থ্যান পূরণ করুন ঃ—

ক) সিমেল ১৮১৮ সালে —— বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

খ) তৎকালীন —— মনোভাবের ফলে সিমেলের চাকুরিতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটে।

গ) সিমেল সারাজীবনে মোট ——— টি বই এবং আড়াইশোর অধিক প্রবন্ধ লিখেছেন।

ঘ) সিমেল ম্যাক্স হ্বেবার এবং ফার্ডিনান্ড টনিসের সাথে একত্রে ——— গড়ে তোলেন।

ঙ) জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অধ্যাপকদের মধ্যে সে সময়ে একমাত্র সিমেলই——— অধ্যাপনা করতেন।

চ) ১৯১৪ সালে সিমেল স্ট্রসবোর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ——— পদে বৃত হন।

৫.৪.১ আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ব

সিমেলের মতে, সমাজবিজ্ঞানগুলি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও ঐতিহাসিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিষয়বস্তুর আলোচনায় ব্যাপৃত। অতএব একটি আলাদা সমাজবিজ্ঞানরূপে সমাজতত্ত্ব বিভিন্ন

ধরনের আচরণের অন্তর্গত মিথষ্ক্রিয়ার আকৃতির অধ্যয়নের বিষয়েই মনোযোগ দেবে। মানবীয় সম্পর্কের আকৃতি ও বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ আলাদা। মিথষ্ক্রিয়ার বিষয়বস্তু গড়ে ওঠে ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়গুলি নিয়ে। কিন্তু মিথষ্ক্রিয়ার আকৃতি বলতে বোঝায় সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, প্রভুত্ব, বশ্যতা ইত্যাদিকে। সিমেলের মতে, সমাজতত্ত্বের প্রধান কাজ হ'ল বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের আকৃতিগুলিকে বর্ণনা, শ্রেণীবদ্ধ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা।

সিমেলের মতে, বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্কের একই আকৃতি প্রকাশ পেতে পারে। সমাজজীবনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিল্পগত বা ধর্মীয় ক্ষেত্রে মিথষ্ক্রিয়ার অনুরূপ ধরন— যেমন প্রতিযোগিতা, অনুকরণ, শ্রমবিভাগ ইত্যাদি দেখা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের মানবীয় আচরণের অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য অনুধাবনের জন্য বিষয়বস্তুর থেকে আকৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। যুদ্ধ ও বিবাহ সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের সামাজিক বিষয় হ'তে পারে। কিন্তু যুদ্ধ ও বিবাহঘটিত বিবাদের ক্ষেত্রে একই রকম মিথষ্ক্রিয়া ঘটতে পারে। আবার বিভিন্ন ধরনের আকৃতির মধ্যে অনুরূপ স্বার্থ ও উদ্দেস্যসমূহ রূপায়িত হ'তে পারে। অর্থনৈতিক স্বার্থের ফলে প্রতিযোগিতার মত পরিকল্পিত সহযোগিতারও উদ্ভব হ'তে পারে। বিষয়বস্তুর চেয়ে আকৃতির উপর বেশি গুরুত্ব দান করার জন্য সিমেলের সমাজতত্ত্ব চর্চার পদ্ধতিকে 'আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ব' বলা হয়।

সেসময়ে বহু ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী মনে করতেন যে, ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি এমনই অভিনব যে সেগুলি বারবার ঘটে না। অতএব ঐসব ঘটনাগুলিকে সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করার মত একটি সমাজবিজ্ঞান গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু সিমেলের মতে, মিথষ্ক্রিয়ার আকৃতির অধ্যায়নের দ্বারা এই সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। তিনিও একমত ছিলেন যে, সিজারের হত্যাকান্ড, অষ্টম হেনরির সিংহাসনে আরোহণ, ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা অভিনব ও বারবার ঘটে না। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাসকে দেখলে এইসব ঘটনাগুলির অভিনবত্বের তুলনায় তাদের অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য বেশি করে চোখে পড়বে। বিভিন্ন রাজার ব্যক্তিগত কার্যাবলী বেশি পরিমাণে পরীক্ষা করার দরকার নেই। কিন্তু রাজাদের ব্যক্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে কিভাবে রাজতন্ত্ররূপ প্রতিষ্ঠানটি তাদের প্রভাবিত করেছিল সেই জ্ঞান সমাজতত্ত্ব যোগাতে পারে। এইভাবে সিমেল সমাজজীবনের একটি জ্যামিতি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সিমেলের মতে, যদি সমাজকে ব্যক্তিদের মধ্যে মিষষ্ক্রিয়ারূপে ভাবা হয় তবে সমাজবিজ্ঞানের কাজ হ'ল এইসব মিথষ্ক্রিয়ার বিভিন্ন আকৃতির বর্ণনা।

আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্বে বাস্তব বিষয়াদির কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে বিমূর্তভাবে বেছে নেওয়া হয়। কোন কোন সামাজিক ঘটনা তাদের বহিঃপ্রকাশে আলাদা হলেও কাঠামোগত ব্যবস্থাপনায় একই রকম হতে পারে। আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্বের পদ্ধতিতে এইসব ঘটনাবলীর তুলনা করা সম্ভব হয়। যেমন সামাজিক মূল্যবোধ মেনে চলা স্কাউট দলে এবং বিপথে চলে যাওয়া কিশোরদের গোষ্ঠীতে নেতার সাথে অনুগামীদের সম্পর্কের কাঠামো একই রকম হ'তে পারে। সিমেলের মতে, অজস্র সামাজিক বিষয়বস্তু থেকে যে নির্দিষ্ট সংখ্যক আকৃতি বেছে নেওয়া সম্ভব তা সমাজজীবনের বিশ্লেষণে সাহায্য করে। সামাজিক বিষয়বস্তুগুলি পরস্পর সম্পর্কহীন উপাদান মাত্র। আকৃতির তাত্ত্বিক ব্যবহারের দ্বারাই এগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে একটি অখণ্ড সমাজজীবনের ধারণা গড়ে তোলা যায়। এছাড়া কতকগুলি বিষয়বস্তু একটি নির্দিষ্ট আকৃতি অর্জন করে বলে সেগুলিকে অন্য বিষয়বস্তু থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়।

সমাজবাস্তবতার ক্ষেত্রে অবশ্য আকৃতিগুলিকে বিশুদ্ধরূপে পাওয়া যায় না। এগুলি মিশ্রিত অবস্থায় থাকে।

দাম্পত্য সম্পর্ক অথবা আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর ক্ষেত্রে প্রভুত্ব ও বশ্যতা, সহযোগিতা ও দ্বন্দ, ঘনিষ্ঠতা ও দূরত্ব একই সঙ্গে বিরাজ করে। এর ফলে একটি আকৃতির সাথে অন্য আকৃতির সংঘর্ষ বেধে যায় ও মিশ্রণ ঘটে। সমাজজীবনে 'অবিমিশ্র সহযোগিতা' বা 'অবিমিশ্র দ্বন্দ্ব' খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ আকৃতিগুলি ধারণার স্তরে বিরাজ করে। বাস্তবে সেগুলির দেখা মেলে না।

সিমেলের আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্বের অনেক সমালোচনা হয়েছে। প্রথম সিমেলের এই মত সত্য নয় যে সামাজিক সম্পর্কের আকৃতিগুলি অন্য কোন শাস্ত্রে অধীত হয় না। যেমন আইনশাস্ত্র প্রভুত্ব, বশ্যতা, দ্বন্দ্ব, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কগুলির আকৃতি ও বিষয়বস্তু উভয়ই বিশ্লেষণ করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের আকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া বলা যায় অর্থনীতির সমস্ত সূত্রই মানবীয় সম্পর্কের বহিরাকৃতি নিয়ে চর্চা করে।

দ্বিতীয় সিমেল আকৃতি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে যে পার্থক্য নির্দেশ করার কথা বলেছিলেন তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। বিষয়বস্তুবিহীনভাবে কোন আকৃতি থাকে না এবং বিষয়বস্তু থেকে আকৃতিকে কঠোরভাবে আলাদা করে তার অধ্যয়ন সম্ভব নয়।

সিমেলের আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্বের মূল্য অনস্বীকার্য। সামাজিক সম্পর্কগুলির আকৃতির শ্রেণীবিন্যাস ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনের কথা সিমেল সঠিকভাবেই বলেছেন। মানবীয় সম্পর্কগুলি এত বিভিন্ন ধরনের এবং সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি এত জটিল যে সেগুলির শ্রেণীবিন্যাস না করলে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ খাপছাড়া হয়ে পড়তে পারে। সিমেলের আগে স্পেনসার ও টার্ডে কিছু পরিমাণে সামাজিক সম্পর্কগুলিকে শ্রেণীবিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের অসমাপ্ত কাজকে সিমেল সমাপ্ত করেছেন।

অনুশীলনী - ৫

১) শূন্যস্থান পূরণ করুণ ঃ—

ক) সিমেলের মতে, মানবীয় সম্পর্কের আকৃতি ও ——— সম্পূর্ণ আলাদা।

খ) সিমেলের সমাজতত্ত্ব চর্চার পদ্ধতিকে ——— বলা হয়।

গ) সিমেলের মতে, দাম্পত্য সম্পর্ক অথবা আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর প্রভুত্ব ও ———, সহযোগিতা ও ———, ঘনিষ্ঠতা ও ——— একই সঙ্গে বিরাজ করে।

২) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

ক) সিমেলের মতে, মিথষ্ক্রিয়ার আকৃতি গড়ে ওঠে ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়গুলি নিয়ে।

খ) সিমেলের মতে, বিভিন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্কের একই আকৃতি প্রকাশ পেতে পারে।

গ) সিমেলের মতে, যুদ্ধ ও বিবাহঘটিত বিবাদের ক্ষেত্রে একই রকম মিথষ্ক্রিয়া ঘটতে পারে।

ঘ) সে সময়ে বহু ঐতিহাসিক মনে করতেন যে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি অভিনব হলেও সেগুলি বারবার ঘটে।

ঙ) সিমেল সমাজজীবনের একটি জ্যামিতি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

চ) সিমেলের মতে, আকৃতিগুলি কখনই মিশ্রিত হয় না।

ছ) সিমেলের আগে আর কোনও সমাজতত্ত্ববিদ সামাজিক সম্পর্কগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করার চেষ্টা করেন নি।

৫.৪.২ সামাজিকতার ধরন

যখন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিথষ্ক্রিয়া সংঘটিত হয় তখন তারা কতকগুলি পারস্পরিক সম্পর্ক বা সামাজিকতার ধরন গড়ে তোলে। সিমেল নানা ধরনের সামাজিকতাকে শনাক্ত করে সেগুলির বিশ্লেষণ করেছেন। সব থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিকতার ধরন হ'ল ঃ যুগল (dayd), ত্রয়ী (triad) এবং আধিপত্য-বশ্যতা (superordination-subordination)।

দু'জন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত সরলতম গোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত সম্পর্কই হ'ল যুগল সম্পর্ক। এর বিভিন্ন প্রকাশ ঘটতে পারে। তবে সবচেয়ে পরিচিত প্রকাশ হ'ল একবিবাহের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা স্বামী-স্ত্রীর একটি পরিবার। যুগল সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত দু'জন ব্যক্তিই কোন বৃহত্তর সমষ্টির নয়, শুধু একে অপরের সম্মুখীন হচ্ছে। দু'জন অংশগ্রহণকারীর উপর এই গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করে বলে একজন সরে দাঁড়ালেই এটি বিনষ্ট হয়। তবে কোন যুগল ত্রয়ীতে রূপান্তরিত হ'লে একজন সদস্য কোনভাবে সরে গেলেও গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব বিপন্ন হয় না। অন্যান্য গোষ্ঠীতে যে অতিব্যক্তিক (superpersonal) সত্তা গড়ে ওঠে এবং যা সদস্যদের উপরে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, তা যুগলে কখনও গড়ে ওঠে না। যুগলসম্পর্কে অংশগ্রহণকারীরা এই সম্পর্কে প্রগাঢ়ভাবে নিমগ্ন হয়। যুগলের ক্ষেত্রে প্রতি সদস্যের উপরে গোটা গোষ্ঠী অপরিহার্যভাবে নির্ভরশীল, অন্যান্য গোষ্ঠীতে দায়িত্ব অন্যের উপর চাপানো যায়। কিন্তু যুগলের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না, কারণ যে কোন যৌথ কার্যসম্পাদনের ব্যাপারে দু'জনকেই অংশ নিতে হয়।

যুগল ত্রয়ীতে রূপান্তরিত হ'লে একজন সদস্য সংযোজিত হয়ে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা মৌলিক পরিবর্তন আনে। যেমন একটি সন্তান লাভের পরে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। কিন্তু ত্রয়ীতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত একজন সদস্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এরাই হ'ল সবচেয়ে সরল কাঠামো যেখানে গোষ্ঠী সদস্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। যখু যুগলগোষ্ঠীতে একজন তৃতীয় ব্যক্তি প্রবেশ করে তখন এই শেষোক্তজন নিচের তিনটি ভূমিকার যে কোন একটি গ্রহণ করে ঃ (১) নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী যে অন্য দু'জনের মধ্যে কারুরই পক্ষ অবলম্বন না করে তাদের বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করে ; (২) এমন ধরনের তৃতীয় পক্ষ যে অন্য দু'জনের বিবাদ উপভোগ করে এবং নিজের সুবিধার জন্য তা ব্যবহার করার চেষ্টা করে ; যেমন 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' (divide and rule) নীতিগ্রহণকারী যে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অন্য দু'জনের মধ্যে বিবাদ বাধায়।

সিমেল শুধু দৈনন্দিন জীবনের মিথষ্ক্রিয়ার ধরন বোঝানোর জন্য তাঁর যুগল ও ত্রয়ীর ধারণা ব্যবহার করেননি। তিনি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নানারকম রাজনৈতিক জোটবন্ধনকে ব্যাখ্যা করতেও এই ধারণা প্রয়োগ করেছেন। যেমন ইংল্যান্ডে রাজা ও অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে কলহবিবাদ দূর করার প্রয়োজনেই সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া সধারণসভার উদ্ভব হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। নববিবাহিত দম্পতীর সাথে শ্বাশুড়ী যে কৌশলপূর্ণ ব্যবহার করে তার সঙ্গে তিনি প্রাচীনকালে গ্রিস জয়ের পর রোম এথেন্স ও স্পার্টার সাথে যে ব্যবহার করত তার তুলনা করেছেন।

যুগল ও ত্রয়ী ছাড়া সিমেল সামাজিকতার একটি মুখ্য ধরন হিসাবে আধিপত্য-বশ্যতার বিশ্লেষণ করেছেন। সিমেলের মতে, অন্য কারও কিছু সম্পর্কের মত প্রভুত্ব ও আনুগত্যের মাধ্যমে সমাজ গড়ে উঠেছে এবং প্রতিটি মানবীয় সমিতিতে প্রভুত্ব ও আনুগত্য উপস্থিত। আধিপত্যের ক্ষেত্রে কিন্তু অধিপতিও তার নিজের

আদেশবলে বাধা পড়ে যায়। প্রভু ও অনুগতেরা তাদের ব্যক্তিত্বের সমান অংশ নিয়ে এই সম্পর্কে প্রবেশ করে না। প্রভু তার ব্যক্তিত্বের সবটাই প্রয়োগ করে, কিন্তু অনুগত তার ব্যক্তিত্বের অংশমাত্র নিয়োগ করে। সিমেলের মতে যত বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে শাসন করতে হবে, ততই প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের কম অংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব হবে। প্রভু ও অনুগত-এর মধ্যে সম্পর্কটা হ'ল পারস্পরিক আদানপ্রদানের ; কেবল প্রভুর চূড়ান্ত আধিপত্য ও অনুগত ব্যক্তির নীরব বশ্যতার ব্যাপার নয়।

সিমেলের মতে, যদি বিভিন্ন ব্যক্তি সমানভাবে একজন শাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন হয় তবে তারা পরস্পরের সমান। স্বৈরাচারী শাসকরা এইরকম সমতাবিধান [যাকে কার্ল ম্যানহাইম 'নেতিবাচক গণতন্ত্রীকরণ' (negative democratization) বলেছেন।]পছন্দ করে য, কারণ তারা এর দ্বারা উপকৃত হয়। সকল প্রজা সমান হয়ে গেলে ক্ষমতার ভাগাভাগি হয় না। সেক্ষেত্রে শাসক পুরো ক্ষমতাটাই হস্তগত করে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু যদি প্রজাদের মধ্যে স্তরবিন্যাস ঘটে তবে উচ্চস্তরে আসীন প্রজারাও কিছুটা ক্ষমতা লাভ করে এবং শাসকের স্বৈরাচার প্রতিহত হয়। যদিও এই স্তরবিন্যাস প্রজাদের মধ্যে অসাম্য বাড়ায়, তা কিন্তু ব্যক্তিকে শাসকের প্রত্যক্ষ ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচায়। যেখানে সামাজিক স্তরবিন্যাস পিরামিডের চেহারা নেয়, সেখানে সবচেয়ে উঁচু ও নিচু স্তর ছাড়া মাঝের প্রত্যেক স্তরই তার অব্যবহিত নিচের স্তরের উপর বিস্তার করে এবং উপরের স্তরের প্রতি বশ্যতা জানায়। এভাবে কারুর কারুর প্রতি আনুগত্যের ক্ষতিপূরণ ঘটে যায় অন্য কারুর উপর ক্ষমতাভোগের মাধ্যমে।

অনুশীলনী - ৬

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

ক) সিমেলের মতে, তিনটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিকতার ধরন হল যুগল, ——— এবং আধিপত্যবশ্যতা।

খ) নববিবাহিত দম্পতীর সাথে শ্বাশুড়ী যে কৌশলপূর্ণ ব্যবহা করে তার সাথে সিমেল প্রাচীনকালে গ্রিস জয়ের পর ——— এথেন্স ও স্পার্টার সাথে যে ব্যবহার করত তার তুলনা করেছেন।

গ) সিমেলর মত, আধিপত্যের ক্ষেত্রে অধিপতির তার নিজের ———— বাধা পড়ে যায়।

ঘ) যেখানে সামাজিক স্তরবিন্যাস ——— -এর চোহারা নেয়, সেখানে সবচেয়ে উঁচু ও নিচু স্তর ছাড়া মাঝের প্রত্যেক স্তরই তার অব্যবহিত নিচের স্তরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে এবং উপরের স্তরের প্রতি বশ্যতা জানায়।

২) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

ক) ত্রয়ীতে একজন সদস্য সরে গেলে গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হয়।

খ) অন্যান্য গোষ্ঠীতে যে অতিব্যক্তিক সত্তা গড়ে ওঠে এবং যা সদস্যদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, তা যুগলে কখনও গড়ে ওঠে না।

গ) সিমেলের মতে, প্রতিটি মানবীয় সমিতিতে প্রভুত্ব ও আনুগত্যের সম্পর্ক দেখা যায় না।

ঘ) সিমেলের মতে প্রভু ও অনুগতদের মধ্যে সম্পর্কটা হ'ল পারস্পরিক আদানপ্রদান।

ঙ) সিমেলের মতে, স্বৈরাচারী শাসকরা নেতিবাচক গণতন্ত্রীকরণকে পছন্দ করে।

৫.৫ সারাংশ

স্পেনসারের মতে, জীবদেহের সাথে সমাজের লক্ষণীয় সাদৃশ্য আছে। জীবদেহ ও সমাজ উভয়েরই ক্রমবিকাশ ঘটছে এবং তার ফলে উভয়ই সরল থেকে জটিল আকার ধারণ করছে। তিনি নিম্নস্তরের জীব ও আদিম সমাজ উভয়েরই ক্ষেত্রে কাঠামোগত সরলতা এবং বিভাজন ও শ্রমবিভাগের অনুপস্থিতির কথা বলেছেন। বিবর্তনের যে পদ্ধতিতে এককোষী প্রাণী থেকে উন্নত মানবপ্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে সেই একই পদ্ধতিতে আদিম সমাজ পরিবর্তিত হ'তে হ'তে আধুনিক শিল্পনির্ভর সমাজে উপনীত হয়েছে, পরবর্তীকালে স্পেনসার অবশ্য জীবদেহ ও সমাজের মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্যের উল্লেখপূর্বক বলেছেন যে, সমাজ একটি জীব নয়, তা জীবদেহের অনুরূপ মাত্র।

জৈবিক সাদৃশ্যবাদকে স্পেনসার তাঁর বিবর্তনবাদের মুখবন্ধ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, বস্তুজগতে, জীবজগতে ও সমাজজগতে একই নিয়মে নিরন্তর বিবর্তন ঘটে চলেছে। এই প্রক্রিয়ায় সরল বস্তু জীব ও সমাজ কালক্রমে জটিল বস্তু, জীব ও সমাজে পরিণত হয় এবং তাদের কার্যকলাপে বৈচিত্র্য ও সংখ্যাধিক্য দেখা দেয়। বিবর্তন প্রক্রিয়ার চার রকম সমাজের পরপর আবির্ভাব হয় ঃ সরল সমাজ, যৌগিক সমাজ, দ্বিগুণ যৌগিক সমাজ ও ত্রিগুণ যৌগিক সমাজ। কতকগুলি পরিবার নিয়ে সরল সমাজ, কতকগুলি গোষ্ঠী নিয়ে যৌগিক সমাজ, কতকগুলি উপজাতি নিয়ে দ্বিগুণ যৌগিক সমাজ এবং জাতিরাষ্ট্র নিয়ে ত্রিগুণ যৌগিক সমাজ গড়ে ওঠে। আয়তন বৃদ্ধি, বহুরূপতা, নির্দিষ্টতা ও সামঞ্জস্যের দিকে সামাজিক বিবর্তনের অগ্রগতি ঘটে। স্পেনসার আরও একভাবে সমাজের শ্রেণীবিভাগ করেছেন ঃ সমরনির্ভর সমাজ ও শিল্পনির্ভর সমাজ।

সিমেলের মতে, মানবীয় সম্পর্কের আকৃতি ও বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ আলাদা, সমাজতত্ত্বের প্রধান কাজ হ'ল বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের আকৃতিগুলিকে বর্ণনা, শ্রেণীবদ্ধ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা। বিভিন্ন ধরনের মানবীয় আচরণের অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য অনুধাবনের জন্য তিনি বিষয়বস্তুর চেয়ে আকৃতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। একারণে সিমেলের সমাজতত্ব চর্চার পদ্ধতিকে 'আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ব' বলা হয়। তাঁর মতে, অজস্র সামাজিক বিষয়বস্তু থেকে যে নির্দিষ্টসংখ্যাক আকৃতি বেছে নেওয়া সম্ভব তা সমাজজীবনের বিশ্লেষণে সাহায্য করে। এভাবে সিমেল সমাজজীবনের একটি জ্যামিতি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বিভিন্ন সমালোচনা সত্ত্বেও সিমেলের আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্বের মূল্য অনস্বীকার্য।

যখন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিথস্ক্রিয়া সংঘটিত হয় তখন তারা কতকগুলি সামাজিকতার ধরন গড়ে তোলে। সিমেলের মতে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি সামাজিতার ধরন হ'ল— যুগল, ত্রয়ী এবং আধিপত্য-বশ্যতা। দু'জনের অংশগ্রহণের উপর যুগলের স্থায়িত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তবে যুগল ত্রয়ীতে রূপান্তরতি হলে একজন সরে গেলেও গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হয় না। ত্রয়ীতে গোষ্ঠী সদস্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে যা যুগলের ক্ষেত্রে হয় না। সিমেলের মতে সমাজ গড়ে ওঠার আবশ্যকীয় শর্ত হ'ল আধিপত্য-আনুগত্যের সম্পর্কের উপস্থিতি। কিন্তু এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভু তার ব্যক্তিত্বের সবটাই নিয়োগ করে যেখানে অনুগত তার ব্যক্তিত্বের অংশমাত্র নিয়োগ করে। যখন সব প্রজাই সমান তখন শাসক পুরো ক্ষমতাই হস্তগত করতে পারে। কিন্তু যখন প্রজাদের মধ্যে স্তরবিন্যাস ঘটে তখন উচ্চস্তরের প্রজারাও কিছুটা ক্ষমতা লাভ করে এবং শাসকের স্বৈরাচার প্রতিহত হয়।

৫.৬ অনুশীলনী

১) স্পেনসার জীবদেহের সাথে সমাজের কিভাবে তুলনা করেছেন ? দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন।

২) মানবদেহের কোন কোন অঙ্গের সাথে শিল্পপ্রধান সমাজের কোন কোন ব্যবস্থার তুলনা স্পেনসার করেছেন ? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন।

৩) জীবদেহ ও সমাজের মধ্যে কি কি বৈসাদৃশ্যের কথা স্পেনসার বলেছেন ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন।

৪) স্পেনসারের বিবর্তন তত্ত্বের মুখ্য দুটি উপপাদ্য কি কি ? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৫) সামাজিক বিবর্তন তত্ত্বে স্পেনসার কোন চার ধরনের সমাজের আবির্ভাবের কথা বলেছেন ? দেড়শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৬) সমরনির্ভর সমাজ ও শিল্পনির্ভর সমাজ বলতে স্পেনসার কি বুঝিয়েছেন ? দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৭) সামাজিক সম্পর্কের আকৃতি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য কি ? কিভাবে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে একই আকৃতি প্রকাশ পেতে পারে অথবা বিভিন্ন আকৃতির মধ্য দিয়ে একই বিষয়বস্তু রূপায়িত হতে পারে ? দেড়শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৮) সিমেল কিভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে সমাজতত্ত্বের দ্বারা সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে মনে করতেন ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৯) সিমেলের মতে, আকৃতির তাত্ত্বিক ব্যবহারের সুবিধা কি কি ? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১০) সিমেলের আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্বের কি কি সমালোচনা করা হয়েছে ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১১) যুগল সম্পর্কের ব্যাপারে সিমেল কি বলেছেন ? দেড়শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১২) যুগল ও ত্রয়ীর মধ্যে পার্থক্য কি ? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন।

১৩) যখন যুগলগোষ্ঠীতে একজন তৃতীয় ব্যক্তি প্রবেশ করে তখন সে কি কি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন ?

১৪) সিমেলের অনুসরণে আধিপত্য-বশ্যতার বিশ্লেষণ করুন। দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন।

৫.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

১) (ক) ×

(খ) ✓

(গ) ×

(ঘ) ×

(ঙ) ✓

অনুশীলনী - ২

১। (ক) বিবর্তনতত্ত্ব

(খ) ক্রমবিকাশ

(গ) মানবদেহ

(ঘ) মস্তিষ্কের

(ঙ) জৈববাদ

(চ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী

(ছ) অসংলগ্ন

অনুশীলনী - ৩

১) (ক) ×

(খ) ✓

(গ) ×

(ঘ) ×

২। (ক) সমাজরূপ

(খ) বিষমরূপ

(গ) দ্বিগুণ যৌগিক সমাজ

(ঘ) ধর্ম

(ঙ) কেন্দ্রীভূত সরকার

অনুশীলনী - ৪

১) (ক) বার্লিন

(খ) ইহুদীবিরোধী

(গ) একত্রিশ

(ঘ) জার্মান সোসিওলজিকাল সোসাইটি

(ঙ) সমাজতত্ত্বের

(চ) প্রফেসর

অনুশীলনী - ৫

১) (ক) বিষয়বস্তু

(খ) আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ব

(গ) বশ্যতা দ্বন্দ্ব দূরত্ব

২) (ক) ×

(খ) ✓

(গ) ✓

(ঘ) ×

(ঙ) ✓

(চ) ×

(ছ) ×

অনুশীলনী - ৬

১) (ক) ত্রয়ী

(খ) রোম

(গ) আদেশবলে

(ঘ) পিরামিড

২) (ক) ×

(খ) ✓

(গ) ×

(ঘ) ✓

(ঙ) ✓

অনুশলনী

১) ৫.৩.১ অনুচ্ছেদের ১ম, ২য় ও ৩য় পংক্তিগুলি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে—

(ক) জীবদেহের বিবর্তন ও সমাজের বিবর্তনের তুলনা

(খ) উভয়েরই ক্ষেত্রে প্রথমদিকে বিভাজন ও শ্রমবিভাগের অনুপস্থিতি

(গ) উভয়েরই ক্ষেত্রে সরল পর্যায় থেকে জটিল পর্যায়ে বিবর্তন

২) ৫.৩.১ অনুচ্ছেদের ৩য় পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে —

(ক) স্নায়ুতন্ত্রের সাথে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার তুলনা

(খ) রক্তসঞ্চালনের সাথে বণ্টন ব্যবস্থার তুলনা

(গ) মস্তিষ্কের সাথে সরকারের তুলনা

৩) ৫.৩.১ অনুচ্ছেদের ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পংক্তিগুলি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্মোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে—

(ক) জীবদেহ সুসমঞ্জস, সমাজ অসমঞ্জস

(খ) জীবদেহে বিভিন্ন অঙ্গের ঘনবদ্ধ সমাহার, সমাজ অসংলগ্ন

(গ) জীবদেহে চেতনা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রে কেন্দ্রীভূত ; সমাজে চেতনা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

৪। ৫.৩.২ অনুচ্ছেদের ১ম পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে —

(ক) স্বল্পসংখ্যক রূপ বা গঠনাকৃতি থেকে বহুসংখ্যক রূপ বা গঠনাকৃতির উদ্ভব

(খ) সরল থেকে জটিলে পরিবর্তন

৫) ৫.৩.২ অনুচ্ছেদের ২য়, ৩য়,৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পংক্তিগুলি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে—

(ক) সরল সমাজ

(খ) যৌগিক সমাজ

(গ) দ্বিগুণ যৌগিক সমাজ

(ঘ) ত্রিগুণ যৌগিক সমাজ

৬। ৫.৩.২ অনুচ্ছেদের শেষ দুটি পংক্তি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে—

(ক) সমরনির্ভর সমাজের বৈশিষ্ট্য

(খ) শিল্পনির্ভর সমাজের বৈশিষ্ট্য

(গ) উভয় সমাজের পার্থক্য।

৭। ৫.৪.১ অনুচ্ছেদের ১ম ও ২য় পংক্তিদ্বয় দেখুন।

৮। ৫.৪.১ অনুচ্ছেদের ৩য় পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে —

(ক) ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির অভিনবত্ব

(খ) সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘটনাগুলির অভিনত্বের চেয়ে তাদের সাদৃশ্যের অনুধাবন

৯) ৫.৪.১ অনুচ্ছেদের ৪র্থ ও শেষ পংক্তিদ্বয় দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে —

(ক) আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্বের পদ্ধতিতে বিভিন্ন ঘটনার তুলনা

(খ) নির্দিষ্ট সংখ্যক আকৃতির দ্বারা সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির শ্রেণীবিন্যাস ও সমাজজীবনের সুষ্ঠ বিশ্লেষণ

(গ) আকৃতির ব্যবহারের দ্বারা সম্পর্কহীন সামাজিক বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে সম্পর্কস্থাপন

(ঘ) বিভিন্ন বিষয়বস্তুগুলির পৃথকীকরণ।

১০) ৫.৪.১ অনুচ্ছেদের ৬ষষ্ঠ ও ৭ম পংক্তিদ্বয় দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে—

(ক) বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানে আকৃতির অধ্যয়ন

(খ) আকৃতি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য রক্ষা অসম্ভব

১১) ৫.৪.২ অনুচ্ছেদের ২য় পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে —

(ক) যুগল গোষ্ঠীর উদাহরণ

(খ) দু'জন অংশগ্রহণকারীর গুরুত্ব

(গ) গোষ্ঠীগত অতিব্যক্তিক সত্তার অনুপস্থিতি

১২) ৫.৪.২ অনুচ্ছেদের ২য় ও ৩য় পংক্তিদ্বয় দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে —

(ক) যুগল ও ত্রয়ীর আপেক্ষিক স্থায়িত্ব

(খ) যুগলে গোষ্ঠীর সদস্যদের উপর নিয়ন্ত্রণের অভাব, ত্রয়ীতে গোষ্ঠীর সদস্যদের উপর নিয়ন্ত্রণ.

১৩) ৫.৪.২ অনুচ্ছেদের ৩য় পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে—

(ক) নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী

(খ) বিবাদ উপভোগ ও ব্যবহারকারী

(গ) 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' নীতিগ্রহণকারী।

১৪) ৫.৪.২ অনুচ্ছেদের শেষ দুটি পংক্তি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে—

(ক) প্রভুত্ব-আনুগত্যের সম্পর্ক দ্বারা সমাজগঠন

(খ) প্রভু ও অনুগতদের ব্যক্তিত্বের অসমান অংশ প্রয়োগ

(গ) প্রভু ও অনুগতের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদান

(ঘ) শাসকের পক্ষে নেতিবাচক গণতন্ত্রীকরণের উপযোগিতা

(ঙ) ক্ষমতার স্তরবিন্যাসের ফলাফল

৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Harry Elmer Barnes : *In Introduction to the History of Sociology* (1950)

(২) Lewis A Coser : *Masters of Sociological Thought* (1950)

(৩) Francis Abraham & John Henry Morgan : *Sociologica Thought* (1985)

(৪) Timothy Raison (ed.) : *The Founding Fathers of Social Science* (1929)

একক ৬ ❐ এমিল ডুর্খাইম

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য
৬.২ প্রস্তাবনা
৬.৩ এমিল ডুর্খাইম ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী
৬.৩.১ সামাজিক বস্তুসত্য
৬.৩.২ শ্রমবিভাগ
৬.৩.৩ আত্মহত্যা
৬.৩.৪ ধর্ম ও সমাজ
৬.৪ সারাংশ
৬.৫ অনুশীলনী
৬.৬ উত্তরমালা
৬.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে সমাজতত্ত্বের মুখ্য স্থপতিদের মধ্যে অন্যতম এমিল ডুর্খাইমের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা সম্পর্কে পাঠকদের মনে কিছু ধারণা জন্মাবে। সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের আধুনিক ধরন—যা কোঁত এবং স্পেনসারের সমাজতাত্ত্বিক ধাঁচের থেকে কিছুটা আলাদা—গড়ে তোলার গৌরব প্রাথমিকভাবে ডুর্খাইমেরই প্রাপ্য। প্রথমোক্ত দু'জনের বৃহদাকার তত্ত্ব (grand theory)-এর বিপরীতে ডুর্খাইম নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক, যা সমাজতত্ত্বের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়গুলির অন্যতম, ডুর্খাইম কর্তৃক বিশেষভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। বর্তমান এককটি পাঠ করলে পাঠক ডুর্খাইমকৃত আধুনিক ধরনের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের সাথে কিছুটা পরিচিত হবেন।

৬.২ প্রস্তাবনা

স্পেনসারের লেখায় যে কর্মনির্বাহী তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন ছিল তা ডুর্খাইমের লেখায় অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। বর্তমান এককে ডুর্খাইমের শ্রমবিভাগ, আত্মহত্যা এবং ধর্মের সামাজিক চরিত্র বিষয় আলোচিত হ'ল। এই তিনটি প্রসঙ্গেই ডুর্খাইমের কর্মনির্বাহী দৃষ্টিভঙ্গি, যা তিনি স্পেনসারের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন, প্রকাশ পেয়েছে। এই তিনটি বিষয়ের আলোচনাতেই ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রসঙ্গটি প্রাধান্য লাভ করেছে। শ্রমবিভাগ প্রসঙ্গে মূলত সামাজিক ঐক্যের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। আত্মহত্যা নামক একান্ত ব্যক্তিগত হিসাবে চিহ্নিত আচরণটিও কিভাবে সামাজিক কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয় তা ডুর্খাইম দেখাবার চেষ্টা করেছেন। ধর্মের সামাজিক চরিত্র উদঘাটনপূর্বক ডুর্খাইম এও প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন যে সমাজই হ'ল ধর্মীয় আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু।

৬.৩ এমিল ডুর্খাইম ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী

প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ এমিল ডুর্খাইমের জন্ম হয় ১৮৫৮ সালে ফ্রান্সে। মূলত দর্শনের ছাত্র হলেও রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বে তিনি আগ্রহী ছিলেন। স্নাতক হবার পর তিনি দর্শনের অধ্যাপনা শুরু করেন। কিছুদিন পরে অধ্যাপনায় বিরতি দিয়ে তিনি জার্মানির বার্লিন ও লাইপ্‌জিগে উচ্চতর পঠনপাঠন ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। এসময় থেকে তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন যেগুলি ফরাসী বিদ্বৎজনদের সমাদর লাভ করে। তিনি ১৮৮৭ সালে বোরদো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ফ্রান্সের মধ্যে প্রথম বোরদো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডুর্খাইমের জন্যই সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রম প্রচলিত হয়। ১৮৯৩ সালে যে গবেষণাপত্রটি তিনি সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন সেটি পরবর্তীকালে 'দ্য ডিভিসন অব লেবার ইন সোসাইটি' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে। তিনি এর কিছু পরেই 'দ্য রুলস অব সোসিওলজিকাল মেথড' ও 'সুইসাইড' নামে আরও দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৮৯৮ সালে 'L' Annee Sociologique' নামে একটি বৈজ্ঞানিক সাময়িকপত্র নিজের সম্পাদনায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এই সাময়িকপত্রটি সারা ফ্রান্সের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার বিতর্কের ও গবেষণার একটি স্বীকৃত মাধ্যম হয়ে ওঠে। ১৯০২ সালে ডুর্খাইম সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষার একটি নবসৃষ্ট অধ্যাপকপদে যোগ দেন। পরে শিক্ষাকে বিলুপ্ত করে ঐ পদটি শুধু সমাজতত্ত্বের জন্য সংরক্ষিত হয়। এসময় থেকে ডুর্খাইম উদীয়মান সমজত্ত্ববিদের শিক্ষণের ব্যাপারে সবিশেষ উদ্যোগী হন এবং তাদের সাথে আলোচনায় তাঁর অধিকাংশ সময় ব্যয় করতে থাকেন। ১৯১২ সালে তাঁর চতুর্থ বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য এলিমেন্টারি ফর্মস্ অব রিলিজিয়াস লাইফ' প্রকাশিত হয় যার মাধ্যমে তিনি ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ১৯১৭ সালে তিনি মারা যান। ডুর্খাইম বিরচিত কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হ'ল ঃ

১) দ্য ডিভিসন অব লেবার ইন সোসাইটি

২) দ্য রুলস অব সোসিওলজিকাল মেথড

৩) সুইসাইড

৪) দ্য এলিমেন্টারী ফর্মস অব রিলিজিয়াস লাইফ

৫) সোসিওলজি অ্যান্ড ফিলসফি

অনুশীলনী -১

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

(ক) ডুর্খাইম ১৮৮৭ সালে —— বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন।

(খ) ডুর্খাইম যে —— টি সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন সেটি পরবর্তীকালে 'দ্য ডিভিসন অব লেবার ইন সোসাইটি' নামে প্রকাশিত হয়।

(গ) ১৮৯৮ সালে ডুর্খাইম '——' নামে একটি বৈজ্ঞানিক সাময়িকপত্র নিজের সম্পাদনায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

(ঘ) ১৯০২ সালে ডুর্খাইম সমাজতত্ত্ব ও —— -র একটি নবসৃষ্ট অধ্যাপকপদে যোগ দেন।

(ঙ) ডুর্খাইমের চতুর্থ বিখ্যাত গ্রন্থ ১৯১২ সালে '——' নামে প্রকাশিত হয়।

৬.৩.১ সামাজিক বস্তুসত্য

ডুর্খাইম মনে করতেন যে একটি বিষয়গত (objective) বিজ্ঞান হিসাবে অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির আদলে সমাজতত্ত্বের গড়ে ওঠা সম্ভব এবং গড়ে ওঠা উচিত। এধরনের সমাজতত্ত্বের গড়ে তোলার জন্য দুটি বিষয়ের প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ এই বিজ্ঞানটির আলোচ্য বিষয় সুনির্দিষ্ট হবে এবং অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির আলোচ্য বিষয়ের থেকে তার পার্থক্য থাকবে। দ্বিতীয়ত অন্যান্য বিজ্ঞানের বিষয়াদির মত এই সমাজতত্ত্বের বিষয়ও পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যার উপযোগী হবে। 'সামাজিক বস্তুসত্য' বা 'সামাজিক ঘটনা' (social fact)-র ধারণার মধ্যে ডুর্খাইম বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের উপযুক্ত এই বিষয়টিকে খুঁজে পান। তিনি মনে করতেন যে সামাজিক ঘটনাগুলি হ'ল নিজস্ব বা অনন্য ধরনের (sui generis) বাস্তবতা। ডুর্খাইমের মতে, একটি সামাজিক ঘটনা অন্য একটি সামাজিক ঘটনার ফল তা কখনই ব্যক্তি-মনস্তত্ত্বের ফল নয়। এমনকি জৈব বা অর্থনৈতিক কারণও সামাজিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। সামাজিক বস্তুসত্যকে একমাত্র সামাজিক কারণ দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়। সামাজিক ঘটনাগুলির বিশেষ কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও বাধ্যবাধকতা আছে। এগুলি বহুযুগ ধরে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জীবৎকাল পেরিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঘটনাবলীকে পদার্থ বা বস্তু হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এটাই হ'ল সামাজিক বস্তুসত্য। অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে আমাদের মনে যে বিষয়ীগত (subjective) ও অস্পষ্ট ধারণা আছে তা থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। বস্তুর বিষয়গত অস্তিত্ব থাকে যা ব্যক্তিনিরপেক্ষ, যা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে একইভাবে প্রতিভাত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে যার অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বদলে যায় না। সামাজিক ঘটনাবলীকেও এইরকম বিষয়গত, সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত, বহির্গত ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞাতব্য অস্তিত্ব হিসাবে দেখতে হবে। সামাজিক ঘটনাবলীকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করবে না। সামাজিক বস্তুসত্যের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব এবং দেওয়া উচিত।

সামাজিক বস্তুসত্য বা ঘটনা বলতে ডুর্খাইম যৌথভাবে কাজ করা, চিন্তা করা এবং অনুভব করার পদ্ধতিসমূহকে বুঝিয়েছেন যাদের মধ্যে ব্যক্তি-চেতনার বহির্গত অস্তিত্বের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। সামাজিক বস্তুসত্যের দু'টি নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে ঃ—

(১) সামাজিক বস্তুসত্য ব্যক্তি-চেতনার বহির্গত। অর্থাৎ ব্যক্তির উপলব্ধির উপর সামাজিক ঘটনাবলীর অস্তিত্ব নির্ভর করে না। অতএব আইনের মত বিভিন্ন সামাজিক বস্তুসত্যের ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। ব্যক্তি এদের কিভাবে গ্রহণ করল না করল তা দিয়ে এদের অস্তিত্ব প্রভাবিত হয় না।

(২) সামাজিক বস্তুসত্য ব্যক্তির আচরণের উপর বাধ্যবাধকতা বিস্তারে সক্ষম, অর্থাৎ ব্যক্তির আচরণ সামাজিক ঘটনাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক বস্তুসত্যের অস্তিত্বের জন্যই ব্যক্তি নির্দিষ্ট ধরনের সামাজিক আচরণ করতে বাধ্য হয়। সামাজিক বস্তুসত্যের দমনমূলক ক্ষমতা আছে। ফলে সামাজিক ঘটনাবলীকে অগ্রাহ্য করে ব্যক্তির পক্ষে তার খুশিমতো কিছু করা সম্ভব নয়। যেমন শাস্তির ভয়ে কেউ সচরাচর দেশের প্রচলিত আইন ভঙ্গ করতে সাহস করে না।

ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক বস্তুসত্যকে অন্তর্দর্শনের দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায় না। সেজন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। ধর্মীয় আনুগত্য, সামাজিক নৈতিকতা, বৈবাহিক অবস্থান, আত্মহত্যার হার, অর্থনৈতিক পেশা ইত্যাদির মত বহির্গত ও দৃষ্টিগোচর বিষয়গুলিকে পর্যবেক্ষণ করে সামাজিক ঘটনাবলীর ধারণা লাভ করা সম্ভব।

ডুর্খাইমের মত, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি হ'ল প্রকৃত অর্থে বস্তুসত্য, কারণ তারা ব্যক্তির অস্তিত্বের বাইরে বিরাজ করে এবং যারা এই প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক সমাজতত্ত্ববিদ সমাজতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠান সমূহের বিজ্ঞান হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই অর্থে সমাজতত্ত্ব হ'ল প্রধানত সামাজিক বস্তুসত্যসমূহের বিজ্ঞান এবং এদের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভই হ'ল সমাজতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য। ডুর্খাইম বলেছেন যে, সামাজিক ঘটনাবলীকে ধারণা হিসাবে নয়, অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় বা বস্তুসত্য হিসাবে বুঝতে হবে। ডুর্খাইমের ভাষায় বস্তুর মধ্যে সমস্ত জ্ঞানের অধিগম্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত যেগুলিকে নিছক মানসিক প্রক্রিয়া দ্বারা বোঝা যায় না, যেগুলির ধারণা লাভের জন্য মনের বহির্গত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ তথ্যের প্রয়োজন, যেগুলি অত্যন্ত বাহ্যিক ও তাৎক্ষণিকভাবে অধিগম্য বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে গড়ে ওঠে, ততটা দৃষ্টিগোচর নয় এরকম এবং অধিকতর নিগূঢ় বৈশিষ্ট্যসমূহে পরিণত হয়।

ডুর্খাইমের মতে, সমাজ-বাস্তবতার সঠিক প্রকাশ ব্যক্তির মধ্যে নয়। গোষ্ঠীর মধ্যেই ঘটে। অতএব সামাজিক ঘটনাবলীর দেখা মেলে গোষ্ঠীর মধ্যে, ব্যক্তির মধ্যে নয়। সামাজিক ঘটনাবলীর ব্যক্তির উপর প্রভাববিস্তারপূর্বক তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলত এদের চরিত্র ব্যক্তিগত ঘটনাবলী থেকে পৃথক। আমরা আমাদের অভ্যাস, আবেগ ও প্রবৃত্তি দমন করতে পারি কারণ এগুলি কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) পদ্ধতিতে বিচরণ করে এবং প্রবলতর চাপের দ্বারা প্রতিহত হয়। কিন্তু সামাজিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি হ'ল কেন্দ্রাভিগ (centripetal) এদের প্রভাব বাইরের থেকে ব্যক্তির উপর আরোপিত হয়। ফলে এদের আটকানো যায় না, বরং এরা ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবুও ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঘটনাবলী, বিশেষত নৈতিক বিধিগুলি সত্যকারের কার্যকরী তখনই হয় যখন তারা ব্যক্তি, নিরপেক্ষভাবে বিরাজ করলেও ব্যক্তি তাদের নিজের চেতনার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ডুর্খাইম 'নিয়ন্ত্রণ' বলতে বুঝিয়েছেন বিধি মেনে চলার নৈতিক দায়িত্ব। সমাজ একই সাথে আমাদের বাইরে ও ভিতরে বিদ্যমান। একমাত্র সামাজিক চাহিদা লঙ্ঘিত হলেই আইনগত বা প্রথাগত নিয়ন্ত্রণকে কাজে লাগানো হয়। অতএব ডুর্খাইমের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সামাজিক বস্তুসত্যের এভাবে সংজ্ঞা নির্ধারন করা যায় যে, এগুলি হ'ল কার্য করার নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট পদ্ধতিসমূহ যেগুলি ব্যক্তির উপর বহির্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপে সক্ষম।

অনুশীলনী -২

১। নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) ডুর্খাইমের মতে, অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির আদলে সমাজতত্ত্বের গড়ে ওঠা সম্ভব নয়।

(খ) ডুর্খাইমের মতে, জৈব বা অর্থনৈতিক কারণও সামাজিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

(গ) ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঘটনাবলীকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করে।

(ঘ) সামাজিক বস্তুসত্য ব্যক্তিচেতনায় বহির্গত।

(ঙ) ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক বস্তুসত্যকে অন্তর্দর্শনের দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়।

(চ) ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি হ'ল প্রকৃত অর্থে বস্তুসত্য।

(ছ) সামাজিক ঘটনাবলী কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) পদ্ধতিতে বিচরণ করে।

২) শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ

(ক) ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঘটনাগুলি হ'ল নিজস্ব বা অনন্য ধরনের ——।

(খ) সামাজিক বস্তুসত্য ব্যক্তির আচরণের উপর —— বিস্তারে সক্ষম।

(গ) অনেক সমাজতত্ত্ববিদ সমাজতত্ত্বকে ——— বিজ্ঞান হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

(ঘ) ডুর্খাইম বলেছেন যে, সামাজিক ঘটনাবলীকে ——— হিসাবে নয়, অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় বা বস্তুসত্য হিসাবে বুঝতে হবে।

(ঙ) ডুর্খাইমের মতে, সমাজবাস্তবতার সঠিক প্রকাশ —— মধ্যে নয়, —— মধ্যে ঘটে।

৬.৩.২ শ্রমবিভাগ

'দ্য ডিভিসন অব লেবার ইন সোসাইটি' নামক গ্রন্থটিতে ডুর্খাইম ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, সামাজিক ঐক্যের রকমফের, বিভিন্ন ধরনের সমাজব্যবস্থা, সমাজের ঐক্য রক্ষায় ও মূল্যবোধ স্থাপনে আইনের ভূমিকা প্রভৃতি ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। শ্রমবিভাগ হ'ল এই বইটির কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ। ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঐক্যের ভিত্তি হল শ্রমবিভাগ, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা স্থাপন করে শ্রমিবিভাগ সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। শ্রমবিভাগের মাধ্যমে সামাজিক কার্যগুলি সাধিত হয় এবং সামাজিক প্রয়োজন মেটে। শ্রমবিভাগই হল সভ্যতার বনিয়াদ। শ্রমবিভাগ সামাজিক নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত করে। এর মাধ্যমে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে, অসম প্রকৃতির লোকেরা একত্রিত হয় এবং বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ঐক্য সাধিত হয়। বন্ধুত্বের বন্ধনে এবং পারিবারিক সম্পর্কেও শ্রমবিভাগের প্রভাব পড়ে।

ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঐক্য দু'প্রকার— যান্ত্রিক ঐক্য (mechanical solidarity) ও জৈব ঐক্য (organic Solidarity)। যান্ত্রিক ঐক্য হ'ল সাদৃশ্যমূলক ঐক্য। আদিম সমাজে এই ধরনের ঐক্যের দেখা মেলে। ডুর্খাইম বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত এই আদিম সমাজের নাম দিয়েছেন 'খণ্ডিত সমাজ' (segmental society)। এখানে ব্যক্তিরা একই ধরনের মূল্যবোধে বিশ্বাস করে, একই ধরনের আবেগ অনুভব করে। একই ধরনের বস্তুকে পবিত্র জ্ঞান করে এবং মানসিকভাবে নিজেদের মধ্যে সাদৃশ্য অনুভব করে, বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনচর্যায় এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকে না। এখানে বৃত্তি বা পেশাগুলি নির্দিষ্ট না হওয়ার জন্য শ্রমবিভাগ অনুপস্থিত বা নিম্নমাত্রায় উপস্থিত। এখানে জনসম্প্রদায়গুলি পরস্পরের অনুরূপ।

জৈব ঐক্য হ'ল বৈসাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক্য। উন্নত শিল্পনির্ভর আধুনিক সমাজে—যে সমাজকে ডুর্খাইম 'পৃথকীকৃত সমাজ' (differentiated society) বলেছেন—এই ধরনের ঐক্য দেখা যায়। এই সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মানসিক ও নৈতিক সাদৃশ্য কমে যায়, তাদের জীবনচর্যায় পার্থক্য দেখা যায়। ফলত তারা আর একরকম থাকে না, ভিন্ন চরিত্র অর্জন করে। উন্নত সমাজে বৃত্তিগুলি নির্দিষ্ট ও পৃথক হয়ে ওঠে। এখানে উন্নত ও জটিল ধরনের শ্রমবিভাগ সংগঠিত হয়, বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব ঘটে। সমাজের বিভিন্ন অংশের পরস্পর নির্ভরশীলতার উপর জৈব ঐক্য গড়ে ওঠে।

ডুর্খাইম বলেছেন যে, তিনটি সামাজিক উপাদানের দ্বারা শ্রমবিভাগের প্রবর্তন ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই তিনটি উপাদান হ'ল সমাজের আয়তন, সমাজের পার্থিব ঘনত্ব ও সমাজের নৈতিক ঘনত্ব (the volume, the material density and the moral density of the society)। সমাজের আয়তন নির্ভর করে জনসংখ্যার উপর এবং সমাজের পার্থিব ঘনত্ব বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে আপেক্ষিক জনসংখ্যা। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সামাজিক যোগাযোগের তীব্রতাকে ডুর্খাইম সমাজের নৈতিক ঘনত্ব বলেছেন। শহর গড়ে ওঠার সাথে সাথে এবং যাতায়াত ও যোগাযোগের সুযোগ বাড়ার সাথে সাথে জনসংখ্যা বাড়ে। সমাজের ঘনীভনব (conden station) ঘটে এবং তারই সাথে সাথে সামাজিক আদানপ্রদানের তীব্রতা বেড়ে যায়। ফলে শ্রমবিভাগের প্রয়াজন দেখা দেয়।

সমাজের আয়তন ও ঘনত্ব বাড়ার সাথে সাথে যেসব সমস্যার উদ্ভব ঘটে সেগুলি সমাধানের উপায় হিসাবে শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হয়। এ সময়ে বহু লোক এক জায়গায় জড় হয় এবং সীমিত সম্পদের অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। বাঁচার লড়াই তীব্রতর হয়। এসময়ে শ্রমবিভাগ এই প্রতিযোগিতা হেতু উদ্ভূত বিরোধকে নিয়ন্ত্রিত ও স্তিমিত করতে সাহায্য করে। যখন ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হয় তখন বিরোধের সম্ভাবনা কমে। প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে একই উপজীবিকায় নিযুক্ত কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে। শিক্ষকের সাথে ব্যবসায়ীর বিরোধ থাকে না, ডাক্তারের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারের বিরোধ বাধে না, কামারের সাথে রাজমিস্ত্রীর বিরোধ থাকে না। যেহেতু তারা ভিন্ন ভিন্ন পেশায় লিপ্ত থাকে, তাদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হয়। ফলে সামাজিক প্রতিযোগিতার তীব্রতা কমে এবং সামাজিক ঐক্য দৃঢ় হয়। এজন্য ডুর্খাইম বলেছেন যে মানবীয় সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শকে কেবল শ্রমবিভাগের অগ্রগতির সাথে সমানুপাতেই চরিতার্থ করা সম্ভব।

ডুর্খাইম আইনের সামাজিক ভূমিকা এবং বিভিন্ন সমাজে তার বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, আইন দু'ধরনের—দমনমূলক ও সংশোধনমূলক। যান্ত্রিক ঐক্যের উপর নির্ভরশীল আদিম সমাজের দমনমূলক আইনের প্রাধান্য ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল শাস্তিদান করা। কোন সামাজিক বিধির লঙ্ঘন ঘটলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হ'ত। বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই সমাজের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য সুনিশ্চিত করা হ'ত। অন্যদিকে সংশোধনমূলক আইনের উদ্দেশ্য হ'ল একটা ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করা। জৈব ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সমাজে আইন মূলত সংশোধনমূলক। এখানে শ্রমবিভাগের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য সুনিশ্চিত করার উদ্যোগ দেখা যায়। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্য ব্যক্তি এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজের প্রতি আনুগত্য জানায়। ফলে উন্নত সমাজে আইনের নির্মমতা হ্রাস পায়। এখানে যেটুকু বিচ্যুতি ঘটে তা সংশোধনমূলক আইনের প্রয়োগ করে ঠিক করে নেওয়া হয়।

ডুর্খাইম শ্রমবিভাগের দু'ধরনের বিকৃতি রূপের কথা বলেছেন— 'নিঃসঙ্গতাবর্ধক শ্রমবিভাগ' (anomic division of labour) এবং 'বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাগ' (forced division of labour)। শিল্পে অতিরিক্ত বিশেষীকরণ হলে শ্রমিকরা পরিচালন ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। একে নিঃসঙ্গতাবর্ধক শ্রমবিভাগ বলে। আর যখন ব্যক্তিরা নিজেদের প্রবণতা অনুযায়ী জীবিকা বেছে নিতে পারে না, বরং একটি জীবিকায় প্রবেশ করতে বাধ্য হয়, তখন তাকে বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাগ বলা হয়। এতে ব্যক্তির স্বাভাবিক গুণাবলী যোগ্য স্বাকৃতি লাভ করে না এবং ব্যক্তির মর্যাদা তার গুণাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না।

অনুশীলনী - ৩

১) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) ডুর্খাইমের মতে, যান্ত্রিক ঐক্য হ'ল বৈসাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ঐক্য।

(খ) ডুর্খাইমের মতে, খন্ডিত সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনচর্যায় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকে না।

(গ) ডুর্খাইমের মতে, সমাজের পার্থিব ঘনত্ব নির্ভর করে জনসংখ্যার উপর।

(ঘ) ডুর্খাইমের মতে, জৈব ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে আইন মূলত দমনমূলক।

(ঙ) ডুর্খাইমের মতে, নিঃসঙ্গতাবর্ধক শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়।

(২) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

(ক) বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা স্থাপন করে শ্রমবিভাগ সমাজে —— প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে।

(খ) ডুর্খাইম উন্নত শিল্পনির্ভর আধুনিক সমাজের নাম দিয়েছেন —— সমাজ।

(গ) সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সামাজিক যোগাযোগের তীব্রতাকে ডুর্খাইম সমাজের —— —— বলেছেন।

(ঘ) সমাজের আয়তন ও ঘনত্ব বাড়ার সাথে সাথে যেসব সমস্যার উদ্ভব ঘটে সেগুলির সমাধানের উপায় হিসাবে —— প্রবর্তিত হয়।

৬.৩.৩ আত্মহত্যা

ডুর্খাইম তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ 'সুইসাইড'-এ আত্মহত্যা নামক সামাজিক ঘটনার সামাজিক কারণ নির্দেশের চেষ্টা করেছেন। ডুর্খাইম তাঁর পূর্বসূরীদের প্রদত্ত আত্মহত্যার মনস্তাত্ত্বিক, সৌজাত্যবিদ্যাগত (eugenics) জীবতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক তত্ত্বসমূহ খণ্ডন করেন। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনুসারে আত্মহত্যার কারণ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মানসিক প্রবণতা এবং ব্যক্তির ব্যর্থতা-হতাশা-বিষাদবোধ। ডুর্খাইম দেখান যে, ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে স্নায়বিক ব্যাধিগ্রস্ত লোক বা পাগলের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে আত্মহত্যার উদাহরণ বিরল। অতএব মানসিক কারণে আত্মহত্যা ঘটে এই যুক্তি দাঁড়ায় না। ডুর্খাইমের আগে একদল সৌজাত্যবিদ আবার এই ধারণা গড়ে তোলেন যে, আত্মহত্যার প্রবণতা বংশগত। এই মতবাদকেও ডুর্খাইম খণ্ডন করেন। তাঁর দ্বারা সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় যে, আত্মহত্যার হার বয়স্ক লোকেদের মধ্যে বেশি। ডুর্খাইম প্রশ্ন তোলেন যে, আত্মহত্যার প্রবণতা বংশগত হলে বেশি বয়সী লোকেদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি হবে কেন ? বংশগত আত্মহননের প্রবণতা তো কম বয়সেই প্রকাশ পেতে পারে।

বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহপূর্বক ডুর্খাইম আত্মহত্যার প্রবণতার একটি সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে, আত্মহত্যার প্রবণতা বিশেষ সামাজিক পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠে। ডুর্খাইম তিন ধরনের আত্মহত্যার কথা উল্লেখপূর্বক প্রত্যেকটির সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এগুলি হ'ল- (১) আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা (egoistic suicide) (২) পরার্থে আত্মহত্যা (altruistic suicide) এবং (৩) নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা (anomic suicide)।

(১) আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা— এই ধরনের আত্মহত্যা ঘটে গোষ্ঠীর সাথে ব্যক্তির সাযুজ্যের অভাবে। কোন ব্যক্তি যখন অতিরিক্ত পরিমাণে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, যখন গোষ্ঠীর সাথে সে একাত্ম হতে পারে না, যখন সে চারপাশের লোকেদের থেকে মনের দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়, ডুর্খাইম বিভিন্ন ধর্মীয়, পারিবারিক, রাজনৈতিক ও জাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ঐক্যের তারতম্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেই ঐক্যের হারের সাথে আত্মহত্যার হারের হ্রাস-বৃদ্ধির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। যেমন তিনি দেখিয়েছেন যে ক্যথলিক খ্রীষ্টানদের মধ্যে আত্মহত্যার হার প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টানদের থেকে অনেক কম। প্রোটেস্টান্ট ধর্মবিশ্বাসে স্বাধীন চিন্তাকে উৎসাহিত করে, অতিরিক্ত ব্যক্তি স্বাধীনতা দেয়, যৌথভাবে পোষণীয় বিশ্বাস ও পালনীয় আচরণপদ্ধতি সেভাবে গড়ে তোলে না। ক্যাথলিকদের ধর্মবিশ্বাসে কিন্তু ঠিক এর বিপরীত প্রবণতাগুলি লক্ষ্য করা যায়। ডুর্খাইমের মতে, গোষ্ঠীর থেকে ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতার জন্য প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে আত্মহত্যা বেশি ঘটে এবং ঠিক এর বিপরীত কারণে ক্যাথলিকদের মধ্যে আত্মহত্যার হার তুলনামূলকভাবে কম। ডুর্খাইম আরও দেখিয়েছেন যে, অবিবাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে ও ছোট পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আত্মহত্যার

প্রবণতা যথাক্রমে বিবাহিত ব্যক্তিদের ও বড় পরিবারের সদস্যদের থেকে বেশি। ডুর্খাইমের মতে, জীবনের ভার দুর্বহ হলেই লোকে আত্মহত্যা করে না। বরং বিভিন্ন সম্পর্কের বন্ধনজনিত জীবনের গুরুদায়িত্ব যত বাড়ে, আত্মহত্যার প্রবণতাও তত কমে।

(২) **পরার্থে আত্মহত্যা** ঃ এই ধরনের আত্মহত্যা আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। পরার্থে আত্মহত্যার কারণ হ'ল গোষ্ঠীর সাথে ব্যক্তির অধিক মাত্রায় একাত্মতাসাধন। সমাজের আদর্শ ও মূল্যমান এদের মধ্যে এমনভাবে অনুপ্রবেশ করে যে সমাজের প্রয়োজনে এবং সমাজের আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে এরা দরকার হ'লে আত্মহত্যাও করতে পারে। এই পরার্থে আত্মহত্যা সব সময়ই পরের উপকার সাধনের জন্য সংঘটিত নাও হতে পারে, কিন্তু তা সব সময়ই সমাজের নির্দিষ্ট আদর্শ ও মূল্যমান অনুসরণ করতে গিয়ে ঘটে থাকে। ভারতের সতীদাহপ্রথা অথবা রাজার মৃত্যুর পর তার সহচর ও ভৃত্যদের আত্মহত্যার প্রথা হ'ল পরার্থে আত্মহত্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এছাড়াও ডুর্খাইম পরার্থে আত্মহত্যার উদারণ হিসাবে জাপানী হারাকিরি প্রথা, হিন্দু সাধকদের ঈশ্বরলাভের জন্য সমাধিস্থ অবস্থায় আত্মবিসর্জন দেওয়ার প্রথা এবং সেনাদলের আত্মোৎর্গকারী বাহিনীর দ্বারা শত্রুর ক্ষতিসাধন করার জন্য স্বেচ্ছায় আত্মবলিদানের কথা বলেছেন।

(৩) **নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা** ঃ এই ধরনের আত্মহত্যার ঘটনা তখনই বাড়ে যখন হঠাৎ ঘটা সমৃদ্ধি অথবা দুর্যোগের ফলে সামাজিক ভারসাম্যের কোন পরিবর্তন হয়। অর্থনৈতিক দুর্যোগের সময়ে, শিল্পে মন্দা দেখা দিলে, মূল্যবৃদ্ধির সময়ে অথবা অর্থনৈতিক অতি সমৃদ্ধির সময়ে বা শেয়ার বাজারে তেজীভাব দেখা দিলে সমানভাবে নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা ঘটতে পারে। যখন বহু লোকের মাত্রাতিরিক্ত দুর্ভোগ দেখা দেয় তখন এ ধরনের আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ে। আবার যখন কিছু লোকের হাতে অতিরিক্ত পরিমাণে ধনাগম হয় তখনও এধরনের আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের হঠাৎ ঘটা পরিবর্তনের সময়ে সামাজিক নীতিবোধের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমে যায়। মানুষের মনে যখন এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে যে, সামাজিক মূল্যবোধগুলোর আর কোন গুরুত্ব বা তাৎপর্য নেই তখন এই ধরনের আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়তে থাকে। অবস্থা এমন যে, পুরনো নীতিগুলি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে, কিন্তু যুগোপযোগী নতুন নীতিগুলি তখনও গড়ে ওঠেনি। মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অপরিমিতি হয়ে ওঠার ফলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অকার্যকারী হয়ে পড়ে। কিংবা মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত হয় এবং সে তার মনের চাহিদার সাথে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়। ফলে আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ে। আত্মহত্যার কারণ হিসাবে ডুর্খাইম অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের মত পারিবারিক নৈরাজ্যেরও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে বিবাহবিচ্ছিন্ন এবং হঠাৎ বিধবা বা বিপ-ীক হয়ে পড়া ব্যক্তিদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

উপরোক্ত তিন ধরনের আত্মহত্যার বিশ্লেষণের পর ডুর্খাইম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে আত্মহত্যা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় ; নানারকম সামাজিক কারণে লোকে আত্মহত্যা করে। ডুর্খাইম তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে তাঁর আত্মহত্যা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলির বাস্তব সমর্থন খুঁজেছেন এবং তাঁর তত্ত্বকে অনেকটা গ্রহণীয় করে তুলেছেন। ডুর্খাইম বলেছেন, "আত্মহত্যা একটি ব্যক্তিগত বিষয় যার কারণগুলি অবশ্যই সামাজিক।"

অনুশীলনী - ৪

১) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) ডুর্খাইম এর ধারণা সমর্থন করেন যে, আত্মহত্যার কারণ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মানসিক প্রবণতা এবং ব্যক্তির ব্যর্থতা-হতাশা-বিষাদবোধ।

(খ) ডুর্খাইম কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় যে আত্মহত্যার হার বয়স্ক লোকেদের মধ্যে বেশি।

(গ) ডুর্খাইম দেখিয়েছেন যে, ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের মধ্যে আত্মহত্যার হার প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টানদের থেকে কম।

(ঘ) ডুর্খাইমের মতে, জীবনের ভার দুর্বহ হলেই লোকে আত্মহত্যা করে।

(ঙ) ডুর্খাইমের মতে, পরার্থে আত্মহত্যা সব সময়েই পরের উপকার সাধনের জন্য সংঘটিত নাও হতে পারে।

(চ) ডুর্খাইমের মতে, অর্থনৈতিক দুর্যোগের সময়ে অথবা অর্থনৈতিক অতি সমৃদ্ধির সময়ে সমভাবে নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা ঘটতে পারে।

(ছ) ডুর্খাইম তাঁর আত্মহত্যার তত্ত্বকে বিশেষ গ্রহণযোগ্য ভাবে উপস্থাপন করতে পারেননি।

২) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

(ক) পরার্থে আত্মহত্যার একটি উদাহরণ হল জাপানী ——— প্রথা।

(খ) নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যার কারণ হিসাবে ডুর্খাইম অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের মত ——— নৈরাজ্যেরও উল্লেখ করেছেন।

৬.৩.৪ ধর্ম ও সমাজ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের মনে বৈজ্ঞানিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। ফলে সে প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাসগুলিকে সন্দেহের চোখে দেখতে শেখে। যুক্তিবাদী ও সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে ডুর্খাইম বুঝতে পারেন যে, পুরনো ধর্মগুলি বৈজ্ঞানিক চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে সেগুলি আর মানুষকে আকর্ষণ করতে পারছে না। এ কারণে তিনি ধর্মের এক নতুন সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, ''Religion's interest are merely the symbolic forms of social and moral interests.'' (ধর্মীয় আগ্রহের বিষয়গুলি বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক আগ্রহের বিষয়ের প্রতীকরূপে উপস্থাপনা মাত্র)।

ডুর্খাইম তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দ্য এলিমেন্টারি ফর্মস্ অব রিলিজিয়াস লাইফ'-এ ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। 'আরুন্টা' (Arunta) নামক অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের ধর্মীয় আচরণের উপর ভিত্তি করে এই পুস্তক লেখা হয়েছে। ডুর্খাইমের মতে, আদিম মানবগোষ্ঠীর অপরিবর্তিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্লেষণ করলেই ধর্মের সত্যকার প্রকৃতি ও লক্ষ্য বোঝা যায়।

ম্যাক্স হ্বেবারের মতে, প্রকৃতিপূজা বা প্রকৃতির শক্তিগুলির উপাসনা ধর্মের অন্যতম মূল উপজীব্য। ডুর্খাইম এর বিরোধতা করেন। এমনকি তাঁর মতে, ঈশ্বরে বিশ্বাস বা ঈশ্বর উপাসনাও ধর্মের মূল বিষয় নয়। কারণ বৌদ্ধ ধর্মে কনফিউসিয়াস প্রচারিত ধর্মে ঈশ্বর কোন স্থান লাভ করেননি। ডুর্খাইমের মতে, ধর্ম মানবসমাজকে অবলম্বন করেই প্রতিষ্ঠিত।

ডুর্খাইমের মতে, ধর্মের সারমর্ম হ'ল জগতের সমস্ত বিষয়বস্তুকে দু'ভাগে ভাগ করা—পবিত্র (sacred) এবং অপবিত্র (profane)। মানুষের নিত্যকার পার্থিব জীবন অপবিত্র বিষয়বস্তুতে ভরা, পবিত্র বিষয়াদি নিয়ে ধর্মের এলাকা গড়ে ওঠে। এর মধ্যে পড়ে কিছু পবিত্র বস্তু, তৎসংক্রান্ত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি। অপবিত্র যাতে হঠাৎ পবিত্রের এলাকায় ঢুকে না পারে সেজন্য পবিত্রকে আলাদা করে রাখা হয়। যেমন হিন্দুরা বাসি জামাকাপড় পড়ে অস্নাত অবস্থায় সাধারণত ঠাকুর ঘরে ঢোকে না। ধর্মের সংজ্ঞা দিয়ে ডুর্খাইম বলেছেন, ''A religon is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, things set apart and forbidden—beliefs and practices which unite into one single moral community called a church, all those who adhere to them.'' (ধর্ম হ'ল পবিত্র বিষয়াদি সংক্রান্ত, অর্থাৎ আলাদা করে রাখা ও নিষিদ্ধ বিষয়াদি সংক্রান্ত বিশ্বাস ও রীতিনীতির একটি সমন্বিত ব্যবস্থা — যেসব বিশ্বাস ও রীতিনীতি সমস্ত অনুগামীদের ধর্মসম্প্রদায় তথা একটি একক নৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করে)।

ডুর্খাইম টোটেম প্রথার উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের মধ্যে টোমেট প্রথা এই পবিত্র এলাকার সৃষ্টি করে। টোটেম হ'ল গোষ্ঠীপ্রতীক। বিভিন্ন ধরনের বস্তু—যেমন বৃক্ষ বা পশু-পক্ষী, কাঠের টুকরো, পালিশ করা র- ইত্যাদি টোমেট হিসাবে গৃহীত হয়। এই টোমেটগুলিকে পবিত্র বস্তু হিসাবে গণ্য করা হয়। আবার টোটেম প্রথা গোষ্ঠীর সদস্যপদের সাথে সম্পৃক্ত বলে তা আরুনটাদের মধ্যে সমাজবন্ধনেরও সৃষ্টি করে। ডুর্খাইম বলেছেন যে, টোটেম প্রথা কিছু পশু-পক্ষী বা বস্তুনিচয়ের উপাদান নয় বরং এ হ'ল এক ধরনের অনামা ও নৈর্ব্যক্তিক শক্তির উপাসনা, যে শক্তি এইসকল সত্তার প্রত্যেকটিতেই প্রকাশিত হয়, কিন্তু যা এগুলির সাথে অভিন্ন নয়।

ডুর্খাইমের মতে, টোটেম প্রথায় যে অনামা, নৈর্ব্যক্তিক, চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত শক্তির আরাধনা করা হয়—যা মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ হয়েও মানুষের কাছাকাছি, তা হ'ল প্রকৃতপক্ষে সমাজ। ডুর্খাইম বলেছেন যে, সমাজ আমাদের মধ্যে দৈবসত্তার অনুভূতি জাগ্রত করে এবং ধর্মীয় উপাসনার নামে মানুষ চিরকাল সমাজকেই শ্রদ্ধা জানিয়েছে। তাঁর মতে, সমাজের ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশই হ'ল ঈশ্বর।

ডুর্খাইমের মতে, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতীক ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক সত্তা বলবান হয়ে ওঠে। এইসব প্রতীক ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর সাথে একাত্মতা অনুভব করে এবং ধর্ম টিকে থাকে ডুর্খাইমের মতে, তিন ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে- (১) নেতিবাচক, যেগুলি হ'ল আহার ও স্পর্শ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধিনিষেধ ; (২) নরনারীর মিলনসংক্রান্ত, যেগুলির উদ্দেশ্য হ'ল জন্মবৃদ্ধি এবং (৩) মৃত্যুসংক্রান্ত।

ডুর্খাইমের মতে, সমাজ এপর্যন্ত বহু ধর্ম ও দেবতার সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজন মত তা করবে। সমাজ বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের পোষকতা করে। এই সমাজই আবার উল্লাস ও উত্তেজনার মুহূর্তে নতুন ধরনের ধর্মবিশ্বাসের সূচনা করে। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানাদির সময়ে দেখা যায় যে উপাসকরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে একরকম আবেশমগ্ন হয়ে নৃত্যগীতাদি বা অন্যপ্রকার উল্লাস ও উত্তেজনাপূর্ণ কর্মাদি সম্পন্ন করে। এই সময়ে মানুষ তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বাইরে অন্য এক জগতে উপনীত নয়। ডুর্খাইম বলেছেন, আসলে মানুষ এসময়ে গোষ্ঠীর শক্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে ধর্মীয় উৎসবাদিতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই যৌথ ও পবিত্র আবেশ ও মগ্নতার সময়ে অনেক ক্ষেত্রে নতুন দেবতা ও ধর্মের সৃষ্টি হয়। ডুর্খাইম আধুনিক সমাজের ধর্মীয়-নৈতিক দ্বন্দ্বের সমাধানের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ধর্ম সমাজের অপ্রত্যক্ষ উপাসনা মাত্র। অতএব যারা কোন বহির্গত নৈতিক শক্তির উপর আস্থাসীল তারা কোন ভ্রমের শিকার একথা বলা বিষয়টির অতি সরলীকরণ মাত্র। ডুর্খাইম এদের সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য বলে গণ্য করেছেন। সামাজিক ঐক্যের সৃজন, বলবৃদ্ধি ও সংরক্ষণ ধর্মের মূল কাজ। ডুর্খাইমের মতে, "Divinity is merely society transfigured and symbolically conceived." ("দৈবসত্তা হ'ল রূপান্তরিত ও প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপিত সমাজই।") যে সকল দেবতাদের মানুষ যৌথভাবে উপাসনা করে তারা হ'ল সমাজের বিভিন্ন শক্তির প্রতীকরূপ মাত্র। অতএব ঐতিহ্যপূর্ণ ধর্মের বিলোপে সমাজের তেমন কোন অসুবিধা হবে না। বরং মানুষকে স্পষ্টভাবে সমাজের উপর তার নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করতে হবে যেটা সে আগে অস্পষ্টভাবে ধর্মের মাধ্যমে উপলব্ধি করত। শুধু সমাজের পবিত্র প্রতীকীকরণের প্রতিই— যেমন জাতীয় পতাকা বা জাতীয় সঙ্গীত—আধুনিক মানুষ শ্রদ্ধা জানাবে, কোন দৈবসত্তার প্রতি নয়। ডুর্খাইম এও বলেছেন যে, আমাদের ঈশ্বর ও সমাজের মধ্যে বেছে নিতে হবে।

অনুশীলনা - ৫

(১) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) ডুর্খাইমের মতে, আদিম মানবগোষ্ঠীর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্লেষণ করে আধুনিক কালে ধর্মের স্বরূপ বোঝা যায় না।

(খ) ডুর্খাইমের মতে, ঈশ্বরে বিশ্বাসও ধর্মের মূল বিষয় নয়।

(গ) ডুর্খাইমের মতে, ঈশ্বর হচ্ছেন সমাজের ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশ।

২) শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ—

(ক) ডুর্খাইম তাঁর 'দ্য এলিমেন্টারি ফর্মস্ অব রিলিজিয়াস লাইফ' লেখেন '———' নামক অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের ধর্মীয় আচরণকে ভিত্তি করে।

(খ) ম্যাক্স হ্বেবারের মতে, ——— ধর্মের মূল উপজীব্য।

(গ) ডুর্খাইমের মতে, ধর্মের সারমর্ম হ'ল জগতের সমস্ত বিষয়বস্তুকে ——— ও ——— এই দু'ভাগে ভাগ করা।

(ঘ) টোটেম হ'ল———।

(ঙ) ডুর্খাইমের মতে, তিন ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে — (১) নেতিচাবক ; (২) নরনারীর মিলনসংক্রান্ত এবং (৩) ———।

(চ) ডুর্খাইমের মতে, সমাজ এপর্যন্ত বহু ধর্ম ও ——— -র সৃষ্টি করেছে।

৬.৪ সারাংশ

ডুর্খাইমের মতে, বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের উপযুক্ত পঠনীয় বিষয় হ'ল সামাজিক বস্তুসত্য বা সামাজিক ঘটনা। এগুলি হ'ল নিজস্ব বা অনন্য ধরনের বাস্তবতা। সামাজিক বস্তুসত্যকে একমাত্র সামাজিক কারণ দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় ; মনস্তাত্ত্বিক, জৈব বা অর্থনৈতিক কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় ন। ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঘটনাবলীকে বিষয়গত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পদার্থ বা বস্তু হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, যা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে একই রূপে প্রতিভাত হয়। এটাই হ'ল সামাজিক বস্তুসত্য। সামাজিক বস্তুসত্যের দু'টি নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য আছে— (১) সামাজিক বস্তুসত্য ব্যক্তিচেতনার বহির্গত, এবং (২) সামাজিক বস্তুসত্য ব্যক্তির আচরণের উপর বাধ্যবাধকতা বিস্তারে সক্ষম। বিভিন্ন বহির্গত ও দৃষ্টিগোচর সামাজিক বিষয়গুলিকে পর্যবেক্ষণ করে সামাজিক ঘটনাবলীর ধারণা লাভ করা সম্ভব। সামাজিক প্রতিষ্ঠাগুলি হ'ল প্রকৃত অর্থে বস্তুসত্য, কারণ তারা ব্যক্তির অস্তিত্বের বাইরে বিরাজ করে এবং যারা এই প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক ঘটনাবলীকে ধারণা হিসাবে নয়, অভিজ্ঞতালবদ্ধ বিষয় বা বস্তুসত্য হিসাবে বুঝতে হবে। সামাজিক ঘটনাবলীর প্রভাব বাইরের থেকে ব্যক্তির উপর আরোপিত হয়। তবুও ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঘটনাবলী, বিশেষতঃ নৈতিক বিধিগুলি তখনই সত্যকারের কার্যকরী হয় যখন তারা ব্যক্তি, নিরপেক্ষভাবে বিরাজ করলেও ব্যক্তি তাদের নিজের চেতনার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ডুর্খাইমের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সামাজিক বস্তুসত্য হ'ল কার্য করার নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট পদ্ধতি যেগুলি ব্যক্তির উপর বহির্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপে সক্ষম। ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঐক্যের ভিত্তি হ'ল শ্রমবিভাগ। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা স্থাপন করে শ্রমবিভাগ সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। ডুর্খাইম দু'ধরনের সামাজিক ঐক্যের কথা বলেছেন—যান্ত্রিক ঐক্য

ও জৈব ঐক্য। যান্ত্রিক ঐক্য হ'ল সাদৃশ্যমূলক ঐক্য। আদিম সমাজে ব 'খণ্ডিত সমাজে' এই ধরনের ঐক্যের দেখা মেলে। জৈব ঐক্য হ'ল বৈসাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ঐক্য। আধুনিক সমাজে ব্য 'পৃথকীকৃত সমাজে' এই ধরেনর ঐক্য দেখা যায়। উন্নত সমাজে বৃত্তিগুলি নির্দিষ্ট ও পৃথক হয়ে যায় বলে এখানে শ্রমবিভাগ সংঘটিত হয় এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে জৈব ঐক্য গড়ে ওঠে। সমাজের আয়তন বা জনসংখ্যা, সমাজের পার্থিব ঘনত্ব বা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে আপেক্ষিক জনসংখ্যা এবং সমাজের নৈতিক ঘনত্ব বা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সামাজিক যোগাযোগের তীব্রতার দ্বারা শ্রমবিভাগের প্রবর্তনকে ব্যাখ্যা করা যায়। শহর গড়ে ওঠার সাথে সাথে জনসংখ্যা বাড়ে এবং সামাজিক আদানপ্রদানের তীব্রতাও বেড়ে যায়। এসময়ে বহু লোক সীমিত সম্পদের অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। এই সমস্যার সমাধানের উপায় হিসাবে শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হয়। যখন ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হয়, তখন সবার সাথে সবার প্রতিযোগিতা বাধে না। তা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে একই উপজীবিকায় নিযুক্ত কিছু ব্যক্তির মধ্যে। ফলে প্রতিযোগিতার তীব্রতা কমে এবং সামাজিক ঐক্য দৃঢ় হয়। ডুর্খাইমের মতে, আদিম সমাজে দমনমূলক আইনের প্রাধান্য ছিল। বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই এখানে সমাজের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য সুনিশ্চিত করা হ'ত। কিন্তু আধুনিক সমাজে আইন মূলত সংশোধনমূলক। এখানে শ্রমবিভাগের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য সুনিশ্চিত হয়েছে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্য ব্যক্তি এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজের প্রতি আনুগত্য জানায়। ফলে উন্নত সমাজের আইনের নির্মমতা হ্রাস পায়। ডুর্খাইম শ্রমবিভাগের দু'ধরনের বিকৃত রূপের কথাও বলেছেন—নিঃসঙ্গতাবর্ধক শ্রমবিভাগ এবং বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাগ।

আত্মহত্যার আলোচনায় ডুর্খাইম তাঁর পূর্বসূরীদের প্রদত্ত আত্মহত্যার মনস্তাত্ত্বিক, সৌজাত্যবিদ্যাগত, জীবতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক তত্ত্বসমূহ খণ্ডন করেন। ডুর্খাইম দেখান যে, মানসিক কারণে বা বংশগত প্রবণতা অনুযায়ী লোকে আত্মহত্যা করে না। ডুর্খাইমের মতে, আত্মহত্যার প্রবণতা বিশেষ সামাজিক পরিমণ্ডলীতে গড়ে ওঠে। তিনি তিন ধরনের আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করে প্রত্যেকটির সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এগুলি হ'ল আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা, পরার্থে আত্মহত্যা ও নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা। যখন কোন ব্যক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে এবং গোষ্ঠীর সাথে একাত্ম হতে পারে না তখন তাঁর মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়। একে ডুর্খাইম আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা বলেছেন। ডুর্খাইম দেখিয়েছেন যে, ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মাচরণগত পার্থক্যের কারণে পোটেস্টান্ট খ্রীষ্টানদের মধ্যে গোষ্ঠীর থেকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার হার ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের থেকে বেশি। ফলে প্রোটেস্টান্টরা বেশি পরিমাণে এবং তুলনামূলকভাবে ক্যাথলিকরা কম পরিমাণে আত্মহত্যা করে। পরার্থে আত্মহত্যার কারণ আবার হল গোষ্ঠীর সাথে ব্যক্তির অতিরিক্ত মাত্রায় একাত্মতাসাধন। সমাজের আদর্শ এদের মধ্যে এমনভাবে প্রবিষ্ট হয় যে সমাজের আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে এরা দরকার হলে আত্মহত্যাও করতে পারে। ভারতের সতীদাহ প্রথা অথবা রাজার মৃত্যুর পর তার সহচর ও ভৃত্যদের আত্মহত্যার প্রথা হ'ল পরার্থে আত্মহত্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ে হঠাৎ ঘটা সমৃদ্ধি অথবা দুর্যোগের সময়ে। অর্থনৈতিক দুর্যোগের সময়ে, শিল্পে মন্দ দেখা দিলে, মূল্যবৃদ্ধির সময়ে অথবা অর্থনৈতিক অতিসমৃদ্ধির সময়ে বা শেয়ার বাজারে তেজীভাব দেখা দিলে সমভাবে এধরনের আত্মহত্যা ঘটতে পারে। এইসব হঠাৎ ঘটা পরিবর্তনের সময়ে সামাজিক নীতিগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ে। উপরোক্ত তিন ধরনের আত্মহত্যার বিশ্লেষণের পর ডুর্খাইম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আত্মহত্যা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় ; নানারকম সামাজিক কারণে লোকে আত্মহত্যা করে।

যুক্তিবাদী ও সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে ডুর্খাইম বুঝতে পারেন যে, পুরনো ধর্মগুলি বৈজ্ঞানিক চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে সেগুলি আর মানুষকে আকর্ষণ করতে পারছে না। একারণে তিনি ধর্মের এক নতুন সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন যে, ধর্মীয় আগ্রহের বিষয়গুলি বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক আগ্রহের বিষয়ের প্রতীকরূপে উপস্থাপনা মাত্র। 'আরুন্টা' নামক অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের ধর্মীয় আচরণের উপর ভিত্তি করে ডুর্খাইম ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে, প্রকৃতিপূজা বা এমনকি ঈশ্বর উপাসনাও ধর্মের মূল কথা নয়। তিনি বলেন যে, ধর্মের সারমর্ম হ'ল জগতের সমস্ত বিষয়বস্তুকে পবিত্র ও অপবিত্র—এই দু'ভাগে ভাগ করা। মানুষের নিত্যকার পার্থিব জীবন অপবিত্র বিষয়বস্তুতে ভরা। পবিত্র বিষয়াদি—যার মধ্যে পড়ে কিছু পবিত্র বস্তু, তৎসংক্রান্ত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি এবং যেগুলিকে অপবিত্রের সংস্পর্শ থেকে আলাদা করে রাখা হয়—নিয়ে ধর্মের এলাকা গড়ে ওঠে। ডুর্খাইমের মতে, অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের মধ্যে টোটেম প্রথা এই পবিত্র এলাকার সৃষ্টি করে। টোটেম হ'ল গোষ্ঠীপ্রতীক। বৃক্ষ বা পশু-পক্ষী, কাঠের টুকরো, পালিশ করা র- ইত্যাদি টোটেম হিসাবে গৃহীত হয়। ডুর্খাইমের মতে, কিন্তু টোটেম প্রথা হ'ল এক অনামা ও নৈর্ব্যক্তিক শক্তির উপাসনা যা এইসকল বস্তু বা সত্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হলেও এগুলির সাথে অভিন্ন নয়। এই শক্তি হ'ল প্রকৃতপক্ষে সমাজ। সমাজের ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশই হ'ল ঈশ্বর। ডুর্খাইমের মতে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতীক ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর সাথে অভিন্নতা অনুভব করে। ডুর্খাইমের মতে সমাজ এপর্যন্ত বহু ধর্ম ও দেবতার সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজনমত তা করবে। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানাদির সময়ে দেখা যায় যে, উপাসকরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে এক প্রকার আবেশমগ্ন হয়ে নৃত্যগীতাদি বা অন্যান্য উল্লাস ও উত্তেজনাপূর্ণ কর্মাদি সম্পন্ন করে। ডুর্খাইমের মতে, আসলে মানুষ এ সময়ে গোষ্ঠীর শক্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে ধর্মীয় উৎসবাদিতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ধর্ম সমাজের অপ্রত্যক্ষ উপাসনা মাত্র। সামাজিক ঐক্যের সৃজন, বলবৃদ্ধি ও সংরক্ষণ হ'ল ধর্মের মূল কাজ। অতএব, ডুর্খাইমের মতে, ঐতিহ্যপূর্ণ ধর্মের বিলোপে সমাজের তেমন কোন অসুবিধা হবে না। বরং মানুষকে স্পষ্টভাবে সমাজের উপর তার নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করতে হবে যেটা যে আগে অস্পষ্টভাবে ধর্মের মাধ্যমে উপলব্ধি করত। শুধু সমাজের পবিত্র প্রতীকীকরণের প্রতিই আধুনিক মানুষ শ্রদ্ধা জানাবে, কোন দৈবসত্তার প্রতি নয়।

৬.৫ অনুশীলনী

১) শ্রমবিভাগ সমাজে কি কার্যসাধন করে। দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২) যান্ত্রিক ঐক্য ও জৈব ঐক্য কি কি ধরনের সমাজে দেখা যায়? দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৩) যে তিনটি সামাজিক উপাদান দ্বারা শ্রমবিভাগের প্রবর্তনকে ডুর্খাইম ব্যাখ্যা করেছেন, সেগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করুন। একশোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৪) ডুর্খাইমের অনুকরণে দু'ধরনের আইন নিয়ে আলোচনা করুন। দেড়শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৫) শ্রমবিভাগের দু'ধরনের বিকৃত রূপের সম্বন্ধে আলোচনা করুন। একশোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৬) ডুর্খাইম কিভাবে তাঁর পুর্বসূরীদের প্রদত্ত আত্মহত্যার বিভিন্ন ব্যাখ্যাসমূহ খন্ডন করেছেন? একশোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৭) আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা সম্বন্ধে আলোচনা করুন। দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৮) পরার্থে আত্মহত্যা সম্বন্ধে আলোচনা করুন। দেড়শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৯) নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা সম্বন্ধে আলোচনা করুন। দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১০) আত্মহত্যা সম্বন্ধে ডুর্খাইমের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত কি? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১১) ডুর্খাইম কেন ধর্মের এক নতুন সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে উদ্যত হন? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১২) ডুর্খাইম ধর্মের সারমর্ম বিষয়ক কি কি তত্ত্ব নাকচ করেন? ডুর্খাইমের মতে ধর্মের সারমর্ম কি? দেড়শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১৩) টোটেম প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করুন। একশোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১৪) ডুর্খাইমের মতে, সমাজ কিভাবে ধর্ম ও দেবতার সৃষ্টি করে? একশোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১৫) ডুর্খাইম কিভাবে তাঁর ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে আধুনিক সমাজের ধর্মীয় নৈতিক দ্বন্দ্বের সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন? দেড়শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১৬) 'সামাজিক বস্তুসত্য' বলতে ডুর্খাইম কি বুঝিয়েছেন? দেড়শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১৭) সামাজিক বস্তুসত্যের কোন দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা ডুর্খাইম বলেছেন। একশোটি শব্দের মধ্যে উত্তরর দিন?

৬.৬ উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

১। (ক) বোরদো
(খ) গবেষণাপত্র
(গ) 'L' Annee Sociologique
(ঘ) শিক্ষা
(ঙ) দ্য এলিমেন্টারি ফর্মস্ অব রিলিজিয়াস লাইফ

অনুশীলনী -২

১) (ক) ×
(খ) ✓
(গ) ×
(ঘ) ×
(ঙ) ✓

২) (ক) ঐক্য

(খ) পৃথকীকৃত

(গ) নৈতিক ঘনত্ব

(ঘ) শ্রমবিভাগ

অনুশীলনী - ৩

১) (ক) ×

(খ) ✓

(গ) ×

(ঘ) ✓

(ঙ) ×

(চ) ✓

(ছ) ×

২) (ক) বাস্তবতা

(খ) বাধ্যবাধকতা

(গ) প্রতিষ্ঠানসমূহের

(ঘ) ধারণা

(ঙ) ব্যক্তির গোষ্ঠীর

অনুশীলনী - ৪

১) (ক) ×

(খ) ✓

(গ) ✓

(ঘ) ×

(ঙ) ✓

(চ) ✓

(ছ) ×

২) (ক) হারাকিরি

(খ) পারিবারিক

অনুশীলনী - ৫

১) (ক) ×

(খ) ✓

(গ) ✓

২) (ক) আরুন্টা

(খ) প্রকৃতিপূজা

(গ) পবিত্র অপবিত্র

(ঘ) গোষ্ঠীপ্রতীক

(ঙ) মৃত্যুসংক্রান্ত

(চ) দেবতা

অনশীলনী

১) ৬.৩.২ অংশের প্রথম ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ দুটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) শ্রমবিভাগের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্যপ্রতিষ্ঠা।

(খ) শ্রমবিভাগের দরুন প্রতিযোগিতা হেতু উদ্ভূত বিরোধের হ্রাস।

২) ৬.৩.২ অংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ দুটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) যান্ত্রিক ঐক্যভিত্তিক খণ্ডিত সমাজের বিবরণ

(খ) জৈব ঐক্যভিত্তিক পৃথকীকৃত সমাজের বিবরণ।

৩) ৬.৩.২ অংশের চতুর্থ পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) সমাজের আয়তন

(খ) সমাজের পার্থিব ঘনত্ব

(গ) সমাজের নৈতিক ঘনত্ব

(ঘ) নগরায়ন ও সমাজের ঘনীভবন

৪) ৬.৩.২ অংশের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) আদিম সমাজ ও দমনমূলক আইন

(খ) উন্নত সমাজ ও সংশোধনমূলক আইন

৫) ৬.৩.২ অংশের শেষ পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) নিঃসঙ্গতাবর্ধক শ্রমবিভাগ

(খ) বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাগ

৬) ৬.৩.৩ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) ডুর্খাইমের পূর্বে আত্মহত্যার বিভিন্ন ব্যাখ্যা

(খ) ডুর্খাইম কর্তৃক আত্মহত্যার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা খণ্ডন

(গ) ডুর্খাইম কর্তৃক আত্মহত্যার বংশভিত্তিক ব্যাখ্যা খণ্ডন

৭) ৬.৩.৩ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) আত্মকেন্দ্রিক আত্মহ্যাতর সংজ্ঞা ও সাধারণ আলোচনা

(খ) ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ও প্রোটেস্টান খ্রীষ্টানদের তুলনা

(গ) পারিবারিক তারতম্য

(ঘ) আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ

৮) ৬.৩.৩. অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) পরার্থে আত্মহত্যার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

(খ) পরার্থে আত্মহত্যার উদাহরণ।

৯) ৬.৩.৩ অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

(খ) সামাজিক নীতির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হ্রাসের ফল

(গ) অর্থনৈতিক ও পারিবারিক নৈরাজ্য।

১০) ৬.৩.৩ অধ্যায়ের সর্বশেষ পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) আত্মহত্যা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সামাজিক ব্যাপার।

১১) ৬.৩.৪ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) পুরনো ধর্মগুলির সাথে নতুন বৈজ্ঞানিক চেতনার অসামঞ্জস্য।

১২) ৬.৩.৪ অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ দুটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) ম্যাক্স হ্বেবারের মতের খণ্ডন

(খ) ঈশ্বর উপাসনাও ধর্মের মূল কথা নয়

(গ) ধর্মের সারমর্ম-পবিত্র ও অপবিত্রতে সবকিছুর বিভাগ

(ঘ) ডুর্খাইম প্রদত্ত ধর্মের সংজ্ঞা

১৩) ৬.৩.৪ অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ দুটি দেখুন। আপনার উত্তেরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) টোটেমের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

(খ) টোটেমের সত্যকার তাৎপর্য

১৪) ৬.৩.৪ অধ্যায়ের অষ্টম পরিচ্ছেদ দুটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) সমাজ কর্তৃক প্রয়োজনানুসারে ধর্ম ও দেবতার সৃষ্টি

(খ) ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানাদির সময়ে উল্লাস ও উত্তেজনা এবং তার প্রকৃত তাৎপর্য।

১৫) ৬.৩.৪ অধ্যায়ের সর্বশেষ পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) ধর্ম সমাজের অপ্রত্যক্ষ উপাসনা এবং সমাজের ঐক্যবৃদ্ধিকারক

(খ) ধার্মিকরা সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য

(গ) কিন্তু বর্তমানে শুধু সমাজের প্রতি ব্যক্তির শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বাঞ্ছনীয়।

১৬) ৬.৩.১ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তর নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) সামাজিক ঘটনাগুলি নিজস্ব ধরনের বাস্তবতা। এগুলির বিশেষ কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য আছে।

(খ) সামাজিক ঘটনাকে একমাত্র সামাজিক কারণ দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়।

(গ) সামাজিক ঘটনাবলীকে বস্তু হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, বিভিন্ন সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিষয়ীগত ধারণা দূর করতে হবে। এটাই সামাজিক বস্তুসত্য।

১৭) ৬.৩.১ অধ্যায়ের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) সামাজিক বস্তুসত্য ব্যক্তি-চেতনার বহির্গত

(খ) সামাজিক বস্তুসত্য ব্যক্তির আচরণের উপর বাধ্যবাধকতা বিস্তারে সক্ষম।

৬.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১) Raymond Aron : *Main Currents in Sociological Thought [Vol.III]* (1965)

২) Lewis A. Coser : *Masters of Sociological Thought* (1996)

৩) Timothy Raison (ed.) : *The Founding Fathers of Social Science* (1929)

৪) Francis Abraham & John Henry Morgan : *Sociological Thought* (1985)

একক ৭ ❐ ম্যাক্স হ্বেবার এবং ভিলফ্রেডো প্যারেটো

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য
৭.২ প্রস্তাবনা
৭.৩ ম্যাক্স হ্বেবার ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী
৭.৩.১ সামাজিক ক্রিয়া
৭.৩.২ আদর্শরূপ
৭.৩.৩ প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিবোধ ও পুঁজিবাদী উদ্যোগ
৭.৩.৪ আমলাতন্ত্র
৭.৪ ভিলফ্রেডো প্যারেটো ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী
৭.৪.১ যৌক্তিক ও অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ
৭.৪.২ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের চক্রাকারে আবর্তন
৭.৪.৩ অবশেষ ও ব্যুৎপত্তিসমূহ
৭.৫ সারাংশ
৭.৬ অনুশীলনী
৭.৭ উত্তরমালা
৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৭.১ উদ্দেশ্য

ফ্রান্সিস আব্রাহাম ও জেন হেনরি মর্গ্যান মন্তব্য করেছেন, "ম্যাক্স হ্বেবারকে কখনও কখনও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সমাজতত্ত্ববিদ বলে মনে করা হয় এবং বস্তুত সমাজতত্ত্বের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে তিনি তাঁর অনপনেয়প্রভাব বিস্তার করেননি।" ডুর্খাইমের সাথে সাথেই সমাজতত্ত্বের আধুনিক ধরন গড়ে তোলার গৌরব হ্বেবারেরই প্রাপ্য। বর্তমান এককটি পাঠ করলে এই বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ তথা আধুনিক ধরনের সমাজতত্ত্বের অন্যতম হোতা হ্বেবারের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা সম্পর্কে কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। আধুনিক সমাজতত্ত্বে যান্ত্রিক চিন্তাধারার সূত্রপাত করেন ভিলফ্রেডো প্যারেটো। তিনি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন এবং মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত নৈরাশ্যবাদী ধারণা পোষণ করতেন। বর্তমান এককটি থেকে পাঠক প্যারেটোর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারাও কিছুটা পরিচয় লাভ করবেন। প্যারেটোর তত্ত্বাবলী থেকেই ইটালীয় ফ্যাসিবাদের আদর্শ উদ্ভূত হয়। মার্ক্সীয় চিন্তাধারার প্রতি হ্বেবারের আংশিক সহানুভূতি থাকলেও মার্ক্সীয় দর্শনের প্রতি হ্বেবারের বিরোধিতাও ছিল তীব্র। অ্যালবার্ট স্যালোমন মন্তব্য করেছেন, 'কার্ল মার্ক্সের প্রেতাত্মার সাথে এক দীর্ঘ ও প্রগাঢ় কথোপকথন চালাতে গিয়ে ম্যাক্স হ্বেবার সমাজতত্ত্ববিদ হয়ে ওঠেন।' অতএব যুগপৎ হ্বেপার ও প্যারেটোর চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হলে পাঠক মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বের ঠিক বিপরীত সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা লাভ করবেন।

৭.২ প্রস্তাবনা

ডুর্খাইম সমাজতত্ত্বের যে আধুনিক ধাঁচ গড়ে তোলেন হ্বেবার তাকে আরও সংগঠিত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। বর্তমান এককে হ্বেবার-কৃত সামাজিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ আলোচিত হয়েছে। ডুর্খাইম সমাজতত্ত্বে নৈর্ব্যক্তিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জের দেন। অপরদিকে হ্বেরা সামাজিক ক্রিয়ার বিষয়ীগত (subjective) অনুধাবনের উপর বেশি গুরুত্ব দেন। এছাড়া বর্তমান এককে হ্বেবার প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টীয় নীতিবোধের বিকাশের সাথে ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের যে সম্পর্ক প্রতিপন্ন করেছিলেন তাও আলোচিত হয়েছে। মার্ক্স যেখানে মূলত সামাজিক উপরিকাঠামোর উপর অর্থনৈতিক ভিত্তি বা উৎপাদন ব্যবস্থার প্রভাব আলোচনা করেছেন, সেখানে হ্বেবার এক বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে অর্থনীতির উপর ধর্মের প্রভাব আলোচনা করেছেন। এছাড়াও বর্তমান এককে প্যারেটো যৌক্তিক ও অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে পার্থক্য তুলে ধরেন তাও আলোচিত হয়েছে। হ্বেবার এবং প্যারোটো উভয়েই মানবীয় আচরণকে ব্যাখ্যা করলেও প্যারেটোর মতে, মানুষের আচরণে যুক্তি অপেক্ষা ভাবাবেগ, অনুভূতি, কুসংস্কার ও অন্যান্য অযৌক্তিক উপাদানের প্রাধান্য বেশি। সর্বশেষে বর্তমান এককে প্যারেটোকৃত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের আবর্তনের তত্ত্ব (theory of circulation of elites) আলোচিত হয়েছে। প্যারেটো-কৃত রাজনৈতিক ও সমাজিক পরিবর্তনের এই তত্ত্ব চক্রাকার (circular) পরিবর্তনের কথা বলে, যা মার্ক্স-কৃত একমুখী (unilinear) পরিবর্তনের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

৭.৩ ম্যাক্স হ্বেবার ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী

ম্যাক্স হ্বেবারের জীবৎকাল হ'ল ১৮৬৪ সাল থেকে ১৯২০ সাল অবধি। বার্লিনে তাঁদের পরিবারে অতিথি হিসাবে আগত জার্মানীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীর সাথে বাল্যকাল থেকে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে। তিনি ভাষা, চিরায়ত সাহিত্য (classics) ও ইতিহাসে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করে আইন অধ্যয়ন করতে থাকেন। ১৮৮৯ সালে তিনি মধ্যযুগীয় বাণিজ্যিক আইনে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন এবং আইনগত ইতিহাসে বিশেষজ্ঞের স্বীকৃতি অর্জন করেন। কিছুদিন পরে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক নিযুত হন। তিনি ১৮৯৪ সালে ফ্রাইবাগ বিশ্বদ্যিালয়ে অর্থনীতির প্রফেসর হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৬ সালে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একই পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন ১৮৯৭ সাল থেকে পাঁচ বছর আর কোনরকম বৌদ্ধিক বা পেশাগত কাজকর্ম করতে পারেননি। এরপরেও তিনি আর আগের মত পুরোপুরি পেশাগাত জীবনে ফিরে যেতে পারেন নি। তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে অসংযুক্ত একজন বেসরকারী বুদ্ধিজীবী হিসাবে হাইডেলবার্গে বসবাস করতে থাকেন। ১৯০৩ সালে তিনি বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা Archir Fur Social wissenschaft Und Sozialpolitik-এর অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি ভাইমার সংবিধানের খসড়া প্রস্তুতকারী কমিশনের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেন। টনিজ ও সিমেলের সাথে একযোগে ১৯১০ সালে তিনি 'জার্মান সোসিওলজিকাল সোসাইটি গঠন করেন। ধর্মের সমাজতত্ত্বের উপর তাঁর গবেষণার বিষয়ে তিনি ১৯১৯ সালে ভিয়েনা ও মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু সময়ব্যাপী বক্তৃতা দেন। মাত্র ৫৬ বছর বয়সে হ্বেবার মারা গেলেও এই স্বল্প জীবনসীমার মধ্যে সমাজতত্ত্বে তাঁর অবদান উজ্জ্বল হয়ে আছে।

হ্বেবারের কয়েকটি বিখ্যাত রচনার নাম নিচে সন্নিবিষ্ট হ'ল ঃ—

১) দ্য রিলিজিয়ন অব ইন্ডিয়া

২) 'দ্য মেথডলজি অব দ্য সোস্যাল সায়েন্সেস

৩) 'দ্য থিওরি অব সোস্যাল অ্যান্ড ইকনমিক অরগ্যানাইজেসন

৪) কালেক্টেড ওয়ার্কস্ ইন সোসিওলজি অ্যান্ড সোস্যাল পলিটিক্স

৫) জেনারেল ইকনমিক হিস্ট্রি

৬) দ্য প্রোটেস্টান্ট এথিক অ্যান্ড দ্য স্পিরিট অব ক্যাপিটালিজম

অনুশীলনী - ১

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

ক) হ্বেবার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে —— -এর অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

খ) হ্বেবার ১৯০৩ সালে Archir Fur Socialwissencschaft Und Soziapolitik-এর —— —— নিযুক্ত হন।

গ) —— ও সিমেলের সাথে একযোগে হ্বেবার ১৯১০ সালে 'জার্মান সোসিওলজিকাল সোসাইটি' গঠন করেন।

ঘ) ওয়েমার সংবিধানের খসড়া প্রস্তুতকারী কমিশনের ——— হিসাবে হ্বেবার কাজ করেন।

ঙ) ধর্মের সমাজতত্ত্বের উপর তাঁর গবেষণার বিষয়ে হ্বেবার ১৯১৯ সালে —— ও মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু সময়ব্যাপী বক্তৃতা দেন।

৭.৩.১ সামাজিক ক্রিয়া

হ্বেবার বিশ্বাস করতেন যে মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও সামাজিক সম্পর্কগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। কিন্তু সমাজতত্ত্বকে ঠিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত বলে তিনি ভাবতেন না। বরং তাঁর মতে, ইতিহাসের মত সমাজবিজ্ঞানগুলির সাথে — যেগুলি মানুষের ক্রিয়াকলাপের তাৎপর্য ব্যক্তিসাপেক্ষ (subjective) ভাবে বোঝার চেষ্টা করে — সমাজতত্ত্বের বেশি মিল আছে। তাঁর মতে, সমাজতত্ত্ব হ'ল এমন "একটি বিজ্ঞান যেটি সামাজিক ক্রিয়ার মর্মগ্রহণমূলক অনুধাবনের চেষ্টা করে যাতে এই সামাজিক ক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি ও ফলাফলসমূহের একটি কার্যকারণ সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় পৌঁছানো যায়।"

হ্বেবার সামাজিক ক্রিয়ার মর্মগ্রহণের জন্য 'সহানুভূতিমূলক ও বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর্দর্শন' বিশেষ দরকার বলে মনে করতেন। অর্থাৎ সমাজতত্ত্ববিদকে সামাজিক ক্রিয়া সঠিকভাবে বুঝতে গেলে কল্পনায় নিজেকে ক্রিয়ারত ব্যক্তি (actor)-র জায়গায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করতে হবে যে সেই ক্রিয়ারত ব্যক্তির জায়গায় সে নিজে থাকলে কি কারণে এবং কিভাবে কাজটি করত। এইরকম সহানুভূতিপূর্ণ ও অন্তর্দর্শনমূলক মর্মগ্রহণের পদ্ধতিকে বোঝানোর জন্য হ্বেবার 'ফের্স্তেহেন' ('Verstehen') শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

ম্যাক্স হ্বেবারের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে ম্যাকাইভার বলেছেন যে, প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি বাইরের থেকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই বোঝা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিভাবে তরল জিনিস জমে যায়, উল্কাপাত কেন হয় অথবা চন্দ্রের থেকে

পৃথিবীর নিদিষ্ট দূরত্ব কিভাবে রক্ষিত হয় তা আমরা বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারি। কিন্তু সামাজিক ঘটনাগুলিকে বুঝতে গেলে সেগুলির মর্মগ্রহণ করা দরকার। কেন একটি আদিম জনগোষ্ঠী গাছ-পাথরকে পূজা করে, কেন জন্মহার কমে যায়, কিভাবে দ্রব্যের দাম ঠিক হয় বা কি কারণে একটি সরকারের পতন ঘটে— সেগুলি বুঝতে গেলে আরও তলিয়ে দেখা দরকার। আমরা এসব ঘটনাকে কিছুটা অন্তর দিয়ে বুঝি। এগুলি ঠিকমত অনুধাবন করার জন্য নিজেকে সেই অবস্থায় প্রক্ষেপ (project) করা দরকার। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ঘটনাবলী কেবল তথ্য বলে সেগুলিকে উপযুক্ত সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু যেসব সামাজিক ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে সেগুলির পিছনে অনেক অকথিত কাহিনী থাকে। সেই ঘটনাগুলি যারা ঘটাচ্ছে তাদের মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও আশাকে না বুঝে ঘটনাগুলি আমরা বুঝতে পারব না। ম্যাকাইভারের মতে, মানুষের আচরণের নানা নিগূঢ় কারণ থাকে বলে এই আচরণ সম্পর্কে আমরা আংশিক ও আপেক্ষিক জ্ঞান লাভ করতে পারি, সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্ভবত কখনই অর্জন করতে পারি না। এই কারণে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বুদ্ধিদীপ্ত ও অন্তর্দর্শনমূলক মর্মগ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন।

হ্বেবার সামাজিক ক্রিয়ার সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন, "ক্রিয়া সামাজিক হয়ে ওঠে যখন এর প্রতি ক্রিয়ারত ব্যক্তির ব্যাক্তিসাপেক্ষ অর্থ আরোপিত হওয়ার ফলে এটি অন্যের ব্যবহারকে গ্রাহ্য করে এবং এর গতিপ্রকৃতি তার দ্বারা নির্ধারিত হয়।" সমাজতত্ত্বের উদ্দেশ্য হ'ল এই ধরনের সামাজিক ক্রিয়াকে বোঝা। সমস্ত পারস্পরিক আচরণ বা ক্রিয়া সামাজিক হয় না। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে যদি দু'জন সাইকেল চালকের মধ্যে রাস্তায় ধাক্কা লাগে তবে তা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র, মোটেই সামাজিক ক্রিয়ার পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু তাদের ধাক্কা এড়ানোর চেষ্টা অথবা ধাক্কা লাগার পর পরস্পরকে দোষারোপ করা সামাজিক ক্রিয়ার পর্যায়ভুক্ত। কারণ এক্ষেত্রে তারা পরস্পরের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন হয়ে এবং নিজস্ব ধারণা আরোপ করে তাদের ক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করছে।

হ্বেবার সামাজিক ক্রিয়াকে চারভাগে ভাগ করেছেন ঃ—

(ক) মানুষ কিছু কিছু কাজ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য মেটানোর জন্য করে। এখান ক্রিয়ারত ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য ঠিক করে এবং যে পথকে তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করে তা বেছে নেয়। যেমন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য লেখাপড়া করে। এই ধরনের সামাজিক ক্রিয়াকে তিনি 'যুক্তিবাদী উদ্দেশ্যসাধক ক্রিয়া ('rational action in relation to a goal') বলেছেন।

(খ) মানুষ অনেক সময়ে নির্দিষ্ট মূল্যবোধ অনুসারে কাজ করে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যটি আদর্শ দ্বারা স্থির হয় এবং কাজের পদ্ধতি তার কার্যকারিতা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। যেমন জাহাজ ডুবে যাওয়ার সময়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন সব যাত্রীকে রক্ষা করতে না পারলে নিজের জীবনরক্ষার সুযোগও ছেড়ে দেয় এবং ডুবন্ত জাহাজে নিজে থেকে মৃত্যুবরণ করে। হ্বেবার এই ধরনের সামাজিক ক্রিয়াকে 'যুক্তিবাদী মূল্যবোধ প্রভাবিত ক্রিয়া' ('rational action in relation to a goal') বলেছেন।

(গ) অনেক সময়ে মানুষ হৃদয়াবেগের ফলে কিছু কিছু কাজ করে থাকে। যেমন শিশু খুব উৎপাত করলে মা বিরক্ত হয়ে তাকে কিলচড় মারেন। হ্বেবার এই ধরনের ক্রিয়াকে 'হৃদয়াবেগ সঞ্জাত ক্রিয়া' ('affective or emotional action') বলেছেন।

(ঘ) যেসব সামাজিক ক্রিয়ার লক্ষ্য ও পদ্ধতি সাবেকী প্রথার দ্বারা নির্ধারিত হয় সেগুলিকে হ্বেবার 'ঐতিহ্যানুযায়ী ক্রিয়া' (traditional action') বলেছেন। ধর্মীয় উৎসব, অনুষ্ঠানাদি এবং দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত কাজগুলি এই পর্যায়ে পড়ে।

অনুশীলনী - ২

১) **নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।**

(ক) হ্বেবারের মতে, মানুষের ক্রিয়াকলাপকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায় না।

(খ) হ্বেবারের মতে, সামাজিক ক্রিয়াকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে কিছুটা কল্পনার আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন।

(গ) ম্যাকাইভারের মতে, বাইরের থেকে পর্যবেক্ষণ করে আমরা সামাজিক ঘটনাবলীকে ঠিক বুঝতে পারি না।

(ঘ) ম্যাকাইভারের মতে, মানুষের আচরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান আমরা সম্ভবত কখনই লাভ করতে পারি না।

(ঙ) হ্বেবরের মতে, সামাজিক ক্রিয়ার মর্মগ্রহণ ব্যক্তি নিরপেক্ষ।

(চ) দু'জন সাইকেল চালকের মধ্যে ধাক্কা লাগলে তা হ্বেবারের মতে সামাজিক ক্রিয়া।

২) **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—**

(ক) হ্বেবারের মতে, সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে —— ও অন্তর্দর্শনমূলক মর্মগ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন।

(খ) হ্বেবার সামাজিক ক্রিয়াকে —— ভাগে ভাগ করেছেন।

(গ) মা শিশুর দুরন্তপনায় বিরক্ত হয়ে তাকে কিলচড় মারলে সেটি —— ক্রিয়ার নিদর্শন।

(ঘ) পরীক্ষায় ভাল ফল করাবার জন্য লেখাপড়া করা হ'ল যুক্তিবাদী —— ক্রিয়ার নিদর্শন।

৭.৩.২ আদর্শরূপ

আদর্শরূপ (Ideal Type) হ'ল এক ধরনের হ্বেবার কর্তৃক উদ্ভাবিত ধারণাগত নির্মিতি (analytical construct)। এর মাধ্যমে বিভিন্ন আপাত সম্পর্কহীন ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যকে আনুধাবন করা যায় এবং বাস্তব ক্ষেত্রে আদর্শ থেকে বিচ্যুতির পরিমাপ করা যায়। এর সঙ্গে মূল্যবিচারের কোন সম্পর্ক নেই। মদ্যপান ও ব্যভিচার থেকে দেশপ্রেম ও ধর্ম—এই সমস্ত সামাজিক বিষয়েরই আদর্শরূপ নির্মাণ সম্ভব। এটি বাস্তবের কোন পরিসংখ্যানগত গড়ও নয়। আদর্শরূপ গঠনের ক্ষেত্রে গোটা বিষয়টি কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে নির্বাচন করে নেওয়া হয় বা জোর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। একারণে বাস্তব ঘটনা কখনই এই নির্মিতিটির ঠিক অনুরূপ হয় না, কিন্তু তা অনেকাংশে নির্মিতিটির কাছাকাছি আসে। শিল্‌স্ এবং ফিঞ্চের মতে, "এক বা একাধিক" দৃষ্টিভঙ্গিকে একতরফা স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে এবং অজস্র চতুর্দিকে পরিব্যাপ্তি, অসংলগ্ন, অধিকাংশ সময়ে উপস্থিত এবং কখনও কখনও অনুপস্থিত, স্বতন্ত্র বাস্তব বিষয়াদির—যেগুলিকে ঐসব একতরফাভাবে জোর দেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী একটি সমন্বিত ধারণাগত নির্মিতির মধ্যে সাজানো হয়েছে—একত্রীকরণের মাধ্যমে একটি আদর্শরূপ গড়ে ওঠে।"

এই আদর্শরূপের ধারণা হ্বেবার তিন ধরনের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন।

(১) প্রথম ধরনের আদর্শরূপের ধারণার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ পাশ্চাত্য ধনতন্ত্র ও প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের কথা বলা যায়। আধুনিক ধনতন্ত্রের মূল উপাদান হিসাবে হ্বেবার এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝিয়েছেন যাতে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য যুক্তিগ্রাহ্য কর্মপ্রণালী ও উৎপাদন-পন্থা অবলম্বন করা হয়। আবার তিনি প্রোটেস্টান ধর্মমতের মূল উপাদান হিসাবে কর্মসম্পর্কিত নীতিবোধের উপর জোর দেন। তাঁর মতে, প্রোটেস্টান্ট ধর্মের কর্মসম্পর্কিত নীতিবোধই পাশ্চাত্য জগতে আধুনিক ধনতন্ত্রের উদ্ভবের মূল কারণ। এইভাবে হ্বেবার ধনতন্ত্র ও প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের অন্যান্য সকল

দিক উপেক্ষাপূর্বক মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে যথাক্রমে সর্বাধিক লাভমুখী যুক্তিগ্রাহ্য কর্মপ্রণালী ও উৎপাদন-পন্থা এবং কর্মসম্পর্কিত নীতিবোধকে উপস্থাপিত করেছেন। আধুনিক ধনতন্ত্র ও প্রোটেস্টান ধর্মের যে চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, বাস্তবের ধনতন্ত্র বা প্রোটেস্টান্ট ধর্মের চেহারা তার সাথে মেলে না। কিন্তু তবুও তিনি বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য এইভাবে ধনতন্ত্রও প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের আদর্শরূপ গড়ে তুলেছেন।

(২) দ্বিতীয় ধরনের আদর্শরূপের ধারণা গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক বাস্তবতার বিমূর্ত স্বরূপকে কেন্দ্র করে। উদাহরণস্বরূপ আমলাতন্ত্র বা কর্তৃত্বের ধারণার কথা বলা যায়। আমলাতন্ত্রের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে হ্বেবার কেবল তার যুক্তিগ্রাহ্য উপাদানগুলি—যেমন কর্মচারীদের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাস, নির্দিষ্ট যোগ্যতানুসারে কর্মচারীদের নিয়োগ, নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে ও নিরপেক্ষভাবে কর্মসম্পাদন প্রভৃতি গ্রহণ করে আমলাতন্ত্রের একটি আদর্শরূপ গড়ে তুলেছেন। কর্তৃত্বের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে হ্বেবার তিন ধরনের কর্তৃত্বের পরম্পরা, প্রথা ও শাসিতের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব গড়ে ওঠে। যেমন বংশগত রাজতন্ত্র। কোন নেতার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বা চারিত্রিক গুণাবলী বা মোহিনীশক্তিকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিত্বনির্ভর কর্তৃত্ব গড়ে ওঠে। যেমন কংগ্রেসে গান্ধীজীর নেতৃত্ব। আইন, অনুশাসন, বিধিনিয়ম ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে যুক্তিগ্রাহ্য আইনভিত্তিক কর্তৃত্ব গড়ে ওঠে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্ব।

(৩) তৃতীয় ধরনের আদর্শরূপের ধারণা সামাজিক ক্রিয়ার বিবিধ প্রকারের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। এগুলি হ'ল যুক্তিবাদী উদ্দেশ্যসাধক ক্রিয়া (যেমন খেতে ফসল ফলানোর জন্য জলসেচ করা), যুক্তিবাদী মূল্যবোধ প্রভাবিত ক্রিয়া (যেমন ডুবন্ত জাহাজের ক্যাপ্টেনের জাহাজে অবস্থানপূর্বক যাত্রীদের নিমজ্জিত হওয়া), হৃদয়াবেগ সঞ্জাত ক্রিয়া (যেমন শিশুসন্তানের উপদ্রবে বিরক্ত জননীর তাকে প্রহার করা) এবং ঐতিহ্যানুসারী ক্রিয়া (যেমন ধর্মীয় অনুষ্ঠান)।

হ্বেবার এ দাবি করেননি যে, সকল প্রকার মানবীয় আচরণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আদর্শরূপের ধারণা প্রয়োগ করা সম্ভব। এছাড়া হ্বেবার আদর্শরূপের ধারণা প্রয়োগ করার সময়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেছেন। এর কতগুলি কারণ আছে। প্রথমত কোন বিশেষ আদর্শরূপকে বাস্তব ঘটনা বলে ভুল করা হতে পারে। দ্বিতীয়ত একটি বিশেষ আদর্শরূপের সাথে বাস্তব ঘটনাকে জোর করে খাপ খাওয়ানোর প্রবণতা দেখা দিতে পারে। তৃতীয়ত আদর্শরূপের ধারণাকে এমন পর্যায়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হতে পারে যাতে ধারণাই শেষ পর্যন্ত বাস্তব ঘটনার রূপ গ্রহণ করতে পারে।

কার্ল মার্ক্স যেভাবে শ্রেণী সংঘর্ষের বিশ্লেষণ করেছেন তাতে আদর্শরূপের পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছে বলা যায়। মার্ক্স প্রতিটি সমাজের দুটি মূল শ্রেণী অস্তিত্ব ও তাদের সংঘর্ষের কথা তুলে ধরেছেন। বাস্তবে সমাজে ঠিক এরকম দু'টি প্রধান শ্রেণী নাও থাকতে পারে। এবিষয়ে মার্ক্স নিজেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু তিনি সমাজবাস্তব থেকে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনুকূল কয়েকটি বৈশিষ্ট্যসূচক দিক বেছে নিয়ে তত্ত্বগতভাবে দু'টি প্রধান শ্রেণীর দ্বন্দ্বের মধ্যেই তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন।

আধুনিককালে অর্থশাস্ত্রেও হ্বেবারের আদর্শরূপের ধারণা প্রযুক্ত হয়। অর্থনীতিতে মানুষের ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করার সময়ে অনুমান করা হয় যে তারা বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক বোধ দ্বারা যান্ত্রিকভাবে চালিত হচ্ছে। এইটিই আদর্শরূপের বিশেষত্ব কতগলি বৈশিষ্ট্যকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া এবং কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করা। কিন্তু বাস্তবে এটা ঘটে না। মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নানান সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত

হয়। বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক বোধ মানুষকে চালনা করতে পারে না। আদর্শরূপ সংক্রান্ত ধারণাটির এখানেই সীমাবদ্ধতা।

অনুশীলনী - ৩

১) **নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।**

(ক) আদর্শরূপের সাথে আদর্শগত মূল্যবিচার জড়িত আছে।

(খ) বাস্তব ঘটনা কখনই আদর্শরূপের ঠিক অনুরূপ হয় না।

(গ) আদর্শরূপ গঠনের ক্ষেত্রে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করা হয়।

(ঘ) হ্বেবার আধুনিক ধনতন্ত্র ও প্রোটেস্টান্ট ধর্মের যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, বাস্তবের ধনতন্ত্র বা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের চেহারা তার সাথে মেলে না।

(ঙ) হ্বেবারের মতে, সকল প্রকার মানবীয় আচরণের বিশ্লষণের ক্ষেত্রে আদর্শরূপের ধারণা প্রয়োগ করা সম্ভব।

২) **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—**

(ক) হ্বেবার আদর্শরূপের ধারণা —— ধরনের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন।

(খ) দ্বিতীয় ধরনের আদর্শরূপের ধারণা গড়ে উঠেছে —— বাস্তবতার বিমূর্ত স্বরূপকে কেন্দ্র করে।

(গ) হ্বেবার তিন ধরনের কর্তৃত্বের কথা বলেছেন ——— ঐহিত্যবাহী কর্তৃত্ব, ব্যক্তিনির্ভর কর্তৃত্ব এবং —— কর্তৃত্ব।

৭.৩.৩. প্রোটেস্টান্ট নীতিবোধ ও পুঁজিবাদী উদ্যোগ

পুঁজিবাদের আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে হ্বেবার মার্ক্সের উৎপাদন পদ্ধতি পরিবর্তনের তত্ত্বকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক কারণ গুরুত্বপূর্ণ হ'লেও তা সমাজ পরিবর্তনের বহু বিচিত্র উপাদান (variable)-এর মধ্যে অন্যতম মাত্রা যা অন্যান্য উপাদানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। হ্বেবারের মতে, ধর্মের মত উপাদান ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করতে পারে। কোন কোন ধর্মবিশ্বাস যেমন অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করে তেমনি কোন কোন ধর্মবিশ্বাস অর্থনৈতিক প্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করে। হ্বেবার ধর্মকে একটি উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে অর্থনীতির উপর এর প্রভাব পরীক্ষা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, প্রোটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বীরাই সেসময়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও শিল্পজগতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত 'প্রোটেস্টান্ট এথিক অ্যান্ড দ্য স্পিরিট অব ক্যাপিটালিজম্' গ্রন্থে হ্বেবার দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, যদিও ধর্মই পুঁজিবাদের আবির্ভাবের একমাত্র কারণ নয় তবুও ধর্মীয় নীতিবোধ এব্যাপারে যে প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা দিয়েছিল সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর মতে, প্রোটেস্টান্ট নীতিবোধে ব্যক্তির যোগ্যতা স্বীকৃত হয় ; পার্থিব বৃত্তি নৈতকি মর্যাদা লাভ করে, সৎ পরিশ্রম সম্মানিত হয় এবং সৎপথে অর্থ উপার্জন নিষ্পাপ কর্তব্যকর্ম বলে ঘোষিত হয়। এর ফলে প্রথমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে উদ্যমী ব্যক্তিদের দ্বারা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সৃষ্টি হয়।

হ্বেবারের মতে, আধুনিক পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হ'ল সীমাহীন সঞ্চয়ের ধারণা যা সর্বোচ্চ লাভের ধারণাকে অনেকটা ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়াও আধুনিক পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রে একটি বিশ্বাস নিহিত আছে। সেটি হ'ল এই যে অধ্যাবসায় ও যুক্তিবাদী ক্রিয়ার ফলেই লাভ হবে, ফাটকাবাজি ও ঝুঁকিবহুল উদ্যোগের ফলে নয়। হ্বেবার

প্রোটেস্টান্ট ধর্মের নমুনা হিসাবে ক্যালভিনের ধর্মমতকে গ্রহণ করেছেন। প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত বলতে সেই সব ধর্মমতকে বোঝায় যেগুলি গোঁড়া ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের প্রতিবাদস্বরূপ খ্রীষ্টীয় সমাজে উদ্‌গত হয়েছিল। ক্যালভিনের ধর্মমত হল এরকমই একটি প্রভাবশালী ধর্মমত। ধর্মের আধ্যাত্মিক দিকের উপর হ্বেবার ততটা নজর দেন নি যতটা তিনি ধর্মীয় নীতিবোধের উপর দিয়েছিলেন। বিশেষতঃ তাঁর তত্ত্বের প্রতিবেদনে তিনি ধর্মের অর্থনৈতিক নীতিবোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি ধর্মের অর্থনৈতিক নীতিবোধ বলতে সেই সব জাগতিক আচরণবিধিকে সামগ্রিকভাবে বুঝিয়েছেন যেগুলি একটি ধর্ম তার অনুগামীদের উপর আরোপ করে। ক্যালভিনের ধর্মের মূল ব্যবহারিক নীতিগুলি ধরে ধরে বিশ্লেষণ করে হ্বেবার দেখিয়েছেন সেগুলি কিভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশে সহায়তা করেছিল।

প্রথমত ক্যালভিনের ধর্মমতে বলা হয় যে মানুষের সীমায়িত মন সর্বব্যাপী ও সর্বনিয়ন্তা জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের মনকে বুঝতে পারবে না। তাই ধর্মীয় রহস্যবাদ ও অনুষ্ঠানাদিকে বেশি পরিমাণে লিপ্ত হয়ে কোন লাভ নেই, কারণ এসবের অন্তর্নিহিত রহস্য মানুষের অগম্য। সেকারণে মানুষের পার্থিব জগতের ব্যাপারেই মনোনিবেশ করা উচিত। এই ধরনের নীতিবোধের ফলে মানুষের মন ধর্মীয় রহস্যবোধ থেকে মুক্ত হয় এবং তার মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিবাদী মানসিকতার উন্মেষ হয়।

দ্বিতীয়ত, ক্যাথলিক ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, আদি পাপের জন্য আদম ও ইভ স্বর্গোদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়। তারপর থেকে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করে তার জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। অতএব পরিশ্রম হ'ল এক ধরনের শাস্তি বিশেষ যা সেই আদি পাপের শাস্তি হিসাবে মানুষকে একনও বহন করতে হচ্ছে। কিন্তু প্রোটেস্টান্ট নীতিবোধ অনুযায়ী কর্মই হ'ল ধর্ম। অতএব প্রোটেস্টান্ট মতবাদীরা উৎপাদনমূলক পরিশ্রম করা উচিত বলে মনে করেন কারণ তা হ'ল পূণ্যকর্ম বিশেষ।

তৃতীয়ত, ক্যাথলিকদের বর্ষপঞ্জী (calender) ছুটির দিনে ভরা— প্রতিটি পবিত্র দিবসেই ছুটি ঘোষিত হয়েছে। ক্যাথলিকদের মতে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের জন্য অবসর দরকার। কিন্তু প্রোটেস্টান্ট নীতিবোধ অনুসারে কর্মই হ'ল ধর্ম। পবিত্র দিবসে ছুটি নিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের কোন দরকার নেই। অতএব কলকারখানা ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি সপ্তাহের সাত দিনই খোলা রাখা যেতে পারে। এর মাধ্যমে সর্বাধিক উৎপাদন ও মুনাফালাভ সম্ভব হবে।

চতুর্থত ক্যালভিনের মতে, কিছু কিছু বাহ্যিক চিহ্নের দ্বারা বোঝা যায় যে, কারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের অধিকারী। এ বাহ্যিক বিষয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল পার্থিব কর্মে সাফল্য। যেহেতু প্রতিটি ব্যক্তিই মৃত্যুর পর তার কি গতি হবে তা জানতে চায়, সেহেতু প্রত্যেকেরই একটি বৃত্তি বেছে নিয়ে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তাতে সাফল্য লাভের চেষ্টা করা উচিত। এই নতুন নীতিবোধ অনুযায়ী একজন ধার্মিক লোকের পক্ষে দারিদ্র্য বরণ করা, সন্ন্যাস নেওয়া, কৃচ্ছ্রসাধন ও তীর্থযাত্রার আবশ্যকতা আর থাকল না। এই নীতিবোধ অনুযায়ী মানুষ লাভজনক কাজ করে এবং ধনসঞ্চয়ের মাধ্যমেও ধর্মাচরণ করতে সক্ষম হবে।

পঞ্চমত, ক্যাথলিক ধর্মমত ঋণের উপর সুদ নেওয়াকে অনুমোদন করে না। সেকারণে মহাজনবৃত্তি একটি ঘৃনিত বৃত্তি হিসাবে চিহ্নিত ছিল। কিন্তু ক্যালভিন ঋণের উপর সুদ গ্রহণকে অনুমোদন করেছিলেন। ফলে বিভিন্ন ঋণদানকারী সংস্থা গড়ে উঠতে লাগলো, মূলধনের সঞ্চয় সম্ভব হ'ল, বিভিন্ন অর্থনৈতিক উদ্যোগে পুঁজির বিনিয়োগ হ'তে থাকল এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বাড়ল।

ষষ্ঠত, প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত অনুসারে প্রত্যেক মানুষের নিজেরই বাইবেল পড়তে পারা উচিত, তার পুরোহিতের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা উচিত নয়। অতএব প্রোটেস্টান্ট ধর্মবিশ্বাস সাক্ষরতা ও শিক্ষাবিস্তার উৎসাহ যোগাল। সাধারণ শিক্ষার বিস্তারের সাথে সাথে বিশেষীকৃত শিক্ষারও উন্নতি হ'ল।

সপ্তমত, ক্যাথলিক অনুশাসনে মদ্যপানের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু প্রোটেস্টান্ট অনুশাসনে মদ্যপান নিষিদ্ধ। ফলে অর্থের অপব্যয় রোধ করে নতুন উদ্যোগে খাটানোর জন্য অর্থ সঞ্চয় করা সহজ হ'ল।

অষ্টমত, প্রোটেস্টান্ট অনুশাসন অনুসারে পার্থিব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখভোগ বেশি পরিমাণে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। অতএব প্রোটেস্টান্ট নীতিবোধ একদিকে প্রচুর সঞ্চয়ের সূত্রপাত করল, আবার তারই সাথে সেই সঞ্চিত অর্থকে পার্থিব সুখের পিছনে ব্যয় করতে নিষেধ করল। এই সঞ্চিত অর্থের দ্বারাই নতুন অর্থনৈতিক উদ্যোগে খাটানোর পুঁজি গড়ে উঠল। ফলে পুঁজিবাদের আবির্ভাব ঘটল।

ইউরোপে ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের পিছনে ভৌগোলিক উপাদান, সামরিক প্রয়োজন ও বিলাসদ্রব্যের চাহিদা, কয়লা ও লোহার প্রতুলতা, অংশীদারী কারবারের উদ্ভব, শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও তৎকালীন যুদ্ধবিগ্রহের প্রভাব-এ সবকিছুই হ্বেবার মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মতে, শুধু এগুলিই পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটায়নি। তিনি বলেছেন, "...সর্বশেষ যে উপাদানটি ধনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছিল তা হল যুক্তিবাদী স্থায়ী উদ্যোগ, যুক্তিবাদী হিসাবসংরক্ষণ ব্যবস্থা, যুক্তিবাদী প্রযুক্তি এবং যুক্তিবাদী আইন — কিন্তু এগুলি আবার একা নয়। যুক্তিবাদী উদ্যম, সাধারণভাবে জীবনযাপন প্রণালীর যুক্তিসম্মতকরণ এবং একটি যুক্তিবাদ অনুযায়ী অর্থনৈতিক নীতিবোধ প্রয়োজনীয় পরিপূরক উপাদান যুগিয়েছিল।"

হ্বেবার প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টীয় নীতিবোধ ছাড়াও পৃথিবীর আরও কয়েকটি ধর্মের— যেমন হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম, ইহুদী ধর্ম ও কনফিউসিয়াস প্রবির্তত ধর্মের — অর্থনৈতিক নীতিবোধ এবং ঐসব ধর্মের অনুগামীদের জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক সংগঠনের উপর সেই নীতিবোধগুলির প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, চীন ও ভারতবর্ষেও কতকগুলি ধর্মনিরপেক্ষ আর্থ-সামাজিক প্রভাবের ফলে আভ্যন্তরীণভাবে ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কনফিউসিয়াসের দ্বারা প্রচারিত ধর্মীয় ভাবাদর্শ এবং হিন্দুধর্মের কর্মফলবাদ ও বর্ণব্যবস্থা এ বিষয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। কর্মফলবাদ অনুসারে ইহজন্মের উদ্যোগের বদলে গতজন্মের কর্মফলই পার্থিব সাফল্যের সৃষ্টি করে। বর্ণব্যবস্থা অনুসারে দরিদ্র ব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। ধনী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা বৈশ্যদের সাাজিক মর্যাদা তুলনায় কম। এরকম ধর্মীয় ভাবাদর্শ ও সামাজিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নতির অনুকূল নয়।

অনুশীলনী - ৪

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

(ক) ——— এবং হ্বেবারের মত জার্মান চিন্তাবিদরা পুঁজিবাদের আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করতে থাকেন।

(খ) হ্বেবারের মতে, আধুনিক পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হ'ল সীমাহীন ——— -এর ধারণা।

(গ) হ্বেবারে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের নমুনা হিসাবে ——— -এর ধর্মমতকে গ্রহণ করেছেন।

(ঘ) হ্বেবার তাঁর তত্ত্বের প্রতিবেদনে ধর্মের ——— নীতিবোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন।

(ঙ) ক্যাথলিক ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে ——— -এর জন্য আদম ও ইভ স্বর্গোদ্যান থেকে বহিষ্কৃত হয়।

(চ) প্রোটেস্টান্ট নীতিবোধ অনুযায়ী ——— -ই হ'ল ধর্ম।

(ছ) হিন্দুধর্মের কর্মফলবাদ ও —— ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা ঘটায়।

২) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) জার্মানিতে পুঁজিবাদের আবির্ভাব হয় ধীরে ধীরে।

(খ) প্রোটেস্টান্ট ধর্ম এক নয়, বহু।

(গ) ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী পরিশ্রম হ'ল এক ধরনের শাস্তি বিশেষ।

(ঘ) ক্যালভিনের মতে, ধর্মাচরণের জন্য দারিদ্র বরণ করা, সন্ন্যাস নেওয়া, কৃচ্ছ্রসাধন ও তীর্থযাত্রার দরকার নেই।

(ঙ) প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত অনুসারে ঋণের উপর সুদগ্রহণ নিষিদ্ধ।

(চ) ক্যাথলিক অনুশাসনে মদ্যপানের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ছ) হ্বেবার প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টীয় নীতিবোধ ছাড়াও পৃথিবীর আরও কয়েকটি ধর্মের অর্থনৈতিক নীতিবোধ বিশ্লেষণ করেন।

৭.৩.৪ আমলাতন্ত্র

হ্বেবারের মতে, আধুনিক কালে আইননির্ভর ও যুক্তিসিদ্ধ কর্তৃত্বের প্রাধান্য আমলাতন্ত্রের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি আমলাতন্ত্রের আলোচনায় তাঁর 'আদর্শরূপ' নামক বিশেষ পদ্ধতিটির প্রয়োগপূর্বক বিশুদ্ধ আমলাতন্ত্রের একটি তাত্ত্বিক প্রকরণ গড়ে তুলেছেন।

হ্বেবার প্রথমে আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের বিশ্লেষণ করেছেন। এর নিম্নলিখিত তিনটি মূল ভিত্তি আছে ঃ—

১) আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর নিয়মিত প্রয়োজনীয় কার্যাবলীকে রীতিবদ্ধ ভাবে কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব (official duties) হিসাবে বিভিন্ন কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করা হয়।

২) এ সকল দায়িত্ব পালনের জন্য আধিকারিকরা যথেষ্ট কর্তৃত্ব পায়। আইনে তাদের এই কর্তৃত্বের বিষয় লিপিবদ্ধ করা থাকে এবং এই কর্তৃত্ব বলবৎ করার প্রয়োজনে তারা শাস্তিদায়ক ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে পারে।

৩) আধিকারিকদের দায়িত্ব পালন এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য পদ্ধতিগত ব্যবস্থাও থাকে।

যেসব যুক্তিসঙ্গত নীতির উপর ভিত্তি করে আমলাতান্ত্রিক কাঠামোকে সংগঠিত করা হয় হ্বেবার সেগুলিও আলোচনা করেছেন। সেগুলি নিম্নে বর্ণিত হ'ল ঃ—

১) কর্মক্ষেত্রে সংগঠন উচ্চাবচ বিন্যাস (hierarchy)-এর উপর স্থাপিত হয়। প্রত্যেক দফতর এক উচ্চতর দফতরের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

২) বিভিন্ন বিমূর্ত (abstract) রীতির একটি সুসমঞ্জস ব্যবস্থা অনুযায়ী কার্যাদি পরিচালিত হয় এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এইসব রীতিসমূহ প্রযুক্ত হয়। এই রীতিসমূহ মোটামুটিভাবে স্থায়ী ও বিশদ। আধিকারিকগণ একপ্রকার প্রায়োগিক শিক্ষার মাধ্যমে এইসব রীতিসমূহের বিষয়ে সম্যকভাবে অবহিত হন।

৩) দফতর পরিচালিত হয় লিখিত নথিপত্রের ভিত্তিতে। এগুলিকে 'ফাইল' বলা হয় যেগুলি তাদের আদিম রূপে সংরক্ষিত থাকে।

৪) প্রতি আধিকারিকের একটি নির্দিষ্ট অধিকারভূক্তি (jurisdiction) থাকে। একজনের অধিকারে আরেকজন সমর্পযায়ের আধিকারিক হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। আমলাতন্ত্র শ্রমবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমলাদের অবস্থান, অধিকার ও দায়িত্বের ব্যাপারে হ্বেবার বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। সেগুলি নিম্নে বর্ণিত হ'ল ঃ—

১) বিশেষ ধরনের যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে অথবা নির্দিষ্ট ধরনের পরীক্ষায় মান যাচাইয়ের মাধ্যমে আমলাতান্ত্রিক কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়। তাদের খুশিমত বরখাস্ত করা যায় না। সাধারণত কর্মচারীদের নির্দিষ্ট নিয়োগকাল (tenure) থাকে।

২) আমলাতন্ত্রে পদোন্নতির ব্যবস্থা হয় কর্মে প্রবীণতা (seniority) বা কর্মদক্ষতা অথবা উভয়ের ভিত্তিতে।

৩) প্রতি কর্মচারী নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন এবং অবসর গ্রহণের পর বার্ধক্যভাতা (pension) লাভ করেন।

৪) বেতন ছাড়া অন্য কোন লাভের উৎস হিসাবে কোন আমলাতান্ত্রিক পদকে আইনগতভাবে ব্যবহার করা যায় না, তবে মধ্যযুগে এটা করা যেত।

৫) কর্মচারীর ব্যক্তিগত জীবন ও থেকে তার দফতরকে অবস্থান, কার্যকলাপ, সম্পদের ব্যবহার ও অন্যান্য বিষয়ে পৃথকীকৃত করা হয়। কোন কর্মচারী তার পদ এবং কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত দ্রব্য ও বিষয়াদিকে আত্মসাৎ করতে পারে না।

৬) একটি পূর্ণবিকশিত দফতরে কার্যাদি সম্পাদনের জন্য কর্মচারীকে তার কর্মক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করতে হয়, যদিও দফতরে কার্যসম্পাদনের সময় সীমিত থাকে।

৭) এক আনুষ্ঠানিক নৈর্ব্যক্তিতার মনোভাব নিয়ে আদর্শ আমলা দফতরের কর্মসম্পাদন করে। সে কাজ করে বিদ্বেষ অথবা আবেগ ছাড়া এবং ফলত অনুরাগ অথবা উৎসাহ ছাড়া। হ্বেবারের ভাষায় ঃ "যত নিখুঁতভাবে আমলাতন্ত্র অমানবিক হয়ে ওঠে, যত সম্পূর্ণভাবে দফতরের কার্যাবলী থেকে ভালবাসা, বিদ্বেষ এবং অন্যান্য নজর এড়িয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, অযৌক্তিক এবং আবেগপূর্ণ উপাদানগুলিকে এ সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়, ততই এর নির্দিষ্ট প্রকৃতি পূর্ণভাবে বিকশিত হয়।"

হ্বেবার আমলাতন্ত্রের শক্তির কথা বলেছেন যা নিম্নে আলোচিত হল ঃ

১) হ্বেবারের মতে, "যেভাবে যান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির সাথে যন্ত্রবিহীন উৎপাদন পদ্ধতির তুলনা করা যায়, ঠিক সেভাবে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য সংগঠনসমূহের তুলনা করা যায়।" অভিজ্ঞতা থেকে সর্বক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সর্বাধিক কমদক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পারে।

২) হ্বেবার বলেছেন, "একবার পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে আমলাতন্ত্র সেইসব সামাজিক কাঠামোগুলির অন্যতম হয়ে ওঠে যেগুলিকে ধ্বংস করা অত্যন্ত কঠিন।" যেখানে শাসনযন্ত্রের আমলাতান্ত্রিকতা পুরোপুরি সম্পাদিত হয়েছে, সেখানে এমন এক ধরনের ক্ষমতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে বাস্তবে যা অভঙ্গুর। হ্বেবার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর জোর দিয়ে আমলাতন্ত্র হিসাবে এমন এক যৌক্তিকভাবে সংগঠিত কাঠামোর চিত্র তুলে ধরেছেন যা সর্বাধিক কর্মদক্ষতার সাথে উৎপাদনের লক্ষ্যে নিয়োজিত এবং রীতিনিয়ম, কর্তৃত্ব, নৈর্ব্যক্তিকতা ও প্রায়োগিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু রীতিনীতির আধিপত্য আমলার স্বেচ্ছাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করলেও তা আবার আমলার নিজস্ব উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাকে খর্ব করে, হ্বেবার বলেছেন, "অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমলা হ'ল চিরঘূর্ণায়মান যন্ত্রের একটি সাধারণ চাকা মাত্র— যে যন্ত্র তার যাত্রাপথ আবশ্যিকভাবে নির্ধারিত করে

দেয়। সেকারণে আধুনিক জগতে আমলাতান্ত্রিকতার বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্বিত হয়েছে। এছাড়া নিয়মকানুনের খুঁটিনাটির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের কাঠিন্য ও অদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আধুনিক আমলাতন্ত্রের আবির্ভাবের কারণগুলি হ্বেবার বর্ণনা করেছেন। প্রথমত, পাশ্চাত্যে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির প্রচলনের ফলে নিয়মিত কর আদায়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই কার্যসাধনের জন্য আমলাতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তির বৈপ্লবিক উন্নতির ফলে আধুনিক যুগে ভোগ্যপণ্যসমূহের উৎপাদন অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন শিল্পগত ও বাণিজ্যিক সংস্থা শিল্পোৎপাদন ও ভোগ্যপণ্য বিপণনের ব্যবস্থা সুচারুভাবে করার জন্য আমলাতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলে। তৃতীয়ত, বর্তমান যুগে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা সুচারুভাবে করার জন্য আমলাতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলে। তৃতীয়ত, বর্তমান যুগে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে রাষ্ট্রের কার্যাবলী বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্র এসকল বর্ধিত কর্ম সম্পাদনের জন্য আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের আশ্রয় নেয়। চতুর্থত, আধুনিক গণতন্ত্রে দলব্যবস্থার প্রবর্তন এবং স্থানীয় স্তরে স্বশাসনের বিস্তারের ফলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও প্রতিনিধিমূলক স্তরে আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য যে আমলাতন্ত্রের আবির্ভাব ঘাটে তা আধুনিক সমাজ-জীবনের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। বর্তমান সমাজবদ্ধ মানুষ মূলত যেসব সংঘ বা সংগঠনের উপর নির্ভর করে তার সমাজ-জীবনযাপন করে, তাদের অধিকাংশ আমলাতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত। হ্বেবারের মতে, আধুনিক জীবনযাত্রা-প্রণালী ও অর্থনীতির যুক্তিসম্মতকরণ (rationalization)-এর সাথে আমলাতন্ত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

অনুশীলনী - ৫

১) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—

(ক) হ্বেবার আমলাতন্ত্রের আলোচনায় তার ——— নামক বিশেষ পদ্ধতিটির প্রয়োগ করেন।

(খ) আধিকারিকরা তাদের কর্তৃত্ব বলবৎ করার জন্য প্রয়োজনে ——— ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে।

(গ) কর্মক্ষেত্রে সংগঠন ——— বিন্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(ঘ) বিভিন্ন ——— রীতির একটি সুসমঞ্জস ব্যবস্থা অনুযায়ী আমলাতান্ত্রিক কাঠামোয় কার্যাদি পরিচালিত হয়।

(ঙ) আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে ফাইলগুলি তাদের ——— সংরক্ষিত থাকে।

(চ) প্রতি আধিকারিকের একটি নির্দিষ্ট ——— থাকে যাতে সমপর্যায়ের আরেকজন আধিকারিক হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

(ছ) কোন আমলা তার পদ এবং কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত দ্রব্য ও বিষয়াদিকে ——— ——— করতে পারে না।

(জ) একটি ——— দফতরে কার্যাদি সম্পাদনের জন্য আমলাকে তার কর্মক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করতে হয়।

(ঝ) এক আনুষ্ঠানিক ——— মনোভাব নিয়ে আদর্শ আমলা দফতরের কর্মসম্পাদন করে।

(ঞ) যেখানে শাসনযন্ত্রের আমলাতান্ত্রিকতা পুরোপুরি সম্পাদিত হয়েছে, সেখানে এমন এক ধরনের ক্ষমতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে বাস্তবে যা ———।

৭.৪ ভিলফ্রেডো প্যারেটো ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী

ভিলফ্রেডো ফ্রেডারিকো দামাসো প্যারেটোর জীবৎকালে হল ১৮৪৮ সাল থেকে ১৯২৩ সাল অবধি। তিনি ইটালির এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরে চিরায়ত সাহিত্যসমূহ (classics)-এ শিক্ষালাভপূর্বক

তিনি তুরিনের বিখ্যাত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে গণিত, প্রাকৃতিক ও ভৌতবিজ্ঞানসমূহ এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। স্নাতক হবার পর তিনি কিছুদিন ইঞ্জিনিয়ার এবং তারপরে লৌহখনির ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেন। ১৮৮৯ সালে তিনি চাকরিতে ইস্তফা দেন এবং উত্তারিধাকারসূত্রে প্রচুর অর্থ লাভ করে স্বাধীনভাবে পড়াশুনা এবং লেখালিখির কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। অর্থনীতিতে কতকগুলি অসাধারণ প্রবন্ধ প্রকাশ করার পর তাঁকে ১৮৯৩ সালে লসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। প্রথমদিকে গণতন্ত্র ও শান্তির আদর্শে বিশ্বাসী হলেও তিনি পরবর্তীকালে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কঠোর সমালোচকে পরিণত হন। এছাড়াও বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হয়ে তিনি মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে এক অত্যন্ত নৈরাশ্যবাদী ধারণা পোষণ করতে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির ক্ষেত্রেও তিনি কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি ১৯০৭ সালে রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক পদ পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৯০৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা পরিত্যাগ করে তিনি আবার স্বাধীনভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণার কাজ করতে থাকেন। ১৯০৬ সালে তাঁর সর্বশ্রেষ্ট গ্রন্থ 'দ্য মাইন্ড অ্যান্ড সোসাইটি এ ট্রিটিজ অন জেনারেল সোসিওলজি' প্রকাশিত হয়। প্যারেটোর চিন্তাধারা ইটালিতে ফ্যাসিবাদের তাত্ত্বিক সমর্থন যুগিয়েছিল বলে মনে করা হয়। তিনি মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের উত্থানকে স্বাগত জানান। তিনি মুসোলিনি কর্তৃক 'সেনেটর' নিযুক্ত হন যদিও পরে মুসোলিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করায় তিনি তার প্রতিবাদও করেন।

প্যারেটোর কয়েকটি বিখ্যাত রচনার নাম নিচে দেওয়া হ'ল ঃ—

১) ভিলফ্রেডো প্যারেটো, সোসিওলজিকাল রাইটিংস

২) ম্যানুয়েল অব পলিটিকাল ইকনমি

৩) দ্য মাইন্ড অ্যান্ড সোসাইটি ঃ এ ট্রিটিজ অন জেনারেল সোসিওলজি

অনুশীলনী - ৬

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

(ক) প্যারেটো ১৮৯৩ সালে ——— বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

(খ) ——— সালে প্যারেটোর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'দ্য মাইন্ড অ্যান্ড সোসাইটি' ঃ এ ট্রিটিজ অন জেনারেল সোসিওলজি' প্রকাশিত হয়।

(গ) প্যারেটো মুসোলিনি কর্তৃক ——— নিযুক্ত হন।

২) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ? ✓ অথবা চিহ্ন × দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) প্যারেটো স্থায়ীভাবে আমৃত্যু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন।

(খ) প্যারেটো মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক ধারণা পোষণ করতেন।

(গ) প্যারেটো মুসোলিনিকে সর্ববিষয়ে সমর্থন করেছেন।

৭.৪.১ যৌক্তিক ও অযৌক্তিক ক্রিয়কলাপ

প্যারেটোর মতে, কোন কাজকে তখনই যৌক্তিক বলা যায় যখন বিষয়ীগত ও বিষয়গতভাবে (subjectively and objectively) কাজটির উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। কোন কাজ তখনই যুক্তিপূর্ণ হিসাবে

বিবেচিত হবে যখন সেসময়ের সেরা জ্ঞানের মাপকাঠিতে কাজটির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সম্ভব বলে মনে হবে এবং কাজটির পন্থাগুলি উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। ক্রিয়ারত ব্যক্তি (actor)-র মনে এবং যেসব ব্যক্তির এব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান আছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা বাস্তব মাপকাঠি অনুযায়ীও উদ্দেশ্যও উপায়ের মধ্যে এই সামঞ্জস্য থাকবে। যেসব কাজ এই যৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের আওতায় পড়ে না সেগুলি হ'ল অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ। প্যারেটোর মতে, ভাবাবেগ হ'ল যুক্তিবিচারের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং এই ভাববেগের দ্বারাই অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ প্রণোদিত হয়। প্যারেটোর মতে, মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ যৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ খুব কম দেখা যায়।

অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপকে প্যারেটো নিম্নোক্ত চারভাগে ভাগ করেছেন ঃ—

(১) প্রথম ধরনের অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে বিষয়গত বা বিষয়ীগত কোন স্তরেই উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য দেখা যায় না। অর্থাৎ গৃহীত উপায়গুলির দ্বারা যুক্তিসংগতভাবে উদ্দেশ্যটি চরিতার্থ হওয়া সম্ভব নয় এবং ক্রিয়ারত ব্যক্তিও ভাবে না যে উপায়গুলির দ্বারা উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হওয়া সম্ভব। প্যারেটোর মতে, এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ বিরল, কারণ মানুষের কার্য সঙ্গতিহীন হলেও সে এই কাজের সমর্থনে যুক্তি দেখাতে চায়।

(২) দ্বিতীয় ধরনের অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে বাস্তবে বা বিষয়গত স্তরে উদ্দেশ্য ও উপায় সামঞ্জস্যহীন হয়। কিন্তু ক্রিয়ারত ব্যক্তি ভুলবশত মনে করে যে গৃহীত উপায়গুলি দ্বারা তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। ধর্মীয় ও জাদুবিদ্যামূলক অনুষ্ঠানাদি এই ধরনের ক্রিয়ার নিদর্শন। বৃষ্টি নামানোর জন্য যখন দেবতার উপাসনা করা হয় তখন বাস্তবে কেবলমাত্র সেই কাজের জন্য বৃষ্টি হয় না। কিন্তু ক্রিয়ারত ব্যক্তি ভাবে যে ঐ দেবারাধনার জন্যই বৃষ্টি হবে।

(৩) তৃতীয় ধরনের অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে বিষয়গত স্তরে বা বাস্তবে উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু ক্রিয়ারত ব্যক্তি এব্যাপারে সচেতন নয়। প্রতিবর্তী ক্রিয়া (reflex action) এধরনের কার্যাদির একটি সুপরিচিত উদাহরণ। কারুর চোখে বালুকণা ঢোকার পূর্বমূহূর্তে সে যদি চোখ বন্ধ করে ফেলে বালুকণা আর ঢুকতে পারে না। এক্ষেত্রে বাস্তবে উদ্দেশ্যের সাথে উপায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু ক্রিয়ারত ব্যক্তি সচেনতভাবে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য ঐ উপায় গ্রহণ করেনি। সহজাত প্রবৃত্তিগত আচরণ (instinctive behaviour) এ ধরনের ক্রিয়ার অন্তর্গত।

(৪) চতুর্থ ধরনের অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে বাস্তবে ঘটা ফলগুলি গৃহীত উপায়গুলির যুক্তিসঙ্গত পরিণাম। আবার ক্রিয়ারত ব্যক্তির চিন্তাভাবনা অনুযায়ীও উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য বিরাজ করে। কিন্তু ব্যক্তিগত স্তরে ও বস্তুগত স্তরে এই কর্মের ফলাফল ভিন্ন রূপ ধারণ করে। শান্তিবাদী, মানবদরদী, রাজনৈতিক নেতা প্রমুখের ভ্রান্ত আশার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত কার্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এঁরা আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য তাঁদের মতামত অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত পন্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁদের কাজের ফলে যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে তা তাঁদের কল্পনানুরূপ হয় না? বাস্তবে এবং তাঁদের মনোজগতেও উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান। কিন্তু এক্ষেত্রে বাস্তবের ঘটনাক্রমের সাথে মনোজগতের ঘটনাক্রমের সমন্বয় ঘটে না।

প্যারেটোর মতে, মানুষের সমস্ত আচরণের একটি স্বল্প অংশই হ'ল যুক্তিসঙ্গত আচরণ। মানুষের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে বা কাজের পরিণতি অনুধাবন করার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক ভাবনা বেশি কাজে লাগে না। অতএব

মানুষের কাজের বেশিটাই অযৌক্তিক না হয়ে পারে না। কিন্তু যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ যুক্তিসঙ্গত আচরণ করে না, সে সবক্ষেত্রেই তার কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চায়। প্যারেটো বলেছেন যে, মানুষ নিজের এবং পরের কাছে প্রমাণ করতে চায় যে তার কার্যকলাপ যুক্তিসঙ্গত চিন্তাভাবনার পরিণাম। কিন্তু আসলে সে আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনা করে মাত্র।

দেওয়ানী আইন তত্ত্বগতভাবে যৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের একটি বিশেষ ধরন, প্যারেটোর মতে, কিন্তু বিচারককদের আচরণ কখনও কখনও অযৌক্তিক হয়ে ওঠে। তাঁর মতে, বিচারালয়ের সিদ্ধান্তগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্ভর করে সেই সময়ে একটি সমাজে ক্রিয়াশীল স্বার্থ ও ভাবানুভূতিগুলির উপর, এবং বিচারকদের ব্যক্তিগত খামখেয়াল ও আকস্মিক ঘটনার উপরও এভাবে উপনীত রায়ের যৌক্তিকতা সম্পাদনের জন্য লিপিবদ্ধ আইনের উল্লেখ করা হয়। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই লিপিবদ্ধ আইনের উপর নির্ভর করে রায় দেওয়া হয়।

প্যারেটোর মতে, অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত চারটি উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে— (১) ক্রিয়ারত ব্যক্তির মনের অবস্থা যা আমাদের অজানা ; (২) যুক্তিপ্রদর্শন, ভাবাদর্শ ও মতের সংমিশ্রণের ফলে উদ্ভূত গোঁড়া মতবাদ (creed); (৩) ক্রিয়ারত ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকাশ, বিশেষত তার কথাবার্তা ; এবং (৪) ক্রিয়ারত ব্যক্তির কাজ বা আচরণ।

অনুশীলনী - ৭

১) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) প্যারেটোর মতে, অযৌক্তিক কার্যকলাপ যে যুক্তিবিরোধী হবেই এমন কোন কথা নেই।

(খ) প্যারেটোর মতে, যে ধরনের অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে বিষয়গত বা বিষয়ীগত কোন স্তরেই উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য দেখা যায় না, সেধরনের অযৌক্তিক কার্যাবলীই বেশি।

(গ) ধর্মীয় বা জাদুবিদ্যামূলক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাস্তবে উদ্দেশ্য ও উপায় সামঞ্জস্যহীন হয়।

(ঘ) প্রবৃত্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে বাস্তবে উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে।

(ঙ) প্যারেটোর মতে, মানুষের সমস্ত আচরণের বৃহদাংশই হ'ল যুক্তিসঙ্গত আচরণ।

২) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

(ক) প্যারেটোর মতে, কোন কাজকে তখনই যৌক্তিক বলা যায় যখন যুক্তি-অনুসারী হওয়ার ফলে —— ও বিষয়গতভাবে কাজটির উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে।

(খ) ধর্মীয় বা জাদুবিদ্যামূলক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাস্তবে উদ্দেশ্য ও উপায় সামঞ্জস্যহীন নয়।

(ঘ) প্রবৃত্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে বাস্তবে উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে।

(ঙ) প্যারেটোর মতে, মানুষের সমস্ত আচরণের বৃহদাংশই হ'ল যুক্তিসঙ্গত আচরণ।

২) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

(ক) প্যারেটোর মতে, কোন কাজকে তখনই যৌক্তিক বলা যায় যখন যুক্তি-অনুসারী হওয়ার ফলে —— ও বিষয়গতভাবে কাজটির উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে।

(খ) অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপকে প্যারেটো —— ভাগে ভাগ করেছেন।

(গ) শান্তিবাদী, মানবদরদী, রাজনৈতিক নেতা প্রমুখের ভ্রান্ত আশার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত কার্যাদির ক্ষেত্রে —— ঘটনাক্রমের সাথে —— ঘটনাক্রমের সমন্বয় ঘটে না।

(ঘ) মানুষের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করার ব্যাপরে বা কাজের পরিণতি অনুধাবন করার ব্যাপারে —— ভাবনা বেশি কাজে লাগে না।

(ঙ) দেওয়ানী আইন —— যৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের একটি বিশেষ ধরন।

৭.৪.২ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের চক্রাকারে আবর্তন

প্যারেটো মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। একদল মানুষ নমনীয়ভাবে পরিস্থিতির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এরা নতুন নতুন উদ্ভাবন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রবৃত্তি হয়। এরা আদর্শের তুলনায় বস্তুবাদী উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেয় এবং উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নীতিবোধ বিসর্জন দিতে দ্বিধা করে না। প্রতারণা ও প্রচারের দ্বারা এরা ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষা করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এরা নানা ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা শুরু করে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কূটনৈতিক রফার দ্বারা রাজনৈতিক শক্তিগুলির পুনর্বিন্যাস করে। ম্যাকিয়াভেলির অনুকরণে প্যারেটো এদের 'শৃগাল' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আর একদল মানুষ আছে যারা হ'ল অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল। এরা পরিবার, গোষ্ঠী, অঞ্চল ও দেশের প্রতি আনুগত্য দেখায়। এরা বিশ্বাস ও আদর্শের দ্বারা চালিত। এরা শ্রেণীগত একতাবোধ, জাতীয়তাবোধ ও ধর্মীয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এরা দরকার মত বলপ্রয়োগে ভয় পায় না বা দ্বিধা করে না। এরা বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষা করে। ম্যাকিয়াভেলির অনুকরণে প্যারেটো এদের 'সিংহ' বলে অভিহিত করেছেন।

প্যারেটোর মতে, মানুষ শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিগত দিক দিয়ে অসমান। যে কোন গোষ্ঠীতে সবচেয়ে সমর্থ ব্যক্তিদের প্যারেটো 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ (elites) বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নৈতিক গুণমান যে উন্নত হবে বা সে যে বিশেষ সম্মানীয় হবে তা প্যারেটো বলেন নি। 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ বলতে তিনি শুধু তাদের বুঝিয়েছেন যারা নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সফল। সফল ব্যবসায়ী, সফল উকিল, সফল শিল্পী, সফল লেখক—এরা সবাই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ।

শ্রেষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্যারেটো আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন—শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এবং অশাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ দেশশাসনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে। শৃগালের মত প্রতারণার মাধ্যমে অথবা সিংহের মত বলপ্রয়োগের দ্বারা এরা জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করে। আদর্শ শাসকগোষ্ঠী একই সাথে শৃগালতুল্য ব্যক্তিবর্গ—যারা কল্পনাপ্রবণ, উদ্ভাবনক্ষম ও বিবেকহীন এবং সিংহতুল্য ব্যক্তিবর্গ—যারা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে ও কার্যসাধন করতে সক্ষম—উভয়কে নিয়ে গঠিত হবে। যখন শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে এই উভয় প্রকার বিরোধী গুণাবলীর সুষ্ঠু মিশ্রণ বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় অনমনীয় আমলাদের হাতে যারা নবীকরণ ঘটাতে ও পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলতে অক্ষম, অথবা শাসনক্ষমতা ন্যস্ত হয় কলহপ্রবণ আইনজ্ঞ ও বাকপটুদের হাতে যারা কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও কার্যসাধনে অক্ষম। এরকম ক্ষেত্রে শাসিত জনগণ শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করে এবং নতুন শাসক শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তিবর্গ ক্ষমতা গ্রহণ করে আরও কার্যকরী শাসনব্যবস্থা কায়েম করে।

যখন কোন শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ অনেকদিন ধরে ক্ষমতায় আসীন থাকে তখন তারা বুদ্ধিবৃত্তির ও শিল্পকলার চর্চায় মেতে উঠতে পারে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বলপ্রয়োগ করতে অনিচ্ছুক হয়ে পড়তে পারে। তারা যদি সম্ভাব্য নেতাদের প্রতি এরকম সহনশীল হয়ে ওঠে তখন সিংহতুল্য নেতৃবর্গ (যারা শাসককুলের অন্তর্ভুক্ত নয়) জনসাধারণকে শৃগালতুল্য শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে পারে। এভাবেই শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ গঠিত হয়, শাসন করে, অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয় এবং পরিশেষে নতুন শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা

অপসারিত হয়। প্যারেটো মন্তব্য করেছেন, 'অভিজাততন্ত্রসমূহ স্থায়ী হয় না। ....ইতিহাস অভিজাততন্ত্রসমূহের কবরখানা। ...ভারসাম্য বিচলিত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ হল নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উচ্চতম গুণাবলী জড়ো হওয়া এবং উল্টোদিকে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে নিম্নতম গুণাবলী জড়ো হওয়া।"

শাসকশ্রেণী দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আসীন থাকলে আরও এটা সম্ভাবনা দেখা দেয়। তারা নিম্নশ্রেণীর থেকে উদ্ভূত নতুন ও সমর্থ ব্যক্তিদের, অর্থাৎ সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে অনিচ্ছুক ও অপারগ হয়ে পড়তে পারে। এক্ষেত্রে নতুন ও শাসনে সক্ষম শাসককুল পুরাতন শাসকশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে। কিন্তু সিংহরা শৃগালদের সরিয়ে ক্ষমতা দখল করলেও পরবর্তীকালে নিজেদের বুদ্ধিবলে শৃগালরা আবার ক্ষমতা দখল করে। শাসকবর্গের চক্রবৎ আবর্তন এভাবে চলতেই থাকে।

অনুশীলনী -৮

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

(ক) প্যারেটো মানুষকে ——— -এ ভাগ করেছেন।

(খ) যারা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষা করে, ——— -র অনুকরণে প্যারেটো তাদের '———' বলেছেন।

(গ) যে কেন গোষ্ঠীতে সবচেয়ে সমর্থ ব্যক্তিদের প্যারেটো '———' বলে উল্লেখ করেছেন।

(ঘ) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে প্যারেটো আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন ঃ ——— শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এবং ——— শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ।

(ঙ) প্যারেটোর মতে, আদর্শ শাসকগোষ্ঠীর একই সাথে ——— ব্যক্তিবর্গ এবং ——— ব্যক্তিবর্গ উভয়কে নিয়ে গঠিত হবে।

(চ) প্যারেটোর মতে, যখন কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতায় আসীন হয়ে থাকে তখন তারা ——— অনিচ্ছুক হয়ে পড়তে পারে।

(ছ) প্যারেটো মন্তব্য করেছেন, "ইতিহাস অভিজাততন্ত্রসমূহের ———।"

(জ) প্যারটোর মতে, শ্রেষ্ঠ শাসকবর্গের ——— আবর্তন চলতেই থাকবে।

৭.৪.৩ অবশেষ ও ব্যুৎপত্তিসমূহ

প্যারেটোর মতে, মানুষের অধিকাংশ কর্মই অযৌক্তিক হ'লেও মানুষ তার আচরণকে যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে করে এবং তার আচরণের যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে চায়। বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত নানা প্রথা, বিচিত্র অভ্যাস, তত্ত্বসমূহ, গোঁড়া মতবাদ, বিশ্বাস, পূর্জার্চনার পদ্ধতি, জাদুবিদ্যার কলাকৌশল ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে প্যারেটো দেখেছেন যে মানুষ বিভিন্ন স্থান, বস্তু, দিন ও সংখ্যাকে শুভ বা অশুভ বলে চিহ্নিত করেছে। এই আচরণ অযৌক্তিক হলেও মানুষ একে যুক্তিসঙ্গত মনে করে এর সমর্থনে যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করার চেষ্টা করেছে। মানবীয় আচরণের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা হ'ল এই যে, মানুষ প্রথমে চিন্তাপূর্বক তার ধারণাগুলি গড়ে তোলে এবং পরে সে ঐসব ধারণা অনুযায়ী কাজ করে। কিন্তু প্যারেটোর মতে, বাস্তব হ'ল এর বিপরীত। মানুষ প্রথমে কাজ করে পরে তার যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করে।

এই প্রসঙ্গে পারেটো দু'টি নির্দিষ্ট অর্থবহ শব্দ ব্যবহার করেছেন— 'অবশেষসমূহ' (reindues) এবং 'ব্যুৎপত্তিসমূহ' (derivations)। অবশেষগুলি হ'ল মানবীয় আচরণের স্থায়ী ও অপরবির্তনীয় উপাদান এবং

কর্মপ্রবৃত্তিমূলক। এগুলি ঠিক অনুভূতি নয়, বরং অনুভূতির প্রকাশক। অবশেষগুলি অনুভূতি ও কর্মের মাঝামাঝি অবস্থান করে। ব্যুৎপত্তিগুলি হল অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল উপাদান। এগুলি হ'ল অযৌক্তিক আচরণের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যাপ্রদান। যেমন চৈনিক খাদ্য পছন্দ করাটা হল ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। কিন্তু চৈনিক খাদ্যরসিক ব্যক্তি যদি সেই খাদ্যের উৎকর্ষজ্ঞাপক ব্যাখ্যা প্রদান করে, তবে তা হ'ল ব্যুৎপত্তিমাত্র। ব্যুৎপত্তিগুলি গড়ে ওঠে মানুষের আচরণ সংক্রান্ত যুক্তি, বিশ্লেষণ, তর্কবিতর্ক ও আদর্শগত সমর্থন খোঁজার মাধ্যমে। প্যারেটোর মতে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাননীয় আচরণসংক্রান্ত ধারণা ও তত্ত্বাবলীকে যেভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে সেভাবে গ্রহণ না করে বরং এসকল ধারণা ও তত্ত্বাবলীর মাধ্যমে মানুষ কিভাবে তার আচরণের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছে তার অন্বেষণ করবে।

প্যারেটো অবশেষগুলিকে নিম্নলিখিত ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন ঃ (১) সংযোগ স্থাপন করার প্রবৃত্তি, যার দ্বারা মানুষ বিভিন্ন বস্তু বা অবস্থাকে সংযুক্ত করে এবং উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় দেয় ; (২) সমষ্টির স্থায়িত্বের অবশেষ যার মাধ্যমে সামাজিক ঐক্যসাধনের ও স্থায়িত্বরক্ষার রক্ষণশীল প্রবণতার প্রকাশ ঘটে ; (৩) অনুভূতির অভিব্যক্তির অবশেষ যা মানুষকে আত্মপ্রকাশে প্রণোদিত করে ; (৪) সামাজিকতার অবশেষ, অথবা সমাজগঠন ও একই ধরনের আচরণপদ্ধতি গড়ে তোলার তাড়না ; (৫) ব্যক্তিগত ন্যায়পরায়ণতার অবশেষ যার ফলে ফৌজদারী আইনের মত প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে ওঠে ; এবং (৬) যৌনপ্রবৃত্তিঘটিত অবশেষ। এদের মধ্যে প্রথম দু'টি অবশেষের কোন একটির আধিক্যের ভিত্তিতে প্যারেটো পূর্বোক্ত অধ্যায়ে উল্লিখিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। শৃগালদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার প্রবৃত্তির আধিক্য থাকে এবং সিংহদের মধ্যে সমষ্টির স্থায়িত্বের অবশেষের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। অ্যাঁরো বলেছেন, প্যারেটোর এই অবশেষসমূহের শ্রেণীবিভাগ প্রমাণ করে যে মানুষের আচরণ সংগঠিত, আচরণের প্রবৃত্তিগুলি নিয়মশৃঙ্খলাহীন নয়, মানুষের প্রকৃতিতে এক অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিরাজ করে এবং সমাজে মানুষের অযৌক্তিক পরীক্ষামূলক আচরণেও এক ধরনের যুক্তিবিন্যাস দেখা যায়।

ব্যুৎপত্তিগুলিকেও প্যারেটো নিম্নলিখিত চারভাগে ভাগ করেছেন ঃ (১) নিশ্চিত উক্তিঘটিত ব্যুৎপত্তি ঘটনা ও অনুভূতিসংক্রান্ত দৃঢ়কথন (affirmation) যার অন্তর্গত ; (২) কর্তৃত্বঘটিত ব্যুৎপত্তি যে কর্তৃত্ব ব্যক্তিনির্ভর, গোষ্ঠীনির্ভর, প্রথানির্ভর বা দৈবনির্ভর হতে পারে ; (৩) সাধারণ ভাবপ্রবণতা ও নীতিসমূহের অনুসারী ও সেগুলির রক্ষক ব্যুৎপত্তি ; এবং (৪) বাচনিক প্রমাণঘটিত ব্যুৎপত্তি যেগুলিকে রূপক বা উপমা হিসাবে প্রকাশিত হয়। অবশেষ ও ব্যুৎপত্তির বিশ্লেষণের দ্বারা প্যারেটো সেই আচরণকে উদ্‌ঘাটিত করেন যা ক্রিয়ারত ব্যক্তির কাছে যৌক্তিক হিসাবে প্রতিভাত হ'লেও নিরপেক্ষ পর্যপেক্ষকের কাছে অযৌক্তিক হিসাবে গণ্য হয়।

প্যারেটোর মতে, ক্রিয়ারত ব্যক্তির উপলব্ধি ও ব্যাখ্যায় তার আচরণের প্রকৃত কারণের সন্ধান মেলে না। বিভিন্ন ব্যুৎপত্তির অন্তর্দেশে নির্দিষ্ট অবশেষের তাড়নার দ্বারা বিভিন্ন মানুষের একই ধরনের আচরণের ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হবে। যেমন প্যারেটো বলেছেন, "একজন চৈনিক, একজন মুসলমান, একজন ক্যালভিনপন্থী, একজন ক্যাথলিক, একজন কান্টের অনুগামী, একজন হেগেলের অনুগামী, একজন বস্তুবাদী—সকলেই চৌর্য থেকে বিরত থাকে ; কিন্তু প্রত্যেকেই তার আচরণের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়।" প্যারেটো কিন্তু মনে করেন যে, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের অনুগামীদের ব্যক্তিগত সততা ও আত্মমর্যাদা রক্ষার একই রকম প্রয়োজন বিদ্যমান। অতএব পঞ্চম অবশেষ বা ব্যক্তিগত ন্যায়পরায়ণতার অবশেষই হ'ল তাদের আচরণের সত্যকার কারণ। এ ব্যাপরে তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক ব্যাখ্যা হ'ল পরবর্তীকালে উদ্ভাসিত যৌক্তিকতা প্রদান মাত্র।

প্যারেটোর মতে, কোন মতবাদে বিশ্বাসীর সাথে সেই মতবাদের সঠিকতা নিয়ে বিতর্ক নিস্ফল। শুধু

বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টির দ্বারাই আমরা মানুষের আচরণের যৌক্তিক ব্যাখ্যার অসারতা এবং মানুষের মূলগত অবশেষসমূহ থেকে বিভিন্ন তত্ত্ব ও ভাবাদর্শের উৎপত্তির বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হব। এই পদ্ধতিতে আমরা নিজেদের ও অপরের আচরণ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করে পরিশেষে মানবীয় আচরণবিজ্ঞান গড়ে তুলতে সমর্থ হব।

অনুশীলনী - ৯

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

(ক) প্যারেটোর মতে, মানুষের অধিকাংশ কর্মই হ'ল ———।

(খ) অবশেষগুলি ——— ও কর্মের মাঝামাঝি অবস্থান করে।

(গ) ———গড়ে ওঠে মানুষের আচরণসংক্রান্ত যুক্তি-বিশ্লেষণ, তর্কবিতর্ক ও আদর্শগত সমর্থন খোঁজার মাধ্যমে।

(ঘ) প্যারেটোর মতে, বিভিন্ন ব্যুৎপত্তির অন্তর্দেশে অবস্থিত নির্দিষ্ট ——— তাড়নার দ্বারা বিভিন্ন মানুষের একই ধরনের আচরণের ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হবে।

২) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) প্যারেটোর মতে, বাস্তবে মানুষ প্রথম চিন্তাপূর্বক তার ধারণাগুলি গড়ে তোলে এবং পরে সে ঐসব ধারণা অনুযায়ী কাজ করে।

(খ) প্যারেটোর মতে, শৃগালদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার প্রবৃত্তির আধিক্য থাকে।

(গ) প্যারেটোর মতে, ক্রিয়ারত ব্যক্তির উপলব্ধি ওব্যাখ্যায় তার আচরণের প্রকৃত কারণের সন্ধান মেলে।

(ঘ) প্যারেটোর মতে, কোন মতবাদে বিশ্বাসীর সাথে সেই মতবাদের সঠিকতা নিয়ে বিতর্ক নিস্ফল।

৭.৫ সারাংশ

হ্বেবারের মতে, সমাজতত্ত্ব সামাজিক ক্রিয়ার মর্মগ্রহণমূলক অনুধাবনের চেষ্টার দ্বারা সামাজিক ক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি ও ফলাফলসমূহের একটি কার্যকারণ সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় পৌঁছতে চেষ্টা করে। এই মর্মগ্রহণের জন্য সহানুভূতিমূলক ও বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর্দশন দরকার যাকে হ্বেবার 'ফের্স্তেহেন' বলেছেন। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই বোঝা ও ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু সামাজিক ঘটনাগুলিকে বুঝতে গেলে সেগুলির মর্মগ্রহণ করা দরকার। এগুলি ঠিকমত অনুধাবন করার জন্য নিজেকে সেই অবস্থায় প্রক্ষেপ করা দরকার। সামাজিক ঘটনাগুলি যারা ঘটাচেছ তাদের মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও আশাকে না বুঝে ঘটনাগুলি বুঝে উঠতে পারব না।

হ্বেবারের মতে, ক্রিয়া তখনই সামাজিক হয়ে ওঠে যখন ক্রিয়ারত ব্যক্তির ব্যক্তিসাপেক্ষ অর্থ আরোপিত হওয়ার ফলে এক ব্যক্তি অন্যের ব্যবহারকে গ্রাহ্য করে এবং ক্রিয়াটির গতিপ্রকৃতি তার দ্বারা নির্ধারিত হয়। সমস্ত পারস্পরিক ক্রিয়া বা আচরণ সামাজিক হয় না। সমাজতত্ত্বের উদ্দেশ্য হ'ল সামাজিক ক্রিয়াকে বোঝা। হ্বেবার সামাজিক ক্রিয়াকে নিম্নোক্ত চারভাগে ভাগ করেছেন ঃ (ক) যুক্তিবাদী উদ্দেশ্যসাধক ক্রিয়া ; (খ) যুক্তিবাদী মূল্যবোধ প্রভাবিত ক্রিয়া ; (গ) হৃদয়াবেগসঞ্জাত ক্রিয়া এবং (ঘ) ঐতিহ্যানুসারী ক্রিয়া।

আদর্শরূপ হ'ল হ্বেবারের দ্বারা উদ্ভাবিত এক ধরনের ধারণাগত নির্মিত যার মাধ্যমে বিভিন আপাত সম্পর্কহীন

ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যকে অনুধাবন করা যায় এবং বাস্তব ক্ষেত্রে আদর্শ থেকে বিচ্যুতির পরিমাণও পরিমাপ করা যায়। এর সঙ্গে মূল্য বিচারের কোন সম্পর্ক নেই। আদর্শরূপ গঠনের ক্ষেত্রে গোটা বিষয়টির কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে নির্বাচন করে নেওয়া হয় বা জোর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। একারণে বাস্তব ঘটনা কখনই এই নির্মিতিটির ঠিক অনুরূপ হয় না, কিন্তু তা অনেকাংশে নির্মিতিটির কাছাকাছি আসে।

এই আদর্শরূপের ধারণা হ্বেবার তিন ধরনের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন। প্রথম ধরনের আদর্শরূপের ধারণার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে— যেমন পাশ্চাত্য ধনতন্ত্র ও প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টীয় ধর্মমত— তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধরনের আদর্শরূপের ধারণা গড়ে উঠেছে আমলাতন্ত্র বা কর্তৃত্বের ধারণার মত ঐতিহাসিক বাস্তবতার বিমূর্ত স্বরূপকে কেন্দ্র করে। তৃতীয় ধরনের আদর্শরূপের সামাজিক ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রকারের (যেমন যুক্তিবাদী উদ্দেশ্যসাধক ক্রিয়া, যুক্তিবাদী মূল্যবোধ প্রভাবিত ক্রিয়া, হৃদয়াবেগ— সঞ্জাত ক্রিয়া ও ঐতিহ্যানুসারী ক্রিয়া) ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়।

পুঁজিবাদের আবির্ভাবের কারণ হিসাবে মার্ক্স অর্থনৈতিক কারণের উপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাথে ভিন্নমত হয়ে হ্বেবার বলেছেন যে, অর্থনৈতিক কারণ সমাজ-পরিবর্তনের একটি উপাদান মাত্র এবং ধর্মও অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে। তাঁর 'প্রোটেস্টান্ট এথিক অ্যান্ড দ্য স্পিরিটি অব ক্যাপিটালিজম্' নামক গ্রন্থে হ্বেবার দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে যদিও প্রোটেস্টান্ট ধর্মের বিকাশই পুঁজিবাদের আবির্ভাবের একমাত্র কারণ নয়, তবু প্রোটেস্টান্ট নীতিবোধ এব্যাপারে প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। তাঁর মতে, আধুনিক পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হ'ল সীমাহীন সঞ্চয়ের ধারণা এবং লাভের জন্য ফাটকাবাজি ও ঝুঁকিবহুল উদ্যোগের উপর জোর না দিয়ে অধ্যবসায় ও যুক্তিবাদী পরিশ্রমের উপর জোর দেওয়া। প্রোটেস্টান্ট ধর্মের নমুনা হিসাবে হ্বেবার ক্যালভিনের ধর্মমতকে গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মের আধ্যাত্মিক দিকের উপর ততটা গুরুত্ব তিনি দেননি যতটা তিনি ধর্মের অর্থনৈতিক নীতিবোধের উপরে দিয়েছিলেন।

হ্বেবারের মতে, ক্যালভিনীয় নীতিবোধ মানুষের মনকে ধর্মীয় রহস্যবোধ থেকে মুক্ত করে এনে মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানসম্মত মানসিকতার উন্মেষ ঘটিয়েছে। যেখানে ক্যাথলিক ধর্মমতে পরিশ্রমকে আদিপাপের শাস্তি বলে মনে করা হয় যা আজও মানুষকে বহন করতে হচ্ছে, প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত অনুসারে সেখানে কর্মই হ'ল ধর্ম। ক্যাথলিকদের বর্ষপঞ্জী ছুটির দিনে ভরা কারণ তাদের মতে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের জন্য অবসর দরকার। কিন্তু প্রোটেস্টান্টরা কর্মের মাধ্যমে ধর্মপালনের উপর জোর দিয়ে কলকারখানা ও ব্যবাসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি সপ্তাহের সাত দিনই খোলা রাখতে বলে। ক্যালভিনের মতে, প্রত্যেকেরই একটি বৃত্তি বেছে নিয়ে পার্থিব সাফল্য লাভ করার চেষ্টা করা উচিত। এই নতুন নীতিবোধ অনুযায়ী একজন ধার্মিক ব্যক্তির পক্ষে দারিদ্র্য বরণ করা, সন্ন্যাস নেওয়া, কৃচ্ছ্রসাধন ও তীর্থযাত্রার আবশ্যকতা আর থাকল না। এই নীতিবোধ অনুযায়ী মানুষ লাভজনক কাজ করে এবং ধনসঞ্চয়ের দ্বারাই ধর্মাচরণ করতে সক্ষম হ'ল। এছাড়াও ক্যাথলিক অনুশাসনের বিপরীতে গিয়ে ক্যালভিন ঋণের উপর সুদগ্রহণের ব্যাপারে আধ্যাত্মিক অনুমোদন দেন। ফলে বিভিন্ন ঋণদানকারী সংস্থা গড়ে উঠলো এবং মূলধন সঞ্চিত হতে লাগলো। প্রোটেস্টান্ট অনুশাসন মদ্যপান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখভোগকে নিরুৎসাহিত করে। এতেও অর্থের অপব্যয় রুদ্ধ হয়ে পুঁজির জন্য অর্থের সঞ্চয় সম্ভব হ'ল। পরিশেষে প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত প্রত্যেক ব্যক্তির নিজে বাইবেল পড়তে পারা উচিৎ এই ঘোষণার দ্বারা সাক্ষরতা এবং সাধারণ ও বিশেষীকৃত শিক্ষাবিস্তারে প্রেরণা যোগাল। ইউরোপে ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের পিছনে হ্বেবার বিভিন্ন উপাদানের অবদানকে মেনেয় নিয়েও বলেছেন যে যুক্তিবাদী অর্থনৈতিক নীতিবোধ— যা প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত থেকে উদ্‌গত হয়েছিল— এব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

হ্বেবার হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম, ইহুদী ধর্ম ও কনফিউসিয়াস-প্রচারিত ধর্মের অর্থনৈতিক নীতিবোধ এবং অনুগামীদের অর্থনীতির উপর ঐ নীতিবোধের প্রভাব নিয়েও আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ভারতবর্ষেও কতকগুলি আর্থ-সামাজিক প্রভাবের ফলে আভ্যন্তরীণভাবে ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু হিন্দুধর্মের কর্মফলবাদ ও বর্ণব্যবস্থা এবিষয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

হ্বেবার 'আদর্শরূপ' নামক বিশেষ পদ্ধতিটির প্রয়োগপূর্বক বিশুদ্ধ আমলাতন্ত্রের একটি তাত্ত্বিক প্রকরণ গড়ে তুলেছেন। তিনি আমলাতন্ত্রের নিম্নলিখিত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন—

(১) আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর প্রয়োজনীয় কার্যাবলীকে কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব হিসাবে বিভিন্ন কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করা হয়।

(২) এসকল দায়িত্ব পালনের জন্য আধিকারিকরা যথেষ্ট আইনগতভাবে লিপিবদ্ধ কর্তৃত্ব পায় যার মধ্যে শাস্তিদানেরও ব্যবস্থা করা থাকে।

(৩) আধিকারিকদের কর্মসম্পাদনের জন্য অন্যান্য পদ্ধতিগত ব্যবস্থাও থাকে।

(৪) কর্মক্ষেত্রে সংগঠন উচ্চাবচ বিন্যাসের উপর স্থাপিত হয়।

(৫) বিভিন্ন স্থায়ী ও বিশদ বিমূর্ত রীতির একটি সুসমঞ্জস ব্যবস্থা হিসাবে কার্যাদি পরিচালিত হয় এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এই রীতিগুলি প্রযুক্ত হয়।

(৬) দফতর পরিচালিত হয় লিখিত নথিপত্রের ভিত্তিতে।

(৭) প্রত্যেক আধিকারিকের একটি নির্দিষ্ট অধিকারভুক্তি থাকে।

(৮) যোগ্যতা যাচাই বা পরীক্ষার মাধ্যমে আমলাতান্ত্রিক কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়। তাদের খুশিমত বরখাস্ত করা যায় না।

(৯) প্রতি কর্মচারী নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন এবং কর্মান্তে বার্ধক্যভাতা লাভ করে।

(১০) বেতন ছাড়া অন্য লাভের উৎস হিসাবে আমলাতান্ত্রিক পদকে ব্যবহার করা যায় না।

(১১) কর্মচারীর ব্যক্তিগত জীবন থেকে তার দফতরকে সর্ব ব্যাপারে পৃথকীকৃত করা হয়।

(১২) একটি পূর্ণ বিকশিত দফতরে কার্যাদি সম্পাদনের জন্য কর্মচারীকে তার কর্মক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করতে হয়।

(১৩) এক আনুষ্ঠানিক নৈর্ব্যক্তিকতার মনোভাব নিয়ে আদর্শ আমলা দফতরের কর্মসম্পাদন করে।

(১৪) আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সর্বাধিক কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পারে।

(১৫) পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত আমলাতান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করা অত্যন্ত কঠিন। হ্বেবার অবশ্য এবিষয়ে অবহিত ছিলেন যে, রীতিনীতির আধিক্য আমলার নিজস্ব উদ্যোগ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতাকে খর্ব করে এবং আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর কাঠিন্য ও অদক্ষতা বৃদ্ধি করায়।

হ্বেবারের মতে, মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির প্রচলন ও নিয়মিত কর আদায়ের প্রয়োজন, প্রযুক্তির উন্নতির

ফলস্বরূপ ভোগপণ্যসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিভিন্ন শিল্পবাণিজ্যিক সংস্থাকর্তৃক সেগুলি বিপণনের প্রয়োজন, আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের বর্ধিত কর্মসম্পাদন ইত্যাদি কারণে বর্তমান যুগে আমলাতান্ত্রিক সংগঠন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। হ্বেবার বলেছেন যে, আধুনিক জীবনযাত্রা প্রণালী ও অর্থনীতির যুক্তিসম্মতকরণের সাথে আমলাতন্ত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলত আমলাতন্ত্র আধুনিক সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে—সসস্ত গুরুত্বপূর্ণ সংঘ ও সংগঠনে—পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে।

প্যারেটোর মতে, কোন কাজকে তখনই যৌক্তিক বলা যায় যখন বিষয়গতভাবে কাজটির উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। যেসব কাজ এই যৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের আওতায় পড়ে না সেগুলি হ'ল অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ। প্যারেটোর মতে মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ যৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ খুব কম দেখা যায়। অযৌক্তিক কার্যকলাপকে প্যারেটো নিম্নলিখিত চারভাগে ভাগ করেছেন ঃ—

(১) প্রথম ধরণের অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে বিষয়গত বা বিষয়ীগত কোনস্তরেই উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকে না।

(২) দ্বিতীয় ধরনের অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে বাস্তবে উদ্দেশ্য ও উপায় সামঞ্জস্যহীন হয়। কিন্তু ক্রিয়ারত ব্যক্তি ভুলবশত মনে করে যে গৃহীত উপায়গুলির দ্বারা তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

(৩) তৃতীয় ধরনের অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে বাস্তবে উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু ক্রিয়ারত ব্যক্তি এব্যাপারে সচেতন নয়।

(৪) চতুর্থ ধরনের অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে বাস্তবে ঘটা ফলগুলি গৃহীত উপায়গুলির যুক্তিসঙ্গত পরিণাম। আবার ক্রিয়ারত ব্যক্তির চিন্তাভাবনা অনুযায়ীও উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত স্তরে ও বস্তুগত স্তরে এই কর্মের ফলাফল ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

প্যারেটোর মতে, যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ যুক্তিসঙ্গত আচরণ করে না। সে কিন্তু নিজের কাছে ও অপরের কাছে নিজের কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চায়। দেওয়ালী আইন তত্ত্বগতভাবে যৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের একটি বিশেষ ধরন। কিন্তু প্যারেটোর মতে, বিচারালয়ের সিদ্ধান্তগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অযৌক্তিক উপাদান (যেমন বিচারকদের ব্যক্তিগত খামখেয়াল বা আকস্মিক ঘটনা)-র উপর নির্ভর করে। খুব কম ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ আইনের উপর ভিত্তি করে রায় দেওয়া হয়। বরং অন্যভাবে উপনীত রায়ের যৌক্তিকতা সম্পাদনের জন্য লিপিবদ্ধ আইনের উল্লেখ করা হয়।

প্যারেটোর মতে, অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত চারটি উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে—(ক) ক্রিয়ারত ব্যক্তির মনের অবস্থা ; (খ) গোঁড়া মতবাদ ; (গ) ক্রিয়ারত ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকাশ এবং (ঘ) ক্রিয়ারত ব্যক্তির আচরণ।

প্যারেটো মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। একদল মানুষ নমনীয়ভাবে পরিস্থিতির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং আদর্শের তুলনায় বস্তুবাদী উদ্দেশ্যকে বেশি প্রাধান্য দেয়। প্রতারণা ও প্রচারের দ্বারা এরা ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষা করে। আর একদল মানুষ হ'ল অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল এবং বিশ্বাস ও আদর্শ দ্বারা চালিত। এরা বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষা করে। ম্যাকিয়াভেলির অনুকরণে প্যারেটো এই দু'দল মানুষকে যথাক্রমে 'শৃগাল' ও 'সিংহ' বলেছেন। যে কোন গোষ্ঠীতে সবচেয়ে সমর্থ ব্যক্তিদের প্যারেটো 'শ্রেষ্ঠ

ব্যক্তিবর্গ বলে উল্লেখ করেছেন। এরা নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সফল। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে প্যারেটো আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন—শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ও অশাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। প্যারেটোর মতে, আদর্শ শাসকগোষ্ঠী একই সাথে শৃগালোপম ব্যক্তিবর্গ এবং সিংহোপম ব্যক্তিবর্গ উভয়কে নিয়ে গঠিত হবে। যখন শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে এই উভয়প্রকার বিরোধী গুণাবলীর সুষ্ঠু মিশ্রণ বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় অনমনীয় আমলাদের হাতে অথবা কলহপ্রবণ আইনজ্ঞ ও বাকপটুদের হাতে। এরকম ক্ষেত্রে শাসিত জনগণ শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করে এবং নতুন শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ক্ষমতা দখল করে। প্রত্যেক সমাজেই সম্ভাব্য ও অসন্তুষ্ট নেতারা থাকে। এদের হয় শাসকগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে অথবা অপসারিত করতে হবে। যখন কোন শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ অনেকদিন ধরে ক্ষমতায় আসীন থাকে তখন তারা সম্ভাব্য নেতাদের প্রতি সহনশীল ও বলপ্রয়োগে অনিচ্ছুক হয়ে পড়তে পারে। তখন সিংহতুল্য নেতৃবর্গ (যারা শাসককুলের অন্তর্ভুক্ত নয়) জনসাধারণকে শৃগালতুল্য শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে পারে। এভাবেই শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ গঠিত হয়, শাসন করে, অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয় এবং পরিশেষে নতুন শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা অপসারিত হয়। শাসকশ্রেণী দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আসীন থাকলে তারা সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে অনিচ্ছুক ও অপারগ হয়ে পড়তে পারে। এক্ষেত্রেও নিম্নশ্রেণী থেকে উদ্ভূত নতুন ও সমর্থ শাসককুল পুরাতন শাসকশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে। কিন্তু সিংহরা শৃগালদের সরিয়ে ক্ষমতা দখল করলেও পরবর্তীকালে নিজেদের বুদ্ধিবলে শৃগালরা আবার ক্ষমতা দখল করবে। শাসকবর্গের চক্রবৎ আবর্তন এভাবে চলতেই থাকে।

প্যারেটোর মতে, মানুষের অধিকাংশ কাজই অযৌক্তিক হ'লেও মানুষ তার আচরণকে যুক্তিসম্মত বলেই মনে করে এবং তার আচরণের যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে চায়। মানুষ তার ধারণাগুলি গড়ে তুলে তার ভিত্তিতে কাজ করে না। বরং যে প্রথমে কাজ করে পরে তার যুক্তি সম্মত ব্যাখ্যা দেয়। প্যারেটো অবশেষ বলতে বুঝিয়েছেন মানবীয় আচরণের স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় উপাদান যেগুলি হ'ল অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল উপাদান। অবশেষগুলি অনুভূতি ও কর্মের মাঝামাঝি বিরাজ করে। আর ব্যুৎপত্তিগুলি গড়ে ওঠে মানুষের আচরণসংক্রান্ত যুক্তি-বিশ্লেষণ, তর্কবিতর্ক ও আদর্শগত সমর্থন খোঁজার মাধ্যমে। প্যারেটো অবশেষগুলিকে নিম্নোক্ত ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন ঃ (১) সংযোগ স্থাপন করার প্রবৃত্তি ; (২) সমষ্টির স্থায়িত্বের অবশেষ ; (৩) অনুভূতির অভিব্যক্তির অবশেষ ; (৪) সামাজিকতার অবশেষ ; (৫) ব্যক্তিগত ন্যায়পরায়নতার অবশেষ এবং (৬) যৌনপ্রবৃত্তিঘটিত অবশেষ। ব্যুৎপত্তিগুলিকেও প্যারেটো নিম্নলিখিত চারভাগে ভাগ করেছেনঃ (১) নিশ্চিত উক্তিঘটিত ব্যুৎপত্তি ; (২) কর্তৃত্বঘটিত ব্যুৎপত্তি ; (৩) সাধারণ ভাবপ্রবণতা ও নীতিসমূহের অনুসারী ও সেগুলির রক্ষক ব্যুৎপত্তি। অবশেষ ও ব্যুৎপত্তির বিশ্লেষণের দ্বারা প্যারেটো সেই আচরণকে উদঘাটিত করেন যা ক্রিয়ারত ব্যক্তির কাছে যৌক্তিক বলে প্রতিভাব হ'লেও নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের কাছে অযৌক্তিক হিসাবে গণ্য হয়। ক্রিয়ারত ব্যক্তির উপলব্ধি ও ব্যাখ্যায় তার আচরণের প্রকৃত কারণের সন্ধান মেলে না। বিভিন্ন ব্যুৎপত্তির অন্তর্দেশ অবস্থিত নির্দিষ্ট অবশেষের তাড়নার দ্বারা বিভিন্ন মানুষের একই ধরনের আচরণকে ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হবে। শুধু বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টির দ্বারাই আমরা মানুষের আচরণকে যৌক্তিক ব্যাখ্যার অসারতা এবং মানুষের মূলগত অবশেষসমূহ থেকে বিভিন্ন তত্ত্ব ও ভাবাদর্শের উৎপত্তির বিষয়টি বুঝতে পারব। এইভাবে আমরা নিজেদের ও অপরের আচরণ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করে পরিশেষ একটি মানবীয় আচরণ বিজ্ঞান গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

৭.৬ অনুশীলনী

১) হ্বেবার সমাজতত্ত্বকে কিভাবে বুঝেছেন ? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২) বুদ্ধিদীপ্ত ও অন্তর্দর্শনমূলক মর্মগ্রহণের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করুন। দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৩) হ্বেবারের মতে কখন ক্রিয়া সামাজিক হয়ে ওঠে এবং সামাজিক হয়না ? একশোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৪) হ্বেবার সামাজিক ক্রিয়াকে কি কি ভাগে ভাগ করেছেন তার বিশদ বর্ণনা করুন। দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৫) সমাজ-পরিবর্তনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হ্বেবার মার্ক্সের থেকে কি ধরনের ভিন্নমত পোষণ করতেন ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৬) হ্বেবার আধুনিক পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের কোন বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছিলেন এবং প্রোটেস্টান্ট ধর্মতন্ত্রের নমুনা হিসাবে কি গ্রহণ করেছিলেন ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৭) ক্যালভিনের ধর্মমতে কিভাবে ধর্মাচরণের পদ্ধতি হিসাবে উৎপাদনমূলক কর্ম ও পার্থিব সমৃদ্ধি লাভের চেষ্টার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৮) কিভাবে প্রোটেস্টান্ট অনুশাসন দ্বারা অর্থের অপব্যয় রুদ্ধ হ'ল এবং পুঁজির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চিত হতে থাকল ? দেড়শটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৯) হ্বেবার কিভাবে প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টীয় নীতিবোধ ছাড়াও পৃথিবীর আরও কয়েকটি ধর্মের অর্থনৈতিক নীতিবোধের প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন ? দেড়শটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১০) আদর্শরূপের ধারণাটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন। দেড়শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১১) হ্বেবার আদর্শরূপের ধারণা কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন ? দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১২) হ্বেবার আদর্শরূপের ধারণা প্রয়োগের কোন কোন সীমাবদ্ধতা ও বিপদের কথা বলেছেন ? দেড়শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১৩) হ্বেবারকে অনুসরণপূর্বক আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের বিশ্লেষণ করুন। পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১৪) হ্বেবারের মতে কোন কোন যুক্তিসঙ্গত নীতির উপর আমলাতান্ত্রিক কাঠামো সংগঠিত হয় ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১৫) আমলাদের অবস্থান, অধিকার ও দায়িত্বের কি ধরনের চিত্র হ্বেবার দিয়েছেন ? দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১৬) হ্বেবারকে অনুসরণপূর্বক আমলাতন্ত্রের শক্তির বিবরণ দিন। একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন ?

১৭) হ্বেবারের মতে আধুনিক আমলাতন্ত্রের আবির্ভাবের কারণ কি কি ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন ?

১৮) প্যারেটো যৌক্তিক ও অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ কাকে বলেছেন ? দেড়শটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১৯) ধর্মীয় ও জাদুবিদ্যামূলক অনুষ্ঠানাদি প্যারেটো কি ধরনের অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২০) প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে প্যারেটো কি ধরনের অযৌক্তিক কার্যাদির অন্তর্ভুক্ত করেছেন ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২১) শান্তিবাদী, মানবদরদী, রাজনৈতিক নেতা প্রভৃতির ভ্রান্ত আশার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত কার্যাদিকে প্যারেটো কি ধরনের অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২২) কিভাবে প্যারেটোর মতে মানুষ যুক্তিসঙ্গত আচরণ না করলেও নিজের কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চায় ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন ?

২৩) প্যারেটো কিভাবে দেওয়ানী আইন ও বিচারালয়ে রায়দান পদ্ধতির বিশ্লেষণ করেছেন ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২৪) প্যারেটোর মতে অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে কি কি উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ থাকে ? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২৫) প্যারেটো কাদের 'শৃগাল' এবং কাদের 'সিংহ' বলেছেন ? দেড়শটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২৬) প্যারেটো 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ' কাদের বলেছেন এবং কি কি ভাগে ভাগ করেছেন ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২৭) প্যারেটোর মতে কি ধরনের শাসকগোষ্ঠী আদর্শ এবং কি ধরনের শাসকগোষ্ঠী আদর্শ নয় ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২৮) কি ভাবে শাসকবর্গের চক্রবৎ আবর্তন চলে ? দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২৯) অবশেষে ও ব্যুৎপত্তিগুলির মধ্যে প্যারেটো কিভাবে পার্থক্য করেছেন ? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৩০) প্যারেটো অবশেষগুলিকে কি কি ভাগে ভাগ করেছেন ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৩১) প্যারেটো ব্যুৎপত্তিগুলিকে কি কি ভাগে ভাগ করেছেন ? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৭.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

১) (ক) আইন

(খ) অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর

(গ) টনিজ

(ঘ) পরামর্শদাতা

(ঙ) ভিয়েনা

অনুশীলনী - ২

১) (ক) × (খ) ✓ (গ) ✓ (ঘ) ✓ (ঙ) × (চ) ×

২) (ক) বুদ্ধিদীপ্ত

(খ) চার

(গ) হৃদয়াবেগ সঞ্জাত

(ঘ) উদ্দেশ্যসাধক

অনুশীলনী - ৩

১) (ক) ×

(খ) ✓

(গ) ✓

(ঘ) ✓

(ঙ) ×

২) (ক) তিন

(খ) ঐতিহাসিক

(গ) যুক্তিগ্রাহ্য-আইনভিত্তিক

অনুশলনী - ৪

১) (ক) মার্ক্স

(খ) সঞ্চয়

(গ) ক্যালভিন

(ঘ) অর্থনৈতিক

(ঙ) আদিপাপ

(চ) কর্ম

(ছ) বর্ণব্যবস্থা

২) (ক) × (খ) ✓ (গ) ✓ (ঘ) ✓ (ঙ) × (চ) ✓ (ছ) ✓

অনুশীলনী - ৫

১) (ক) আদর্শরূপ (খ) শাস্তিদায়ক (গ) উচ্চাবচ (ঘ) বিমূর্ত (ঙ) আদিম রূপে

(চ) অধিকারভুক্তি (ছ) আত্মসাৎ (জ) পূর্ণবিকশিত (ঝ) নৈর্ব্যক্তিকতার (ঞ) অভঙ্গুর

অনুশীলনী - ৬

১) (ক) লসেন

(খ) ১৯০৬

(গ) সেনেটর

২) (ক) × (খ) ✓ (গ) ×

অনুশীলনী - ৭

১) (ক) ✓ (খ) × (গ) ✓ (ঘ) ✓ (ঙ) ×

২) (ক) বিষয়ীগত

(খ) চার

(গ) বাস্তবের মনোজগতের

(ঘ) বৈজ্ঞানিক

(ঙ) তত্ত্বগতভাবে

অনুশীলনী - ৮

১) (ক) দু'ভাগ

(খ) ম্যাকিয়াভেলি সিংহ

(গ) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ

(ঘ) শাসক অশাসক

(ঙ) শৃগালতুল্য সিংহতুল্য

(চ) বলপ্রয়োগ

(ছ) কবরখানা

(জ) চক্রবৎ

অনুশীলনী - ৯

১) (ক) অযৌক্তিক

(খ) অনুভূতি

(গ) ব্যুৎপত্তিগুলি

(ঘ) অবশেষের

২ (ক) ×

(খ) ✓

(গ) ×

(ঘ) ✓

অনুশীলনী

১) ৭.৩.১ অনুচ্ছেদের প্রথম পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) মানুষের ক্রিয়াকলাপের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের সম্ভাব্যতা।

(খ) সমাজতত্ত্বের সাথে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির অধিক মিল।

(গ) হ্বেবার প্রদত্ত সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা।

২) ৭.৩.১ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তিদ্বয় দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) সহানুভূতিমূলক ও বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর্দর্শনের পদ্ধতি বা ফেরস্তেহেন।

(খ) মাক্স হ্বেবারের তত্ত্বের ম্যাকাইভার-কৃত ব্যাখ্যা ঃ প্রকৃতিবিজ্ঞানের ঘটনাবলী ও সমাজবিজ্ঞানের ঘটনাবলী বোঝার পদ্ধতির পার্থক্য এবং মানুষের বোঝার সীমাবদ্ধতা।

৩) ৭.৩.১ অনুচ্ছেদের চতুর্থ পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) হ্বেবারের প্রদত্ত সমাজিক ক্রিয়ার সংজ্ঞা এবং এই সংজ্ঞা বহিঃক্রিয়াদির অসামাজিক প্রকৃতি।

(খ) সাইকেল চালকদের ধাক্কা লাগার উদাহরণ।

৪) ৭.৩.১ অনুচ্ছেদের শেষাংশে সামাজিক ক্রিয়ার বিভিন্ন ভাগ [(ক), (খ), (গ) এবং (ঘ)] দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক —

(ক) সামাজিক ক্রিয়ার হ্বেবর-কৃত চারটি ভাগ।

(খ) যুক্তিবাদী উদ্দেশ্যসাধক ক্রিয়া

(গ) যুক্তিবাদী মূল্যবোধ-প্রভাবিত ক্রিয়া

(ঘ) হৃদয়াবেগ সঞ্জাত ক্রিয়া

(ঙ) ঐতিহ্যানুসারী ক্রিয়া।

৫) ৭.৩.৩ অনুচ্ছেদের প্রথম পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) ইংল্যান্ড ও জার্মানিতে পুঁজিবাদের আবর্ভাবের পার্থক্য ও চিন্তজগতে তার ফল

(খ) মার্ক্স-কৃত অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হ্বেবারের ভিন্নমত পোষণ

(গ) অর্থনীতির উপর ধর্মের প্রভাবের ব্যাপারে হ্বেবারের মত।

৬) ৭.৩.৩ অনুচ্ছেদের তৃতীয় পংক্তিটির প্রথমাংশ দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) আধুনিক পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

(খ) প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের নমুনা হিসাবে ক্যালভিনের ধর্মমত।

৭) ৭.৩.৩ অনুচ্ছেদের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পংক্তিগুলি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতে পরিশ্রম সম্বন্ধে আলাদা ধারণা (২য় সূত্র)

(খ) ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট বর্ষপঞ্জীর পার্থক্য (৩য় সূত্র)

(গ) পার্থিব সাফল্যের ক্যালভিন-কথিত প্রয়োজন (৪র্থ সূত্র)।

৮) ৭.৩.৩ অনুচ্ছেদের অষ্টম, দশম ও একাদশ পংক্তিগুলি দেখুন। অষ্টম পংক্তি সংক্রান্ত আলোচনা শেষে আসবে। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট অনুশাসনে মদ্যপান বিষয়ে ভিন্ন নির্দেশ (৭ম সূত্র)

(খ) প্রোটেস্টান্ট অনুশাসনে পার্থিব সুখভোগের উপর নিষেধাজ্ঞা (৮ম সূত্র)

(গ) ঋণের উপর সুদগ্রহণের ব্যাপারে ক্যাথলিক ও ক্যালভিনীয় অনুশাসনের ভিন্ন নির্দেশ (৫ম সূত্র)।

৯) ৭.৩.১ অনুচ্ছেদের শেষ পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) হ্বেবার কর্তৃক বিভিন্ন ধর্মের অর্থনৈতিক নীতিবোধের প্রভাব বিশ্লেষণ

(খ) চীন ও ভারতের ক্ষেত্রে কনফিউসিয়াম প্রচারিত ধর্মীয় ভাবাদর্শ এবং হিন্দুধর্মের কর্মফলবাদ ও বর্ণব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রভাব।

১০) ৭.৩.২ অনুচ্ছেদের প্রথম পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) আদর্শরূপে হ্বেবার-উদ্ভাবিত একটি ধারণাগত নির্মিতি

(খ) আদর্শরূপের ব্যবহার

(গ) আদর্শরূপের মূল্যবিচারের সাথে সংশ্রবহীনতা

(ঘ) বাস্তবের ঠিক আদর্শরূপের অনুরূপ না হওয়ার কারণ

(ঙ) শিল্‌স্‌ ও ফিঞ্চের সংজ্ঞা।

১১) ৭.৩.২ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তিগুলি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) তিন ধরনের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আদর্শরূপের প্রয়োগ

(খ) নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে প্রথম ধরনের প্রয়োগ

(গ) ঐতিহাসিক বাস্তবতার বিমূর্ত স্বরূপের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধরনের প্রয়োগ

(ঘ) সামাজিক ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রকারের ক্ষেত্রে তৃতীয় ধরনের প্রয়োগ।

১২) ৭.৩.২ অনুচ্ছেদের ষষ্ঠ ও শেষ অনুচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) সকল ধরনের মানবীয় আচরণের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আদর্শরূপের অপ্রযোজ্যতা

(খ) আদর্শরূপ ব্যবহারের সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের তিনটি কারণ

(গ) আধুনিক অর্থশাস্ত্রে আদর্শরূপের ধারণার প্রয়োগ এবং তার সীমাবদ্ধতা।

১৩) ৭.৩.৫ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তিগুলি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব

(খ) আধিকারিকদের আইনগত কর্তৃত্ব

(গ) অন্যান্য পদ্ধতিগত ব্যবস্থা।

১৪) ৭.৩.৫ অনুচ্ছেদের ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম ও দশম পংক্তিগুলি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) উচ্চাবচ বিন্যাস

(খ) বিভিন্ন বিমূর্ত রীতি

(গ) লিখিত নথিপত্র

(ঘ) নির্দিষ্ট অধিকারভুক্তি

১৫) ৭.৩.৫ অনুচ্ছেদের একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ ও পংক্তিগুলি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) আমলাদের নিয়োগ

(খ) পদোন্নতি

(গ) বেতন অবসরভাতা

(ঘ) অন্য লাভের উৎস নয়

(ঙ) ব্যক্তিগত জীবন থেকে কর্মক্ষেত্রের পৃথকীকরণ

(চ) কর্মক্ষমতার পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার

(ছ) আনুষ্ঠানিক নৈর্ব্যক্তিকতা

১৬) ৭.৩.৫ অনুচ্ছেদের ঊনবিংশ, বিংশ ও একবিংশ পংক্তিগুলি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) সর্বাধিক কর্মক্ষমতা

(খ) আমলাতন্ত্রের অভঙ্গুরতা

১৭) ৭.৩.৫ অনুচ্ছেদের ত্রয়োবিংশ পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক —

(ক) মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি ও কর আদায়

(খ) অধিকমাত্রায় উৎপাদিত ভোগ্যপণ্যের বিপণন

(গ) রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধি

(ঘ) আধুনিক গণতন্ত্র

১৮) ৭.৪.১ অনুচ্ছেদের প্রথম পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) যৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের বৈশিষ্ট্য

(খ) অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের প্রবৃত্তি

(গ) সম্পূর্ণ যৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের অপ্রতুলতা

১৯) ৭.৪.১ অনুচ্ছেদের চতুর্থ পংক্তিটি [(২)] দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) দ্বিতীয় ধরনের অযৌক্তিক কার্যের বৈশিষ্ট্য

(খ) ধর্মীয় ও জাদুবিদ্যামূলক অনুষ্ঠানের উদাহরণ

২০) ৭.৪.১ অনুচ্ছেদের পঞ্চম পংক্তিটি [(৩)] দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) তৃতীয় ধরনের অযৌক্তিক কার্যের বৈশিষ্ট্য

(খ) প্রতিবর্তী ক্রিয়ার উদাহরণ ও প্রবৃত্তিগত আচরণ

২১) ৭.৪.১ অনুচ্ছেদের ষষ্ঠ পংক্তিটি [(৪)] দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) চতুর্থ ধরনের অযৌক্তিক কার্যের বৈশিষ্ট্য

(খ) শান্তিবাদী, মানবদরদী, রাজনৈতিক নেতা প্রভৃতির ভ্রান্ত আশাভিত্তিক কর্মের বিশ্লেষণ।

২২) ৭.৪.১ অনুচ্ছেদের সপ্তম পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) মানুষের অধিকাংশ কাজের অযৌক্তিকতার কারণ

(খ) মানুষের স্বীয় কার্যের যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টার মাধ্যমে আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনা।

২৩) ৭.৪.১ পরিচ্ছেদের অষ্টম পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) দেওয়ানী আইনের তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা ও বিচারকদের আচরণের অযৌক্তিকতা

(খ) বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাস্তব পদ্ধতি

(গ) লিপিবদ্ধ আইনের উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও লিপিবদ্ধ আইনের উপর নির্ভরশীলতার অভাব।

২৪) ৭.৪.১ পরিচ্ছেদের শেষ পংক্তিটি দেখুন।

২৫) ৭.৪.২ পরিচ্ছেদের প্রথম পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গগুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) প্যারেটো-কৃত মানুষের দু'টি ভাগ

(খ) শৃগালের চরিত্র

(গ) সিংহদের চরিত্র।

২৬) ৭.৪.২ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় পংক্তিটির পুরো অংশ এবং তৃতীয় পংক্তির প্রথমাংশ দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের বৈশিষ্ট্য

(খ) শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ও অশাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ।

২৭) ৭.৪.২ পরিচ্ছেদের তৃতীয় পংক্তির শেষাংশ দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) শৃগালতুল্য ও সিংহতুল্য ব্যক্তিদের উভয়কে নিয়ে আদর্শ শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের গঠন

(খ) উভয় প্রকার বিরোধী গুণাবলীর সুষ্ঠু মিশ্রণ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে কোন এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন

(গ) শাসিত জনগণ কর্ত্তৃক শাসকদের অপসারণ।

২৮) ৭.৪.২ পরিচ্ছেদের শেষ দুটি পংক্তি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) সম্ভাব্য নেতাদের প্রতি শাসকগোষ্ঠীর সহনশীলতার ফলাফল

(খ) ভারসাম্য বিচলনের ব্যাপারে প্যারেটোর মন্তব্য

(গ) সম্ভাব্য নেতাদের শাসকগোষ্ঠীর নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে অনিচ্ছার ফলাফল

(ঘ) শ্রেষ্ঠ শাসকবর্গের চক্রবৎ আবর্তন।

২৯) ৭.৪.২ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) অবশেষ বলতে কি বোঝায়

(খ) ব্যুৎপত্তি বলতে কি বোঝায়।

৩০) ৭.৪.২ পরিচ্ছেদের তৃতীয় পংক্তিটির প্রথমাংশ দেখুন। আপনার উত্তরে অবশেষসমূহের ছয়টি ভাগ সম্বন্ধে আলোচনা থাকা প্রয়োজন।

৩১) ৭.৪.২ পরিচ্ছেদের চতুর্থ পংক্তিটির প্রথমাংশ দেখুন। আপনার উত্তরে ব্যুৎপত্তিসমূহের চারটি ভাগ সম্বন্ধে আলোচনা থাকা প্রয়োজন।

৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১) Raymond Aron : *Main Currents in Sociological Thought [Vol. II]* (1965)

২) Lewis A. Coser : *Masters of Sociological Thought* (1966)

৩) Timothy Raison (ed) : *The Founding Fathers of Social Science* (1929)

৪) Francis Abraham & John Henry Morgan : *Sociological Thought* (1985)

একক ৮ ❐ র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও ম্যালিনোউস্কি

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য
৮.২ প্রস্তাবনা
৮.৩ র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী
৮.৩.১ র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের কর্মনির্বাহী তত্ত্ব
৮.৩.২ আদিম সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আত্মীয়তা সম্পর্ক
৮.৪ ম্যালিনোউস্কি ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী
৮.৪.১ ম্যালিনোউস্কির কর্মনির্বাহী তত্ত্ব
৮.৪.২ আদিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবন ও বিনিময় ব্যবস্থা
৮.৫ র‍্যাডক্লিফব্রাউন ও ম্যালিনোউস্কি ঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা
৮.৬ সারাংশ
৮.৭ অনুশীলনী
৮.৮ উত্তরমালা
৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে সমাজতত্ত্বে সামাজিক নৃতত্ত্ববিদদের অবদান সম্পর্কে পাঠকদের কিছুটা ধারণা জন্মাবে। সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা অনেকাংশে সামাজিক নৃতত্ত্বের তত্ত্বসমূহ দ্বারা প্রভাবিত। বিশেষত কর্মনির্বাহী তত্ত্ব সমাজতত্ত্বে ও সামাজিক নৃতত্ত্বে সমভাবে ব্যবহৃত হয়। সামাজিক নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে প্রাণপুরুষ হলেন র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও ম্যালিনোউস্কি। এই এককে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও ম্যালিনোউস্কির চিন্তাধারার মধ্যে সমাজতত্ত্বের পক্ষে প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়, বিশেষত তাঁদের কর্মনির্বাহী তত্ত্বের ভাষ্য আলোচিত হয়েছে।

৮.২ প্রস্তাবনা

ডুর্খাইমের চিন্তাধারায় যে কর্মনির্বাহী তত্ত্ব অঙ্কুরিত হয়েছিল, র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও ম্যালিনোউস্কির চিন্তাধারায় তা সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে। ডুর্খাইম সংক্রান্ত এককে তাঁর কর্মনির্বাহী তত্ত্ব স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হয় নি ; তাঁর শ্রমবিভাগ, আত্মহত্যা ও ধর্মের সামাজিক চরিত্র সংক্রান্ত আলোচনায় তার কর্মনির্বাহী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও ম্যালিনোউস্কির ক্ষেত্রে তাঁদের প্রদত্ত কর্মনির্বাহী তত্ত্বের বিশেষ ধরনের ভাষ্যের বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আদিম সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি এবং আত্মীয়তা সম্পর্কের বিষয়ে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের চিন্তাধারা এই এককে আলোচিত হয়েছে। সর্বশেষে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবন ও

বিনিময় ব্যবস্থার ম্যালিনোউস্কি-কৃত বিশ্লেষণ এই এককের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উপরোক্ত বিষয়গুলির আলোচনা আদিম জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকের উপরে আলোকপাত করতে পারে।

৮.৩ র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী

এ. আর. র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন (A. R. Radcliffe-Brown)-এর জীবৎকাল হ'ল ১৮৮১ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল অবধি। বার্মিংহামের কিং এডওয়ার্ডস্ হাইস্কুল এবং কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। কেম্ব্রিজে খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদ রিভার্স্ ও হ্যাডনের সংস্পর্শে এসে তিনি সামাজিক নৃতত্ত্বের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে তিনি ফরাসী সমাজ-তাত্ত্বিকদের বিশেষত ডুর্খাইমের চিন্তাধারা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তিনি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও অস্ট্রেলিয়ায় বিবিধ ক্ষেত্র সমীক্ষা (field research) করে সেগুলির ফলাফল প্রকাশিত করেন। স্বচ্ছ ও সুব্যবস্থিত চিন্তার দ্বারা এসং সঠিক শব্দচয়ন ও অসাধারণ প্রকাশভঙ্গির দ্বারা সামাজিক নৃতত্ত্বের তাত্ত্বিক ধারণাগত উন্নতি ঘটান। তাঁর লেখালিখি ও বক্তৃতার দ্বারা তিনি তত্ত্বগত ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। তিনি একজন অসাধারণ শিক্ষক ছিলেন এবং শিক্ষাকক্ষের বাইরেও ছাত্রদের সাথে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তাদের উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁর ছাত্রকুলও ছিল বিশ্বব্যাপী কারণ তিনি কেপ টাউন, সিডনি, শিকাগো, অক্সফোর্ড, আলেক্সান্দ্রিয়া, ইয়েংচিং, সাওপাওলো, গ্রাহাম্স্টাউন, ম্যাঞ্চেস্টার, লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও জোহানেসবার্গে অধ্যাপনা করেছেন। পরবর্তীকালে খ্যাতনামা সামাজিক নৃতত্ত্ববিদদের অনেকেই তাঁর ছাত্র। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নের যোগ্য একটি বিষয় হিসাবে সামাজিক নৃতত্ত্বের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি আদায় করেন। যথার্থভাবেই তিনি ম্যালিনোউস্কির সাথে যুগ্মভাবে আধুনিক সামাজিক নৃতত্ত্বের প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন লিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হ'ল ঃ ১) দ্য আন্দামান আইল্যান্ডারস্ ২) দ্য সোশ্যাল অরগ্যানাইজেশন অব অস্ট্রেলিয়ান ট্রাইবস্ ; ৩) স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন ইন প্রিমিটিভ সোসাইটি।

অনুশীলনী -১

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

ক) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের জন্ম সাল হ'ল ——।

খ) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদ —— ও —— -এর সংস্পর্শে এসে সামাজিক নৃতত্ত্বের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

গ) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন —— ও —— -র বিবিধ ক্ষেত্রসমীক্ষা করেন।

ঘ) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন —— -র সাথে যুগ্মভাবে আধুনিক সামাজিক নৃতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতার স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

৮.৩.১ র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের কর্মনির্বাহী তত্ত্ব

বিবর্তনবাদী (evolutionary) তত্ত্বে গোটা মানবসমাজের বিবর্তনের পর্যালোচনা করা হয় এবং পরিব্যাপ্তিমূলক (diffusionist) তত্ত্বে বলা হয় যে অন্য সমাজের থেকে ধার করা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি সমাজের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন যখন ১৯২০-র দশকের গোড়ায় লিখতে শুরু করেন তখন ইংল্যান্ডে সামাজিক

নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে আগেকার বিবর্তনবাদী তত্ত্ব এবং পরিব্যাপ্তিমূলক তত্ত্ব অকেজো বলে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ এই তত্ত্বগুলি মূলত অতীত ঘটনাবলীর বিশ্লেষণের উপরে গড়ে ওঠে ; কিন্তু আদিবাসী সমাজের ক্ষেত্রে অতীত ঘটনাবলীর কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। এছাড়াও ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ যেসব বিবরণ সেসময়ে পাওয়া গেল তার থেকে জানা গেল যে আদিম সমাজগুলি শুধু অতীত থেকে বয়ে আসা অথবা অন্য সমাজ থেকে লব্ধ বা পরিব্যপ্ত কিছু বর্বর প্রথার উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে নি। এই সমাজগুলি হ'ল সামগ্রিকভাবে কার্যরত ব্যবস্থা যার প্রথা ও পদ্ধতিগুলিকে নিজস্বভাবে বুঝতে হবে।

আদিম সমাজগুলিকে নতুনভাবে বোঝার ক্ষেত্রে একটি ধারণাগত হাতিয়ার যোগাতেই র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন 'কর্ম' (function) শব্দটির অবতারণা করেন। ডুর্খাইমের মত তিনি বিশ্বাস করতেন যে একটি সমাজ হ'ল একটি ব্যবস্থাপনা (system)। অর্থাৎ সমাজ কিছু অংশের সমন্বয়ে গঠিত যেগুলি পরস্পরের সাথে এবং গোটা সমাজের সাথে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমাজের একটি কাঠামো আছে যে কাঠামো গড়ে ওঠে বিভিন্ন বাস্তব সম্পর্কের জটিল তন্তুজালের দ্বারা। সমাজের অংশস্বরূপ বিভিন্ন সামাজিক প্রথাগুলি আবার বিভিন্ন কর্মসম্পাদন করে। সামগ্রিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত কোন আংশিক কার্যাবলী সামগ্রিক কর্মসম্পাদনে যে অবদান রাখে তাকেই র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন 'কর্ম' বলেছেন। যেমন শরীরের একটি বিশেষ অঙ্গের গোটা শরীরকে কার্যরত রাখার ব্যাপারে অবদানই হ'ল তার কর্ম, তেমনি একটি গোটা সমাজের কার্যসম্পাদনের ব্যাপারে একটি বিশেষ সামাজিক প্রথার যেমন অপরাধের শাস্তিবিধানের বা মৃতের সৎকার অনুষ্ঠানের, অবদানই হ'ল সেই প্রথাটির কর্ম। সমাজব্যবস্থার একটি কর্মগত ঐক্য আছে, অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন অংশ এমন একটি সামঞ্জস্যের সাথে কাজ করে যাতে নিরন্তর মীমাংসার অযোগ্য দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় না। সামাজিক কাঠামোর অস্তিত্বের প্রয়োজনীয় শর্তের উপরে জোর দেওয়ার জন্য র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের কর্মনির্বাহী তত্ত্বকে সমাজতত্ত্ববিদরা 'কাঠামোগত কর্মনিবার্হী তত্ত্ব' (structural-functional theory) বলে অভিহিত করেছেন।

র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের কর্মনির্বাহী তত্ত্বের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা করা হয়েছে। তিনি অবশ্য ডুর্খাইমের কর্মনির্বাহী তত্ত্বের 'আবশ্যকতা' (need)-র ধারণাকে পরিহার করেছিলেন এবং কখনই সামাজিক প্রথার 'উদ্দেশ্য' (purpose) বা 'লক্ষ্য (aim)-এর কথা বলেননি। কিন্তু তবুও যদি তাঁর মতো করে মেনে নেওয়া হয় যে প্রতিটি সামাজিক প্রথারই কর্ম আছে, তবে তার থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব যে যেখানে যা কিছু প্রথা আছে তা সবই প্রয়োজনীয় বা কাজের। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক পরিবর্তনকে বিরূপ চোখে দেখতে শেখায়। কারণ একটি প্রথাসমন্বিত ব্যবস্থা যদি সত্যকার কার্যনির্বাহী হয় তবে যে কোন পরিবর্তন এই কার্যকর ব্যবস্থাকে এলোমেলো করে দেবে।

র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গেলে তাকে গ্রহণের বিরোধিতা করেন নি। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু বিভিন্ন আদিম সমাজ ঐতিহাসিক উপাদান অপ্রতুল। তার মতে, ঐতিহাসিক ও কর্মনির্বাহী—এই উভয়ই পদ্ধতিই ব্যবহারযোগ্য কিন্তু এগুলি আলাদা এবং এদের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আলাদা। একারণেই র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন নৃতত্ত্বের অপর একটি শাখা মানবজাতিত্ত্ব (ethonology), যাতে কিভাবে সামাজিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমান রূপ নিল তা পর্যালোচিত হয় এবং সামাজিক নৃতত্ত্ব, যাতে এগুলি কিভাবে কাজ করছে এবং বর্তমান যুগে তাদের প্রাসঙ্গিকতা কি তা পরীক্ষা করে এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের মতে, সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ নিজে তাঁর পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু হিসাবে নির্দিষ্ট কোন আদিম সমাজে বসবাসপূর্বক সামাজিক ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি লক্ষ্য করবে এবং এইপ্রকার পর্যবেক্ষণমূলক ক্ষেত্রসমীক্ষার উপর ভিত্তি

করে নিজের গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করবে। তাঁর মতে, বিভিন্ন ধরনের সমাজের তুলনার দ্বারা সর্বত্র প্রযোজ্য কিছু সাধারণ সামাজিক সূত্র গড়ে তোলা সম্ভব এবং এই পদ্ধতিতেই সমাজের একটি স্বাভাবিক বিজ্ঞান গড়ে উঠবে। যদিও র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের তত্ত্ব ও পদ্ধতি বর্তমান কালে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে, তবুও এ ব্যাপারে তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য পরবর্তীকালে অন্যদের আরও উন্নত তত্ত্ব ও পদ্ধতি গড়ে তুলতে প্রেরণা যুগিয়েছে।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান (ritual) বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের কাঠামোগত কর্মনির্বাহী তত্ত্ব সুষ্ঠভাবে প্রকশিত হয়েছে। তাঁর 'দ্য আন্দামান আইল্যান্ডারস্' নামক গ্রন্থে তিনি বাস্তবক্ষেত্রে ডুর্খাইমের একটি প্রকল্প (hypothesis) পরীক্ষা করার চেষ্টা করেন। এই প্রকল্পটি হ'ল যে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রাথমিক কর্ম হ'ল একটি সমাজের যৌথ অনুভূতি প্রকাশপূর্বক সামাজিক সংযোগ প্রবণতাকে জোরদার করা এবং বহু সময়ব্যাপী একটি সামাজিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করা। কিন্তু এব্যাপারে তাঁর পরবর্তী লেখাগুলিতে আরও অগ্রসর হয়ে তিনি দাবি করেন যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান শুধুমাত্র সমাজের উপর মানুষের নির্ভরতা প্রকাশ করে না ; তা গোটা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপরে মানুষের নির্ভরতাকে নির্দেশ করে। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের মতে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান হ'ল মূলত প্রকাশক— এ হ'ল একই সাথে কিছু বক্তব্য পেশ করার এবং কোন কাজ সম্পন্ন করার উপায়। যেমন মৃতের সদ্‌গতির ব্যবস্থাপনা। অতএব টাইলর এবং ফ্রেজার যেভাবে জাদুবিদ্যা ও ধর্মকে বিজ্ঞান হয়ে ওঠার ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টা বলে চিহ্নিত করেছেন, র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের বক্তব্য অনুযায়ী তারা তা নয়। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের মতে, যে কোন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগত পদ্ধতির ব্যাপারে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। প্রথমত, এগুলি যে জনগোষ্ঠীর দ্বারা আচরিত তারা এগুলির কি মানে করে এবং দ্বিতীয়ত, এগুলির সামাজিক ফলাফল কি ? তাঁর এই দু'টি প্রশ্ন পরবর্তীকালে ইভান্স প্রিচার্ড, ন্যাডেল এবং অন্যান্য সামাজিক নৃতত্ত্ববিদকে জাদুবিদ্যা ও ধর্মের ব্যাপারে আরও গভীরতর অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি করে।

অনুশীলনী - ২

১) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

ক) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের কর্মনির্বাহী তত্ত্বকে 'কাঠামোগত কর্মনির্বাহী তত্ত্ব' বলা চলে।

খ) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন সামাজিক প্রথার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের কথা বলেছিলেন।

গ) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের কর্মনির্বাহী তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক পরিবর্তনকে স্বাগত জানায়।

ঘ) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের মতে, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান গোটা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপরে মানুষের নির্ভরতাকে নির্দেশ করে।

৮.৩.২ আদিম সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আত্মীয়তা সম্পর্ক

হ্বেবার এবং অন্যান্য কিছু চিন্তাবিদের অনুসরণে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন রাজনৈতিক সংগঠনের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন যে, এটি একটি নির্দিষ্ট আঞ্চলিক কাঠামোর মধ্যে শারীরিক শক্তির ব্যবহার বা ব্যবহারের সম্ভাবনার মাধ্যমে দমনমূলক কর্তৃত্বের সংগঠিত অনুশীলনের দ্বারা সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপন বা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। কিন্তু তাঁর মতে, যেসব বিবিধ উপায়ের দ্বারা আদিম সমাজের সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় তাদের ঠিক 'আইন' বলে অভিহিত করা যায় না। এই 'আইন' শব্দটি পাশ্চাত্য সমাজের জটিল বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে প্রযোজ্য। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন তাঁর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক লেখালেখিতে এই পরিভাষা সংক্রান্ত অসুবিধার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যদিও তাঁর সমসাময়িক প্রথিতযশা সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ ম্যালিনোউস্কি—

যিনি 'ক্রাইম অ্যান্ড কাস্টম ইন স্যাভেজ সোসাইটি' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন— এব্যাপারটি সঠিকভাবে ধরতে পারেন নি। ডুর্খাইমের মতে, আদিম সমাজগুলি এক বিশেষ ধরনের ফৌজদারী আইনের দ্বারা শাসিত ; দেওয়ানী আইন অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজগুলির বৈশিষ্ট্য। ম্যালিনোউস্কি এই মতের বিরুদ্ধাচারণ করে বলেন যে ট্রোবিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জের মতে আদিম সমাজগুলিতে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ধরনের আদানপ্রদানের বিধি বা দেওয়ানী আইনের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উভয় চিন্তাবিদই ভ্রান্তভাবে ক্ষুদ্রায়তন নিরক্ষর সমাজগুলির সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অচেনা পদ্ধতিগুলি পাশ্চাত্য ধারণার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন এই অসুবিধা হৃদয়সঙ্গম করে আদিম সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি বোঝার ও শ্রেণীবিন্যাস করার একটি আরও সুনির্দিষ্ট ও সংস্কৃতি-নিরপেক্ষ উপায় নির্দেশ করেন।

এই উপায় তিনি খুঁজে পান সামাজিক পুরস্কার ও শাস্তিবিধান (social sanction)-এর তত্ত্বের মধ্যে। তাঁর মতে, এই সামাজিক পুরস্কার ও শাস্তিবিধান হ'ল গোটা সমাজের বা সমাজের যথেষ্ট সংখ্যক সদস্যের একটি নির্দিষ্ট ধরনের ব্যবহারের—যা অনুমোদিত অথবা অননুমোদিত হয়—প্রতি প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়াগুলিকে নানাভাবে ভাগ করা যায়—ইতিবাচক (পুরস্কারপ্রদান) ও নেতিবাচক (শাস্তিপ্রদান), সংগঠিত ও শিথিল, এবং প্রাথমিক ও গৌণ। শেষোক্ত বিভাজনটি নির্ভর করে নিয়মভঙ্গের ক্ষেত্রে কে ব্যবস্থা নিচ্ছে—জনমর্থনপুষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সংস্থা নিজেই না গোটা সমাজ বা তার স্বীকৃত প্রতিনিধিরা—তার উপরে। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের এই বিন্যাসে পাশ্চাত্য সমাজের ফৌজদারী আইন পুরস্কার বা শাস্তিবিধানের সংগঠিত নেতিবাচক রূপের অন্তর্ভুক্ত হয়। বহু আদিম সমাজ অবশ্য এই ধরনের রীতিভঙ্গের বিরুদ্ধে সংগঠিত নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া চাড়াও ভালভাবেই চালিয়ে নেয়। এই বিন্যাস ক্ষেত্রসমীক্ষারত সামাজিক নৃতত্ত্ববিদদের সুযোগ করে দেয় সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এমন অনেক উপায় যথোচিত ভাবে বিবেচনা করার যেগুলিকে সঠিক অর্থে আইন বলা যাবে না—যেমন রক্তাক্ত কুলবিবাদ (blood feed) ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিশ্বাস ও পদ্ধতিসমূহ এবং জনমত।

আত্মীয়তা সম্পর্কের বিষয়ে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হ'ল 'দ্য সোশাল অরগ্যানাইজেশন অব অস্ট্রেলিয়ান ট্রাইবস্'। এই বইটিতে তিনি অস্ট্রেলিয়ার উপজাতিদের আত্মীয়তা সম্পর্ক ঘটিত প্রথা ও পরিভাষাসমূহের বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি অন্যান্য মহাদেশের, বিশেষত আফ্রিকার আদিম মানুষের আত্মীয়তা সম্পর্কও আলোচনা করেন। এই আলোচনা 'আফ্রিকান সিস্টেমস্ অব কিনশিপ অ্যান্ড ম্যারেজ' নামক বিখ্যাত সঙ্কলনের র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন লিখিত ভূমিকায় বিধৃত আছে।

আত্মীয়তা সম্পর্কের বিশ্লেষণেও র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতার দ্বারা এব্যাপারে ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ অজস্র তথ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি শনাক্ত করেন এবং বিভিন্ন প্রকার আত্মীয়তাসম্পর্কের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেন। তাঁর ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দগুচ্ছ—যেমন 'ভ্রাতা-ভগ্নীর গোষ্ঠীর একতা' (the unity of the sibling group), 'কুলগোষ্ঠীর একতা', (the unity of the lineage group), 'ভ্রাতা-ভগ্নীর সমতুল্যতা' (the equivalence of siblings) ইত্যাদি বিভিন্ন মুখ্য ধরনের আত্মীয়তা সম্পর্কের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছে। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের আগে কেউ এত পরিষ্কারভাবে একাজ করতে পারেন নি। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন আরও দেখান যে কিছু আদিম সমাজে ভিন্ন বংশের দু'জন ব্যক্তির সংযোগস্থাপনকারী বিভিন্ন আত্মীয়তা সম্পর্ক (যেমন শ্যালক-ভগ্নীপতি বা মাসী-বোনপো)-এর থেকেও একই বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আরও গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সম্পর্কের অন্তর্গত গোষ্ঠী উপাদানকে তুলে ধরে এবং একে কোন না কোন নামে শনাক্ত করে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন আত্মীয়তা সম্পর্ক ও কুলগত তত্ত্বের একটি সুদৃঢ় কাঠামো প্রস্তুত করেন। এই কাঠামোকে কাজে লাগিয়েই পরবর্তীকালেই ইভান্স-প্রিচার্ড, ফোর্টস প্রমুখ সামাজিক নৃতত্ত্ববিদরা এই তত্ত্বের আরও অগ্রগতি ঘটান।

মামা-ভাগ্নের সম্পর্কের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের এইসব তত্ত্বগত ধারণাগুলির সম্যক প্রয়োগ ঘটেছে। 'দ্য মাদার'স্ ব্রাদার ইন সাউথ আফ্রিকা' নামক তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, অনেক সমাজে পিতৃবংশানুক্রমিক গোষ্ঠীর সদস্যপদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হ'লেও কোন ব্যক্তির সাথে তার মামা (যিনি তার পিতৃ বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীর বহির্গত)-র অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। এর কারণ ব্যক্তি তার মাতার প্রতি যে উষ্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে সেটিই তার মাতার ভ্রাতার প্রতি প্রসারিত হয়। ভ্রাতা-ভগ্নীর সমতুল্যতার নীতি অনুযায়ী মা আর মামা কোন কোন পরিপ্রেক্ষিতে যেন একই রকম আত্মীয় হিসাবে প্রতিভাত হন। পরবর্তীকালে কিছু সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ এই তত্ত্বের সমালোচনা করে বলেছেন যে, এটি মাতৃবংশানুক্রমিক সমাজে প্রযোজ্য নয়। এই সমাজে যদিও সন্তানরা তাদের মাকে একইভাবে ভালবাসে, এখানে কিন্তু পিতার পরিবর্তে মামাই হলেন কর্তৃত্বের কেন্দ্রবিন্দু। অতএব মাতার প্রতি পোষিত মনোভাব এখানে মামার প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে না। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনি নিজেও পরবর্তীকালে তাঁর তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে সচেতন হয়ে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন যা তাঁর 'স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন ইন প্রিমিটিভ সোসাইটি' নামক গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় হিসাবে মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে যদিও পিতৃবংশানুক্রমিক ও বহির্বিবাহভিত্তিক সমাজে ভাগ্নের সাথে মামার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে, তারা কিন্তু দুটি আলাদা কুলগোষ্ঠীর অন্তর্ভুত। অতএব তাদের সম্পর্কের মধ্যে স্বাতন্ত্য ও সংযুক্তি দুইই থাকে এবং রসিকতার সম্পর্কের দ্বারা এই দ্বৈততাকে মানিয়ে চলার চেষ্টা করা হয়। এইভাবে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিতে প্রাধান্য দিয়ে মামা-ভাগ্নের সম্পর্কের একটি কাঠামোগত বিশ্লেষণ করেন। আত্মীয়তা সম্পর্কের অন্যান্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তিনি গোষ্ঠীগত উপাদানকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছে।

অনুশীলনী - ৩

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

ক) ——— -এর তত্ত্ব হল র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন নির্দেশিত আদিম সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলিকে বোঝার একটি সুনির্দিষ্ট ও সংস্কৃতি-নিরপেক্ষ উপায়।

খ) সামাজিক পুরস্কারপ্রদান হ'ল একটি নির্দিষ্ট ধরনের ব্যবহারের প্রতি সমাজের ——— এবং সামাজিক শাস্তিবিধান হ'ল———— প্রতিক্রিয়া।

গ) আত্মীয়তা সম্পর্কের বিষয় র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হ'ল ———

২) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের মতে, আদিম সমাজে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার বিভিন্ন উপায়কে আইন বলা হয়।

(খ) ভ্রাতা-ভগ্নীর সমতূল্যতার নীতি মাতৃবংশানুক্রমিক সমাজে প্রযোজ্য নয়।

৮.৪ ম্যালিনোউস্কি ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী

ব্রোনস্লি ম্যালিনোউস্কির জীবনৎকাল হ'ল ১৮৮৪ সাল থেকে ১৯২৪ সাল অবধি। তিনি র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের সমসাময়িক ছিলেন। ম্যালিনোউস্কি জাতিতে পোল ছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি পর্দার্থবিদ্যা ও অঙ্কে ডক্টরেট ডিগ্রি পান। ফ্রেজারের 'গোল্ডেন বাউ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি পাঠ করে তিনি নৃতত্ত্বে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি উইলিয়াম উন্ড ও কার্ল বুচারের তত্ত্বাবধানে দু'বছর কাজ করেন। ইংল্যান্ডে সেময়ে ওটেস্টারমার্কস হবহাউস, সেলিগম্যান, হাডন এবং রিভার্সের মত প্রথিতযশা সামাজিক নৃতত্ত্ববিদগণ বিরাজ

করছিলেন। তাঁদের সংস্পর্শের আকর্ষণে ম্যালিনোউস্কি ১৯১০ সালে লন্ডনে আসেন এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর অতিবাহিত করেন। এখানেই ১৯১৩ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'দ্য ফ্যামিলি অ্যামং দ্য অস্ট্রেলিয়ান অ্যাবরিজিনস্' প্রকাশিত হয়। সেলিগম্যান তাঁর বন্ধু ও পরামর্শদাতা হয়ে ওঠেন এবং এঁরই সাহায্যে ম্যালিনোউস্কি ১৯১৪ সালে তাঁর প্রথম ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ লাভ করেন। তিনি পাপুয়া ও নিউগিনি পরিভ্রণ করেন এবং ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল অবধি মেলানেশিয়ার ট্রোব্রিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ক্ষেত্রসমীক্ষা করেন। তিনিই প্রথম নৃতত্ত্ববিদ যিনি স্থানীয় ভাষায় ঐ আদিবাসীদের সাথে কথোপকথন চালান এবং তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে বসবাস করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে আদিম মানুষদের সামাজিক জীবনকে বুঝতে গেলে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করা দরকার এবং প্রত্যেক সামাজিক নৃতত্ত্ববিদের অন্তত একটা আদিবাসী সমাজের এই ধরনের পর্যবেক্ষণ করা উচিত। বর্তমানের ব্যাপক নৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্রসমীক্ষা তাঁরই শিক্ষার ফল বলে মনে করা হয়। ট্রোবিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের উপর ম্যালিনোউস্কির বিখ্যাত বিবরণী তৎকালীন ব্রিটিশ সামাজিক নৃতত্ত্বের চর্চার ধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ম্যালিনোউস্কি লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৯২৭ সালে এই শিক্ষায়তনের সামাজিক নৃতত্ত্বের প্রথম অধ্যাপকপদ অলঙ্কৃত করেন। ইভান্স-প্রিচার্ড, ফার্থ, ফোর্টস, ক্যাবেরী, মেয়ার, ন্যাডেল, রীড, স্যাপেরা প্রমুখ পরবর্তীকালে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদদের সকলেই তাঁর ছাত্র।

ম্যালিনোউস্কি লিখিত কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হ'ল ঃ (১) আরগোনাটস্ অব দ্য ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক ; (২) ক্রাইম অ্যান্ড কাস্টম ইন স্যাভেজ সোসাইটি, (৩) এ সায়েন্টিফিক থিওরি অব কালচার অ্যান্ড আদার এসেজ।

অনুশীলনী - ৪

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

ক) ——— নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি পাঠ করে ম্যালিনোউস্কি নৃতত্ত্বে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

খ) মেলানেশিয়ার ——— দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যে ম্যালিনোউস্কি ক্ষেত্রসমীক্ষা করেন।

গ) ১৯১৩ সালে ম্যালিনোউস্কির প্রথম গ্রন্থ ——— প্রকাশিত হয়।

ঘ) ১৯২৭ সালে ম্যালিনোউস্কি ——— -এ সামাজিক নৃতত্ত্বের প্রথম অধ্যাপকপদ অলঙ্কৃত করেন।

৮.৪.১ ম্যালিনোউস্কির কর্মনির্বাহী তত্ত্ব

সামগ্রি কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত কোন আংশিক কার্যাবলী সামগ্রিক কার্যসম্পাদনে যে অবদান রাখে তাকেই র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন 'কর্ম' বলেছেন। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন প্রদত্ত কর্মের এই সংজ্ঞাকে ম্যালিনোউস্কি 'পিচ্ছিল' (glib) বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, কর্মনির্বাহী তত্ত্বকে বিশ্লেষণের কাজে লাগাতে হ'লে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোয় কর্মের আরও দৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাপ্রদান জরুরী। তিনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে ব্যক্তির ক্ষুধা ও কাজের মত মৌলিক শারীরিক প্রয়োজনগুলির প্রতি যৌথ প্রতিক্রিয়া—যে প্রতিক্রিয়া সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ দ্বারা কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে— হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, সংস্কৃতি হ'ল এমন একটি উপায় বা পদ্ধতি যার দ্বারা মানুষ তার প্রয়োজনসাধনের ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিবেশগত সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলির আরও ভালভাবে মোকাবিলা করতে পারে। মানবীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সবসময়েই প্রাথমিক বা শারীরিক এবং তার থেকে উদ্ভূত সাংস্কৃতিক প্রয়োজনসাধনের সাথে সম্পর্কিত। অতএব 'কর্ম' বলতে বোঝায় কোন একটি মানবীয় প্রয়োজনের তৃপ্তিবিধান। কর্মের এই ধরনের সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য ম্যালিনোউস্কির কর্মনির্বাহী তত্ত্বকে 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মনির্বাহী তত্ত্ব' (individualistic

functionalism) আখ্যা দেওয়া হয়। ম্যালিনোউস্কির মতে, মানুষ ক্ষুন্নিবৃত্তি ছাড়া বাঁচতে পারে না। আর মানবপ্রজাতি প্রজনন ছাড়া অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। এ ব্যাপারে মানুষ অন্যান্য পশুদের সমতুল্য। কিন্তু তবুও যে তাদের থেকে আলাদা, কারণ মানুষ একটি সংগঠিত সমাজব্যবস্থায় অন্যান্য মানুষদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে এসব প্রয়োজন মেটায়। পশুরা স্থূলভাবে সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে এসকল প্রয়োজন মেটায়, কিন্তু মানুষ সংস্কৃতির মাধ্যমে তার প্রয়োজনসাধন করে। পিঁপড়ের মত কিছু সামাজিক প্রাণী আছে যারা তাদের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে সহযোগিতা করে। কিন্তু মানুষ এসকল সামাজিক প্রাণীর থেকে আলাদা, কারণ মানুষের উন্নতমানের চিন্তাশক্তি ও ভাষা আছে এবং তার উত্তরাধিকার দিয়ে যেতে পারে। অতএব মানবপ্রকৃতির জ্ঞান, মূল্যবোধ ও আচরণবিধির একটা বহুযুগের সঞ্চয় আছে যা আবার প্রতি প্রজন্মে উন্নত হয়। এরই ফলে মানুষ জীবনের অর্থনৈতিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর এবং যৌনসম্পর্ক স্থাপনের ও প্রজনন ঘটানোর বিভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন উপায় উদ্ভাবন করেছে। মানুষ বিভিন্ন হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি বানিয়েছে যা তারা বিভিন্ন কাজে লাগায়। আগে মানুষ সরাসরি প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে শিকার বা সংগ্রহের মাধ্যমে খাদ্য যোগাড় করত। এখন সে নানাভাবে নানাপ্রকার খাদ্যবস্তু উৎপাদন, সংরক্ষণ ও রন্ধন করে। আদিম মানুষের সরল খাদ্য-আহরণ প্রক্রিয়া সরাসরি ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রাথমিক প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত ছিল। বর্তমানের জটিল খাদ্য-আহরণ প্রক্রিয়ায় ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রাথমিক প্রয়োজন ছাড়াও কতকগুলি নতুন অর্থনৈতিক প্রয়োজন যুক্ত হয়ে গেছে। কারণ খাদ্যসংগ্রহের সাথে একটি জটিল উৎপাদনপদ্ধতি ও অর্থনৈতিক বিন্যাস জড়িয়ে গেছে। যেমন বিভিন্ন স্থানে খাদ্য সরবরাহের জন্য পথঘাট নির্মাণ ও রেলপথ স্থাপন করতে হয়েছে। খাদ্যসংগ্রহ ছাড়াও মানুষকে শরীররক্ষার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে বস্তু পরিধান করতে হয় ও গৃহে বসবাস করতে হয়। এগুলি মানুষকে উত্তাপ, শৈত্য, বৃষ্টিপাত, বন্যজন্তুর আক্রমণ ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে। কিন্তু বস্ত্রপরিধান বা বসবাসের বন্দোবস্ত করা এখন আর শুধু শরীর রক্ষার উপায় নয়, এগুলি সাথে নানা ধরনের 'উদ্ভূত' (derived) ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন যুক্ত হয়ে গেছে। যেমন সুচারু বস্ত্রপরিধান ও শোভনসুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা মানুষের নান্দনিক প্রয়োজন মেটায় এবং অহংবোধকেও তৃপ্ত করে।

যৌনপ্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধন ও প্রজননের প্রয়োজন এখন শুধু যৌনসঙ্গমের মাধ্যমে মেটে না। দীর্ঘকালীন যৌন সঙ্গমের জন্য মানুষ এখন বিবাহ বা অন্য কোন স্থায়ী সহবাসের পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। মানবপ্রজাতির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য শুধু সন্তান-উৎপাদনই যথেষ্ট নয়। এর সাথে দীর্ঘকালীন লালনপালন, সামাজিকীকরণ ও শিক্ষাদানের প্রয়োজন যুক্ত হয়ে গেছে। এইসব প্রয়োজনসাধনের জন্য যৌনমিলনকে বিবাহে রূপান্তরিত করতে হয়। এই বিবাহ-প্রতিষ্ঠান আবার নিয়ন্ত্রিত হয় অজাচার (incest), বহির্বিবাহ ও পছন্দমূলক বিবাহের রীতিনীতি দ্বারা। পিতৃমাতৃত্ব (parenthood), বংশধারা গণনার রীতি এবং নানা ধরনের আত্মীয়তাসম্পর্ক প্রজননের সাথে যুক্ত হয়ে পরিবার ব্যবস্থাকে সহযোগিতামূলক, আইনগত ও নৈতিক সম্পর্কসমূহের এক জটিল সমন্বিত ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে তোলে। এভাবেই মানুষ তার শারীরিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে গিয়েই এমন আরও অনেক প্রয়োজনের সম্মুখীন হয় যেগুলি এক জটিল ও সাংস্কৃতিক সমাজবন্ধনের মাধ্যমেই সিদ্ধ করা যায়।

অতএব মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি ছাড়াও কতকগুলি উদ্ভূত ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন আছে। সমাজের সঞ্চিত জ্ঞান ও নীতিবোধসমূহ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চালিত করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলা, দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগিতা বিধানের জন্য সামাজিক পুরস্কারপ্রদান ও শাস্তিবিধান ব্যবস্থার প্রয়োজন শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে কর্তৃত্ব বলবৎ করা এবং গোষ্ঠীর আত্মরক্ষার জন্য রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন। সামাজিক রীতিনীতির প্রতি বিশ্বাসস্থাপন এবং জীবনের নানা বিপদাপদ ও যন্ত্রণায় মানুষকে আশা যোগানের জন্য

একক ৯ ❐ আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিকদের অবদান

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য

৯.২ প্রস্তাবনা

৯.৩ থষ্টেইন ভেবলেন

৯.৩.১ সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত সাধারণ ধ্যান ধারণা

৯.৪ চার্লস হর্টন কুলে

৯.৪.১ আত্ম-দর্পণ

৯.৪.২ প্রাথমিক গোষ্ঠী

৯.৫ জর্জ হার্বাট মীড

৯.৫.১ কর্ম বা আচরণ বিশ্লেষণ

৯.৫.২ আত্ম-তত্ত্ব

৯.৫.৩ আত্ম-উদ্ভব

৯.৬ রবার্ট এজরা পার্ক

৯.৬.১ সংঘবদ্ধ ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

৯.৬.২ সামাজিক প্রক্রিয়া

৯.৬.৩ সামাজিক দূরত্ব

৯.৬.৪ সামাজিক পরিবর্তন

৯.৬.৫ প্রাণ শৃঙ্খলা ও সামাজিক শৃঙ্খলা

৯.৬.৬ আত্ম, সামাজিক ভূমিকা ও প্রান্তিক মানুষ

৯.৭ পিটিরিম আলেক্সান্ড্রোভিচ্ সোরোকিন

৯.৭.১ সমাজতত্ত্ব

৯.৭.২ ব্যক্তিত্ব

৯.৭.৩ সামাজিক প্রক্রিয়া

৯.৭.৪ সামাজিক পরিবর্তন

৯.৮ সারাংশ

৯.৯ অনুশীলনী

৯.১০ উত্তরমালা

৯.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি সমাজতাত্ত্বিক বিকাশে আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিকদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন ও তাঁদের অবদান বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- থর্ষ্টেইন ভেবলেন এর সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত সাধারণ ধ্যান ধারণার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আত্ম-তত্ত্ব সম্পর্কে কুলে, মীড ও পার্ক এর অবদানের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন।
- সামাজিক-প্রক্রিয়া ও সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে পার্ক ও সোরোকিন এর অবদানের মধ্যেও তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন।

৯.২ প্রস্তাবনা

আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে পথ প্রদর্শক কয়েকজন সমাজতাত্ত্বিকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান নিয়ে এই এককে আলোচনা করা হবে। সর্ব প্রথমে আমরা থর্ষ্টেইন ভেবলেন এর অবদান নিয়ে আলোচনা করবো। অর্থনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক ভেবলেন কিভাবে অর্থনৈতিক ব্যবহারের বিশ্লেষণে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে মূল গুরুত্ব প্রদান করেছেন, এখানে আমরা তা দেখবার চেষ্টা করবো। এরপর চার্লস হর্টন কুলের আত্মদর্শন ও প্রাথমিক গোষ্ঠী সংক্রান্ত তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হবে। আত্মদর্পণ-এ প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে কিভাবে আত্মবিকাশ ঘটে, ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে এবং সে ক্ষেত্রে প্রাথমিক গোষ্ঠীর ভূমিকাই বা কি, এ নিয়ে আলোচনা করা হবে। পরবর্তী পর্বে আমরা সমাজ মনস্তত্ত্ববিদ জর্জ হার্বার্ট মীড এর সমাজতাত্ত্বিক অবদান নিয়ে আলোচনা করবো। তাঁর আচরণ বিশ্লেষণ ও আত্ম-উদ্ভবের তত্ত্বে তিনি অঙ্গভঙ্গী, ঈশারা, অর্থপূর্ণ প্রতীক, সর্বজনীন অপর প্রভৃতি ধারণার অবতারণা করেছেন। মৌলিক এই সমস্ত ধারণা কিভাবে তাঁর তত্ত্বকে যুগান্তকারী করে তুলেছে, আমরা তা অনুধাবন করবার চেষ্টা করবো। এছাড়াও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সমাজতাত্ত্বিক, চিকাগো ঘরানার প্রাণ-পুরুষ রবার্ট এজরা পার্ক এর অবদান নিয়েও এই এককে আলোচনা করা হবে। বর্ণবৈষম্য বিরোধী এই বাস্তব জীবনমুখী সমাজতাত্ত্বিক একদিকে যেমন বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ের বাস্তবমুখী বিশ্লেষণ করেছেন তেমনি সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বহু সামাজিক সমস্যার সমাধানেও তিনি ছিলেন। বর্তমান এককে এই দিকপাল মার্কিন সমাজতাত্ত্বিকের বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করার চেষ্টা করা হবে। সর্বশেষ আলোচ্য বিষয়—আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে পিটিরিম সোরোকিন এর অবদান। এই এককে সোরোকিনের বিভিন্ন ধারার চিন্তাভাবনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পাশাপাশি সমাজ পরিবর্তন সংক্রান্ত তাঁর মৌলিক অবদান নিয়ে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করবার চেষ্টা করা হবে।

৯.৩ থর্ষ্টেইন ভেবলেন (Thursten Vebelen) (১৮৫৭ — ১৯২৯)

প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজ সমালোচক থর্ষ্টেইন বান্দে ভেবলেন (১৮৫৭-১৯২৯) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উইস্‌কন্‌সিন-এ এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মূলত দর্শন ও অর্থনীতির ছাত্র হ'লেও

সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। প্রখ্যাত দার্শনিক ডেভিড হিউম (David Hume) ও ইমানুয়েল কান্ট (Imanuel Kant) ছাড়াও তিনি প্রধানত ধ্রুপদী সমাজতাত্ত্বিক হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer), কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক এডওয়ার্ড বেলামী (Edward Belame) ও সর্বজনবিদিত মনীষী কার্ল মার্ক্সের (Karl Marx) দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। সমাজতত্ত্বে ভেবলেন-এর অবদান নিম্নলিখিত ধারায় সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

৯.৩.১ সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত সাধারণ ধ্যান ধারণা

বিবর্তনবাদী ও সমাজতাত্ত্বিক যুক্তিবোধের আলোকে ধ্রুপদী অর্থনীতির সমালোচনার মধ্য দিয়ে ভেবলেন এর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার সঠিক প্রতিফলন ঘটেছে। কোনও শাশ্বত সাধারণ নিয়মের পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবহার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে, প্রাচীন যুগের অর্থনৈতিক বিনিময়কে বুঝতে হ'লে রিকার্ডীয় ধারণার ব্যবহার সঙ্গত হবে না। ভেবলেন বিত্তবান পরিবারে জন্মানোর সৌভাগ্য লাভ করেন নি। হয়তো দারিদ্র্য ও দুঃখে পরিপূর্ণ তাঁর ব্যক্তি জীবনই চিন্তাজগতে তাঁকে আনন্দবাদ (Hedonism) ও উপযোগবাদ (utilitanianism) এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সহায়তা করেছে। তাই হয়তো তিনি আনন্দবাদী ও উপযোগবাদী অর্থনীতির বিরুদ্ধে এক নয়া অর্থনীতি গড়তে চেয়েছিলেন—যে অর্থনীতি ইতিহাস নির্ভর, বিবর্তনবাদী ও মানুষের নিয়ন্ত্রক ভূমিকা (মানুষের সক্রিয়তা) অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তিনি মানুষকে একটি কর্মপ্রিয় প্রাণী হিসেবেই বর্ণনা করেছেন—অলস, সুখী, সুযোগ-সন্ধানী নয়।

স্পেন্সোরীয় ও ডারউইনীয় ভাবধারায় বিশ্বাসী ভেবলেন মানব বিবর্তনকে তার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বা অভিযোজনের একটি চিরস্থায়ী প্রক্রিয়া হিসেবে দেখিয়েছেন। মার্ক্স ও হেগেলের (G.W.F.Hegel) বিপরীতে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বিবর্তনের কোনও চরম লক্ষ্য নেই, বরং ক্রমপুঞ্জিত ঘটনাবলীর সমাহারই বিবর্তন। উন্নততর প্রযুক্তির আবিষ্কার ও ব্যবহার মানব বিবর্তনকে সূচিত করে। শেষ বিচারে শিল্প-বিদ্যা বা শিল্প-কলা বা শ্রমশৈলী (industrial arts) মানুষের সঙ্গে তার প্রাকৃতিক পরিবেশের অভিযোজনকে নির্ধারণ করে এবং এক্ষেত্রে প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম।

ভেবলেন-এর মতে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাভাবনা প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার অবস্থানের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। একই ভাবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে বহু মানুষের সংঘবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে মানুষের অভ্যাস, বিবিধ সামাজিক প্রথা, কাজকর্ম্ম ও চিন্তাভাবনার ধারা। এই সমস্ত অভ্যাস ও প্রথাই ধীরে ধীরে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। ভেবলেন-এর মত অনুযায়ী সামাজিক বিবর্তনকে শিল্প-কলার বিকাশজনিত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের একটি বিশেষ ধরন হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তিনি বিবর্তনের চারটি ধাপের উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ নবপ্রস্তর যুগের শান্তিপূর্ণ আদিম অর্থনীতি। দ্বিতীয়ত লুণ্ঠন ভিত্তিক বর্বর অর্থনীতি, যেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ, সম্পত্তি, পুরুষ প্রাধান্য, অবকাশভোগী শ্রেণী (leisure class) ইত্যাদির উদ্ভব হয়। তৃতীয়ত, প্রাক্ আধুনিক হস্তশিল্প ভিত্তিক অর্থনীতি এবং চতুর্থত, যন্ত্র-নির্ভর আধুনিক অর্থনীতি।

ভেবলেন-এর এই বিবর্তন তত্ত্ব যদিও বর্তমানে সর্বজনগ্রাহ্য নয় তবুও মার্ক্সবাদের সঙ্গে মিলে মিশে চলা তার প্রযুক্তি নির্ধারণ তত্ত্ব (technological determinism) আধুনিক যুগের সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ সম্পর্কে ভেবলেন-এর ধারণা দ্বান্দ্বিক। এই সমাজের আধারে বর্তমান আছে পরস্পর বিরোধী বিবিধ বিষয়। যেমন, ব্যবসা ও শিল্প, মালিকানা ও প্রযুক্তি, আর্থিক (pecuniary) বনাম শিল্প-ভিত্তিক জীবিকা, দ্রব্য উৎপাদক বনাম অর্থ উৎপাদক ও কর্ম-কুশলতা বনাম বিক্রয়ে দক্ষতা। তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক, ডারউইনবাদী দার্শনিক উইলিয়াম গ্রাহাম সামনার (W.G.Summer) এর মতে, শিল্প মালিকরা যোগ্যতম। তাই আধুনিক সমাজে তাদের প্রাধান্য যুক্তিযুক্ত। ভেবলেন ভিন্ন মত পোষণ করেন। বরং তিনি শিল্প মালিকদের পরজীবি'র সঙ্গে তুলনা করেছেন যেহেতু তারা অপরের প্রযুক্তিগত নেতৃত্ব ও আবিষ্কারের উপর নির্ভর করেই ফুলে ফেঁপে ওঠে। এদেরকে তিনি অবকাশ-ভোগী শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। "শিল্প সম্প্রদায়ের (industrial community) উপর নির্ভর করে থাকে অবকাশ ভোগী শ্রেণী, শিল্প সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা অবস্থান করে না।" তাঁর মতে, শিল্প মালিকরা শ্রমশীল নয় তাই বিবর্তনের প্রক্রিয়াতে তাদের কোনও প্রগতিশীল ভূমিকা নেই, বরং তারা এই প্রক্রিয়াকে বাধা দিয়েছে, বিকৃত করেছে। মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিবর্তন নির্ভর করে আছে সেই সমস্ত মানুষের উপর যাদের মনন, শিল্প-কলা ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সুচর্চিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রয়েছে।

সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত এই সমস্ত ধ্যান-ধারণা ছাড়াও ভেবলেন প্রতিযোগিতা, জ্ঞান-সমাজতত্ত্ব (Sociology of knowledge), কার্য-নির্বাহী বা উপযোগীতাবাদী বিশ্লেষণ (functional analysis) ও সামাজিক পরিবর্তনের উপর তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন।

প্রথমত, প্রতিযোগিতা ঃ ভেবলেন-এর মতে, আত্ম-মর্যাদা (self esteem) অর্জনের লক্ষ্যে মানুষ প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত হয়। প্রতিযোগিতায় সাহায্যলাভের উদ্দেশ্যে মানুষ সর্বদাই নিজের উচ্চ অবস্থানের অথবা ক্ষমতার প্রতি তার প্রতিযোগীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। দৃষ্টি আকর্ষক ভোগ (conspicuous consumption), দৃষ্টি আকর্ষক অবকাশ, উচ্চমর্যাদার প্রমাণস্বরূপ দৃষ্টি আকর্ষক বিবিধ প্রতীকের প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষ তার প্রতিবেশীকে ছাপিয়ে যেতে চায় এবং এইভাবে নিজের আত্ম-মর্যাদা বাড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। অভিজাততন্ত্র (aristocracy) দ্বারা শাসিত যুগে, বর্বরতার যুগে শুধুমাত্র অবকাশভোগী শ্রেণীর মধ্যেই সীমিত ছিল এই প্রতিযোগিতা। কিন্তু ভেবলেন-এর মতে, আধুনিক সমাজে স্থান অপ্রতিরোধ্য এই দৃষ্টি আকর্ষণের প্রতিযোগিতা।

দ্বিতীয়ত, জ্ঞান সমাজতত্ত্ব ঃ ভেবলেন-এর মতে, জ্ঞান প্রণালী আসলে জীবন প্রণালীরই প্রতিফলন। সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের জ্ঞানেরও বিবর্তন ঘটে চলেছে। প্রাচীন সমাজের অভিন্নতা জ্ঞানের জগতেও লক্ষ্য করা যেত। পরবর্তীকালে পেশার ক্ষেত্রে সমাজে যেভাবে বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে, জ্ঞানের জগতেও ঠিক সেভাবেই বিভিন্নতা প্রকাশ পেয়েছে।

তৃতীয়ত, কার্যনির্বাহী বিশ্লেষণ বা উপযোগীতাবাদী বিশ্লেষণ ঃ দৃষ্টি আকর্ষক ভোগের দৃশ্যমান বা প্রকট (manifest) উপযোগিতার তুলনায় ভেবলেন গুরুত্ব বেশী দিয়েছেন প্রচ্ছন্ন (latent) উপযোগীতার উপর। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মোটর গাড়ির মালিকের কাছে তার গাড়ি শুধুমাত্র তার কাজের প্রয়োজনই মেটায় না, প্রচ্ছন্নভাবে তা তার সামাজিক সম্মানও বাড়িয়ে তোলে। এমন বহু কাজ মানুষ করে থাকে যা সরাসরি অর্থাৎ, প্রকটভাবে তার উপকারই করে না, হয়ত বা কিছুটা ক্ষতিই করে কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে ঐ সমস্ত কাজ তার সামাজিক সম্মান বা মর্যাদা বৃদ্ধিতে হয়ত অনেকটাই সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক, শহুরে বঙ্গ সমাজে বহুল প্রচলিত (কিছুটা অহেতুক) বিজাতীয় (বা মিশ্র) ভাষায় কথোপকথন, ধূমপান বা মদ্যপানের

অভ্যাসের উল্লেখ করা যেতে পারে। একইভাবে যথেষ্ট (পাত্রে-অপাত্রে-কুপাত্রে) দান-খয়রাতির অভ্যাসের উল্লেখও বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পরিশেষে, সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্বঃ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভেবলেন প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকাকে মূল গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, শিল্প-কলা বা প্রযুক্তির উন্নয়নের মানই কোনও সমাজের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মানকে নির্ধারিত করে। নব প্রযুক্তির আবিষ্কার ও প্রচলনের ফলে স্বয়ংক্রিয় ভাবেই অর্থাৎ নিজের থেকেই সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে না। নব-প্রযুক্তি পুরোন সমাজের অভ্যাস, প্রথা তথা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান করে। পুরোন সমাজের প্রতিনিধিরা স্থিতিশীলতা (status quo) সমর্থক। নতুন প্রযুক্তি পুরোন সমাজের প্রতিনিধিদের কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা করে, পরাজিত করে এবং নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করে। এই পরিবর্তন সময় সাপেক্ষ, কারণ এটি ধীর গতিতে চলে। মার্ক্সের বিপরীতে দাঁড়িয়ে ভেবলেন কখনই মনে করতেন না যে, শ্রেণী সংগ্রামই ইতিহাসের চালিকাশক্তি। তাঁর মতে, নব-প্রযুক্তির অগ্রগতি ও পুরোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে তার সংঘাতই ইতিহাসকে গড়ে তোলে।

উপসংহারে সংক্ষেপে বলা যায়, সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় ভেবলেন-এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান তাঁর প্রতিযোগিতা তত্ত্ব এবং প্রচ্ছন্ন উপযোগীতাবাদ। সেই সঙ্গে উল্লেখ্য তাঁর প্রযুক্তি নির্ভর ইতিহাসের গতি নির্ধারণ তত্ত্ব ও সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের তত্ত্ব। প্রযুক্তি আমদানীর মাধ্যমে পশ্চাদপদ সমাজের দ্রুত উন্নয়নের তত্ত্ব বর্তমানে খুবই সময়োপযোগী এবং অদূর ভবিষ্যতেও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ থাকবে বলেই মনে করা হয়।

অনুশীলনী ঃ ১

১) ভেবলেন বর্ণিত বিবর্তনের চারটি ধাপ কি কি?

২) অবকাশ-ভোগী শ্রেণী বলতে কি বোঝায়?

৯.৪ চার্লস হর্টন কুলে (Charls Horton Cooley)

সমাজতত্ত্ব ও সমাজমনস্তত্ত্বে চার্লস হর্টন কুলে (১৮৬৪- ১৯২৯)'র অবদান অসামান্য। প্রখ্যাত আইনজীবী থমাস এম কুলের পুত্র চার্লস হর্টন কুলে আমেরিকান সমাজতত্ত্ব বিকাশের একজন যুগান্তকারী বাক্তিত্ব হ'লেও প্রথমজীবনে তিনি ছিলেন কারিগরী বিদ্যা ও অর্থনীতির ছাত্র।

হার্বাট স্পেনসার, অগাষ্ট কোঁৎ (August Komte), লুইস হেনরি মরগান (Lewis Henry Morgan), গ্যাব্রিয়েল টার্ডে (G.Tarde), অ্যালেক্সিস্ ডি (Alexis D) প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজ দার্শনিকদের বিবিধ পঠন-পাঠনের মাধ্যমেই তিনি সমাজতত্ত্বে প্রবেশ করেন। তৎসত্ত্বেও তিনি চার্লস ডারউইন (Charles Darwin), জেমস ব্রাইস (James Bryce), জেমস মার্ক বল্ডউইন (James Mark Boldwin) এবং উইলিয়াম জেমস্ (William James)-এর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। প্রধানতঃ উইলিয়াম জেমস-এর principles of Psychology গ্রন্থটির প্রভাব তাঁর উপর ছিল সুগভীর।

সমাজতত্ত্বে কুলের অবদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য আমরা মূলত তাঁর নিম্নবর্ণিত তত্ত্বগুলির মধ্যে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

৯.৪.১ আত্মদর্পণ (Looking glass self)

সম্ভবত কুলের সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব এই আত্মদর্পণ। কুলের মতে, আত্মবিকাশ (development of self) ঘটে মূলত অপরের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে। ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে গড়ে ওঠে আত্ম (self) । কোনও ব্যক্তির আত্মসচেতনতা আসলে তার সম্পর্কে অন্যান্য লোকের ধারণার-ই প্রতিফলন। অতএব "তুমি"/"আপনি" অথবা "সে"/"তিনি" ছাড়া "আমি"র অস্তিত্ব-ই অকল্পনীয়। আত্ম'র এই প্রতিফলক ভূমিকার কথা মাথায় রেখেই তিনি একে দর্পণ বা আয়নার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

ব্যক্তির কাছে ব্যক্তি দর্পণ

আত্ম-গঠনের মূলে প্রতিফলন ব্যক্তি-ব্যক্তির দর্পণ একে অপরের প্রতিফলন

Each to each a looking glass Reflects the other that do the pass আত্মদর্পণের মাধ্যমে আত্মবিকাশের প্রক্রিয়াটি মূলতঃ তিনটি পরস্পর আত্মসম্পর্কিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে থাকে। প্রথমত, কল্পনায় অন্য ব্যক্তির কাছে আমাদের উপস্থিতি। দ্বিতীয়ত, এ সম্পর্কে সেই ব্যক্তির মতামত এবং তৃতীয়ত, উক্ত মতামত অনুযায়ী আমাদের আত্মানুভূতি (Self feeling) অর্থাৎ গর্বিত বা লজ্জিত হওয়া। আরও সহজ ভাষায় বলা যেতে পারে যে, যখনই সমাজে একজন, উদাহরণস্বরূপ প্রথমা, অন্য একজনের, ধরা যাক দ্বিতীয়ার, সম্মুখীন হয় তখন দ্বিতীয়ার চোখে মুখে প্রথমার উপস্থিতির প্রতিফলন ফুটে ওঠে। প্রথমা বুঝতে পারে দ্বিতীয়া তাকে কি দৃষ্টিতে দেখছে। যদি সুনজরে, সপ্রশংস দৃষ্টিতে দ্বিতীয়া তাকে দেখে তবে প্রথমা আনন্দিত হয় এবং সেই অনুযায়ী ভবিষ্যতেও সে নিজের আচার ব্যবহার, সাজপোশাক ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করে-অন্যথায় প্রথমা লজ্জিত হয় ও নিজেকে অন্যভাবে গড়ে তোলে যাতে সে দ্বিতীয়ার প্রশংসা পায়। এই প্রক্রিয়া একমুখী নয় এবং দ্বিতীয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই চলমান প্রক্রিয়ায় আত্মদর্পণের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে "'আত্ম" এবং ঘটে আত্মবিকাশ। অতএব, বলা যায়, "আত্ম" বিকশিত হয় এক ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির পারস্পরিক যোগাযোগের মধ্য দিয়ে, যা ব্যক্তির চৈতন্যে প্রতিফলিত হয়, ব্যক্তি মননে তার ছাপ রেখে যায়।

কুলের মতে, সমাজ এমনই বহু "আত্ম"র সমাহার। যেন আমি তোমার মন বোঝার চেষ্টা করি কল্পনায়, বিশেষত তোমার মন আমার মন সম্পর্কে কি ভাবছে এবং একই সঙ্গে আমার মন তোমার মন সম্পর্কে কি ভাবছে-সেই সম্পর্কেই বা তোমার মন কি ভাবছে। আমি আমাকে উপস্থিত করি, আমার মনকে হাজির করি তোমার মনের সামনে এবং তুমিও যে তাই করবে সেটাও আশা করি। আত্মগঠনের বা আত্ম বিকাশের এই ক্রীড়ায় (Game) যে ব্যর্থ হবে, সে সঠিক ভাবে অংশ নিতে পারবে না। সমাজ তৈরী হয় ব্যক্তিমননে বহু ব্যক্তির মিথষ্ক্রিয়া (interaction) র মাধ্যমে। অবস্থান যেমন আমার মনে তেমনই তাদের সকলের মনে, তোমার মনেও, সবার-ই মনে।

"আত্মদর্পণ"-এর এই তত্ত্ব রচনায় কুলে জেমস-এর ভাবধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। কুলে বর্ণিত "আত্ম" আসলে জেমস বর্ণিত সামাজিক আত্মরই (Social Self) একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা ; মূলগত ধারণা উভয়ের ক্ষেত্রেই এক। আত্ম গড়ে ওঠে একের মধ্যে অন্যের প্রতিফলনের মাধ্যমে।

কুলের গুরুত্ব শুধুমাত্র "আত্মদর্পণ" তত্ত্বের জন্যই যদি হ'ত তাহলে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে হয়ত তার এতটা গুরুত্ব থাকত না। প্রায় সমগুরুত্বপূর্ণ অবদান তিনি রেখে গেছেন তাঁ প্রাথমিক গোষ্ঠীতত্ত্বের মাধ্যমে।

৯.৪.২ প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary Group)

কুলের মতে, প্রাথমিক গোষ্ঠী বা মুখ্য গোষ্ঠী (Primary Group) ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক স্থাপনে এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তিকে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাথমিক গোষ্ঠী বলতে তিনি অন্তরঙ্গ, মুখোমুখি সম্পর্ক ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। একটা গোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন। মনস্তত্বগতভাবে এই অন্তরঙ্গতার ফলে সৃষ্টি হয় বিবিধ ব্যক্তিসত্তার মিশ্রণে গড়ে ওঠা এক বিভিন্ন "আমি"-র এক সামগ্রিকতা। এই সামগ্রিকতার-ই অপর নাম 'আমরা'। প্রাথমিক গোষ্ঠীর একতা শুধুমাত্র সহানুভূতি ও ভালবাসার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে না, এখানে এমন কি প্রতিযোগিতা মনোভাবও থাকতে পারে।

প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১) মুখোমুখী সম্পর্ক (Face to face relationship)

২) কোনও সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির অনুপস্থিতি

৩) তুলনামূলক স্থায়িত্ব

৪) স্বল্প সদস্য সংখ্যা

৫) অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক অন্তরঙ্গতা

পারিবার, প্রতিবেশী, শিশুদের খেলাধূলার গোষ্ঠী ইত্যাদি প্রাথমিক গোষ্ঠীর উদাহরণ। এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলিতে সদস্যরা কখনই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা অথবা ক্ষুদ্র স্বার্থ কেন্দ্রিকতায় আচ্ছন্ন থাকে না। সহানুভূতি ও ভালবাসার বন্ধনের প্রত্যেকে কাজ করে এই প্রাথমিক গোষ্ঠীতে। এর বিপরীতে গৌণ গোষ্ঠীতে (Secondary Group-যদিও কুলে নিজে কখনো এই ধরনের গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেন নি) সাধারণত ব্যক্তিস্বার্থই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

জীবনের আদর্শ ও সামাজিক ঐক্যের মূল আধার এই প্রাথমিক গোষ্ঠী। গোষ্ঠী স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থের আত্মসমর্পণ ঘটে প্রাথমিক গোষ্ঠীতে এবং তার ফলে ব্যক্তির লোভ, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও আত্মকেন্দ্রিকতা ইত্যাদির বিপরীতে গড়ে ওঠে এক নৈতিক মূল্যবোধ।

আত্মদর্পণ ও প্রাথমিক গোষ্ঠীর ধারণা কুলের চিন্তাভাবনায় অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলেমিশে রয়েছে। অপরের চিন্তা ভাবনা, মূল্যবোধ ও বিচার বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেওয়া—যা কিনা একজন পরিণত পূর্ণবয়স্ক মানুষের বিশেষ গুণ এবং এই গুণ একমাত্র প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্তরঙ্গতার মধ্যেই বিকাশ লাভ করতে পারে। অপরিণত আত্মকেন্দ্রিক মানুষ প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যেই অপরের ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রয়োজন ও পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া ইত্যাদির প্রথম পাঠ লাভ করে। প্রাথমিক গোষ্ঠীই ব্যক্তিকে অপরের জায়গায় দাঁড় করাতে পরে। কুলের মতে প্রাথমিক গোষ্ঠীর মাধ্যমেই মানব প্রকৃতি বিকশিত হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির আলোচনায় ভেবলেন-এর পরেই উচ্চারিত হয় কুলের নাম। ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক

ইতিহাস চর্চায় কুলের নাম হয়ত সামান্যই উচ্চারিত হবে ; কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশের কোনও ইতিহাস সম্ভবত কুলের আত্মদর্পণ ও প্রাথমিক গোষ্ঠীর আলোচনাকে বাদ দিয়ে গড়ে উঠতে পারবে না। তিনি সমাজতাত্ত্বিক বিকাশে কোনও নতুন ধারার জন্ম দিতে পারেন নি— একথা সত্য ; কিন্তু তিনি নানাভাবে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন - এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

অনুশীলনী ঃ ২

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

কুলে আত্মকে একটি —— সঙ্গে তুলনা করেছেন।

২) প্রাথমিক গোষ্ঠীর মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ?

৯.৫ জর্জ হার্বার্ট মীড (George Herbert Mead) (১৮৬৩-১৯৩১)

জর্জ হার্বার্ট মীড (১৮৬৩-১৯৩১) আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। বাস্তবধর্মী (Pragmatist) এই দার্শনিক চিন্তার জগতে ঋণী ছিলেন চার্লস ডারউইন (Charles Darwin), উইলহেলম ফ্রেডরিক হেগেল, ইমানুয়েল কান্ট প্রমুখ কালোত্তীর্ণ দার্শনিকদের কাছে। একই সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক চার্লস হর্টন কুলে, জন ডিউইয়ে (John Dewey) জেমস বল্ডউইন প্রভৃতি দার্শনিকদের দ্বারা তিনি যেমন প্রভাবিত ছিলেন তাঁরাও অনুরূপভাবে প্রভাবিত ছিলেন মীড এর চিন্তার দ্বারা।

ব্যবহারবাদী (Behaviouristic) মীড এর চিন্তায় দর্শন ও সামাজিক মনস্তত্ব মিশে রয়েছে। তাঁর মতে, মানুষকে কর্মের মধ্য দিয়েই বিচার করা উচিত। গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মানুষের চলন-বলন, আচার ব্যবহারে যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়, অথবা যে সাধারণ নিয়ম খুঁজে পাওয়া যায়- তারই অধ্যয়ন সমাজ মনস্তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য।

নীচে সমাজতত্ত্বে মীড এর অবদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

৯.৫.১ কর্ম বা আচরণ বিশ্লেষণ (Analysis of the "act")

মীড সমাজকে বিবিধ সামাজিক আচরণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। শ্রম বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থিত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক দেওয়া ইত্যাদি বিষয়কে মীড "সামাজিক আচরণ" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, চরিত্রগতভাবে ভিন্ন বিবিধ মানুষের মধ্যে সামাজিক সমন্বয় সম্ভব হয় ভূমিকা গ্রহণ (role taking) এর দ্বারা। নিজের আচরণকে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করার নামই "ভূমিকা গ্রহণ"। আচরণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মীড 'ভূমিকা গ্রহণ" ছাড়াও সর্বজনীন অপর (generalised other), অঙ্গভঙ্গী বা ইশারা (gesture), অর্থপূর্ণ প্রতীক (significant symbol) ইত্যাদি ধারণার অবতারণা করেছেন। আত্ম (self) তত্ত্বের আলোচনায় উপরোল্লিখিত ধারণা সমূহের বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে।

ব্যক্তির প্রতিটি কর্মই (বা আচরণই), যেমন বৃহত্তর সামাজিক কর্মের একটি অংশ বিশেষ তেমনি তা উক্ত ব্যক্তির নিজ জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশও বটে। মীড এর মূল আলোচ্য বিষয় "কর্ম", আর এই কর্মের সূচনা হয়

দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণের তাগিদে। মানুষের ব্যবহারকে (behaviour) এরকম বিবিধ কর্মের সমাহার হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। কর্ম সদাবিকাশমান। সদাপরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত মানিয়ে চলার মধ্য দিয়ে কোনও কর্ম পরিণতি লাভ করে।

৯.৫.২ আত্ম তত্ত্ব (Theory of self)

মীড এর মতে, সমাজ বিনা আত্ম (self) বা কোনওরকম আত্ম সচেতনতা সম্ভব নয়। বিবিধ সামাজিক কর্মের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগের চলমান প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে সামাজিক কাঠামো। এই প্রক্রিয়ায় অঙ্গভঙ্গী বা ইশারা (gesture) খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মীড প্রাণীজগতের তাৎপর্যহীন ইশারার সঙ্গে মানব জগতের সচেতন ও তাৎপর্যপূর্ণ ইশারা'র (significant gesture) মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নিরূপণ করেন। প্রাণীজগতের ইশারা নির্ভর করে উদ্দীপকের তৎক্ষণাৎ সাড়া (response) দানের উপর। এর বিপরীতে মানুষের ক্ষেত্রে, ব্যক্তি তার নিজের চিন্তার মধ্যেই তার প্রশ্নের উত্তর খোঁজে। নিজ মধ্যে অপরের উপস্থিতি-ভূমিকাগ্রহণ, অন্য ব্যক্তির কর্মের ধরন অনুযায়ী নিজ কর্মের ধরন স্থির করার প্রবণতা ইত্যাদি বিষয়সমূহ তাৎপর্যপূর্ণ ইশারার ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়। কিন্তু সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে ইশারা যথেষ্ট নয় ; পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য ভাষা'র (language) প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সম অর্থ বহনকারী কিছু মৌলিখ ইশারা বা বাচনিক ইশারাই ভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়। পারস্পরিক বোধ্য বা পরস্পরের কাছে বোধ্য ইশারাকে মীড তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক (significant symbol) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ভাষার মধ্যে আমরা ইশারা'র তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীকে রূপান্তর ঘটতে দেখি। কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীকের মধ্য দিয়ে সকলের কাছে একই অর্থ বহন করে ভাষা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ''আমি একটি বই কিনেছি'' -এই বাক্যটি বাংলা ভাষায় বলা হয়েছে। বাক্যটি যখন উচ্চারিত হয় তখন প্রকৃত পক্ষে কন্ঠ হ'তে সুনির্দিষ্ট কিছু শব্দ এক্ষেত্রে এক একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক যা বক্তা ও শ্রোতার কাছে একই অর্থ বহন করে। ফলত, বক্তা এই বাক্য'র মধ্য দিয়ে যে অর্থ পরিস্ফুট করতে চান, শ্রোতার কাছে সেই অর্থই পরিস্ফুট হয় এবং সৃষ্টি হয় ভাষার। মনুষ্যেতর প্রাণী চিন্তায় নিজেকে অন্যের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না- অর্থাৎ তারা চিন্তা করতে পারে না। মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী। তার নিজের মনের মধ্যে কোনও প্রশ্ন দেখা দিলে সেই প্রশ্নের উত্তরও সে নিজের মনের মধ্যেই খোঁজে-খুঁজে পায়। অর্থাৎ একই সঙ্গে কোনও প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য উত্তর সম্পর্কে চিন্তা করবার ক্ষমতা মানুষের আছে। নিজ প্রশ্নের উত্তর নিজ মধ্যে খুঁজে পাওয়ার এই প্রক্রিয়ায় অতএব মানুষ নিজ মধ্যেই অপরের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। সহজভাবে বলা যায়, মনুষ্য সমাজে একজন মানুষ নিজ মধ্যে অপরের ভূমিকা খুঁজে পায় (ভূমিকা গ্রহণ) যা মনুষ্যেতর প্রাণীজগতে সম্ভব নয়। অপ্রতীকি মিথষ্ক্রিয়ায় (non-symbolic interaction) অন্যান্য প্রাণীদের মতো মানুষ নামক প্রাণীটিও সরাসরি সাড়া দিতে পারে। কিন্তু প্রতীকি মিথষ্ক্রিয়ায় (symbolic interaction) তাৎপর্যপূর্ণ ইশারার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তারা একে অপরের মনোভাব ব্যাখ্যা করতে পারে এবং তার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী কর্মপন্থা নিরুপণ করতে পারে।

৯.৫.৩ আত্ম উদ্ভব (Genesis of Self)

শৈশব অবস্থা থেকে ভূমিকা গ্রহণের মধ্য দিয়ে ঘটে আত্ম-উদ্ভব বা আত্ম'র বিকাশ। সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক ব্যবহার করা সম্ভব নয়। পরবর্তীকালে খেলাধুলা'র মধ্য দিয়ে শিশু অপরের ভূমিকা গ্রহণ করতে শেখে। শিশু কখনো মায়ের ভূমিকা, দিদি, শিক্ষিকা, পরিচারিকা, স্বাস্থ্যকর্মীর ভূমিকা (মেয়েরা) অথবা বাবা'র ভূমিকা, দাদা, পরিচারক, শিক্ষক, গাড়িচালক বা পুলিশের ভূমিকা (ছেলেরা) গ্রহণ করে। এইভাবে

খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শিশুমনে নিজেকে অপরের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারার ক্ষমতা বিকশিত হয়। তাদের ভূমিকাই শিশু গ্রহণ করে যারা তার কাছে পরিচিত (সামান্য হ'লেও) ও গুরুত্বপূর্ণ বা আকর্ষণীয়। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে অপরের ভূমিকা গ্রহণকে শিশু মনোবিকাশের প্রথম পর্যায় বলা যায়। এখনো শিশু বুঝতে পারে না যে তার সঙ্গে অপরাপর ব্যক্তির সম্পর্ক ছাড়াও ঐ সমস্ত লোকজনের (অপরাপর ব্যক্তিসমূহ) মধ্যে ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান, অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ, সে নিজের বাবাকে তার মায়ের, অথবা দাদু-ঠাকুমারও বাবা বলে মনে করে। তার নিজের দাদু যেন তার ঠাকুমারও দাদু। পরবর্তী পর্যায়ে জটিল ও সংগঠিত ক্রীড়ায় (game) অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সে অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে সচেতন হয়। এখন সে বুঝতে পারে যে তার সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্ক বা তার সঙ্গে তার বাবার সম্পর্ক অথবা বাবা ও মায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সবই আলাদা রকমের। খেলার তুলনায় ক্রীড়া অপেক্ষাকৃত জটিল ও সংগঠিত। ক্রীড়ায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে 'সর্বজনীন অপর' (generalised other) এর ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। দু'জন ব্যক্তির মধ্যে একজন অন্যজনের 'অপর'। কিন্তু বহু ব্যক্তির মধ্যে একজনের 'অপর' অনেকে, নানা ব্যক্তি, যারা আবার পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। এই নানা ব্যক্তি একত্রে একজন ব্যক্তির কাছে 'সর্বজনীন অপর' হিসেবে পরিগণিত হয়। শিশু মনোবিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে শিশু এই সর্বজনীন অপরের ভূমিকা অনুধাবন করতে পারে এবং এর মধ্য দিয়ে সমগ্র সম্প্রদায়ের (community) বা সমাজের (society) মনোভাব সম্বন্ধে সচেতন হয়। এখন সে আর শিশু নয়। একজন পরিণত ব্যক্তিত্ব।

"আত্ম"-র কাঠামো বা গঠন বিশ্লেষণে মীড উইলিয়াম জেমস এর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। বিশেষত, জেমস প্রণীত "আমি" (I) এবং "আমাকে" (me) এর মধ্যে প্রভেদ মীডকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। অধ্যাপক মার্টিন্ডেল এর মতে আত্ম ধারণা কেবলমাত্র কিছু সামাজিক মনোভাবের সংগঠনের ফলে গড়ে ওঠে না। "আত্ম"-র মধ্যে থাকে "আমি" এবং ব্যক্তিগত এই "আমি" সামাজিক "আমাকে" সম্বন্ধে সচেতন থাকে। "আমি" কখনই আমাকে নয়। আমি কর্ম্মের নীতি। অপরাপর ব্যক্তির মনোভাবের প্রভাবে যে আত্ম গড়ে ওঠে, "আমি" তার প্রতি সাড়া দেয় বা প্রতিক্রিয়া করে। ভবিষ্যতের "আমাকে" এর স্মৃতির মধ্যে নিহিত থাকে বর্তমানের "আমি"। "আমি" ব্যক্তিগত। কিন্তু "আমাকে" সামাজিক। অপরের অস্তিত্ব বিনা "আমাকে" এর ধারণা অকল্পনীয়। সামগ্রিক অর্থে আত্ম, অতএব, দুটি বিষয় দ্বারা গঠিত। প্রথম, "আমাকে" এর মধ্যে সর্বজনীন অপরের যে স্থায়ী প্রতিফলন দেখা যায় সেই বিষয়টি ও দ্বিতীয়ত, অপ্রত্যাশিত, লাগাম ছাড়া স্বতস্ফুর্ততার প্রতীক "আমি"।

সামাজিক কর্ম (Social acts) প্রসঙ্গে মীড এর অবস্থান কিছুটা পরস্পর বিরোধী মনে হয়। একদিকে তিনি সহযোগিতামূলক কর্মকে সামাজিক কর্ম বলেছেন, অন্যদিকে দ্বন্দ্ব-সংঘাতমূলক কর্মকেও সামাজিক কর্ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, শুধুমাত্র সহযোগিতা নয়, প্রতিযোগিতাও সামাজিক কর্ম হিসেবে বিবেচিত হ'তে পারে। প্রখ্যাত জার্মান সমাজতাত্ত্বিক জর্জ সিমেলের মতো মীডও মনে করতেন যে দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতা একে অপরের পরিপূরক।

চার্লস হর্টন কুলে'র মতো মীডও "জ্ঞান সমাজতত্ত্ব" (Sociology of Knowledge) এর একজন পথপ্রদর্শক। কুলের মতোই তিনিও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতিতে সহানুভূতিমূলক অনুধাবন (sympathetic understanding) এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন- অর্থাৎ বোঝাতে চেয়েছেন যে, বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নয়, সামাজিক কর্ম বা অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিক বিষয়কে অনুধাবন করতে গেলে তা কর্তার (actor) দৃষ্টিভঙ্গীতে বা তার নিজস্ব অবস্থান থেকেই করা উচিত। তবে সমাজতত্ত্বে কুলের অবদানে যে আত্মবাদীতা (subjectivism) বা

আত্মজ্ঞানবাদীতা (solipsism) এর বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা যায়, মীড এর রচনায় তা অনুপস্থিত। পরিবর্তে, মীড-এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় সামাজিক বস্তুবাদীতা (social objectivism) । মীড এর মতে, সমাজ কোনও মানসিক বিষয় নয়, মানুষের বস্তুগত অভিজ্ঞতার (objective experience) উপর নির্ভর করে সমাজের অস্তিত্ব। এখানেই তিনি অপরাপর সমাজ মনস্তাত্ত্বিকদের তুলনায় স্বতন্ত্র, এখানেই সমাজতত্ত্বে তাঁর চিরস্মরণীয় সুগভীর অবদান স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অনুশীলনী ঃ ৩

১) ভূমিকা গ্রহণ কি ? উদাহরণ দিন।

.....

.....

.....

.....

২) সর্বজনীন অপর বলতে কি বোঝেন ?

.....

.....

.....

.....

৯.৬ রবার্ট এজরা পার্ক (Robert Ezra Park) (1864 - 1944)

সমাজতত্ত্বে বিখ্যাত চিকাগো ঘরাণার পুরোধা রবার্ট এজরা পার্ক (১৮৬৪-১৯৪৪) সমাজতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।

সমাজতত্ত্বে পার্কের অবদান বহুমুখী, বহুধাবিভক্ত। তাঁর এই অবদান নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

৯.৬.১ সংঘবদ্ধ ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Collective Behaviour & Social Control)

সামাজিক কাঠামোর (social structure) বিশ্লেষণ অপেক্ষা পার্ক সামাজিক প্রক্রিয়ার (social process) আলোচনায় বেশী উৎসাহী ছিলেন। সমাজতত্ত্বকে পার্ক, সংঘবদ্ধ ব্যবহারের বিজ্ঞান হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মিথষ্ক্রিয়ার (interaction) প্রক্রিয়াজাত ঐতিহ্য ও নিয়ম কানুনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের (মিথষ্ক্রিয়া) ফলে সৃষ্টি হয় সমাজ। সমাজের মূল বিষয়টি নিহিত থাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। পার্কের মতে, সমাজের মূল বিচার্য বিষয় হ'ল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। সর্বত্রই সমাজ এক নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ করা, সংঘবদ্ধ করা এবং তাদের উদ্যমকে নতুন দিশা দেখানোই সমাজের কাজ। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানুষ সমাজের অঙ্গীভূত হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যৌথ

ভাবে বসবাস করতে উদ্যোগী হয়—তার অনুসন্ধানের পদ্ধতি বা সেই প্রক্রিয়ার অধ্যয়নই সমাজতত্ত্ব।

যে পদ্ধতি বা পন্থায় সংঘবদ্ধ ব্যবহারকে সংগঠিত করা যায়, ধারণ করা যায় বা একটি নির্দিষ্ট অভিমুখে তাকে চালিত করা যায় পার্ক তাকেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে অভিহিত করেছেন। সমাজে বিভিন্ন রকমের প্রক্রিয়া, যেমন প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, বিরোধ প্রভৃতি দেখা যায়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, বিরোধকে প্রশমিত করা হয় এবং মানুষকে সামাজিক শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায়। অবশ্য পার্ক-এর মতে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ-এর মাধ্যমে কখনোই সামাজিক শৃঙ্খলাকে চিরস্থায়ী করা যায় না, যেহেতু পারস্পরিক বিরোধের নিয়ন্ত্রণ ও পারস্পরিক বিরোধের স্থায়ী অপসারণ একই বিষয় নয়। সমাজে পারস্পরিক বিরোধিতা চিরকালই ছিল, আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই বিরোধকে কিছুটা প্রশমিত করা যায় মাত্র। বিরোধ প্রশমনের ক্ষেত্রে পরস্পর মানিয়ে নেওয়া বা উপযোজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯.৬.২ সামাজিক প্রক্রিয়া (Social Process)

পার্ক চার ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন—প্রতিযোগিতা (competition), দ্বন্দ্ব (conflict), উপযোজন (accommodation) ও আত্মীকরণ (assimilation)।

প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব ঃ সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার এক শাশ্বত মূল রূপ হ'ল প্রতিযোগিতা। পার্ক-এর মতে প্রতিযোগিতা এক ধরনের মিথষ্ক্রিয়া যেখানে মুখোমুখি সম্পর্ক বা সংসর্গ (contact) সাধারণত অনুপস্থিত থাকে। কোনও মূল্যবান বা কাঙ্খিত বস্তুর অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে যখন একাধিক মানুষ পৃথক পৃথক ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে তখনই প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ সাধারণতঃ একে অপরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে না। যখন দুই প্রতিযোগীর মনের সংযোগ ঘটে, অর্থাৎ একজনের কাছে প্রতিযোগিতার যে অর্থ তা' অন্যের কাছে পৌঁছয় এবং ফলত দু'টি মন পারস্পরিক প্রভাবিত হয়, তখনই গড়ে ওঠে সামাজিক সংসর্গ (social contact)। তখনই অসচেতন প্রতিযোগিতা পরিণত হয় সচেতন দ্বন্দ্বে এবং প্রতিযোগীরা একে অপরকে বিরোধীপক্ষ বা শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে। পার্ক এর মতে, জীবজগৎ তথা প্রাকৃতিক জগতের মতোই মানবসমাজেও প্রতিযোগিতা চিরন্তন ও সদা প্রবহমান। অন্যদিকে দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত এবং সবিরাম, অর্থাৎ কিছুটা বিচ্ছিন্ন বা সদা প্রবহমান নয়। পার্ক এরমতে, অর্থনৈতিক জগতে নিজেদের অবস্থান উন্নত করার প্রয়োজনে বা সামাজিক সম্মান অর্জনের লক্ষ্যে মানুষ পারস্পরিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। বাস্তুতান্ত্রিক সম্প্রদায়ে (Ecological community) একজনের অবস্থান নির্ধারণ করে প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব সমাজে (society) তার অবস্থান নির্ধারণ করে।

উপযোজন ঃ দ্বন্দ্বের অবসানে ঘটে উপযোজন-এ যখন সমাজে সম্মান ও ক্ষমতা, উচ্চতর বা নিম্নতর অবস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলি বিভিন্ন সামাজিক নিয়মকানুনের দ্বারা অন্তত সাময়িক ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও স্থিরীকৃত হয় ; দ্বন্দ্বের ভূমিকা হয়ে পড়ে প্রচ্ছন্ন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেই দ্বন্দ্বের পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে। অতএব, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মতোই উপযোজন ভঙ্গুর প্রকৃতির এবং মুহূর্তে দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হ'তে পারে. উপযোজন আসলে দ্বন্দ্বের সাময়িক, স্বল্পকালীন বিরতি। অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও সহযোগীবৃন্দ উল্লেখিত পার্ক ও তার সহযোগী সমাজতাত্ত্বিক বার্জেস-এর মতে, "উপযোজনের মাধ্যমে বিবদমান উপাদান সমূহের উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয় যার ফলে এই সংঘাত আপাত দৃষ্টিতে অদৃশ্য হয় (অবশ্য তা সুপ্ত

থাকতে পারে এবং ভবিষ্যতে পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে)। উপযোজন স্থায়ী হ'তে পারে যেমন, বর্ণ ভিত্তিক সমাজে বিভিন্ন বর্ণের সহ অবস্থান ; অথবা তা অস্থায়ী হ'তে পারে, যেমন মুক্ত সমাজে (open society) বিভিন্ন শ্রেণীর সহ অবস্থান।

আত্মীকরণ ঃ Introduction to the Science of Sociology বা সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানের ভূমিকা গ্রন্থে পার্ক ও বার্জেস উপরোল্লিখিত তিনটে সামাজিক প্রক্রিয়া ছাড়াও আত্মীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, আত্মীকরণ এমন এক ধরনের মিলন প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীসমূহ, স্মৃতি অনুভব, মনোভাব ইতিহাস এমনকি জীবনের সকল অভিজ্ঞতা পরস্পর বন্টন করে নেয় এবং এইভাবে একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় নিজেদের সামিল করে নেয় ; সৃষ্টি হয় এক সাধারণ জীবনধারা। উপযোজন এবং আত্মীকরণের মধ্যে মূল পার্থক্য হ'ল প্রথমোক্ত প্রক্রিয়াটি হঠাৎ ও চরম এবং শেষোক্তটি ধীর ও স্বাভাবিক। পার্ক-এর মতে, উপরোল্লিখিত তিনটি সামাজিক প্রক্রিয়া, যথাঃ প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব ও উপযোজন বহু ধরনের সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে ঘটে থাকে। কিন্তু আত্মীকরণের ঘটনা বা তৎসংক্রান্ত আলোচনা তিনি সংস্কৃতির সমাজতত্ত্বর (sociology of culture) মুখ্য আলোচ্য বিষয় হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

৯.৬.৩ সামাজিক দূরত্ব (Social distance)

পার্ক আজীবন বিবিধ বর্ণগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব মোচনে সক্রিয় ছিলেন। সমাজতাত্ত্বিক জর্জ সিমেলের (George Simmel) কাছ থেকে পাওয়া সামাজিক দূরত্বের ধারণার সাহায্যে বিবিধ বর্ণগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের রহস্য উন্মোচনে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। বিভন্ন গোষ্ঠী বা ব্যক্তির মধ্যে অবস্থিত পারস্পরিক নৈকট্য বা অন্তরঙ্গতার পরিমাণকে সামাজিক দূরত্ব বলে। দু'টি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক দূরত্ব যত বেশী হয়, পারস্পরিক প্রভাবের সম্ভাবনা ততই হ্রাস পায়। পার্ক-এর মতে, জনগোষ্ঠী সচেতনতা বা শ্রেণী সচেতনতা নামক প্রত্যয়গুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক দূরত্বের বিষয়টিকেই তুলে ধরে। এই সমস্ত প্রত্যয়গুলি এমন একটি মানসিক অবস্থাকে সূচিত করে যেখানে আমরা অপরাপর সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেদের সামাজিক দূরত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বাড়ীতে যে ঝি-চাকর (কাজের লোক) কাজ করে তাদের সঙ্গে ততক্ষণই গৃহকর্ত্রীর সুসম্পর্ক বজায় থাকে যতক্ষণ সেই কাজের লোক নিজের জায়গা সম্বন্ধে সচেতন থাকেন, নিজের সীমানা সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। অন্যথায় সম্পর্ক তিক্ত হয়ে পড়ে। সর্বদাই আশা করা হয় যাতে কাজের লোক সঠিক দূরত্ব বজায় রাখে। পার্কের মতে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রবৃত্তিগত ও স্বাভাবিক প্রবণতা-ই আসলে সংস্কার বা বদ্ধমূল বিশ্বাস (prejudice)। এই অর্থে বদ্ধমূল বিশ্বাসকে পার্ক কোনরকম অস্বাভাবিক বিষয় বলে মনে করেন নি বরং এটা খুবই স্বাভাবিক এবং শাশ্বত বা চিরন্তন। বদ্ধমূল বিশ্বাসবিহীন কোন মানুষ দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে পারে না। বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। বন্ধুত্ব ছাড়া যেমন কোনও ব্যক্তির নিজস্ব জগৎ গড়ে উঠতে পারে না, তেমনই শত্রুতাহীন জীবন অতিবাহিত করাও সম্ভব নয়। বদ্ধমূল বিশ্বাসের কারণেই আমার বন্ধুর গুণাবলী বিচারে আমি যেমন ঝোঁক (bias) মুক্ত নই তেমন শত্রুর গুণও আমার চোখে পড়ে না. পার্ক-এর মতে সামাজিক দূরত্ব ও বদ্ধমূল বিশ্বাসকে মনুষ্য সমাজ থেকে কখনোই মুছে ফেলা যাবে না। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেছেন যে, জাতি-গোষ্ঠীগত বদ্ধমূল বিশ্বাস এবং সামাজিক দূরত্বকেই কখনোই জাতি গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা বা দ্বন্দ্বের সাথে গুলিয়ে ফেলা উচিত হবে না।

৯.৬.৪ সামাজিক পরিবর্তন (Social change)

সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে পার্ক তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, অতৃপ্তি ও তদ্‌জনিত সংকট ও সামাজিক অসন্তোষ। দ্বিতীয়ত, সামাজিক অসন্তোষজাত গণ আন্দোলনের পর্যায় ও তৃতীয়ত ঃ এক নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উদ্ভবের মধ্য দিয়ে উপযোজন এবং এই সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি।

সামাজিক অসন্তোষের কারণে প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুনগুলি ভাঙ্গতে থাকে এবং এক সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। প্রথমদিকে এই আন্দোলন কিছুটা অসংগঠিত থাকলেও ধীরে ধীরে তা সংগঠিত হয়ে ওঠে এবং একটি স্থায়ী সাংগঠনিক রূপ পায়। পরবর্তী পর্যায়ে সংগঠিত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় এক নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো—ঘটে উপযোজন। পার্ক পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াকে "প্রাকৃতিক ইতিহাস" natural history হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করেছেন।

৯.৬.৫ প্রাণ শৃঙ্খলা ও সামাজিক শৃঙ্খলা (The Biotic Order and the Social Order)

ডারউইনের প্রভাবে প্রভাবিত পার্ক উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের সমাহারে গঠিত প্রাণশৃঙ্খলা ধারণার অবতারণা করেছেন। তিনি এই প্রাণশৃঙ্খলাকে সম্প্রদায় আখ্যা দিয়েছেন। পার্ক সম্প্রদায়ের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যর উল্লেখ করেছেন ঃ ১) একটি নির্দিষ্ট সীমাভিত্তিক সংগঠন ২) নিজ অঞ্চলে মোটামুটি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকা ৩) বিভিন্ন এককের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধতা। ঐক্যবদ্ধ প্রাণ সম্প্রদায় (Biotic Community) -এর মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী এক জটিল সম্পর্কের আবর্তে আবদ্ধ। এক প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সম্প্রদায়ের প্রতিটি একক ক্ষমতা অনুযায়ী পরিবেশে যথাযোগ্য স্থান লাভ করে।

প্রাণ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বিকাশের যে নিয়ম দেখা যায় তা মানব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু পার্কের মতে, প্রাণ সম্প্রদায় ও মানব সম্প্রদায় উভয়ের মধ্যেই এক ধরনের বাস্তুতান্ত্রিক শৃঙ্খলা (ecological order) পরিলক্ষিত হ'লেও মানব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষত একটি সামাজিক বা নৈতিক শৃঙ্খলাও পরিলক্ষিত হয় যা অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণ জগতে দেখা যায় না।

জীব জগতে যে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম (struggle for existence) দেখা যায়, পার্ক-এর মতে মানব সমাজের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা তার সঙ্গে তুলনীয়। উভয়ের মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। উভয়ক্ষেত্রেই আধিপত্য নীতি (principle of dominance) পরিলক্ষিত হয়। নগরাঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে মুখ্যত আধিপত্য ও গৌণত প্রতিযোগিতা দেখা যায়। নগরাঞ্চলে আগত অভিবাসীদের (immigrant) ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সর্বপ্রথম (নগর বিকাশের প্রথম পর্যায়ে) তারা নগরের কেন্দ্রের কাছাকাছি বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে তারা ক্রমাগত দূরে সরে যেতে থাকে এবং অবশেষে নগরের বহিঃসীমানা বরাবর বসবাস করতে বাধ্য হয়। আর্থসামাজিক বিচারে অধিকতর বলশালী গোষ্ঠীর মানুষদের আধিপত্য বিস্তার ও পাশাপাশি তাদের সঙ্গে ও নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণেই এই ধরনের ঘটনা ঘটে। এইভাবে ক্রমাগত নগরাঞ্চল ছাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল আর্থসামাজিক ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর মানুষেরা শহরতলী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

৯.৬.৬ আত্ম, সামাজিক ভূমিকা ও প্রান্তিক মানুষ (Self, Social Role and Marginal Man)

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও পার্ক আত্ম ও সামাজিক ভূমিকা (The self and the social role) প্রসঙ্গে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। উইলিয়াম জেমস্ ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে একই ধারায় পার্ক তাঁর আত্ম-ধারণার

ব্যাখ্যা করেন। এক্ষেত্রে পার্ক-এর বিশেষ অবদান হ'ল আত্ম ধারণার সঙ্গে "সামাজিক ভূমিকা" ধারণার যোগসাধন। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন যে, ব্যক্তি (person) শব্দটির মূল অর্থ মুখোশ (Persona) । নাটক থেকে এই Persona বা মুখোশের ধারণাটি নেওয়া হয়েছে। নাটকে যেমন একই ব্যক্তি নানা মুখোশে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে থাকে সামাজিক মানুষের ক্ষেত্রেও সেই একই বক্তব্য। একই ব্যক্তি যেন বিভিন্ন সময়ে মুখোশ পরিবর্তনের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন শিক্ষিকা একই সঙ্গে দিদি, মা, বোন পিসী, কোনও সংস্থার সদস্যা, নেত্রী, লেখিকা ইত্যাদি বহু সামাজিক ভূমিকা পালন করেন এবং এক একটি পরিস্থিতিতে বিশেষ সামাজিক ভূমিকা পালন করেন। এই ভূমিকাগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি নিজেকে চিনতে পারেন, নিজের সম্বন্ধে একটি ধারণা গড়ে তোলেন এবং গড়ে ওঠে তাঁর "আত্ম"। সামাজিক অবস্থান-এর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ব্যক্তির আত্ম ধারণা। এই আত্ম ধারণা তত্ত্বের উপর নির্ভর করে পার্ক গড়ে তোলেন তাঁর ""প্রান্তিক মানুষ" (Marginal Man) সংক্রান্ত তত্ত্ব। পার্ক-এর মতে, প্রান্তিক মানুষ একই সঙ্গে দু'টি সংস্কৃতির শরিক, কিন্তু কোনটিতেই পুরোপুরি বিরাজ করেন না। তিনি সদা পরিবর্তনশীল ও উভয়বল (ambivalent)। তাঁর মধ্যে বিপরীত ধর্মী শক্তি যুগপৎ বিদ্যমান। একই সঙ্গে তিনি দুই পৃথিবীর মানুষ এবং উভয় পৃথিবীতে তিনি অচেনা, বাইরের লোক। উদাহরণস্বরূপ, কোনও শহরে বসবাসকারী সংখ্যালঘু ভিন্ন ভাষাভাষী বা ধর্ম বা সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষের কথা বলা যায়। এমনকি কাজকর্মে প্রয়োজনে প্রায় স্থায়ীভাবে বিদেশে বসবাসকারী বাড়ির একজন সদস্য বা প্রিয়জনের কথাও সম্ভব উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য এই প্রান্তিকতা বা তার এই প্রান্তিক অবস্থান তাকে শুধু অসুবিধার মধ্যেই ফেলে না তার মনোজগতকে অনেক বেশী প্রশস্ত করে, ঝোঁকবিহীন ও যুক্তিবাদী মানুষ হিসাবে তাকে গড়ে তোলে। যেহেতু সে কোনও গোষ্ঠীতেই সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করে না অতএব সে তুলনামূলক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হ'তে পারে। সিমেল ও ভেবলেন-এর মতো পার্ক-ও মনে করেন যে, প্রান্তিক মানুষ অপেক্ষাকৃত সুসভ্য ও উন্নততর।

শহুরে, সুপণ্ডিত, সুদক্ষ লেখক পার্ক সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি সমাজতত্ত্বে সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন। ধারণাটি ঠিক নয়। তিনি কখনই সংখ্যাগত বা পরিমাণগত পরিমাপের বিরোধী ছিলেন না। প্রয়োজনমতো বিভিন্ন পদ্ধতির সঠিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান সংগ্রহের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। যেহেতু তিনি শুধুমাত্র চিন্তার জগতে বিচরণকারী সমাজতাত্ত্বিক ছিলেন না এবং বিশ্ববিদ্যালয় বা সরাসরি পড়াশুনার জগতের বাইরের বহু বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেই কারণেই সম-সাময়িক অপরাপর সমাজতাত্ত্বিকদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি পরিমাণ মানুষের কাছে পৌছতে পেরেছেন এবং এইভাবে চিন্তার জগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের মেলবন্ধন ঘটানোর মধ্য দিয়ে পার্ক সমাজতত্ত্বকে গভীরভাবে পরিপুষ্ট করেছেন-এ বিষয়ে বোধ হয় কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

অনুশীলনী ঃ ৪

১) পার্ক কি কি সামাজিক প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন ?

.....

.....

.....

.....

২) প্রাণ সম্প্রদায় ও মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ নিরূপণ করুন।

.....

.....

.....

.....

৯.৭ পিটিরিম আলেক্সান্ড্রোভিচ্ সোরোকিন (Pitirim Alexandrovich Sorokin) (1889 -1968)

বিংশ শতাব্দীর প্রথিতযশা আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক পিটিরিম এ. সোরোকিন আদতে এক দরিদ্র রাশিয়ান কৃষক পরিবারের সন্তান। তরুণ প্রগতিশীল সোরোকিন ছিলেন জার বিরোধী রাশিয়ান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। কিন্তু রাশিয়ান বিপ্লবের রক্তাক্ত ইতিহাস তাঁকে কম্যুনিষ্ঠ বিরোধী ও রক্ষণশীল করে তোলে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন এবং আজীবন তিনি সেই পদে সম্মানের সঙ্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বহু সমাজতাত্ত্বিক প্রবন্ধ ও পুস্তক রচয়িতা সোরোকিনের সমাজতাত্ত্বিক অবদান সংক্ষেপে বিবৃত করা কষ্ঠসাধ্য। তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য চারখণ্ডে রচিত " সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিবিদ্যা" (Social and cultural Dynamics) গ্রন্থটি ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে "সমাজ, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্ব" (Society, culture and personality), "সমসাময়িক সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বাবলী"(Cotemporary Sociological Theories) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। উপরোল্লিত রচনা সমূহের মাধ্যমে সোরোকিনের সমাজতাত্ত্বিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে যে আভাস পাওয়া যায় নীচে তা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হ'ল।

৯.৭.১ সমাজতত্ত্ব (Sociology)

সোরোকিন সমাজতত্ত্বকে মূলত তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখেছেন। প্রথমত, বিশ্লেষণাত্মক সমাজতত্ত্ব (analytical sociology)। তাঁর "সমসাময়িক সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বাবলী" গ্রন্থে তিনি সমাজতত্ত্বকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, সমাজতত্ত্ব এমন একটি বিষয় যা (১) বিভিন্ন শ্রেণীর বা সামাজিক বিষয়াবলীর মধ্যে বা বিবিধ সামাজিক ঘটনাবলীর মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করে, ২) বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের (যথা ঃ অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধর্মনীতি ইত্যাদি) এর মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের অনুসন্ধান করে এবং ৩) বিভিন্ন সামাজিক ও অসামাজিক (non-social) বিষয় সমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের অনুসন্ধান করে। তিনি সমাজকে বিশ্লেষকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখেছেন এবং সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি সামাজিক মিথষ্ক্রিয়াকে (Social Interaction) মূল একক হিসাবে দেখেছেন। তাঁর "সামাজিক ও সাংস্কতিক গতিবিদ্যা" গ্রন্থে যদিও এই বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী তিনি বজায় রেখেছেন তবুও এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক তত্ত্বাবলীর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সোরোকিন চিরাচরিত 'প্রগতি' ধারণার পরিবর্তে সমাজ পরিবর্তনের এক নতুন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। ১৯৪৭

খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী পর্যায় থেকে তিনি এক নতুন (তৃতীয়) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন যাকে ঐক্যপন্থী (integralist) দৃষ্টিভঙ্গী বলা চলে। এই নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সমাজতাত্ত্বিক তথ্যাবলীর অনুসন্ধান তিনটি উপায়ে করা যেতে পারে ঃ ১) ইন্দ্রিয় অনুভূতি (sense perception) ও অভিজ্ঞতালব্ধ (empiric) পর্যবেক্ষণের (observation) সাহায্যে ; ২) মানুষের বিচারশক্তি (Human reason)-র যুক্তি দ্বারা ; এবং ৩) বিশ্বাস বা অতীন্দ্রিয় অতি যৌক্তিক স্বজ্ঞা (intuition) বা গুপ্ত রহস্যমূলক অভিজ্ঞতার দ্বারা। অন্যভাবে বলা যায় যে, সোরোকিন সত্যদর্শনের এমন একটি পদ্ধতির কথা বলেন যা বিজ্ঞান, যুক্তি ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই কারণেই তা অধিকাংশ সমাজতাত্ত্বিকের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বর্জিত। বিশেষত, সমালোচকেরা সোরোকিনের তৃতীয় পন্থা- যা 'বিশ্বাস' (Faith) কে অধিকতর গুরুত্ব দেয়-কিছুতেই মানতে রাজি নন। তাঁদের মতে, বিজ্ঞানে রহস্য, বিশ্বাস বা স্বজ্ঞার কোনও স্থান হ'তে পারে না।

৯.৭.২ ব্যক্তিত্ব (Personality)

তাঁর সমাজ, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্ব গ্রন্থে সোরোকিন ব্যক্তিত্বকে সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে দেখিয়েছেন। প্রচলিত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিত্বর ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে ব্যক্তিত্বের আন্তঃ সম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ব্যক্তি বনাম সমাজ বিতর্ককে তিনি অর্থহীন বলে মনে করেন। ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজ বা সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তি বড় -এই ধরনের ধারণায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না।

সোরোকিনের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে অসংখ্য আত্ম-অথবা অসংখ্য ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। কোনও ব্যক্তি যতগুলি গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত, তিনি সমসংখ্যক আত্ম (self) বা ভূমিকা (Role) পালন করে থাকেন। অতএব, বলা যেতে পারে যে, সোরোকিন ব্যক্তিত্বের বহুমুখীতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর "সামাজিক সচলতা" ও অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে তিনি সামাজিক পরিবর্তন ও ব্যক্তিত্বের বিশৃঙ্খলা (disorganisation)-র মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একটি নির্দিষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোয় সাধারণতঃ একটি নির্দিষ্ট ধরনের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে এটা পরিস্কার যে তিনি ব্যক্তিত্বের গঠনে সমাজ ও সংস্কৃতির গুরুত্বকে নির্দ্বিধায় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একই সঙ্গে এক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ ও নেতৃত্বের ভূমিকায় বিষয়টিকে ও তিনি লঘু করেন নি।

৯.৭.৩ সামাজিক প্রক্রিয়া (Social process) ঃ

সমাজতত্ত্বকে সোরোকিন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে অর্থপূর্ণ মিথষ্ক্রিয়ার অধ্যয়ন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। সামাজিক সাংস্কৃতিক বিষয় সমূহকে তিনি তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন, ১) মানুষের চিন্তন (thinking), ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া (action and reaction) ২) অর্থ, মূল্য ও নিয়ম-যেগুলি ক্রিয়াকে ঘটায় বা ক্রিয়ার একটি অংশ হিসাবে বিরাজ করে। (অর্থ-meaning, মূল্য-Value, নিয়ম-norms) এবং ৩) মানুষের বাহ্যিক ব্যবহার (Overt behaviour) ও বস্তুগত বিষয়সমূহ (material phenomena) যেগুলির মধ্য দিয়ে অর্থ, মূল্য ও নিয়ম সমূহ বিষয়গত ভাব প্রকাশিত হয় ও সামাজিক হয়ে ওঠে। সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু হিসেবে সোরোকিন মানুষের ব্যবহার, সামাজিক সংগঠন, সামাজিক প্রক্রিয়া, ব্যবহারের অর্থ, মূল্য, নিয়ম ইত্যাদি বিষয়সমূহের উল্লেখ করেছেন। উপরোল্লিখিত সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ কোনও একটির অধিক গুরুত্ব তিনি স্বীকার করেননি। যাবতীয় সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে তিনি সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন।

বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক বিন্যাসে (Social system) যে মিথষ্ক্রিয়ার প্রক্রিয়া দেখা যায়, সোরোকিন তার কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন ; যথা, ১) সংগঠনের অস্তিত্ব বা অনুপস্থিতি ২) সহ ভ্রাতৃত্ব (Solidarity) বা বিরোধ (atagomism) এবং ৩) ঐক্যের উপস্থিতি বা তার অভাব। তিনি সহ-ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য প্রক্রিয়াকে দুটি আন্তঃসম্পর্কিত সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন।

৯.৭.৪ সামাজিক পরিবর্তন (Social Change) ঃ

সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে সোরোকিনের অবদান সম্ভবত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, একাধারে গৃহীত এবং বিতর্কিত। "বিপ্লবের সমাজতত্ত্ব", "সামাজিক সচলতা", "সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিবিদ্যা" (social and cultural Dyanmics), "দুর্যোগে মানুষ ও সমাজ" (Man and society in calamity) প্রমুখ গ্রন্থাবলীতে তিনি সামাজিক স্তর-বিন্যাস, সামাজিক সচলতা বিপ্লব ও সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

"সামাজিক সচলতা" গ্রন্থে তিনি সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকৃতি ও কারণসমূহের বিশ্লেষণ পূর্বক স্তরবিন্যাসের অনিবার্যতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রত্যেক সমাজেই উচ্চ-নিচ ভেদাভেদ, অসাম্য ইত্যাদি বিষয় চিরস্থায়ী হিসেবে বিরাজ করে। স্তরবিন্যাসবিহীন কোনও সমাজের কথা কল্পনা করা যায় না। প্রসঙ্গত, তিনি শ্রেণীহীন তথা স্তরবিন্যাসহীন সমাজের স্বপ্নকে একটি অবাস্তব কল্পনা হিসেবে উল্লেখ করেন। ফরাসী ও রাশিয়ান বিপ্লবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর বিপ্লবের সমাজতত্ত্ব গ্রন্থে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, বিপ্লব আসলে একদিকে মানুষের যুক্তিবোধ ও অন্যদিকে অসংলগ্ন, অসামাজিক, জান্তব প্রবৃত্তির মধ্যে যে ভারসাম্য বজায় থাকে, তার ভাঙ্গন। যেহেতু বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানুষের শুভবুদ্ধির বদলে জৈবিক অথবা জান্তব প্রবৃত্তির জয়লাভ ঘটে, অতএব বিপ্লব এক সামাজিক দুর্যোগ বিশেষ।

বহু সমালোচিত সোরোকিনের এই বিপ্লবের তত্ত্ব বর্তমানে অধিকাংশ সমাজতাত্ত্বিক বর্জন করেছেন.

তুলনায় অধিকতর সমাদৃত তাঁর সামাজিক সচলতার তত্ত্ব। সোরোকিন দুই ধরনের সামাজিক সচলতার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, আনুভূমিক (Horizontal) ও দ্বিতীয়ত, উলম্বী (vertical) সামাজিক সচলতা। একই স্তরে অবস্থিত কোনও একটি গোষ্ঠী থেকে অন্য কোনও গোষ্ঠীতে কোনও ব্যক্তির অবস্থান পরিবর্তনকে তিনি আনুভূতিক সচলতা বলেছেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তির শ্রেণী-অবস্থান অথবা সামাজিক অবস্থানের কোনও পরিবর্তনের ঘটনাকে বলা হয় উল্লম্বী সচলতা। এক্ষেত্রে হয় ব্যক্তির শ্রেণী-অবস্থানের উন্নতি ঘটে বা তিনি উচ্চগামী হন অথবা তার অবস্থানের অবনতি ঘটে বা তিনি নিম্নগামী হন। সোরোকিনের মতে, প্রত্যেক সমাজেই উল্লম্বী সচলতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু বিভিন্ন সমাজে এই বিষয়টি বিভিন্ন রকম গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে সোরোকিনের মুখ্য অবদান নিহিত আছে তাঁর 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিবিদ্যা' গ্রন্থটিতে। সংস্কৃতির বিশ্লেষণ ও সমাজ পরিবর্তনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি মূলত তিন ধরনের সংস্কৃতি বা তিন ধরনের মানসিকতার উল্লেখ করেন ; যথা, অনুভূতি মূলক (Sensate), ধর্মমূলক (ideational) ও ভাবমূলক (idealistic)।

অনুভূতিমূলক সাংস্কৃতিক মানসিকতা অনুযায়ী বাস্তবকে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা সম্ভব বলে মনে করা হয়। এই মানসিকতা মূলত অজ্ঞাবাদী (agnostic) বা নাস্তিকতা (atheistic)-র মানসিকতা। অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্বের বদলে বাস্তব জগতের মধ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই যাবতীয় ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা সম্ভব বলে এক্ষেত্রে মনে করা হয়। কোনও রকম পরম সত্যের অস্তিত্বে (absolute) এই ধরনের মানসিকতা বিশ্বাস করে না।

জাগতিক অথবা ভৌতিক সন্তুষ্টির প্রয়োজনে পৃথিবীর উপর বা প্রকৃতির উপর আধিপত্য বা কর্তৃত্ব কায়েম করাই এই ধরনের মানসিকতার মূল উদ্দেশ্য। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই এক্ষেত্রে ক্ষমতার উৎস।

অপরদিকে, ধর্মমূলক সাংস্কৃতিক মানসিকতা বাস্তব অবস্থাকে গুরুত্বহীন বলে মনে করে। এর উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিকতা এবং এই উদ্দেশ্য সাধনে প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে আনবার কোন মানসিকতা থাকে না ; বরং প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াই এই ধরনের সাংস্কৃতিক মানসিকতা সম্পন্ন মানুষের মূল উদ্দেশ্য। বিশ্বাস ও গুপ্ত জ্ঞানই এক্ষেত্রে সত্যের ও ক্ষমতার উৎস।

ভাববাদী (idealistic) সাংস্কৃতিক মানসিকতা উপরোল্লিখিত দু'টি সাংস্কৃতিক মানসিকতার এক সংশ্লেষ বিশেষ। তবু কিছুটা হ'লেও এক্ষেত্রে ধর্মমূলক সাংস্কৃতিক মানসিকতার আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক, বিশ্বাস বা অনুভূতির পরিবর্তে এই ভাববাদী সাংস্কৃতিক মানসিকতার পর্যায়ে যুক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সোরোকিন এই ধরনের সাংস্কৃতিক মানসিকতার পক্ষপাতী ছিলেন।

সমাজ পরিবর্তনের চালিকাশক্তি নিহিত রয়েছে এই প্রতিটি মানসিকতা বা বিন্যাস (system) এর অভ্যন্তরে। অর্থাৎ, প্রতিটি বিন্যাসেরই অভ্যন্তরে রয়েছে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়ার এক স্বকীয় প্রবণতা। অতএব অনুভূতি মূলক সমাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে এতটাই অনুভূতিপ্রবণ বা অনুভূতি নির্ভর হয়ে পড়ে যে, তার অস্তিত্ব রক্ষাই আর সম্ভব হয় না। অর্থাৎ নিজেই নিজের ধ্বংসের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে। মানুষ তখন অনুভূতিমূলক মানসিকতা তথা অনুভূতি নির্ভর বিন্যাসকে বর্জন করে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে ধর্মমূলক মানসিকতা বিন্যাসকে গ্রহণ করে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই ধরনের মানসিকতাও ক্রমাগত বিকশিত হবার পথ ধরে তার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় এবং সমাজ অতিরিক্ত পরিমাণ ধর্মপ্রবণ য ধর্মভিত্তিক হয়ে পড়ে। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে এই মানসিকতারও বিনাস ঘটে এবং উদ্ভব ঘটে ভাববাদী সাংস্কৃতিক মানসিকতার, ভাববাদী মানসিকতা-নির্ভর সমাজের যেখানে যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাঁর এই সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্বের সমর্থনে সোরোকিন গ্রীক সংস্কৃতির উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত গ্রীক সংস্কৃতি ছিল ধর্মমূলক। পরবর্তী ১৫০ বছর জুড়ে (এই সময়টিকে এথেন্সের স্বর্ণযুগ বলা হয়) গ্রীসে ভাববাদী সাংস্কৃতিক মানসিকতা বিরাজ করে। খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ, রোমান সাম্রাজ্যের পর্যায়ে, সংস্কৃতি ছিল অনুভূতিমূলক। পরবর্তী ২০০০ বছর এক মিশ্র সাংস্কৃতিক মানসিকতার অবস্থানের পর পুনরায় দীর্ঘকালের জন্য আবির্ভাব ঘটে ধর্মমূলক পর্যায়-এর। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চতুদর্শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত (দান্তে, থমাস অ্যাকুইনাস প্রমুখ মনীষীদের সময়ে) সংস্কৃতি ছিল ভাবমূলক। পরবর্তী পর্যায়ে পুনরায় অনুভূতিমূলক পর্যায়ের আবির্ভাব ঘটে যা বর্তমানে প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছিয়েছে। সোরোকিনের মতে, বর্তমানে ধর্মমূলক পর্যায়ে পুনরাবির্ভাবের কিছু কিছু নিদর্শন পরিস্ফুট হচ্ছে।

সোরোকিন মনে করতেন যে, কোনও একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের আভ্যন্তরীন শক্তিই তার বিকাশ ও চূড়ান্ত পর্যায়ে, তার বিনাশের কারণ। যদিও অধিকাংশ সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক সোরোকিনের এই সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্বকে চক্রাকার তত্ত্ব (Cyclical theory) আখ্যা দিয়েছেন তবুও অধ্যাপক মার্গারেট উইলসন ভাইন (Margaret Wilson Vine) এর মতে, সোরোকিন বর্ণিত সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্বকে সরল রৈখিক সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব বলা চলে। ভাইনের মতে, সোরোকিন একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সরলরৈখিক বিকাশ (একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি

থেকে ক্রমাগত বিকাশের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় পর্যন্ত) এবং তারপর ঠিক একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটার কথা বলেছেন। পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে সংস্কৃতি বারে বারে ধর্মমূলক ও অনুভূতিমূলক অবস্থার মধ্যে ঘড়ির দোলকের মত ওঠা নামা করে এবং মধ্যবর্তী পর্যায়ে কখনো আবির্ভাব ঘটে ভাবমূলক পর্যায়ের কখনো বা মিশ্র কোনও পর্যায়ের।

সোরোকিন শুধুমাত্র সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্বই বর্ণনা করেননি, তাঁর তত্ত্বের সমর্থনে রাজনীতি, কলা, দর্শনের জগৎ থেকে বহু নির্দশনও পেশ করেছেন ; এক কথায় তাঁর এই অবদান অতুলনীয়। সমাজতত্ত্বকে সোরোকিন বহুদিক থেকে পরিপুষ্ট করেছেন। কিন্তু তবুও তিনি আজও প্রাপ্য গুরুত্ব পান নি। হয়ত এর একটি কারণ এই যে, তিনি একটু বেশীই আক্রমণাত্মক ছিলেন। হয়তো ভবিষ্যতের সমাজতাত্ত্বিকরা সমাজতত্ত্বে পিটিরিম সোরোকিনের অবদানকে পুনুরাবিস্কার করবেন, সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে তাঁর প্রাপ্য গুরুত্ব স্বীকার করে নেবেন।

অনুশীলনী ঃ ৫

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

ক) সোরোকিন ব্যক্তিত্বের——— উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

খ) সোরোকিন বিপ্লবকে একটি ——— বলে মনে করতেন।

২) সমাজ পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি কি কি ?

.....

.....

.....

.....

৯.৮ সারাংশ

আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে পথিকৃৎ কয়েকজন সমাজতাত্ত্বিকের অবদান এই এককের আলোচ্য বিষয়। থর্স্টেইন ভেবলেন-এর মধ্যে অর্থনীতি ও দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও চার্লস হর্টন কুলে ও জর্জ হাবার্ট মীড মূলত তাঁদের সমাজতাত্ত্বিক অবদান রেখে গেছেন সমাজ মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট থেকে। অন্যদিকে, রবার্ট এজরা পার্ক ও পিটিরিম সোরোকিন ছিলেন মুখ্যত সমাজতাত্ত্বিক।

ভেবলেনের প্রসিদ্ধি অর্থনৈতিক ব্যবহারের বিশ্লেষণে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে গুরুত্বপ্রদানের কারণে। মার্ক্সীয় ভাবধারায় প্রভাবিত ভেবলেন মানুষকে একটি কর্মপ্রিয় প্রাণী হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন। একই সঙ্গে ডারউইনীয় ও স্পেন্সারীয় ভাবধারার প্রভাবে তিনি নিজেকে বিবর্তনবাদী দার্শনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অবকাশভোগী শ্রেণীর ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত এই সকল আলোচনার পাশাপাশি বর্তমান এককে প্রতিযোগিতা, জ্ঞান সমাজতত্ত্ব ও উপযোগীতাবাদী বিশ্লেষণ সম্পর্কে তাঁর অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজতত্ত্বে কুলের খ্যাতি আত্মদর্পন ও প্রাথমিক গোষ্ঠী বিষয়ে তাঁর অবদানের কারণে। তাঁর মতে, আত্ম প্রতিফলকের ভূমিকা পালন করে। কোনও ব্যক্তির আত্মস্থ হয় বহু ব্যক্তির মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে। আতমগঠনে প্রাথমিক গোষ্ঠীর ভূমিকা অনন্য। আত্মদর্পণ ও প্রাথমিক গোষ্ঠীর ধারণা কুলের (cooley) চিন্তা-ভাবনায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। বর্তমান এককে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজ মনস্তত্ত্ববিদ মীডও সমাজতত্ত্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁর আত্ম তত্ত্বের মাধ্যমে। তিনি সমাজকে বিবিধ আচরণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে দেখিয়েছেন। আচরণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মীড ভূ মিকা গ্রহণ, অঙ্গভঙ্গী, সর্বজনীন অপর, ইশারা, অর্থপূর্ণ প্রতীক ইত্যাদি ধারণার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিখ্যাত হয়েছেন। কুলের মতো তিনিও জ্ঞান সমাজতত্ত্ব, সহানুভূতিমূলক অনুধাবন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এ সংক্রান্ত আলোচনা এই এককে আছে।

বিখ্যাত চিকাগো ঘরানার পুরোধা রবার্ট পার্ক-এর অবদান সমাজতত্ত্বে যুগান্তকারী। বর্তমান এককে তাঁর সংঘবদ্ধ ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক প্রক্রিয়া, সামাজিক দূরত্ব, সামাজিক পরিবর্তন, প্রাণ-শৃঙ্খলা ও সামাজিক শৃঙ্খলা এবং আত্ম, সামাজিক ভূমিকা ও প্রান্তিক মানুষ সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান নিয়ে চর্চা করা হয়েছে। তিনি শুধুমাত্র চিন্তাবিদই ছিলেন না, এক সক্রিয় কর্মীর ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে তিনি আধুনিক সমাজের বহু সমস্যা সমাধানেও উদ্যোগীর ভূমিকা পালন করেছেন।

বর্তমান এককে আলোচিত অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিকদের সঙ্গে পিটিরিম সোরোকিন-এর মূল প্রভেদ হ'ল এই যে তিনি আমেরিকান সমাজতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত তাঁর মতামতের পাশাপাশি সমাজ পরিবর্তনের বিষয়ে তাঁর মৌলিক অবদানের কারণে তিনি সর্বজনবিদিত। অনুভূতিমূলক, ধর্মমূলক ও ভাবমূলক পর্যায়ের চক্রাকার আবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের চাকা সতত ঘূর্ণায়মান বলে তিনি মনে করতেন। সুবিখ্যাত সামাজিক পরিবর্তন-এর তত্ত্ব ছাড়াও ব্যক্তিত্ব, সামাজিক প্রক্রিয়া, বিপ্লব ইত্যাদি প্রসঙ্গে তাঁর অবদান সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান এককে।

স্বল্প পরিসরে আমেরিকান সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করতে পারে এই এককটি।

৯.৯ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ

(১) "বিবর্তনবাদী ও সমাজতাত্ত্বিক যুক্তিবোধের আলোকে ধ্রুপদী অর্থনীতির সমালোচনার মধ্য দিয়ে ভেবলেন-এর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার সঠিক প্রতিফলন ঘটেছে"ঃ ব্যাখ্যা করুন।

(২) কুলে'র আত্মদর্পণ তত্ত্বটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

(৩) মীড-এর আত্ম-উদ্ভব তত্ত্বটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

(৪) সামাজিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে পার্ক-এর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করুন।

(৫) সোরোকিন-এর মতে সামাজিক পরিবর্তনের মুখ্য স্তরগুলি কি কি? সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

(১) সামাজিক প্রক্রিয়ার কি কি বৈশিষ্ট্যের কথা সোরোকিন উল্লেখ করেছেন ?

(২) সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে পার্ক এর বক্তব্য কি ? উল্লেখ করুন।

(৩) আচরণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মীড কি কি ধারণার অবতারণা করেছেন ?

(৪) কুলের চিন্তাভাবনায় আত্মদর্পণ ও প্রাথমিক গোষ্ঠী কিভাবে মিলেমিশে রয়েছে ?

(৫) দৃষ্টি আকর্ষক ভোগ কি ?

বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নাবলী ঃ

(১) ভেবেলেন-এর মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের অভিযোজন কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয় ?

(২) ব্যক্তি-ব্যক্তির দর্পণ একে অপরের প্রতিফলন ঃ কার উক্তি ?

(৩) প্রতীকি মিথষ্ক্রিয়া সম্ভব——— (প্রাণী জগতে বা মানব জগতে)

(৪) 'প্রান্তিক মানুষ' ধারণাটি কার অবদান ?

(৫) 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিবিদ্যা' বইটি (Social and cultural Dynamics) —— কার রচনা ?

৯.১০ উত্তরমালা

অনুশীলনী ঃ ১

(১) প্রথমত, নব্যপ্রস্তর যুগের শান্তিপূর্ণ আদিম অর্থনীতি ; দ্বিতীয়ত, লুন্ঠনভিত্তিক বর্বর অর্থনীতি ; তৃতীয়ত, প্রাক্-আধুনিক হস্তশিল্প ভিত্তিক অর্থনীতি এবং চতুর্থত, যন্ত্রনির্ভর আধুনিক অর্থনীতি।

(২) ভেবলেন-এর মতে, শিল্পমালিকরা শিল্প সম্প্রদায়ের বাইরে অবস্থান করে। তারা শ্রমশীল নয়, শিল্প সম্প্রদায়ের শ্রমশীল মানুষদের শ্রমের উপর নির্ভর করে থাকা এই সমস্ত শিল্প মালিকদের শ্রেণীকে অবকাশ ভোগী শ্রেণী বলে।

অনুশীলনী ঃ ২

(১) দর্পণের।

(২) প্রাথমিক গোষ্ঠীর মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। মুখোমুখী সম্পর্ক ; ২। কোনও সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির অনুপস্থিতি। ৩। তুলনামূলক স্থায়িত্ব ; ৪। স্বল্প সদস্যসংখ্যা এবং ৫। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক অন্তরঙ্গতা।

অনুশীলনী ঃ ৩

(১) নিজেকে অপরের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করাই ভূমিকা গ্রহণ, নিজের আচরণকে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার

করাই ভূমিকাগ্রহণ। উদাহরণস্বরূপ, শিশু মা, দিদি, পরিচারিকা (কন্যা সন্তান) অথবা বাবা, দাদা, পারিচারক, গাড়িচালক বা পুলিশের ভূমিকা (পুত্র সন্তান) গ্রহণ করে।

(২) বহু ব্যক্তির মধ্যে একজনের 'অপর' অনেকে, নানা ব্যক্তি, যারা আবার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই নানা ব্যক্তি একত্রে একজন ব্যক্তির কাছে 'সর্বজনীন অপর' হিসেবে পরিগণিত হয়। শিশু মনোবিকাশে সর্বজনীন অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

অনুশীলনী ঃ ৪

(১) প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, উপযোজন ও আত্মীকরণ।

(২) পার্কের মতে, প্রাণী সম্প্রদায় ও মানব সম্প্রদায় উভয়ের মধ্যেই এক ধরনের বাস্তুতান্ত্রিক শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হ'লে ও মানব সম্পদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষত একটি সামাজিক বা নৈতিক শৃঙ্খলা ও পরিলক্ষিত হয় যা অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণীজগতে দেখা যায় না।

অনুশীলনী ঃ ৫

(১) ক) বহুমুখীতার, খ) সামাজিক দুর্যোগ।

(২) অনুভূতিমূলক পর্যায়, ধর্মমূলক পর্যায় ও ভাবমূলক পর্যায়।

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ

(১) ৯.৩.১ এর প্রথম ৫টি অনুচ্ছেদ দেখুন।

(২) ৯.৪.১ দেখুন।

(৩) ৯.৫.৩ দেখুন।

(৪) ৯.৬.২ দেখুন।

(৫) ৯.৭.৪ দেখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

(১) সোরোকিন সামাজিক প্রক্রিয়ার তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, যথা-ক) সংগঠনের অস্তিত্ব বা অনুপস্থিতি, খ) সহভ্রাতৃত্ব, গ) ঐক্যের উপস্থিতি বা তার অভাব।

(২) পার্ক তাঁর "আত্মধারণা" তত্ত্বের সাথে "সামাজিক ভূমিকা" ধারণার যোগসাধন করেন। তাঁর মতে, ব্যক্তি শব্দটির মূল অর্থ মুখোশ। একই ব্যক্তি যেন মুখোশ পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ভূমিকা পালন করেন। এই ভূমিকাগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি নিজেকে চিনতে পারেন, নিজের সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে তোলেন ও গড়ে ওঠে তাঁর আত্ম।

(৩) ভূমিকাগ্রহণ, সর্বজনীন অপর, অঙ্গভঙ্গী বা ইশারা, অর্থপূর্ণ প্রতীক ইত্যাদি।

(৪) অপরের চিন্তা ভাবনা, মূল্যবোধ ও বিচার বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেওয়া একমাত্র প্রাথমিক গোষ্ঠীর

অঙ্গরঙ্গতার মধ্যেই সর্বোত্তমরূপে সম্ভবপর হয়। অপরিণত, আত্মকেন্দ্রিক মানুষ প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যেই অপরের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, প্রয়োজন ও পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া ইত্যাদির প্রথম পাঠ লাভ করে। প্রাথমিক গোষ্ঠীই একজন ব্যক্তিকে অপরের জায়গায় দাঁড় করাতে শেখায়, আত্মদর্পণের মধ্য দিয়ে আত্ম প্রক্রিয়া মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কুলের চিন্তাভাবনায় অতএব আত্মদর্পণ ও প্রাথমিক গোষ্ঠী ওতোপ্রোতভাবে মিলেমিশে রয়েছে-এ কথা সুনিশ্চিতভাবেই বলা চলে।

(৫) অবকাশ ভোগী শ্রেণীর মানুষেরা নিজেদের উচ্চ-মর্যাদা সম্পন্ন সামাজিক অবস্থানের বড়াই করবার প্রয়োজনে লোক দেখানো ভোগ-বিলাসময় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগবিলাসের পাশাপাশি অপচয়ও ঘটে প্রচুর। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে এই জাঁকধর্মী ভোগকেই ভেবলেন তাঁর বিখ্যাত " অবকাশভোগী শ্রেণীর তত্ত্ব" গ্রন্থের দৃষ্টি আকর্ষক ভোগ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নাবলী ঃ

(১) শিল্পবিদ্যা বা শিল্পকলার দ্বারা।

(২) চার্লস হর্টন কুলে'র।

(৩) মানব জগতে।

(৪) রবার্ট এজরা পার্ক।

(৫) পিটিরিম অ্যালেক্সান্ড্রোভিচ্ সোরোকিন-এর রচনা।

৯.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। Coser, Lewis A : Masters of Sociological Thought : Ideas in Historical and Sociological Thought, Jaipur, Rawat Publications. 1996.

২। Ritzer, George : Classical Sociological Theory, New York, The Megraw-Hill Companies, Inc., 1996

৩। International Encyclopedia of Social Science, Vol. 16 (Veblen), Vol.3 (Cooley), Vol;10 (Mead), Vol.11 (Park) and Vol. 15 (Srokin), 1968.

৪। Martindale, Don : The Nature and Types of Sociological Theory, London, Routledge and Kegan Paul, 1964.

৫। Giddens, Anthony : Sociology (3rd ed.), Cambridge Polity Press. 1998.

একক ১০ ❐ মহাদেশীয় (ইউরোপীয়) সমাজতাত্ত্বিকদের অবদান

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য

১০.২ প্রস্তাবনা

১০.৩ গীতানো মস্কা

১০.৩.১ সামাজিক বল

১০.৩.২ শাসক শ্রেণীর তত্ত্ব

১০.৪ রবার্ট মিশেল্‌স্‌

১০.৪.১ রাজনৈতিক সংগঠন

১০.৫ কার্ল ম্যানহাইম

১০.৫.১ জ্ঞান সমাজতত্ত্ব

১০.৫.২ মতাদর্শ ও স্বপ্নকল্প বা স্বপ্নরাষ্ট্র

১০.৫.৩ আধুনিক সমাজে পরিকল্পনা ও সামাজিক পুনগর্ঠন

১০.৬ উইলিয়াম আইজ্যাক থমাস

১০.৬.১ সামাজিক ব্যবহার

১০.৬.২ সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও সমাজ পরিবর্তন

১০.৭ ফ্লোরিয়ান জ্ঞানেইস্কি

১০.৭.১ ইউরোপ ও আমেরিকায় পোল্যান্ডীয় চাষী

১০.৭.২ সামাজিক সংগঠন

১০.৭.৩ সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি

১০.৭.৪ সমাজতত্ত্ব

১০.৮ সারাংশ

১০.৯ অনুশীলনী

১০.১০ উত্তরমালা

১০.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে মহাদেশীয় (ইউরোপীয়) সমাজতাত্ত্বিকদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন ও তাঁদের অবদান বর্ণনা/ ব্যাখ্যা করতে পারবেন। আরও সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে বলা

যায় যে, এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- গীতানো মস্কা'র সামাজিক বল ও শাসক শ্রেণীর তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল তত্ত্বগুলির উপযোগীতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে রবার্ট মিশেলস্-এর মতামত বর্ণনা করতে পারবেন।
- কার্ল ম্যানহাইমের জ্ঞান সমাজতত্ত্ব, মতাদর্শ ও স্বপ্নকল্প বা স্বপ্নরাষ্ট্র ও আধুনিক সমাজে সামাজিক পরিকল্পনা ও সামাজিক পুনর্গঠনের ব্যাখ্যা করতে পারবেন ও বর্তমান সমাজে পরিকল্পনা ও পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে ম্যানহাইমের তত্ত্বের সফল প্রয়োগ করবার চেষ্টা করতে পারেবন।
- উইলিয়াম আইজ্যাক থমাসের সামাজিক ব্যবহার এবং সামাজিক পরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে পোল্যান্ডের কৃষকদের জীবন যাত্রার সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি ফ্লোরিয়ান জ্ঞানেইস্কির সামাজিক সংগঠন, সমাজতাত্তিক পদ্ধতি ও সমাজতত্ত্ব-এর ধারণাগুলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

১০.২ প্রস্তাবনা

ইউরোপীয় সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে প্রথিতযশা কয়েকজন চিন্তাবিদ-এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে এই এককে আলোচনা করা হবে। সর্বাগ্রে আমরা মূলত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গীতানো মস্কার সমাজতাত্ত্বিক অবদান নিয়ে আলোচনা করবো। মস্কার খ্যাতি তাঁর শাসক শ্রেণী তত্ত্বের কারণে। সংগঠিত, সংখ্যালঘু শাসক সম্প্রদায় কিভাবে অসংগঠিত সংখ্যাগুরু জনসমষ্টির উপর তাদের কতৃত্ব কায়েম করে-মস্কার মূল বিবেচ্য বিষয় ছিল সেইটিই। তাঁর মতে, শাসন ব্যবস্থা যে কোনও ধরনের হোক না কেন-একনায়কতন্ত্র বা গণতন্ত্র-সেই ব্যবস্থায় শাসক শ্রেণীর উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী।

রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে বিরাজমান গোষ্ঠীতন্ত্রের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে গেছেন গীতানো মস্কার সুযোগ্য উত্তরসূরী অপর এক দিকপাল ইতালীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রবার্ট মিশেলস্। রাজনৈতিক সংগঠনে নেতৃত্বের প্রকৃতি, নেতা ও অনুগামীর মধ্যে সম্পর্ক, দলীয় মতাদর্শ ও কর্মপন্থা প্রমুখ প্রতিটি ক্ষেত্রেই গোষ্ঠীতান্ত্রিকতা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান এককে এই সমস্ত বিষয়াবলীর পাশাপাশি গোষ্ঠীতন্ত্রের বৈশিষ্ট সমূহের ব্যাপারে মিশেল্স্ এর মতাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

এই এককের পরবর্তী আলোচ্য বিষয় সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে প্রখ্যাত আধুনিক প্রজন্মের সমাজতাত্ত্বিক কার্ল ম্যানহাইমের অবদান। মূলতঃ তিনি বিখ্যাত তাঁর জ্ঞান সমাজতত্ত্ব এবং মতাদর্শ ও স্বপ্নকল্প তত্ত্বের জন্য। তাঁর মতাদর্শ তত্ত্বটি মার্ক্সীয় দর্শনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হ'লেও স্বপ্নকল্প তত্ত্বটির মধ্যে তাঁর মৌলিকতা লক্ষণীয়। সমসাময়িক সমাজে ম্যানহাইম স্বপ্নকল্পের অপমৃত্যু লক্ষ্য করেছেন, গভীর বেদনার সাথে, কেন স্বপ্নকল্প শেষ হয়ে যায়? এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হবে বর্তমান এককে।

সমাজতাত্ত্বিক উইলিয়াম আইজ্যাক থমাস জন্মসূত্রে আমেরিকান হ'লেও পোল্যান্ডের সমাজতাত্ত্বিক ফ্লোরিয়ান জ্ঞ্যানেইস্কির সাথে যৌথ ভাবে লিখিত পোলিশ পেজ্যান্ট গ্রন্থটির জন্যই ইউরোপীয় সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার

বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম হিসেবে বিবেচিত হন। পোলিশ পেজ্যান্ট ছাড়াও তিনি সাংস্কৃতিক ও সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান তত্ত্ব প্রণয়ন করে গেছেন। বর্তমান এককে আমরা এ সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করবো।

পোল্যান্ডীর সমাজতত্ত্বের পথিকৃৎ ফ্লোরিয়ান জ্ঞ্যানেইস্কির অবদান আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়। থমাসের সঙ্গে যৌথভাবে লিখিত 'পোলিশ পেজ্যান্ট ইন ইউরোপ অ্যান্ড আমেরিকা' গ্রন্থটির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে বিষয়বস্তুর সারল্যের আড়ালে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতীয়মান সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতির নতুনত্ব। দৃষ্টিবাদী গবেষণায় ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, আত্মজীবনী, রোজনামচা ইত্যাদির ব্যবহার গ্রন্থটিকে তার স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। এক্ষেত্রে জ্ঞানেইস্কির অবদান অপরিসীম। পাশাপাশি এই এককে আলোচনা করা হবে সামাজিক সংগঠন, সমাজতত্ত্ব ও সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞ্যানেইস্কির গুরুত্বপূর্ণ অবদান সমূহ ।

১০.৩ গীতানো মস্কা (Gaetano Mosca) (১৮৫৮ - ১৯৪১)

ইতালীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গীতানো মস্কা (১৮৫৮-১৯৪১) সিসিলি অঞ্চলের পালেরমোতে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সময় সিসিলি ছিল ইতালীর সর্বাধিক অনুন্নত অঞ্চলগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান। মস্কার চিন্তাভাবনায় সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ সিসিলিয় পরিবেশের প্রভাব কতটা গভীর ছিল তা নিরূপন করা খুবই কষ্টসাধ্য। তবে ইতালীর মার্ক্সবাদী দার্শনিক অ্যান্টোনিও গ্রামশি (Antonion Gramschi) ও আমেরিকান ঐতিহাসিক উইলিয়াম সলোমন এর Willam soloman) মতে, সিসিলিয় পশ্চাৎপদ পরিবেশই হয়তো সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি যুবক মস্কার যাবতীয় বিরোধ অথবা বিরুদ্ধ ভাবনার মূল কারণ।

মস্কার মতে, অধিবিদ্যক (wetaphsical) বিমূর্ততার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতিষ্ঠাই রাজনৈতিক আচরণের যাবতীয় দোষ ত্রুটি দূর করতে পারে। তাঁর এই মত খুব স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের (positivist philosophy) প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। যদিও একই সঙ্গে তিনি সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও পরীক্ষণ পদ্ধতির (experimental method) প্রয়োগের সীমাবদ্ধতার ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন।

মূলত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মস্কা সমাজতত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছেন। সমাজতত্ত্বে তাঁর অবদান নীচে আলোচনা করা হ'ল।

১০.৩.১ সামাজিক বল (Social Force)

সামাজিক গুরুত্ব আছে এমন যে কোনও বস্তু অথবা মনুষ্য কর্ম বা সক্রিয়তাকে সামাজিক বল বলা চলে। কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তখনই শাসক হয়ে উঠতে পারে যখন সে বিবিধ সামাজিক বলকে নিজ স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। মস্কার মতে, শাসক শ্রেণীর (ruling class) ক্ষমতা নির্ভর করে সামাজিক বল সমূহের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে। (সামাজিক বল সমূহের উদাহরণ ঃ অর্থ, জমি, সামরিক শক্তি, ধর্ম, শিক্ষা, কায়িক শ্রম বিজ্ঞান ইত্যাদি)। কোনও শাসকশ্রেণী বা সরকারের বা রাজত্বের আভ্যন্তরীণ স্থায়িত্ব, সাফল্য বা প্রগতিশীলতা নির্ভর করে নিয়মিত সামাজিক বল সৃষ্টির মাধ্যমে। সামাজিক বলসমূহের এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে যে কেন মস্কাকে আমরা সমাজতাত্ত্বিক না বলে একজন

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসেবে স্মরণ করি? উত্তর খুবই সহজ। মস্কা সর্বদাই সমারে রাজনৈতিক দিকটি নিয়ে চিন্তির ছিলেন-অতএব তিনি মূলত একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।

যাই হোক, মস্কার মতে, বিভিন্ন সামাজিক বলসমূহের মধ্যে সামরিক শক্তি অন্যতম। মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে মাত্র বিগত কয়েক শতাব্দীকালব্যাপী অসামরিক প্রশাসনকে সামরিক শক্তি উপর আধিপত্য বিস্তার করতে দেখা যাচ্ছে। বরং সামরিক অত্যাচারী (military tyranny) শাসনই মানব সমাজের ক্ষেত্রে চিরন্তন। নিরস্ত্রীকরণের যে স্বপ্ন উদারনৈতিক দার্শনিকেরা দেখেন, মস্কার কাছে তা নিরর্থক, অনৈতিহাসিক। অস্ত্র-সজ্জিত সেনাবাহিনী আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও অপরিহার্য।

১০.৩.২ শাসক শ্রেণীর তত্ত্ব (Theory of the Ruling Class)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ইতালীর রাষ্ট্রবিজ্ঞান মস্কার 'The Ruling Class', (১৮৯৬) গ্রন্থটির আবির্ভাবের সমসাময়িক। প্যারেটো (V. Pareto) Elite (এলিট-বাছাই করা বা সেরা অংশ) বলতে যা বুঝিয়েছেন মস্কার ভাষায় তাই রাজনৈতিক শ্রেণী (political class) বা শাসক শ্রেণী (Ruling Class)। প্যারেটোর মতো তিনিও সকল প্রকার সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনসমষ্টিকে "শাসক" ও "শাসিত" এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। শাসকশ্রেণীর সদস্যরা সংখ্যায় কম কিন্তু তারা সংগঠিত। এই সংগঠিত সংখ্যালঘু শাসক সম্প্রদায় অসংগঠিত সংখ্যাগুরু জনসমাজের উপর তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করে। শাসক শ্রেণীর কতিপয় গুণাবলী যথা, বিত্ত, শিক্ষা, বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা (বিবিধ সামাজিক বল সমূহ) ইত্যাদি জনসাধারণের উপর তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, শাসক শ্রেণী কেবল ছল-চাতুরী বা বল প্রয়োগ দ্বারাই শাসন করেন না ; তারা এক রাজনৈতিক সূত্র (political formula) প্রবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের শাসন ক্ষমতার যৌক্তিকতা বা বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ, শাসক শ্রেণী শাসিত জনগণের মধ্যে এই শ্বিাস সৃষ্টি করে যে, তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার নৈতিক ও বিধিসম্মত বা আইনসিদ্ধ। শাসক বা রাজনৈতিক শ্রেণীর ক্ষমতার নৈতিক ও আইনগত ভিত্তি প্রদানের নীতিকেই মস্কা রাজনৈতিক সূত্র নামে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, সভ্যতা বা সমাজভেদে এই রাজনৈতিক সূত্র বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে ; যেমন ধর্মীয় সমাজগুলিতে ধর্মগুরুদের শাসন ক্ষমতার ভিত্তি হ'ল জনসমষ্টির ধর্মীয় বিশ্বাস। উন্নত, আধুনিক সমাজগুলিতে শাসনশ্রেণীর ক্ষমতার ভিত্তি হ'তে পারে আইন ও যৌক্তিক ধারণা। যাইহোক, 'রাজনৈতিক সূত্র' প্রবর্তনের মাধ্যমে শাসকশ্রেণী চিরকাল শাসনক্ষমতা অধিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করে।

মস্কার মতে, কি একনায়কতন্ত্র বা গণতন্ত্র কোনক্ষেত্রেই শাসকশ্রেণীর অনুপস্থিতিতে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আধিপত্য বিস্তারে শাসক শ্রেণী মতাদর্শ (ideology)—র তুলনায় সামাজিক বলের দ্বারাই অধিকতর বলীয়ান থাকে। বিভিন্ন সামাজিক বলের মধ্যে আবার সম্পদ বা অর্থবলই শাসকশ্রেণীতে অংশগ্রহণের ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। বিষয়টি প্রাচীন গ্রীসের গোষ্ঠী-শাসন (oligarchy) বা বর্তমান পুঁজিবাদী শাসন উভয়ক্ষেত্রেই সমান সত্য। আবার সামাজিক বিশৃঙ্খলার সময় সামরিক শৌর্যই শাসকশ্রেণীতে অন্তর্ভুক্তির মূল নিরিখ। একইরকমভাবে জ্ঞানও শাসক শ্রেণীর কাছে কোনও কোনও সময় একটি বিশেষ সামাজিক বল-এর ভূমিকা পালন করে।

মস্কার রাজনৈতিক সূত্রের নিরিখে ইতিহাসের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সম্ভব। রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে ঐকমত্য বা বৈধতার প্রয়োজনেও রাজনৈতিক সূত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মস্কার মতে, সমাজে পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি ভিন্ন প্রবণতা সর্বদাই বিরাজমান। প্রথমত, অভিজাততান্ত্রিক প্রবণতা এবং দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক প্রবণতা। অভিজাততান্ত্রিক প্রবণতার ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান বা শাসক শ্রেণীর মধ্যে বংশানুক্রমিক ধারায় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখবার একটা ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে গণতান্ত্রিক প্রবণতার ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণীতে শাসিত জনগণের মধ্যে থেকে নব নব সদস্যের অন্তর্ভুক্তির একটি ঝোঁক কাজ করে। এই দুই প্রবণতার পাশাপাশি একই রকমভাবে পরস্পর বিরোধী দু'টি মূলনীতি সমাজে বিরাজমান। প্রথমত, স্বৈরতান্ত্রিক (autocratic) নীতি যেখানে কর্তৃত্ব নিম্নগামী এবং দ্বিতীয়ত, উদারনৈতিক নীতি ; কর্তৃত্ব যেখানে উর্দ্ধগামী (গণতন্ত্রে যেমন নীচুতলার মানুষের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে উচ্চতর নেতৃত্বের ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব)। তবে এই দু'টি স্বাধীন নীতি পরস্পর বিরোধী হ'লেও এদের সহাবস্থানও লক্ষ্য করা যায়।

শাসক শ্রেণী তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল খোদ শাসক শ্রেণীর মধ্যেই দু'টি ভিন্নস্তরের অস্তিত্ব সম্পর্কে মস্কার মতামত। তাঁর মতে, প্রথম (উচ্চতর) স্তরে বিরাজ করে খোদ সরকার এবং দ্বিতীয় (নিম্নতর) স্তরে অন্যান্য বিবিধ রাজনৈতিক ক্ষমতাসমূহ। এই তত্ত্বের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল বিচার সংক্রান্ত প্রতিরোধ (juridical defence)- এর ধারণা। যখন বিভিন্ন সামাজিক বল সমূহ একটি ভারসাম্যের অবস্থায় বিরাজ করে (যা মস্কার মতে সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর) তখনই রাষ্ট্রের এই বিচার সংক্রান্ত প্রতিরোধের প্রয়োজন হয়। সামাজিক বলসমুহের আগ্রাসী মনোভাবকে অথবা যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ সামাজিক বলসমূহের ধারক তাদের আগ্রাসী মনোভাবেক রুখে দেওয়ার জন্য এই বিচার সংক্রান্ত প্রতিরোধ খুবই প্রয়োজনীয়। মানুষের অভ্যাস, প্রথা, নীতিবোধ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের সংবিধান একত্রে এই বিচার-সংক্রান্ত প্রতিরোধকে গড়ে তোলে। মস্কার মতে, শাসক শ্রেণী সমূহের মান নির্ধারণ করা যেতে পারে তারা কি পরিমাণ ও কি ধরনের সামাজিক বলসমূহের ভারসাম্যকে সূচিত করছে-সেই বিষয়টির দ্বারা অনুরূপ শাসক শ্রেণী নিয়ন্ত্রিত সরকারসমূহের মান নির্ধারণ করা যায় তাদের বিচার-সংক্রান্ত প্রতিরোধের মান এর সাহায্যে।

মস্কা সংসদীয় ব্যবস্থাকে (parliamentary system) প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার (representative government) ব্যবস্থার একটি অবক্ষয়ী রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থাতেই সর্বোচ্চ মানের বিচার-সংক্রান্ত প্রতিরোধ-এর প্রকাশ ঘটে।

মস্কার শাসকশ্রেণীর তত্ত্বটি নানাভাবে সমালোচিত হয়ে আসছে। প্রথমত, তাঁর 'শাসক শ্রেণী'র ধারণাটি অত্যধিক পরিমাণে নমনীয়। শাসক শ্রেণী বলতে তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সম্পত্তির মালিক, রাজনৈতিক কর্মকর্তা political personnel) বুদ্ধিজীবী, সরকারী আমলা ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের বোঝাতে চেয়েছেন দ্বিতীয়ত, শাসক শ্রেণী ও রাজনৈতিক শ্রেণীকে তিনি সমার্থক মনে করেছেন। কিন্তু এ দু'টি সমার্থক নাও হতে পারে। তৃতীয়ত, সি রাইট মিলস, মস্কার 'শাসক শ্রেণী' ধারণাটিকে সন্তোষজনক মনে করেন নি। মিলস এর মতে, শ্রেণী (class) হচ্ছে একটি অর্থনৈতিক শব্দ এবং শাসন (rule) হচ্ছে একটি রাজনৈতিক শব্দ। কাজেই শাসক শ্রেণী ধারণাটির মধ্যে অর্থনৈতিক শ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক শাসন জাতীয় বিভ্রান্তির অবকাশ থেকে যায়।

১৮৯৬খ্রীষ্টাব্দে যখন মস্কার প্রথম বই The Ruling Class বইটি প্রকাশিত হয় তখন এই শাসক শ্রেণী ধারণাটি তেমন কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি-ইতিহাসের ব্যাখ্যা হিসেবেও নয় বা রাজনীতির আলোচনার একটি নতুন দিক হিসেবেও নয়। পরবর্তীকালে ভিলফ্রেডো প্যারেটোর লেখার মধ্য দিয়ে শাসক শ্রেণী জাতীয় সংখ্যালঘু শাসকদের বিষয়টি সর্বজনবিদিত হয়ে ওঠে। অপরদিকে সংসদীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মস্কার সুগভীর সমালোচনা মস্কার তত্ত্বকেই সর্বব্যাপী সমালোচনার মুখে ঠেলে দেয়। যদিও মস্কাকে একজন

উদারনৈতিক চিন্তাবিদ বলা হয় তবুও তাঁর সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি চরম বিরোধিতা তাঁকে এক উদারনীতি বিরোধী অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

সার্বিক বিচারে মস্কা ছিলেন একজন মধ্যপন্থী, উদারনৈতিক অথচ রক্ষণশীল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যিনি একই সঙ্গে সামাজিক সংস্কারের ধীর প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণী-ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রের অবশ্যম্ভাবীতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। এই সমাজে বুর্জোয়া গোষ্ঠীর অন্তর্গত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মূল্যবোধ আধিপত্য বিস্তার করবে ও এই সমাজ নৈতিকতার নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

অনুশীলনী ঃ ১

১) মস্কার মতে শাসক শ্রেণী কি?

.....

.....

.....

.....

২) নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে মস্কার মতামত কি?

.....

.....

.....

.....

৩) মস্কা সংসদীয় গণতন্ত্রের সমর্থক——ঠিক/ভুল

১০.৪ রবার্ট মিশেল্‌স্ (Robert Michels) (১৮৭৬-১৯৩৬)

ইতালীয় রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট মিশেলস বিংশ শতাব্দীর প্রথিতযশা সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। Elite (বাছাই করা/শ্রেষ্ঠ/সেরা) তত্ত্বের বিকাশে সাধারণত ভিলফ্রেডো প্যারেটোও গীতানো মস্কা'র পাশাপাশিই স্মরণীয় মিশেলস এর অবদান। মূলত তিনি বিখ্যাত তাঁর Political Parties (রাজনৈতিক দল) তত্ত্বের জন্য। ১৯১১ সালে Political Parties নামে একটি পুস্তক তিনি প্রকাশ করেন যার মুখ্য আলোচ্য বিষয় রাজনৈতিক সংগঠন সমূহের মধ্যে বিরাজমান গোষ্ঠীতন্ত্রের (oligarchy) বিষয়টি। সমসাময়িক বিবিধ রাজনৈতিক বিষয়াবলী তাঁর রচনায় ঘুরে ফিরে এসেছে। এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বিপ্লব, শ্রেণী-দ্বন্দ্ব, শ্রমিক সংগঠন, গণ সমাজ (mass society), জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদি। সমাজে বুদ্ধিজীবী ও এলিট (elite) দের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি চিন্তিত ছিলেন। সমসাময়িক চিন্তাবিদদের তুলনায় অনেক বেশী বিস্তৃতরূপে তিনি নতুনতর চিন্তার ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন। এই নতুনতর চিন্তাভাবনার বিষয়গুলির মধ্যে সুপ্রজনন বিদ্যা (engenics), নারীবাদ (feminism) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইউরোপীয় সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে রাজনৈতিক

সমাজতাত্ত্বিক মিশেলস-এর ভূমিকা নীচে আলোচনা করা হ'ল।

১০.৪.১ রাজনৈতিক সংগঠন (Political Parties)

রাজনৈতিক সংগঠন সংক্রান্ত আলোচনায় মিশেলস্-এর মূল বক্তব্য এই রকম ঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অর্জনের লক্ষ্যে গড়ে তোলা সংগঠনগুলিতে পরবর্তীকালে একধরনের সুগভীর গোষ্ঠীতান্ত্রিক বা চক্রতান্ত্রিক (oligarchic) প্রবণতা গড়ে ওঠে যা মূল লক্ষ্যটিকে, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অর্জনের লক্ষ্যটিকেই গুরুতর সমস্যার মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। মিশেলস্ এর ভাষায় গণতান্ত্রিক সংগঠন এমন একটি সংগঠন যা "নির্বাচিতকে নির্বাচকমণ্ডলীর উপর, আজ্ঞাপকদের উপর এবং প্রতিনিধিগণকে প্রতিনিধি-প্রেরকদের উপর আধিপত্য প্রদান করে। সংগঠন মানেই গোষ্ঠীতন্ত্র"-সংখ্যাগুরুর উপর সংখ্যালঘুর শাসন, আধিপত্য। মিশেলস্ এর "গোষ্ঠীতন্ত্রের লৌহ আইন" তত্ত্বের (Iron Law of Oligarchy) মখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় এইটিই।

নেতৃত্বের প্রকৃতি ঃ গোষ্ঠীতান্ত্রিক প্রবণতার কোনও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ব্যাপারে মিশেলস্ উৎসাহী ছিলেন না। বরং সাংগঠনিক চাহিদা উদ্ভুত বিভিন্ন সমস্যাই এই গোষ্ঠীতান্ত্রিক প্রবণতা গড়ে ওঠার জন্য মূলত দায়ী বলে তিনি মনে করতেন। মূলত সংগঠনের বিকাশ, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা, সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যা, বাস্তবে কাজের পরিধি ও জটিলতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সমস্যা, শ্রম বিভাজন সংক্রান্ত সমস্যা, নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রক্রিয়া ও সাংগঠনিক জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব জনিত সমস্যা ইত্যাদি সংগঠনে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে-তার অর্থ এই যে নিশ্চয়ই সেখানে সুদক্ষ, পেশাদারী নেতৃত্বের ব্যাপারে মিশেলস্ এর বক্তব্য হ'ল এই যে, তারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ব্যাপারেযথেষ্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বা দায়িত্বশীল থাকা সত্ত্বেও সাংগঠনিক ও অন্যান্য রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার খাতিরে অগণতান্ত্রিক বা গোষ্ঠীতান্ত্রিক হয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

নেতা ও অনুগামী ঃ গণতান্ত্রিক সংগঠনে অনুগামীদের দক্ষতার অভাব ও আবেগ প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে নেতারা নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখে মিশেলস্ তা লক্ষ্য করেছেন। অনুগামীরাই নেতাকে নির্বাচন করে। কিন্তু গোষ্ঠীতান্ত্রিকতায় আবদ্ধ নেতৃবৃন্দ পরবর্তীকালে পুনরায় নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থানকে যাচাই করে নেওয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহী হয়ে পড়ে।

শুধুমাত্র নির্বাচন ব্যবস্থার অস্তিত্বই গণতান্ত্রিকতার নিরিখ হ'তে পারে না। অনুগামী জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণের মাত্রার বিচারে নির্ধারিত হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য. রাজনৈতিক সংগঠনগুলি বা দলগুলি জনস্বার্থে যে কাজ করে তাতে জনতার আশা-আকাঙ্খা পূরণের পরিবর্তে মূল উদ্দেশ্য হিসেবে সংগঠনের বা নিজেদের উন্নতির বিষয়টিই প্রাধান্য পায় বলে মিশেলস্ মনে করেন (অবশ্য বহু ক্ষেত্রে এই বিষয়টি নেতৃত্বের অবচেতনে ঘটে, অর্থাৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়)। এটা ঘটতে পারে আমজনতার অনীহা ও অজ্ঞতার কারণে। জনতার এই নিষ্ক্রিয়তা ভেঙে তাদের সচেতন ও সক্রিয় করে তুলতে বহুক্ষেত্রেই নেতারা ব্যর্থ হন, এটা তারা চান না। তাঁর মতে, নেতা কখনই জনতার হাতে তার ক্ষমতা ছেড়ে দেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত না নতুন কোনও নেতার আবির্ভাব ঘটে (যে পুরোনো নেতার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে) পুরোনো নেতা ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করতেই পছন্দ করেন-ক্ষমতা দখল করে থাকেন, স্বাভাবিকভাবেই।

গোষ্ঠীতন্ত্র ও গণতন্ত্র সংক্রান্ত অন্যান্য তত্ত্বের মতো মিশেলস্ ও অনুগামীর প্রতি নেতার দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নেতা কি শুধুমাত্র তার নিজের নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতি বা সেই অঞ্চলের প্রতি দায়বদ্ধ না কি যে সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে তার নিজের অঞ্চলটি একটি ক্ষুদ্র অংশ সেই বৃহত্তর অঞ্চলের প্রতিও দায়বদ্ধ? তিনি কি শুধুমাত্র তার দলীয় সদস্যদের প্রতি দায়বদ্ধ না কি বৃহত্তর জনগণ (যাঁরা তাকে নির্বাচিত করেছেন বা নির্বাচকবৃন্দ)

এর প্রতিও দায়বদ্ধ ? মিশেলস্ এর মতে, বৃহত্তম সমাজের প্রতি এই দায়বদ্ধতার বিষয়টি বেশী সমস্যাসঙ্কুল হয়ে পড়ে যখন দল ক্ষমতায় থাকে, বিরোধীপক্ষের ভূমিকায় নয়।

দলীয় মতাদর্শ ও কর্মপন্থা ঃ মিশেলস্ দু'টি প্রশ্ন নিয়ে সবিশেষ চিন্তিত ছিলেন। প্রথমত, কোনও বিপ্লবী দল কি বিপ্লবী কর্মপন্থা অনুসরণ করতে পারে ? দ্বিতীয়ত, কোনও গণতান্ত্রিক দল কি গণতান্ত্রিক কর্মপন্থা অনুসরণ করতে পারে ? তাঁর মতে, প্রথমটির উত্তর না বাচক অর্থাৎ কোনও বিপ্লবী দলের পক্ষে ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী কর্মপন্থা অনুসরণ করা বা বিপ্লব ঘটানো সম্ভব নয়। দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর এত সহজ সরল ভাবে দেওয়া যাবে না এবং এক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান তুলনামূলকভাবে অপরিষ্কার। তাঁর মতে, অল্প কিছু ক্ষেত্রে গোষ্ঠীতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক দলের পক্ষে গণতান্ত্রিক কর্মপন্থা অনুসরণ করা সম্ভব। অন্যদিকে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, গণতান্ত্রিক দল যদি আভ্যন্তরীণ গঠনে গণতান্ত্রিক না হয় তবে সার্বিক অর্থে সমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। মিশেলস্ একটি আদর্শ দলের কল্পনা করেছেন যা সম্পূর্ণরূপে মতাদর্শগত গোষ্ঠী (ideological group), যেখানে সদস্যরা প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের স্বপ্নপূরণে সচেষ্ট থাকে এবং নিজেদের স্বার্থকে গোষ্ঠী-স্বার্থের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে। তাঁর মতে, দলীয় মতাদর্শ থেকে বিচ্যুতির মূল কারণ গোষ্ঠী তন্ত্র। গোষ্ঠীতন্ত্র প্রকৃতিগতভাবেই নির্বাচনে জয়লাভ করবার উদ্দেশ্যে সদস্যদের মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হ'তে উৎসাহিত করে। প্রথমদিককার সমাজতান্ত্রিক দলগুলিকে মিশেল্স্ আদর্শ দল বলে মনে করতেন। বৃহৎ গণতান্ত্রিক দলগুলি (mass democratic parties) যেহেতু মুক্ত বা এই সমস্ত দলগুলির দরজা যেহেতু খোলা এবং দলীয় নীতি আদর্শের প্রতি সংকল্পবদ্ধ থাকবার ব্যাপারটাকে কম গুরুত্ব দেয়-এই সমস্ত দলগুলিকে তাই সত্যিকারের "দল" হিসেবে গণ্য করা যায় না।

গোষ্ঠীতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ মিশেলস্ গোষ্ঠীতন্ত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপঃ

১) নেতৃত্বের উত্থান ; ২) পেশাদারী নেতৃত্বের উদ্ভব ; ৩) আমলাতন্ত্রের বিকাশ-অর্থাৎ, নিয়মিত বেতনভুক ও সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনকারী আমলা বা আধিকারিক এর অস্তিত্ব ; ৪) কর্তৃত্বের কেন্দ্রিকতা ; ৫) উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পরিবর্তন, মূলত প্রাথমিক বা অন্তিম উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি ; ৬) ক্রমবর্ধমান মতাদর্শগত দৃঢ়তা-রক্ষণশীলতা ; ৭) নেতা ও অনুগামীদের মধ্যে স্বার্থ, উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর ক্রমবর্ধমান দূরত্ব ও নেতার স্বার্থের আধিপত্য ; ৮) কর্মপন্থা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুগামীদের অংশগ্রহণের সুযোগ কমে যাওয়া ; ৯) উদীয়মান বিরোধী মনোভাবাপন্ন নেতাকে পুরোন নেতৃত্বের মধ্যে মিশিয়ে নেওয়ার প্রবণতা ও ১০) ব্যাপকতার প্রবণতা-সদস্য থেকে একটি নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর নির্বাচকমণ্ডলী ও তারপর বৃহত্তর বা গোটা সমাজ জুড়ে নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা।

গোষ্ঠীতন্ত্রের সহায়ক বহু বিষয়ের উপস্থিতি শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনের মধ্যে দেখা যায়। এই ধরনের সংগঠনগুলিতে নেতৃত্বের অবস্থানে থাকা মধ্যবিত্ত নেতাদের পক্ষে পুনরায় কারখানার কায়িক শ্রমের জগতে ফিরে যাওয়া কষ্টসাধ্য। এছাড়া শ্রমিকদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার অভাব, তথ্য বা সংবাদের (information) অভাব, নিস্পৃহতা ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি বিষয়গুলি গোষ্ঠীতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মিশেলস্ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের পরিপ্রেক্ষিতে মুষ্টিমেয় একদল লোকের শাসন ও আধিপত্যের কথা বললেও তাঁর এই গোষ্ঠীতন্ত্রের লৌহবিধিটি সকল প্রকার রাজনৈতিক দল, সংগঠন এবং

রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই কার্যকর হ'তে দেখা যায়। এই বিচারে তত্ত্বটি সর্বজনীনতা লাভ করেছে বলা চলে। কারণ এই গোষ্ঠীতন্ত্রের লৌহবিধি অনুসারে রাষ্ট্র ও সরকার মুষ্টিমেয় একদল লোকের সংগঠন বই কিছুই নয়। এই সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের উপর আইনগত কর্তৃত্ব স্থাপন করা এবং জনগণকে শাসন ও শোষণ করা। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ নিজেরা নিজেদের শাসন করতে সর্বকালে ও সর্বস্থানেই অক্ষম। কাজেই অতীতে ও বর্তমান সমাজে এবং গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা নির্বিশেষ সর্বত্র মুষ্টিমেয় একশ্রেণী লোকের কর্তৃত্ব, শাসন ও আধিপত্য বিদ্যমান দেখা যায়। ফলে, কোথাও গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র কার্যকর নেই, যা কার্যকর দেখা যায় তা হচ্ছে গোষ্ঠীতন্ত্র।

রবার্ট মিশেলস্ এর গোষ্ঠীতন্ত্রের লৌহবিধি তত্ত্বটি নানাভাবে সমালোচিত হয়ে আসছে। প্রথমত ক্যাসিনেলীর (Cassinelli) মতে, সংগঠনে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির একাধিপত্য কার্যকর থাকার মূলে সংগঠনের বৃহদায়তন প্রকৃতিই প্রধান কারণ নয় বরং নেতা ও অনুগামীদের মধ্যে সম্পর্কই প্রধানত দায়ী। নেতৃবৃন্দকে অনুগামীদের নিকট দায়িত্বশীল রাখার আইনগত ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে তাদের গণস্বার্থ বিরোধী ভূমিকা পালন থেকে বিরত রাখা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, জনগণের রাজনৈতিক উদাসীনতা ও অনীহাবোধ অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়। শিক্ষা বিস্তার ও ব্যাপক রাজনীতিকরনের মাধ্যমে জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সক্রিয় করা সম্ভব।

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিরোধী রাজনৈতিক দল স্বীকৃত থাকে। ফলে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলের পক্ষে গোষ্ঠীতন্ত্রের প্রভাবে গণবিরোধী ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয় না। কারণ, বিরোধী দল ক্ষমতাসীন দলের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদাজাগ্রত প্রহরীর ভূমিকায় নিয়োজিত থাকে।

সোরেল, প্যারেটো, মস্কা ও হ্বেবারের মতো মিশেল্স্ও তদানীন্তন গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার বাতাবরণকে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর মূল আক্রমণ ছিল কার্ল মার্ক্সের বিরুদ্ধে। তাঁর মতে, গণ প্রশাসন ও গণআইনের মতো বাস্তব ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদ অচল। সমাজতন্ত্র একটি প্রশাসনিক সমস্যা।

মিশেল্স্-এর বিভিন্ন তত্ত্বাবলী পরবর্তীকালে বহু গবেষণাকে উদ্দীপিত করেছে। সংগঠন, আমলাতন্ত্র, লক্ষ্য বিচ্যুতি (goal displacement) ইত্যাদি বহুল চর্চিত সাম্প্রতিক বিষয়াবলী সমাজতত্ত্বে রবার্ট মিশেল্স্-এর অবদান সম্পর্ক নতুনতর উৎসাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

অনুশীলনী ঃ ২

১) গণতান্ত্রিক সংগঠনে নেতা কি ভাবে তার ক্ষমতা বজায় রাখে?

.....

.....

২) গোষ্ঠীতন্ত্রের লৌহ আইন বলতে আপনি কি বোঝেন?

.....

.....

.....

.....

১০.৫ কার্ল ম্যানহাইম (Karl Mannheim) (১৮৯৩—১৯৪৭)

বিংশ শতাব্দীর প্রথিতযশা জার্মান সমাজতাত্ত্বিক কার্ল ম্যানহাইম ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরীর বুদাপেষ্ট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সিমেল, ওয়েবার, মার্ক্স ও নব মার্ক্সবাদী জর্জ লুকাস (George lucas) -এর দ্বারা প্রভাবিত ম্যানহাইম তাঁর জ্ঞান সমাজতত্ত্বের তত্ত্বের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। ম্যানহাইমকে জ্ঞান সমাজতত্ত্বের জনক বলা চলে। এছাড়াও ম্যাক্স হ্বেবারের প্রভাবে তিনি যুক্তিবাদ (rationality) তত্ত্বের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তাঁর যুক্তিবাদ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা বহুক্ষেত্রেই হ্বেবারের (Max Weber) চিন্তাভাবনার তুলনায় সংক্ষিপ্ত, সুনির্দিষ্ট ও সহজতর। সমাজতত্ত্বে ম্যানহাইমের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল।

১০.৫.১ জ্ঞান সমাজতত্ত্ব (Sociology of knowledge)

ম্যানহাইমের মতে, জ্ঞান সমাজতত্ত্বেরএকাধিক পূর্বসূরী থাকলেও বিষয়টির উদ্ভব কার্ল মার্ক্স-এর হাতেই। মার্ক্সের মতাদর্শ তত্ত্ব (Theory of ideology) আসলে জ্ঞান-সমাজতত্ত্বেরই এক প্রতিরূপ বিশেষ। চিন্তন (thought) ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অধ্যয়ন করার পাশাপাশি জ্ঞানের সামাজিক বা অস্তিত্ববাদী (existential) শর্তাবলী ব্যাখ্যা করা ও জ্ঞান সমাজতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর সমস্ত চিন্তাভাবনা জুড়ে ছিল কোনও ধারণার (idea)-র সঙ্গে যে কাঠামোর (structure) মধ্যে ঐ ধারণা নিহিত থাকে সেই কাঠামোর সম্পর্কের বিষয়টি। তিনি ধারণার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, চিন্তাভাবনা এমন একটি বিষয় যা একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ঘটমান সামাজিক কাজকর্মের (activity) সঙ্গে সম্পর্কিত। ম্যানহাইমের মতে, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি আগাগোড়াই কোনও ব্যক্তির কাজকর্ম্ম বা সক্রিয়তাকে তার গোষ্ঠী জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত করে আলোচনা করে। গোষ্ঠী জীবনের সহযোগিতার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জ্ঞান এর উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। এখানে সকলে একসঙ্গে কাজ করার মধ্য দিয়ে, একই রকম অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার মধ্য দিয়েও একটি সাধারণ অর্থাৎ একই রকম ভবিষ্যতের অংশীদার হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকের জ্ঞান বিকশিত হয়।

অতএব, ম্যানহাইম চিন্তনের অস্তিবাদী ও সামাজিক শর্তাবলীর ব্যাখ্যানকে জ্ঞান সমাজতত্ত্ব বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁর মতে, জ্ঞান ও ধারণা একটি নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে ; যদিও বিভিন্ন মাত্রায় এবং একটি নির্দ্দিষ্ট সামাজিক কাঠামো ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে। কোনও নির্দিষ্ট সময়ে হয়তো কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট গোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় একটি সামাজিক ঘটনা অথবা বিষয়কে অধিকতর অনুধাবন করতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ অনুধাবন অসম্ভব। অবশ্যম্ভাবীরূপেই চিন্তন পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে যথানুপাতিক (perspectivistic)- "thought is inevitably perspectivistic".

এ প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। সাত জন দৃষ্টিহীন মানুষের গল্প। তাদেরকে একটি হাতির সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই শুধুমাত্র স্পর্শের সাহায্যে তারা বুঝবার চেষ্টা করে হাতিটিকে মজা হ'ল এই যে, যে ব্যক্তি হাতিটির যে অংশটিকে স্পর্শ করে বুঝবার চেষ্টা করেছিল, তার কাছে হাতি নামক প্রাণীটির আকার সেই রকমই মনে হয়েছিল। যেমন, একজনের বক্তব্য হাতি মোটা থামের মতো দেখতে একটা প্রাণী। অন্যরাও প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব অনুভব অনুযায়ী হাতি সম্বন্ধে একটা নিজস্ব ধারণা অর্জন করেন। অতএব সৃষ্টি হয় প্রবাদের অন্ধের হস্তীদর্শন। ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতি থেকে উঠে আসা বিভিন্ন মানুষ যখন কোন একটি সাধারণ বিষয়কে নিজ নিজ পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবন করবার চেষ্টা করে তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা ঐ বিষয়টি সম্পর্কে প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা সিদ্ধান্তে পৌঁছায় ভিন্ন রূপ চিন্তাভাবনা করে। অতএব বলা চলে, চিন্তন (thought) পরিস্থিতি নির্ভর বা পরিস্থিতি আপেক্ষিক ('situationally relative')।

সামাজিক কাঠামো ও জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কের রূপভেদের বিষয়টি ম্যানহাইম পরিহার করেছেন বা কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, চিন্তার বা জ্ঞানের অস্তিবাদী নির্ধারণ বিষয়টি কার্য-কারণ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ নয়। একমাত্র দৃষ্টিবাদী বা প্রত্যক্ষবাদী (empirical) গবেষণার সাহায্যেই সামাজিক কাঠামো ও জ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত সম্পর্কের বিবিধ রূপভেদের সম্পর্কে সম্যক ও বাস্তব ধারণা অর্জন করা যেতে পারে।

ম্যানহাইমের মতে, সামাজিক কাঠামোগত অবস্থার একটি নির্ভরযোগ্য সূচক শ্রেণী-ব্যবস্থা। শ্রেণীগত অবস্থানের উপর নির্ভর করে কোনও মানুষের জ্ঞান বা ধারণার জগৎ। যেমন, জমিদার বা ভূস্বামী ও ক্ষুদ্র চাষী বা ভূমিদাস-এদের চিন্তাভাবনা, জ্ঞান বা ধারণার জগৎ ভিন্ন। প্রসঙ্গত উল্লেখ, যদিও কার্ল মার্ক্সের শ্রেণী-তত্ত্বের প্রভাব এক্ষেত্রে পরিস্কার, তবুও তিনি শ্রেণী ছাড়া ও অন্যান্য বহুবিধ সামাজিক বিষয়সমূহ, যেমন-মর্যাদা গোষ্ঠী (status group) অথবা পেশাগত অবস্থান ইত্যাদি বিষয়কে জ্ঞান বা ধারণার নির্ধারক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১০.৫.২ মতাদর্শ ও স্বপ্নকল্প বা স্বপ্নরাষ্ট্র (Ideology and Utopia)

'Ideology and Utopia' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ম্যানহাইম মতাদর্শ ও স্বপ্নকল্পের এক সুসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। মতাদর্শ ও স্বপ্নকল্প-উভয়েই ধারণার এক একটি বিন্যাস বা সুসমৃদ্ধ সমষ্টি। মতাদর্শ, বর্তমান সমাজের বাস্তবতাকে আড়াল করে অতীতের আলোকে বাস্তব সমাজকে অনুধাবন বা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করে। অন্যদিকে, স্বল্পকল্প এমন কিছু ধারণার বিন্যাস বা সমষ্টি যা ভবিষ্যতের লক্ষ্যে বর্তমান সময় অতিক্রম করে যায় (transcends the present and is oriented to the future)। যারা মতাদর্শকে ব্যবহার করে বা মতাদর্শ-পন্থী তারা আসলে সংরক্ষণশীল (conservative) বা স্থিতাবস্থার (status) পক্ষে। অন্যদিকে, যারা স্বপ্নকল্পে বিশ্বাসী বা স্বপ্নকল্প-পন্থী তারা প্রগতিশীল (Progressive) বা স্থিতাবস্থার অবসান ও নতুনতর, উন্নত সমাজ ব্যবস্থার দিশারী। স্বল্পকল্প-পন্থীর ভবিষ্যতের স্বপ্ন, উন্নত সমাজের স্বপ্ন, প্রচলিত বর্তমান সামাজিক কাঠামোর জায়গা থেকে অসম্ভব বলে মনে হয়। অতএব, বলা চলে যে, মতাদর্শপন্থী ও স্বপ্নকল্পপন্থীরা পরস্পর বিরোধী। আসলে "মতাদর্শ" ও "স্বপ্নকল্প" দুটি লেবেল (label) বা তকমা যা একটি গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর উপর আরোপ করে। সমাজ ক্ষমতাবান গোষ্ঠী ক্ষমতাহীনদের স্বপ্নের ফেরিওয়ালা বা স্বপ্নপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করে। অন্যদিকে, ক্ষমতাহীন ও ক্ষমতাকামীরা ক্ষমতাবানদের উপর মতাদর্শপন্থীর লেবেল সেঁটে দেয়।

ম্যানহাইমের মতে, মতাদর্শ বা স্বপ্নকল্প, উভয়েই বিক্ষিপ্ত (distarted) মানসিক অবস্থাকে সূচিত করে। উভয় ক্ষেত্র থেকেই বিক্ষেপণ বা বিকৃতি দূর করাই জ্ঞান সমাজতাত্ত্বিকের কাজ। মতাদর্শগত বা স্বপ্নকাল্পনিক বিকৃতি

থেকে দূরে থেকে বাস্তব সত্য সন্ধানই জ্ঞান সমাজতাত্ত্বিকের প্রধান কর্তব্য।

তাঁর মতাদর্শ তত্ত্বটি মার্ক্সীয় দর্শনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হ'লেও স্বপ্নকল্প তত্ত্বটি প্রধানত তাঁর নিজস্ব অবদান। ম্যানহাইমের মতে, স্বপ্নকল্পপন্থী ক্ষমতাকামী মানুষেরা যখন ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হয়, স্বপ্নকাল্পনিক মানসিকতা তখন শেষ বিন্দুতে পৌঁছয়। অদূর অতীতে ক্ষমতাহীন কিন্তু অধুনা ক্ষমতাবান মানুষদের স্বপ্নকল্প ধীরে ধীরে পরিণত হয় মতাদর্শে। ক্রমে এর বিরুদ্ধে আবার গড়ে ওঠে এক নতুন স্বপ্নকল্প-প্রতি-স্বপ্নকল্প (counter utopia)

তাঁর সমসাময়িক সমাজে ম্যানহাইম স্বপ্নকল্পের অপমৃত্যু লক্ষ্য করেছেন গভীর বেদনার সাথে। কেন স্বপ্নকল্প শেষ হয়ে যায় ? প্রথমতঃ এটা সত্য যে স্বপ্নের সওদাগরেরা ক্ষমতায় এলেই, প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারলেই, স্বপ্ন দেখা ভুলে যায়, নিজেদের ধ্যানধারণাকে বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া তাদের স্বপ্নকল্প পরিণত হয় মতাদর্শে। দ্বিতীয়ত, একই সঙ্গে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রকমের স্বপ্নকল্প অবস্থান করে এবং দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় পরস্পরের ধ্বংসের কারণ হয়। তৃতীয় বা শেষ কারণ হিসেবেও এই বিভিন্ন স্বপ্নকল্পের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কথাই উল্লেখ করা যায়। এই দ্বন্দ্ব পারস্পরিক ধারণা-ব্যবস্থা বা চিন্তাধারাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। স্বপ্নকাল্পনিক চিন্তাভাবনাও বাদ যায় না। ফলত প্রভূত সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে স্বপ্নকল্প শেষ হয়ে যায়।

আধুনিক সমাজের অতিরিক্ত বিষয়ানুগতা ("matter of factness") স্বপ্নকল্প ও মতাদর্শ- উভয়েরই ধ্বংসের কারণ। হ্বেবারের মতো ম্যানহাইমও এক্ষেত্রে আধুনিক সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান মোহভঙ্গের (disenchantment) প্রক্রিয়াকে এর জন্য দায়ী করেছেন। আমরা এমন এক বিশ্বের দিকে এগিয়ে চলেছি যেখানে " সমস্ত ধারণাকে অমর্যাদা করা হয়েছে এবং সমস্ত স্বপ্নকল্পকে ধ্বংস করা হয়েছে" (..... all ideas have been discredited and all utopias have been destroyed).

উপরোল্লিখিত দু'টি প্রধান অবদান ছাড়াও তাঁর জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে তিনি তাত্ত্বিক দিক থেকে কিছুটা প্রায়োগিক দিকে মনোসংযোগ করেন এবং পরিকল্পনা ও সামাজিক পুনর্গঠনের দিকে নজর দেন।

১০.৫.৩ আধুনিক সমাজে পরিকল্পনা ও সামাজিক পুনর্গঠন (Planning and Social Re-construction in the Modern World)

ম্যানহাইম তাঁর জ্ঞান সমাজতত্ত্বকে একটি পরিকল্পিত সমাজ গড়ে তুলবার লক্ষ্যে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমস্যার মধ্যে ফেলেন না বরং পরিকল্পনা ও গণতন্ত্র একে অপরের পরিপূরক। তিনি এমন একটি পরিকল্পিত সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন যেখানে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সর্বাত্মকবাদ (Totalistarianism) অথবা তার বদলে অবাধ নীতি (laissez faire) কোনটিকেই তিনি মেনে নিতে পারেন নি। বরং গণতান্ত্রিক পরিকল্পনাকেই তিনি অধিকতর কাম্য বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, সুপরিকল্পনার অর্থ সামাজিক গঠন ও কার্য সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের সাহায্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী উপাদানগুলির বিরুদ্ধে এক সচেতন আক্রমণ। অতএব, সুপরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন সমাজ সম্পর্কে এক অনুপুঙ্খ সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এর জন্য সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতার প্রয়োজন—বিশেষীকরণ (specialisation) প্রসূত স্বাধীনতার তুলনায় তা অধিকতর প্রয়োজনীয়।

আধুনিক সমাজের বিবিধ সমস্যার কারণ হিসেবে ম্যানহাইম মূল্যবোধের সংকটের কথা উল্লেখ করেছেন এবং উত্তরণের উপায় হিসেবে আধ্যাত্মিক পুর্নজাগরণ প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন।

পরবর্তীকালের সমাজতাত্ত্বিকেরা, বিশেষত, রবার্ট কে মার্টন (Robert K. Merton) প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকেরা ম্যানহাইমের কিছু সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, বহু ক্ষেত্রে 'মন' (mind) এবং 'জ্ঞান' (knowledge) কে একই অর্থে ব্যবহার করা ম্যানহাইমের উচিত হয়নি। মন একটি চলমান প্রক্রিয়ার মতো যার ফলে মান এর উদ্ভব ঘটে। 'মন' ও 'জ্ঞান' এক বিষয় নয়। শুধু জ্ঞান এর সংজ্ঞায়নে অস্বচ্ছতাই নয়, জ্ঞানের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের বিষয়টিও তাঁর লেখায় পরিষ্কার নয়। এ বিষয়ে ম্যানহাইম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কথা বলেছেন এবং এই বিবিধ বক্তব্য সমূহকে তিনি কখনই একটি সাধারণ ধারণার ছত্রছায়ায় আনতে পারেননি। এই ধরনের বহু দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও সমাজতত্ত্বে ম্যানহাইম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর জ্ঞান সমাজতত্ত্বের জন্যই। অতি সম্প্রতি সমাজতত্ত্বে ঐক্যবদ্ধ বা সশ্লেষণাত্মক তত্ত্বের যে বিকাশ ঘটছে, বহু পূর্বেই ম্যানহাইম ছিলেন তার পথপ্রদর্শক, এইখানেই আধুনিক সমাজতত্ত্বের বিকাশে তাঁর সুগভীর অবদান নিহিত রয়েছে।

অনুশীলনী ঃ ৩

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) ম্যানহাইমের মতে চিন্তন———সঙ্গে যথানুপাতিক।

খ) যারা মতাদর্শপন্থী তারা আসলে ————।

গ) আধুনিক সমাজের অতিরিক্ত ———— স্বপ্নকল্প ও মতাদর্শ-উভয়েরই ধ্বংসের কারণ।

১০.৬ উইলিয়াম আইজ্যাক থমাস (William Isaac Thomas) (১৮৬৩-১৯৪৭)

আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক উইলিয়াম আইজ্যাক থমাস (১৮৫৩-১৯৪৭) ভার্জিনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। জীবনের প্রথমদিকে তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত জনজাতিবিদ (ethnographer) । জনজাতিবিদ্যা'র পাশাপাশি তিনি ক্রমে বিবিধ মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলীতেও উৎসাহী হয়ে পড়েন এবং জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে তিনি একজন প্রখ্যাত সমাজ মনস্তাত্ত্বিক (Social psychologist) হিসেবে পরিচিত হন। আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক বিভাগের তিনি প্রথম দিকের এক স্বনামধন্য সমাজতাত্ত্বিক ছিলেন। থমাস মূলতঃ বিখ্যাত পোল্যান্ডীয় (পোলিশ) সমাজতাত্ত্বিক ফ্লেরিয়ান জ্যানেইস্কির (Florian Znanecki) সঙ্গে যৌথভাবে লিখিত 'পোলিশ পেজ্যান্ট' (Polish peasant) গ্রন্থটির জন্য। জীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক পুস্তক প্রবন্ধ রচনা করলেও সমাজতত্ত্বের কোনও নির্দ্দিষ্ট চিন্তাধারা (Theory) বা ঘরানার তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন নি। বরং তিনি দৈনন্দিন জীবনের বহু বিষয় নিয়ে দৃষ্টিবাদী গবেষণা (empirical research) করেছেন। এই সমস্ত বিষয়াবলীর মধ্যে লিঙ্গ ভেদ বা যৌন ভেদ (sex difference), শিশু অপরাধ, সামাজিক সংগঠন ও পরিযান (migration) সংক্রান্ত গবেষণা উল্লেখযোগ্য। তাঁর সমগ্র অবদান স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তবুও সমাজতত্ত্বে তাঁর সাধারণ অবদান নীচে সংক্ষেপে আলোচিত হ'ল।

১০.৬.১ সামাজিক ব্যবহার (Social Behaviour)

যৌন-প্রভেদের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে থমাস-এর মানব ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়। সুশীলতা বা লাজুকতা, নারীসুলভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভেদ ইত্যাদির ব্যাখ্যায় তিনি জীব বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথ্য বা Data ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, পুরুষ ও নারীর

ব্যবহারিক পার্থক্যের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ (জৈবিক) ও বাহ্যিক (সামাজিক-সাংস্কৃতিক) উভয় রকমের কারণ বর্তমান থাকলেও তিনি প্রধানতঃ আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ জৈবিক কারণকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যদিও সেই সময়কার সাধারণ প্রবণতা অনুযায়ী তিনি জৈবিক কারণকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়কেও কখনো কখনো অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এর প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনার "চার ইচ্ছা" ধারণায়। এই চারটি ইচ্ছা হ'ল-নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের ইচ্ছা, কর্তৃত্ব করার ইচ্ছা, স্বীকৃতি লাভের ইচ্ছা এবং নিরাপত্তা লাভের ইচ্ছা। আবার জীবন বিজ্ঞানের প্রভাব লক্ষ্যণীয় যখন তিনি বলেন যে, সব রকমের ব্যবহারই দু'টি মূল ক্ষুধা (hunger) কারণে ঘটে, যথাঃ খাদ্য বা খাদ্যের ক্ষুধা ও যৌন ক্ষুধা। অবশ্য 'পোলিশ পেজ্যান্ট' গ্রন্থে তিনি ক্ষুধা চারটি মূল ইচ্ছার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জৈবিক ও সামাজিক উভয় কারণেরই অবতারনা করেছেন। ব্যবহারের বিশ্লেষণে থমাস পরবর্তীকালে পরিস্থিতিগত দৃষ্টিভঙ্গীর (situational approach) অবতারনা করেন। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষ বিভিন্ন রকমের ব্যবহার করে। ব্যবহার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে কোনও মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যবহারকে পর্যবেক্ষণ ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করা উচিত। এ প্রসঙ্গে তিনি ""পরিস্থিতির সংজ্ঞায়ন" "definition of the situation "এর ধারণার অবতারনা করেন। তিনি এক্ষেত্রে পরিস্থিতির আত্মগত (subjective) সংজ্ঞার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই ব্যক্তিগত নথি (personal document), জীবন ইতিহাস (life history) প্রমুখ পদ্ধতির ব্যবহারকে তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সমসাময়িক সর্বব্যাপী বস্তুগত (objective) সংজ্ঞায়নের এর পরিবেশে থমাস এর আত্মগত সংজ্ঞায়ন অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

১০.৬.২ সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও সমাজ পরিবর্তন (cultural evolution and social change)

নৃতত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে থমাস সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও তার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। একই সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক সমাজে ঘটমান সুদূরপ্রসারী সামাজিক পরিবর্তনের ঘটনাবলীর দ্বারাও [যেমনঃ নগরায়ণের উদ্ভব, গণ পরিযান (mass migration) এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন] তিনি প্রভাবিত ছিলেন। সাংস্কৃতিক বিবর্তনের যাবতীয় এক রৈখিক (unilinear) তত্ত্বকে অতি সাদামাটা এবং যান্ত্রিকতা দোষে দুষ্ট বলে মনে করে বর্জন করেছিলেন তিনি। তার বদলে তিনি তুলনামূলক জটিলতার এক সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব রচনা করেন। এই তত্ত্বে তিনি নিয়ন্ত্রণ (control), অভ্যাস (habit), সংকট (crisis) এবং নজর (attention)-এই সমস্ত ধারণার অবতারনা করেন। তাঁর মতে, অর্থপূর্ণ যে কোনও কাজেরই উদ্দেশ্য থাকে নিয়ন্ত্রণ—নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য সফল বা বিফল যাই হোক না কেন। নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি আবার অভ্যাসগত। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে সামাজিক জীবনে সংকট উপস্থিত হয়। তখন নজর দেওয়া হয় নতুনতর সমাধানের উপায়ের দিকে। 'পোলিশ পেজ্যান্ট' অথবা পোল্যান্ডীয় চাষীদের জীবন নিয়ে গবেষণাকালে থমাস বিভিন্ন সমাজে পরিবর্তনের বিভিন্ন গতি ও তার ফলাফলের বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করেন। অশিক্ষিত কৃষক সমাজে পরিবর্তনের ধীর গতির ফলে চালু সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর মধ্যে নতুন উপাদানের প্রবেশ অনেক সহজতর-ফলত জনগণের মধ্যে কোনও সর্বব্যাপী হতাশা বা নৈতিকতার স্খলন দেখা যায় না। কিন্তু আধুনিক সমাজের দ্রুতগতি পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথাগত সমাজিক নিয়ন্ত্রণ অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। গোষ্ঠী ঐক্য ভেঙে পড়ে এবং ব্যবহার আরও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। প্রাথমিক গোষ্ঠীর জায়গায় আবির্ভাব ঘটে জন সমাজের (mass society)।

থমাসের মতে, আধুনিক সমাজ এক দ্রুত ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

ফলত, দেখা দিচ্ছে সামাজিক বিশৃঙ্খলা (social disorganisation) । পুরাতন সমাজে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কারণে প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এক ধরনের স্থায়িত্ব বজায় থাকতো। আধুনিক সমাজের দ্রুতগতি পরিবর্তনের ধাক্কায় তা' ভেঙে যাচ্ছে। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে থমাস একটি নতুন সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন যা সুশৃঙ্খল উপায়ে ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে অধ্যয়ন করতে পারবে এবং এইভাবে এক নতুন সমাজের দিশারী হয়ে উঠতে পারবে।

'পোলীশ পেজ্যান্ট' ও অন্যান্য রচনায় থমাস এক সার্বিক বা বৃহত্তর সমাজতাত্ত্বিক (macrosociological) দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রাখলেও পরবর্তীকালে তিনি এক আণুবীক্ষনিক (microscopic) সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। কোনও মানুষের চিন্তাভাবনার ধরন, অর্থাৎ সে কি বিষয় নিয়ে চিন্তা করছে এবং তা কিভাবে তার কার্যকে প্রভাবিত করছে-এই বিষয়টিকে তিনি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত বলে মনে করেছেন। প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক মার্ক্স, হ্বেবার ও ডুর্কহাইম এর বৃহত্তম সমাজতাত্ত্বিক (macrosociological) দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীতে থমাস এক ক্ষুদ্রতর সমাজতাত্ত্বিক (micro-sociological দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। সমাজতত্ত্বের কোনও সুনির্দ্দিষ্ট ঘরানা'র সাথে যুক্ত না থাকলেও তাঁর সমাজ মনস্তাত্ত্বিক এই অবস্থান চিকাগো ঘরানার মূল সূর, অর্থাৎ প্রতীকি মিথস্ক্রিয়াতত্ত্বর (symbolic interactionism) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বহু বিচারেই থমাস ছিলেন বিংশ শতাব্দীর এক অনন্য সমাজতাত্ত্বিক। সমাজতত্ত্বের আরামকেদারা (armchair) জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে তিনি দৃষ্টিবাদী গবেষণার মাধ্যমে বিষয়টিকে প্রয়োগমুখী করে গড়ে তুলবার এক সার্থক প্রচেষ্টা চলিয়ে যান আজীবন। সমাজতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় তিনি নিয়োজিত ছিলেন। বহু বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষার একটি বিষয় হিসেবে সমাজতত্ত্বের প্রভূত বিকাশ ঘটান- থমাসের সরাসরি উদ্যোগ ও প্রভাবে। সমাজতত্ত্বকে আধুনিক করে গড়ে তুলেছিলেন তিনি। যদিও তাঁর তত্ত্বগত অবদান অপরিসীম তবুও তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল, একটি সার্থক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজতত্ত্বকে দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সফলভাবে প্রয়োগ করা এবং এই কাজে তিনি সফল হয়েছিলেন, একথা বলা চলে।

অনুশীলনী ঃ ৪

১) থমাস বর্ণিত চারটি ইচ্ছা কি কি?

২) থমাসের মতে আধুনিক সমাজের বিশৃঙ্খলার কারণ কি?

১০.৭ ফ্লোরিয়ান জ্ঞ্যানেইস্কি (Florian Znaniecki) (১৮৮২-১৯৫৮)

ফ্লোরিয়ান উইটোল্ড জ্ঞ্যানেইস্কি পোল্যান্ডের স্বুইয়াটনিকিতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি ছিলেন একজন কবি। পরবর্তীকালে তিনি দর্শনশাস্ত্রে উৎসাহিত হন এবং শেষ পর্যন্ত থমাসের (W.I.Thomas) প্রভাবে তিনি সমাজতত্ত্বের জগতে প্রবেশ করেন। ইংরাজী ও পোলিশ (পোল্যান্ডীয়) ভাষায় তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন। পোলিশ সমাজতত্ত্বের এই পথিকৃৎ ১৯২২ সালে পোলিশ সমাজতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। তাঁর বিবিধ রচনার মধ্যে থমাসের সঙ্গে যৌথভাবে রচিত The Polish Peasant in Europe and

America গ্রন্থটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই সুবৃহৎ গ্রন্থটিতে শুধু একটি বিশেষ গোষ্ঠীর (পোলিশ কৃষক) সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিবরণই তুলে ধরা হয়নি, সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব ও পদ্ধতিবিদ্যার বিকাশের ক্ষেত্রে ও গ্রন্থটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

১০.৭.১ ইউরোপ ও আমেরিকায় পোল্যান্ডীয় চাষী (The Polish Peasant in Europe and America)

১৯১৮-১৯২০ খ্রীষ্টাব্দকাল জুড়ে প্রকাশিত থমাস ও জ্যানেইস্কি'র এই গ্রন্থটি অদ্যাবধি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক কাজ হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। থমাস ও জ্যানেইস্কি আজীবন দুই ভিন্ন ধারার সমাজতাত্ত্বিক হ'লেও তাঁদের এই যৌথ প্রয়াস (ভিন্নতার কারণেই), অধ্যাপক রবার্ট বিয়ারষ্টেস্ট (Robert Bierstedt) এর মতে, অনেক বেশী সাফল্য লাভ করেছে। থমাসের অভিজ্ঞতা ও মনস্তাত্ত্বিক গভীরতার সঙ্গে জ্যানেইস্কির ইতিহাস জ্ঞান, দার্শনিক পাণ্ডিত্য ও নিয়মাবদ্ধতা 'পোলিশ পেজ্যান্ট (The polish Peasant in Europe and America) গ্রন্থটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক দলিলের মর্যাদা দিয়েছে।

মূলত, জনজাতিসত্তা (ethnic identity) ও জনজাতি উপসংস্কৃতি (ethnic subculture) বিষয়গুলিকে নিয়ে লেখা 'পোলিশ পেজ্যান্ট' গ্রন্থটি বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ রচনা। পাঁচটি খণ্ডে বিস্তৃত এই গ্রন্থটির মুখ্য আলোচ্য বিষয় চিকাগো শহরে বসবাসকারী পোলিশ অভিবাসী বা বহিরাগমনকারী (immigrant) দেব জীবন ইতিহাস (life-history) । ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, আত্মজীবনী, রোজনামচা (diary) এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত নথিপত্রের অনুপুঙ্খ বিবরণ 'পোলিশ পেজ্যান্ট'-এর অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। এই সমস্ত নথিপত্রে উল্লেখিত ঘটনা বা কাহিনীর মধ্য থেকে জনজাতিসত্ত্বা ও উপসংস্কৃতি সম্বন্ধে যে তত্ত্বগত সারমর্ম উদ্ধার করা সম্ভব, এখানে তাই আলোচ্য।

থমাস ও জ্যানেইস্কির মুখ্য উদ্দেশ্য বা আলোচ্য বিষয় হ'ল সমাজ পরিবর্তন। তাঁদের মতে, মনোভাব (attitude) ও মূল্যবোধের (values) পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই নির্ধারণ করে সামাজিক পরিবর্তনকে। কোনও সামাজিক বা ব্যক্তিগত ঘটনার কারণ শুধুমাত্র অন্য কোনও সামাজিক বা ব্যক্তিগত ঘটনা নয় বরং কোনও সামাজিক এবং ব্যক্তিগত ঘটনার যৌথ উপস্থিতি ; অর্থাৎ, কোনও মূল্যবোধ অথবা কোনও মনোভাবের অস্তিত্বের কারণ সব সময়ই অন্য কোনও মূল্যবোধ ও মনোভাবের যৌথ উপস্থিতি। সামাজিক ব্যবহারের বস্তুগত (Objective) ও আত্মগত (subjective) দিকই ছিল তাঁদের অনুসন্ধানের মূল বিষয়। মানুষের ব্যবহারের উপর বাইরের অথবা বস্তুগত কোনও বিষয়ের প্রভাব তখনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন ব্যক্তি আত্মগতভাবে তাকে উপলব্ধি করে। অভিজ্ঞতা দ্বারা পুষ্ট মনোভাব কিভাবে বস্তুগত বিষয়াবলীর প্রতি ব্যক্তির সাড়াদানকে নির্ধারণ করে, তাঁর বিশ্লেষণই গবেষকের মূল কাজ। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, শহরের বস্তিতে নবাগত বহিরাগমনকারীদের অপরাধ প্রবণতা বস্তি অঞ্চলের সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণে হয় তা নয় বরং বহিরাগমনকারীরা বস্তি অঞ্চলে এসে নিয়ম কানুনের যে শৈথিল্য দেখতে পায় বা আত্মগতভাবে উপলব্ধি করে তাই তাদেরকে অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়তে উৎসাহিত করে।

মনোভাব ও মূল্যবোধের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে থমাস ও জ্যানেইস্কি মানুষের চার ধরনের মূল অবিলাষ বা ইচ্ছার (wish) উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, নতুন অভিজ্ঞতার অভিলাষ, দ্বিতীয়ত, স্বীকৃতি (recognition) লাভের অভিলাষ তৃতীয়ত, কর্তৃত্বের অভিলাষ এবং চতুর্থত, নিরাপত্তার

অভিলাষ। যদিও সমগ্র 'পোলিশ পেজ্যান্ট' রচনাটি জুড়ে এই চারটি মূল অভিলাষের প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে বারে বারে এসেছে তবুও প্রসঙ্গটি এই রচনায় খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় বলেই মনে হয়। এমনকি জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে থমাস ও জ্যানেইস্কি নিজেরাই এই চার অভিলাষের প্রসঙ্গটির গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন।

১০.৭.২ সামাজিক সংগঠন (Social organisation)

এর সঙ্গে ব্যক্তির মনোভাবের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ও সামাজিক বিধিনিষেধ এবং ব্যক্তি কর্তৃক তার মান্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে থমাস ও জ্যানেইস্কি তিন ধরনের মানুষের অস্তিত্বের উল্লেখ করেন। প্রথমত, ফিলিষ্টিন-এই ধরনের মানুষ সামাজিক ঐতিহ্যের স্থায়ী অংশগুলিকে গ্রহণ করে ও মেনে চলে। জীবনে হঠাৎ কোনও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিলে এই ধরনের মানুষদের কাজকর্ম্মে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খুব ধীর গতিতে এই ধরনের মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয় ধরনের মানুষ ঠিক এর বিপরীত-বোহেমিয়ান। যেহেতু এই ধরনের মানুষদের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে গঠিত থাকে না অতএব বিবর্তনের সম্ভাবনাও যথেষ্ট থাকে। এই ধরনের মানুষ সতত পরিবর্তনশীল হ'তে পারে তাই ফিলিষ্টাইনের তুলনায় সে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ব্যাপারে অধিকতর সক্ষম। প্রথম ধরনের মানুষ, অর্থাৎ ফিলিষ্টাইন, বাধ্য (conformist) ; কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের মানুষ, অর্থাৎ বোহীমিয়ান, বিদ্রোহী (rebel)। তৃতীয় এক ধরনের মানুষের অস্তিত্বের কথাও থমাস ও জ্যানেইস্কি উল্লেখ করেছেন- সৃষ্টিশীল মানুষ (creative man) সদাসর্বদা নতুনতর চিন্তাভাবনা করেন, বিভিন্ন বিষয়ে সে সতত উৎসাহী। সে শুধুমাত্র ঐতিহ্যের দাস নয়, সামাজিক প্রয়োজনের খাতিরে সে নির্বিচারে বিদ্রোহীও নয়-আবিষ্কার তথা নতুনতর দিশার অনুসন্ধান এবং ঐতিহ্যের হাত ধরে সে সমাজ পরিবর্তনের এক সৃষ্টিশীল, যার মধ্যে ফিলিষ্টাইনেরসুবোধ বালকসুলভ মান্য করে চলা চরিত্রের বা রক্ষণশীলতার সামান্য ছাপ নেই অথবা বোহেমিয়ানের অবাধ্য চরিত্রের বা বিদ্রোহী চরিত্রের সামান্য ছোঁয়াও নেই।

'পোলিশ পেজ্যান্ট' রচনায় তত্ত্ব ও প্রমাণের মধ্যে বেশ কিছু অসংগঠিত বর্তমান। তৎসত্ত্বেও হার্বাট ব্লুমার Herbert Blumer-এর মতে, 'পোলিশ পেজ্যান্ট' আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নক্ষত্র এবং এর তাত্ত্বিক কাঠামো বর্তমানকালের বহু সমাজতাত্ত্বিকের কাছেই এখনো উৎসাহব্যঞ্জক।

১০.৭.৩ সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি (The method of Sociology)

বিয়ারষ্টেস্ট-এর মতে, জ্যানেইস্কির যাবতীয় রচনার মধ্যে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর "সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি" শীর্ষক পুস্তকটি সবচেয়ে বেশী সুশৃঙ্খল, সুসম্বদ্ধ। এই বইটিতে তিনটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, সমাজতত্ত্ব কোনও সাধারণ (general) সমাজবিজ্ঞান নয়, একটি বিশেষ (special) সমাজ বিজ্ঞান এবং এর একটি বিশেষ বিষয়বস্তু (subject matter) আছে, নিজস্ব তথ্য বা উপাত্ত (data) আছে। দ্বিতীয়ত, দৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানমনস্কতার পরিবর্তে সমাজতত্ত্ব বাস্তব সমাজের গভীরতর অর্থ অনুধাবনে আগ্রহী। তৃতীয়ত, কঠোর যৌক্তিক মান নির্ভর হ'লেও সমাজতত্ত্ব পরিমাণগত নয়, গুণগত একটি বিষয়। জ্যানেইস্কির মতে, যদিও বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে বহু শিক্ষা দেয়, তবুও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সংগ্রহের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট নয় ; প্রয়োজন তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর উপস্থিতি। তত্ত্ব ও গবেষণা (theory and research) -র মধ্যে তুলনামূলক গুরুত্ব বিচারে তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। নিয়মহীন যুক্তিবাদ (rationalism) অথবা পরিকল্পনাহীন অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) কোনটিই সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের

ক্ষেত্রে সঠিক দিশা দেখাতে পারে না।

১০.৭.৪ সমাজতত্ত্ব (Sociology)

জ্যানেইস্কির মতে, সমাজতত্ত্ব সামাজিক ব্যবস্থার (social system) বিজ্ঞান। সামাজিক ব্যবস্থাসমূহকে তিনি চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলি হ'ল সামাজিক ক্রিয়াসমূহ (social actions), সামাজিক সম্পর্কাবলী (Social relations), সামাজিক ব্যক্তিসমূহ (social persons) এবং সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ (social groups)। এই সমস্ত উপব্যবস্থার প্রকৃতি থেকে বোঝা যায় যে, সমাজতত্ত্ব একটি বিশেষ বিজ্ঞান যা শুধুমাত্র এক ধরনের সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তা হ'ল সামাজিক ব্যবস্থা। অন্যান্য সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা-যেমন, প্রযুক্তিবিদ্যাগত (বা প্রযুক্তিগত), অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদির সঙ্গে সমাজতত্ত্ব সম্পর্কিত নয়।

জ্যানেইস্কির মতে, সমাজতত্ত্ব সামাজিক বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়। সমাজতত্ত্বের মধ্যে একটা মানবতাবাদী বা মানবিক বিষয় রয়েছে যেটা সমাজতত্ত্বকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের থেকে পৃথক করেছে। তিনি আরও বলেছেন যে, সমাজতত্ত্ব একটি বিশেষ (specific) সামাজিক বিজ্ঞান, কোনও সাধারণ (general) সামাজিক বিজ্ঞান নয়। সমাজে যা কিছু ঘটে তার সবকিছুই সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় নয়। সচেতন মানুষ হিসেবে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার (interaction) মাধ্যমে ব্যক্তি যে সামাজিক কর্ম-ব্যবস্থা (systems of social actions) গড়ে তোলে-তাই সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। জ্যানেইস্কির আর একটি বক্তব্য হ'ল এই যে-সমাজতত্ত্বের পদ্ধতি ভৌত বিজ্ঞান সমূহের মতোই বস্তুগত, সংক্ষিপ্ত ও সুগভীর। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতার বিচ্যুতি ঘটায় না সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির মানবিক দিকটি, এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ব গড়ে তুলতে গেলে মানবিক বিষয়ের সঙ্গে ভৌতবিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতার এক সংমিশ্রণ ঘটানো প্রয়োজন। মানবতাবাদী দিকটিই সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার এক কৌলীন্য গড়ে তোলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সমাজতাত্ত্বিক উপাত্ত হিসেবে গণ্য করার মধ্য দিয়ে।

উপরোক্ত অবদান ছাড়াও জ্যানেইস্কি জ্ঞান-সমাজতত্ত্বর ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তাঁর The Social Role of the Man of knowledge গ্রন্থটি জ্ঞান-সমাজতত্ত্বের জগতে এক অনন্য অবদানই শুধু নয়, তাঁর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নিজস্ব ধরনের এক অনবদ্য নিদর্শনও বটে।

অনুশীলনী ঃ ৫

১) 'সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি' নামক গ্রন্থে জ্যানেইস্কি সমাজতত্ত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে কি মতামত ব্যক্ত করেছেন?

.....

.....

.....

.....

.....

২) 'পোলিশ পেজ্যান্ট' গ্রন্থে থমাস ও জ্যানেইস্কি কি কি ধরনের মানুষের অস্তিত্বের উল্লেখ করেন?

.....

.....

.....

.....

১০.৮ সারাংশ

সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে ইওরোপ মহাদেশের কয়েকজন প্রধান সমাজতাত্ত্বিকের অবদান এই এককে আলোচিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে গীতানো মস্কা ও রবার্ট মিশেলস্ মূলত রাষ্ট্রনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক (political sociologist)। মস্কার খ্যাতি প্রধানত তাঁর শাসক শ্রেণীর তত্ত্বের জন্য। ছল-চাতুরী, রাজনৈতিক সূত্র ইত্যাদির মাধ্যমে কিভাবে ক্ষমতাবান সংখ্যালঘু শাসক শ্রেণীর সদস্যরা, ক্ষমতাহীন, অসংগঠিত, সংখ্যাগুরু জনসাধারণের উপর তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করে—মস্কা তারই ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও তাঁকে একজন উদারনৈতিক চিন্তাবিদ বলা হয় তবুও সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর চরম বিরোধিতা তাঁকে এক উদারনীতি বিরোধী অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এই এককে শাসকশ্রেণী তত্ত্বের পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক কারণেই সামাজিক বল তত্ত্বেরও আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজতত্ত্বে এলিট তত্ত্বের বিকাশে ভিলফ্রেডো প্যারেটোর পাশাপাশিই উচ্চারিত হয় মস্কা ও মিশেলস্-এর নাম। মিশেলস্-এর মতে, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এলিটরা এক ধরনের গোষ্ঠীতন্ত্রের প্রবর্তন করে। সংগঠন মানেই গোষ্ঠীতন্ত্র। অতীতে, বর্তমানে গণতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে সর্বদাই গোষ্ঠীতান্ত্রিকতা বর্তমান। মিশেলস্-এর রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীতন্ত্রের লৌহবিধি সংক্রান্ত আলোচনা এই এককে করা হয়েছে।

জ্ঞান সমাজতত্ত্বে তাঁর উল্লেখ্য অবদান কার্ল ম্যানহাইমকে ইউরোপীয় সমাজতত্ত্বে এক অন্যতম আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যদিও কার্ল মার্ক্সের প্রভাব তাঁর জ্ঞান সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় সুস্পষ্ট তবুও মার্ক্সের বিপরীতে শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য সামাজিক বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব প্রদান, ম্যানহাইমের জ্ঞান সমাজতাত্ত্বিক আলোচনাকে পৃথক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। এই এককে তাঁর জ্ঞান সমাজতত্ত্ব'র পাশাপাশি তাঁর মৌলিক অবদান মতাদর্শ ও স্বপ্নকল্প তত্ত্বেরও আলোচনা করা হয়েছে। জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে তিনি সমাজ পরিকল্পনা ও পুনর্গঠনের মতো প্রায়োগিক বিষয়েও তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। এখানে সংক্ষেপে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয় নিয়ে দৃষ্টিবাদী গবেষণার জন্য বিখ্যাত উইলিয়াম আইজ্যাক থমাস সামাজিক ব্যবহার ও সামাজিক পরিবর্তনের উপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবুও তিনি মূলত প্রসিদ্ধ ফ্লোরিয়ান এর সঙ্গে যৌথভাবে প্রণীত The Polish peasant in Europe and America গ্রন্থটির জন্য। সমাজপরিবর্তনে মনোভাব ও মূল্যবোধের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভূমিকা মুখ্য বলে তাঁরা মতপ্রকাশ করেছেন। সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিবিদ্যা সম্পর্কে জ্যানেইস্কির গুরুত্বপূর্ণ অবদানও এই এককে আলোচিত হয়েছে 'পোলিশ পেজ্যান্ট' এর পাশাপাশি। সংক্ষেপে বলা চলে, সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে ইউরোপীয় ঘরানার চিন্তাবিদদের অবদান সম্পর্কে আলোচনার একটা প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই এককে।

১০.৯ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ

১) গীতানো মস্কার শাসন শ্রেণীর তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।

২) "সংগঠন মানেই গোষ্ঠীতন্ত্র" —— কার উক্তি ? যুক্তি সহকারে বক্তব্যটির যাথার্থতা বিশ্লেষণ করুন।

৩) কার্ল ম্যানহাইমের মতাদর্শ ও স্বপ্নকল্প তত্ত্বটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

৪) জনজাতিসত্ত্বা ও জনজাতি উপসংস্কৃতি'র বিষয়ে থমাস ও জ্যানেইস্কির বক্তব্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন।

৫) সমাজতত্ত্ব ও সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্যানেইস্কি'র মতবাদ আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১) সামাজিক বল প্রসঙ্গে মস্কার বক্তব্য কি ?

২) মস্কার শাসক শ্রেণী তত্ত্বটি কিভাবে সমালোচিত হয়েছে ?

৩) 'গোষ্ঠীতন্ত্রের লৌহ আইন' সম্পর্কে কি জানেন ?

৪) গোষ্ঠীতন্ত্রের কি কি বৈশিষ্ট্যে'র কথা মিশেলস্ উল্লেখ করেছেন ?

৫) কার্ল ম্যানহাইমের জ্ঞান-সমাজতত্ত্বের মুখ্য বক্তব্য কি ?

৬) সামাজিক সংগঠনের আলোচনা প্রসঙ্গে থমাস ও জ্যানেইস্কি যে বিভিন্ন ধরনের মানুষের উল্লেখ করেন, সেগুলি কি কি ?

বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নাবলী ঃ

'ক' স্তম্ভ ও 'খ' স্তম্ভ'র মধ্যে সঠিক যোগাযোগ স্থাপন করুন।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
গীতানো মস্কা	পরিস্থিতিগত দৃষ্টিভঙ্গী
রবার্ট মিশেলস্	রাজনৈতিক সূত্র
উইলিয়াম আইজ্যাক থমাস	সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি
কার্ল ম্যানহাইম	রাজনৈতিক সংগঠন
ফ্লোরিয়ান জ্যানেইস্কি	জ্ঞান সমাজতত্ত্ব

১০.১০ উত্তরমালা

অনুশীলনী ঃ ১

১) মস্কা সকল প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনসমষ্টি বা জনগণকে 'শাসক' ও 'শাসিত' এই দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন। সংখ্যালঘু, সংগঠিত, ক্ষমতাবান জনগোষ্ঠী যারা অসংগঠিত, সংখ্যাগুরু, ক্ষমতাহীন জনসাধারণের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব ছলে, বলে, কৌশলে কায়েম করে, মস্কা তাদেরকেই শাসক শ্রেণী হিসেবে অভিহিত করেছেন।

(২) নিরস্ত্রীকরণের যে স্বপ্ন উদারনৈতিক দার্শনিকেরা দেখেন, মস্কার কাছে তা' নিরর্থক, অনৈতিহাসিক। তাঁর মতে, সামাজিক অত্যাচারী (military tyranny) শাসনই মানব সমাজের ক্ষেত্রে চিরন্তন। অস্ত্র সজ্জিত সেনাবাহিনী আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও অপরিহার্য।

(৩) ভুল।

অনুশীলনী ঃ ২

(১) গোষ্ঠীতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়ে এবং অনুগামীদের দক্ষতার অভাব ও আবেগপ্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে গণতান্ত্রিক সংগঠনে নেতা তার ক্ষমতা বজায় রাখে বলে মিশেলস্ মনে করেন।

(২) মিশেলস্ এর ভাষায় গণতান্ত্রিক সংগঠন এমন একটি সংগঠন যা "নির্বাচিতকে নির্বাচকমণ্ডলীর উপর এবং প্রতিনিধিগণকে প্রতিনিধি প্রেরকদের উপর আধিপত্য প্রদান করে। সংগঠন মানেই গোষ্ঠীতন্ত্র"— সংখ্যাগুরুর উপর সংখ্যালঘুর শাসন, আধিপত্য। " গোষ্ঠীতন্ত্রের লৌহ আইন" তত্ত্বের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় এইটিই।

অনুশীলনী ঃ ৩

(ক) পরিপ্রেক্ষিতের ; (খ) সংরক্ষণশীল ; (গ) বিষয়ানুগতা।

অনুশীলনী ঃ ৪

(১) থমাস বর্ণিত চারটি ইচ্ছা নিম্নরূপ ঃ-

১। নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের ইচ্ছা, ২। কর্তৃত্ব করার ইচ্ছা, ৩। স্বীকৃতিলাভের ইচ্ছা ; ও ৪। নিরাপত্তালাভের ইচ্ছা।

(২) থমাসের মতে, আধুনিক সমাজ এক দ্রুত ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং এই পরিবর্তনের ধাক্কায় ভেঙে যাচ্ছে পুরোন সমাজের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যেকার পারস্পরিক নির্ভরশীলতাজনিত স্থায়িত্ব। আধুনিক সমাজের বিশৃঙ্খলার মূল কারণ এইটিই।

অনুশীলনী ঃ ৫

(১) প্রথমত, সমাজতত্ত্ব কোনও সাধারণ সমাজবিজ্ঞান নয়, একটি বিশেষ সমাজবিজ্ঞান এবং এর একটি

একক ১১ ❐ আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকদের অবদান

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য

১১.২ প্রস্তাবনা

১১.৩ ট্যালকট পারসন্‌স্‌

১১.৩.১সামাজিক বিন্যাস

১১.৩.২ সামাজিক বিবর্তন

১১.৪ রবার্ট কে মার্টন

১১.৪.১ কাঠামো উপযোগীতাবাদ

১১.৫ সি. রাইট মিল্‌স্‌

১১.৫.১ নব সমাজতত্ত্ব

১১.৫.২ ক্ষমতাবান এলিট

১১.৫.৩ সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা

১১.৬ সারাংশ

১১.৭ অনুশীলনী

১১.৮ উত্তরমালা

১১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকদের অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন। সুনির্দ্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- ট্যালকট পারসন্‌স (Talcott Persons) -এর সামাজিক বিন্যাস ও সামাজিক বিবর্তন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রবার্ট মার্টন এর (Robert Merton)-কাঠামো উপযোগীতাবাদ সম্পর্কে জানতে পারবেন ও কাঠামো উপযোগীতাবাদী তত্ত্বের সাহায্যে আপনার চারিদিকে ঘটমান সামাজিক বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- সি. রাইট মিল্‌স্‌ (C. Wright Mills)-এর নব সমাজতত্ত্ব, ক্ষমতাবান এলিট ও সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার ধারণাগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১১.২ প্রস্তাবনা

এই এককে আমরা বিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক চর্চিত ও জনপ্রিয় তিনজন সমাজতাত্ত্বিকের অবদান নিয়ে আলোচনা করবো।

প্রথমত, ট্যালকট পারসনস্ ঃ আধুনিক কাঠামো-উপযোগীতাবাদী তত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক ট্যালকট পারসন্স্ কিভাবে তাঁর সামাজিক বিন্যাস ও সামাজিক বিবর্তন তত্ত্বের মধ্য দিয়ে কাঠামো-উপযোগীতাবাদী তাত্ত্বিক আলোচনাকে এক নতুন দিশা দেখিয়েছেন-এখানে তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হবে কর্তার বিবিধ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা পরিবর্তনশীল ধরনের ধারণাটিও।

পরবর্তী সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট কে মার্টন ঃ তুলনায় অধিকতর আধুনিক ও বাস্তবমুখী মার্টন বহুক্ষেত্রেই পারসন্স্কে অতিক্রম করে গেছেন কাঠামো উপযোগীতাবাদী তত্ত্বের প্রায়োগিক দিকটির বিচারে। এই এককে মার্টনের মধ্যমান তত্ত্ব, ক্রিয়া, অপক্রিয়া, অনক্রিয়া, প্রকট ও প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া (ক্রিয়া ও উপযোগীতা একই অর্থে) সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। পাশাপাশি প্রাসঙ্গিকভাবেই আমরা বুঝবার চেষ্টা করবো বিধিশূন্যতার তত্ত্বের মধ্যে মার্টনের ক্রিয়াবাদী বা উপযোগীতাবাদী তত্ত্বের সফল প্রয়োগের বিষয়টিও।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বিতর্কিত (সম্ভবত অধিকতম আলোচিত) সমাজতাত্ত্বিক সি. রাইট মিলস্ এর অবদান বর্তমান এককে আমাদের শেষ আলোচ্য বিষয়। নব সমাজতত্ত্ব, ক্ষমতাবান এলিটের পাশাপাশি মিলস্ এর খ্যাতি মূলত তাঁর সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা তত্ত্বের মৌলিকতায়। মানবতাবাদী সমাজতত্ত্বের একজন পথিকৃৎ ছিলেন তিনি। এই এককে স্বল্পায়ু এই সমাজতাত্ত্বিকের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে বিস্তৃত অবদান সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবার চেষ্টা করবো।

১১.৩ ট্যালকট পারসন্স্ (Talcott Parsons) (১৯০২-১৯৭৯) ঃ

বিংশ শতাব্দীর সম্ভবত সর্বাধিক আলোচিত আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক ট্যালকট পারসনস্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন ও জার্মানীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। আধুনিক সমাজ, সংস্কৃতি ও মানব বিবর্তন বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করবার প্রয়োজনে সমাজতত্ত্বে তিনি একটি নতুন তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। এটি হ'ল ক্রিয়বাদী তত্ত্ব (action theory)। এই তত্ত্ব রচনায় তিনি এমিল ডুর্কহাইম (Emile Durkheim), ম্যাক্স হ্বেবার (Max Weber) ও সিগমণ্ড ফ্রয়েডের (Sigmond Freud) দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন আধুনিক কাঠামো-উপযোগীতাবাদী (structural functionalist) সমাজতাত্ত্বিক। প্রধানত এই উপযোগীতাবাদী চিন্তাভাবনার কারণেই শুধু সমাজতত্ত্ব নয়, সমগ্র সমাজবিজ্ঞানেই পারসন্স্ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছেন। আবার একই সঙ্গে এই উপযোগীতাবাদই তাঁর সবচেয়ে বিতর্কিত অবদান এবং তাঁর বিরুদ্ধে বহু সমালোচনার লক্ষ্য। সমাজতত্ত্বে প্রথিতযশা এই সমাজতাত্ত্বিকের মূল অবদানগুলি সংক্ষেপে নীচে আলোচনা করা হ'ল।

১১.৩.১ সামাজিক বিন্যাস (Social System)

সামাজিক বিন্যাসের আলোচনা পারসন্স্ শুরু করেন ক্রিয়া (action) ধারণাটি বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে।

মানুষের সব ধরনের ব্যবহার, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত, সচেতন বা অসচেতন যাই হোক না কেন, পারসন্স্-এর মতে ক্রিয়া তাকেই বলে। শুধুমাত্র দৃশ্যমান ব্যবহারই নয়, চিন্তাভাবনা, অনুভব বা আশা-আকাঙ্খার মতো বিমূর্ত বিষয়গুলিও ক্রিয়া হিসেবে পরিগণিত হয়।

তাঁর মতে, মানব-ক্রিয়ার একই সঙ্গে চারটি আলাদা প্রেক্ষাপট (context) রয়েছে। প্রথমত, জৈবিক প্রেক্ষাপট ঃ প্রাণীর শারীরবৃত্তিয় ও স্নায়ুতান্ত্রিক অস্তিত্ব ও তদ্‌জনিত বিবিধ প্রয়োজন বা চাহিদা। দ্বিতীয়ত, মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটঃ ব্যক্তিত্বের প্রেক্ষাপট, মনস্তাত্ত্বিক অধ্যয়নের বিষয়। তৃতীয়ত, সামাজিক প্রেক্ষাপটঃ কর্তা (actor) ও গোষ্ঠীর মধ্যে বা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া, সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নের বিষয়। চতুর্থত, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটঃ-আদর্শ (norms), ব্যবহারের ধরন, মূল্যবোধ, মতাদর্শ, জ্ঞান প্রভৃতি, নৃতত্ত্ববিদ্যার অধ্যয়নের বিষয়।

মূর্ত ক্রিয়া সততই সর্বাঙ্গীন (concrete action is always total)- এর অর্থ তার ঐ চারটি প্রেক্ষাপটই বর্তমান থাকে। শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের স্বার্থেই ঐ চারটি প্রেক্ষাপটকে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়।

সামাজিক বিন্যাসের কাঠামো ঃ পারসন্স্কে কাঠামো-উপযোগীতাবাদ (structural functional theory) তত্ত্বের মুখ্য ব্যক্তিত্ব বলে মনে করা হয় তার কারণ সামাজিক সংগঠন ও সামাজিক বিন্যাসের বিশদ ব্যাখ্যা তিনি কাঠামো (structure) ও তার উপযোগিতা (function)- এই দুইটি ধারণার সাহায্যে করেছিলেন। তাঁর মতে, আদর্শ সংস্কৃতির (normative culture) প্রাতিষ্ঠানিক ধরনকে কাঠামো বলে। অন্য ভাবে বলা যায়। প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ (institutionalization) প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় কাঠামো। পারসন্স্ কাঠামোর স্থায়িত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তুলনামূলক অধিকতর স্থায়ী এই কাঠামোর চারটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এইগুলি নিম্নরূপঃ

১। **ভূমিকা (Roles)** ঃ বিবিধ গোষ্ঠীতে (collectivity) ব্যক্তির সদস্যপদ ও অংশগ্রহণের ধরন (উদাহরণ ঃ পিতা, শিক্ষক ইত্যাদির ভূমিকা)

২। **গোষ্ঠী (Collectivities)** ঃ কোনও একটি বিশেষ ভূমিকা বা মূল্যবোধ বা মতাদর্শকে কেন্দ্র করে কিছু ব্যক্তির সমষ্টিকে গোষ্ঠী বলে।

৩। **আদর্শ (Norms)** ঃ ব্যবহারের কিছু নির্দ্দিষ্ট ধরনকে নিয়ম বা আদর্শ বলে।

৪। **মূল্যবোধ (Values)** ঃ সমগ্র বিন্যাস বা ব্যবস্থাটির কাঙ্খিত লক্ষ্যকে নির্দ্দিষ্ট করে মূল্যবোধ।

প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়াটি কিছু মূর্ত বা বাস্তব সামগ্রিক কাঠামোর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সচল থাকে। এই সমস্ত বাস্তব (মূর্ত) সামগ্রিক কাঠামোকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলে। পরিবার ও আত্মীয়তা, অর্থনৈতিক কাঠামো, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও আইনী ব্যবস্থা সমূহকে এই ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হ'ল।

সামাজিক বিন্যাসের উপযোগীতাবাদী বিশ্লেষণঃ কোনও ব্যবস্থায় কাঠামোগত উপাদানগুলি যদি স্থায়ী চরিত্রের হয় তবে উপযোগীতার ধারণা বা তৎসংক্রান্ত উপাদানগুলি গতিশীল বা পরিবর্তনশীল চরিত্রের হয়ে থাকে। পারসন্স্-এর মতে, প্রত্যেক সমাজব্যবস্থাকে চারটি ক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যা বা উপযোগীতাবাদী সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। এইগুলি নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।

১। **প্রথমত, অভিযোজন (Adaptation)**ঃ কোনও ব্যবস্থাকে (system) সর্বদাই বাইরের পরিবেশ পরিস্থিতির

সঙ্গে মানিয়ে/খাপ খাইয়ে নিতে হয়। কোনও ব্যবস্থা যেমন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে পরিবর্তন করে নেয় তেমনি প্রয়োজনে পরিবেশকেও পরিবর্তিত করে।

২। **লক্ষ্য পূরণ (Goal attainment)** ঃ লক্ষ্য পূরণ বা উদ্দেশ্যসিদ্ধির অর্থ নামেতেই পরিস্কার। সমগ্র ব্যবস্থা বা তার বিবিধ অংশগুলির উদ্দেশ্য চরিতার্থ বা পূরণ করাই লক্ষ্য পূরণ।

৩। **ঐক্য বা সংহতি (integration)** ঃ ব্যবস্থাভুক্ত বিবিধ অংশাবলীর মধ্যে সমন্বয়সাধন করাই এই উপযোগীতার লক্ষ্য। এর ফলে বিবিধ অংশগুলির নিজেদের মধ্যে এবং অংশ ও সামগ্রিকের মধ্যে ঐক্য বা সংহতি গড়ে ওঠে।

৪। **আদর্শ রূপ রক্ষণাবেক্ষন (Pattern maintenance on Latency)** ঃ সমাজের মুখ্য মূল্যবোধের ধরন বা আদর্শ রূপকে রক্ষণাবেক্ষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সামাজিক কাঠামো হচ্ছে কোনও সমাজব্যবস্থার মূল ধরন, ফলত, এর রক্ষণাবেক্ষণ কোনও ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য কার্য বা উপযোগীতা। বিবিধ টানাপোড়েনের (tension) নিয়ন্ত্রণ এক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবস্থার আদর্শ রূপ রক্ষণাবেক্ষণে সহায়ক।

পারসন্‌স্‌ তাঁর সামাজিক বিন্যাস এর আলোচনায় কাঠামোগত উপাদান, বাস্তব সামগ্রিক কাঠামো (সামাজিক প্রতিষ্ঠান) ও উপযোগীতা/ক্রিয়াগত উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন।

১। মূল্যবোধ নামক কাঠামোগত উপাদানটি পরিবার, শিক্ষা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সমাজের মূল ধরন বা আদর্শ রূপ রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগীতা পূরণ করে।

২। আদর্শ বা নিয়ম নামক কাঠামোগত উপাদান আইন ব্যবস্থা সংক্রান্ত বাস্তব সামগ্রিক কাঠামো বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ঐক্য বা সংহতিমূলক কার্য সম্পন্ন করে।

৩। গোষ্ঠী নামক কাঠামোগত উপাদান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে লক্ষ্য পূরণ কার্য সম্পূর্ণ করে।

৪। ভূমিকা নামক কাঠামোগত উপাদান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান নামক বাস্তব কাঠামোর মাধ্যমে অভিযোজন বা খাপ খাইয়ে নেওয়ার কার্য সম্পন্ন করে।

এই সমন্বয় প্রচেষ্টার পাশাপাশি পারসন্‌স্‌ বিবিধ কাঠামোগত বা বাস্তব (মূর্ত) সামাজিক কাঠামোগত বা ক্রিয়াগত উপাদান সমূহকে পারস্পরিক সংযোগ ও নিয়ন্ত্রণের কৌশল বিদ্যা বা 'সংযোগ নিয়ন্ত্রণ বিদ্যা'র (cybernetics) আলোকে স্তরবিন্যস্ত করেন। এই স্তরবিন্যাস ব্যবস্থায় উচ্চস্তরে অবস্থানকারী উপাদানসমূহ তথ্যর (information) বিচারে অধিকতর শক্তিশালী কিন্তু কর্মশক্তির (energy) বিচারে দুর্বলতর। অপরদিকে, নিম্ন অবস্থানকারী উপাদানসমূহ তথ্যর বিচারে দুর্বলতর হ'লেও কর্মশক্তির বিচারে সবলতর। মানব ক্রিয়ার চারটি প্রেক্ষাপট, যথা-সাংস্কৃতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও জৈবিকের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট স্তরবিন্যাসে সর্বোচ্চ স্থান দখলকারী, অর্থাৎ তথ্যে সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও কর্মশক্তিতে দুর্বলতম। পরবর্তী প্রেক্ষাপটসমূহ, যথাক্রমে সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক ও জৈবিক, স্তরবিন্যাসে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান দখল করে। একই রকম স্তরবিন্যাস কাঠামোগত উপাদানসমূহের ক্ষেত্রে ও বর্তমান ক্ষেত্রে মূল্যবোধ, আদর্শ/নিয়ম, গোষ্ঠী ও ভূমিকাকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানাধিকারী বলা চলে। অনুরূপ স্তরবিন্যাস লক্ষ্যণীয় ক্রিয়া/উপযোগীতা সংক্রান্ত উপাদানসমূহের ক্ষেত্রেও। এক্ষেত্রে আদর্শ রূপ রক্ষণাবেক্ষণ সর্বোচ্চস্থান দখল করে ও ক্রমপর্যায়ে ঐক্য বা সংহতি লক্ষ্যপূরণ ও অভিযোজন স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান দখল করে।

সামাজিক বিন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে সামাজিক ক্রিয়া'র ব্যাখ্যায় পারসন্‌স্‌ কর্তার (actor) পাঁচ ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা বলেন। ক্রিয়ার ধরনের পাঁচটি পরিবর্তনশীল ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। প্রতিটি একটি যুগ্ম বাছাই (binary choice) যা প্রত্যেক সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা যায় এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে কর্তাকে এই পরস্পর বিপরীত ধর্মী যুগ্ম বাছাই-এর মধ্য থেকে একটাকে বেছে নিতে হয়। এই পাঁচ ধরনের যুগ্ম বাছাই থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে গেলে কর্তাকে সর্বমোট পাঁচ ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়তে হয়। এদেরকে পরিবর্তনশীল ধরন (Pattern variables) বলে। এই পাঁচটি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিম্নরূপঃ

১। আবেগ সর্বস্বতা বনাম আবেগহীনতা (affectivity versus affective neutrality) ঃ কর্তা কোনও সামাজিক বিষয়কে আবেগপূর্ণ বা আবেগহীন-কিভাবে দেখবে সেই দ্বন্দ্ব। যেমন, চিকিৎসক বোগীকে (রোগীর বাড়ির/নিজের লোকের মতো) আবেগ পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখবেন, না রোগীকে যথেষ্ট দূরত্বে রেখে আবেগহীন বা আবেগ-নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখবেন-সেই দ্বন্দ্ব।

২। সুনির্দিষ্টতা বনাম পরিব্যাপ্ততা (specificity versus diffuseness) ঃ সামাজিক কোনও বিষয়ের একটি ক্ষুদ্র (সুনির্দিষ্ট) অংশ অথবা সমগ্র অংশ (পরিব্যাপ্ত অংশ) থাকে। কর্তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কোন্‌ অংশের উপর সে অধিক গুরুত্ব দেবে-সেই বিষয়টি।

৩। সর্বজনীনতা/সর্বব্যাপীতা বনাম বিশেষতা বা স্বতন্ত্রতা (universalism versus particularism) ঃ সামাজিক বিষয়গুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করার সমস্যা-সামাজিক বিষয়গুলি কর্তা একটি সাধারণ সর্বজনীন মান-এর নিরিখে বিচার করতে পারে অথবা বিশেষ কোনও মান-এর নিরিখে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করতে পারে-কর্তার দ্বন্দ্ব এখানেই।

৪। আরোপ বনাম অর্জন (ascription versus achievement) ঃ সামাজিক বিষয়গুলিকে আরোপিত বা অর্জিত কি ধরনের বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিচার করা উচিত -সেই দ্বন্দ্ব।

৫। আত্ম বনাম গোষ্ঠী (self versus collectivity)ঃ নিজস্বার্থ না কি গোষ্ঠী স্বার্থ? কর্তা কোন্‌টিকে অধিকতর গুরুত্ব দেবে সেই দ্বন্দ্ব।

পারসন্‌স্‌-এর মতে, ক্রিয়া'র চারটি প্রেক্ষাপটের প্রতিটিতেই এই পরিবর্তনশীল ধরন (pattern variables) ধারণাটির প্রয়োগ করা চলে।

১১.৩.২ সামাজিক বিবর্তন (Evolution of Societies)

তাঁর প্রথম দিককার লেখায় পারসন্‌স্‌ প্রাচীন ও আধুনিক সমাজের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য নিরূপন করেছেন। পরবর্তীকালে সুসম্বদ্ধ উপায়ে তিনি সামাজিক-সাংস্কৃতিক (sociocultural) পরিবর্তনের প্রধান পর্যায়গুলি সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করেন। তিনি তিনটি প্রধান পর্যায়ের উল্লেখ করেন, যথা ঃ প্রাচীন (primitive), মধ্যবর্তী (intermediate) ও আধুনিক (modern)। এই তিনটি মুখ্য পর্যায় ছাড়াও কয়েকটি পরিবর্তনের পর্যায়, অর্থাৎ দু'টি মূল পর্যায়ের মধ্যে একটা অন্তবর্তী পর্যায়ও বিদ্যমান। ঊনবিংশ শতকের একরৈখিক বিবর্তনবাদীদের বিপরীতে পারসন্‌স্‌ আধুনিক সমাজের সাবালক আধুনিক সমাজের পূর্বে কোনও রকম প্রাক-বয়স্ক বৃদ্ধির দশার (pre-adult growth phase) অস্তিত্বের উল্লেখ করেন নি। বিবর্তনকে তিনি বরং মানব সভ্যতার সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বিকাশের একটি সাধারণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছিলেন। তাঁর মতে, কোনও জীবন্ত বা

সচল ব্যবস্থার (living system) অভিযোজনের বা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার বৃদ্ধিকেই ঐ ব্যবস্থার বিবর্তন বলে। বিবর্তনের ফলে বিভিন্ন অংশগুলি (কোন ব্যবস্থার) এমনভাবে পৃথক হয়ে পড়ে যে প্রতিটি অংশ আরো বেশী পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করতে পারে, অর্থাৎ প্রতিটি অংশের উপযোগীতা বেড়ে যায়। পারসন্‌স্‌-এর সমাজপরিবর্তনের তত্ত্বকে, অতএব বিবর্তনবাদী উপযোগীতাবাদ (evolutionary functionalism) বলা চলে।

পারসন্‌স্‌-এর ত্রিস্তর সূত্রে সামাজিক বিবর্তনের দু'টি মূল, কিছুটা জটিলতর পরিবর্তনের বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন। প্রথমত, প্রাচীন সমাজ থেকে মধ্যবর্তী সমাজে বিবর্তনের ক্ষেত্রে লিখনের (writing) সূচনা'র ভূমিকা। দ্বিতীয়ত, সর্বজনীন আইনব্যবস্থার উদ্ভবের পাশাপাশি ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে (ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে) আধুনিক সমাজের উদ্ভব। পারসন্‌স-এর মতে, আধুনিকীকরণ (modernization) সংক্রান্ত আলোচনায় শিল্প বিপ্লবকে বহু ক্ষেত্রেই প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে-বিশেষত এই প্রক্রিয়ার অর্থনৈতিক দিকটিকে। বরং সমগুরুত্বের তিনটি বিপ্লব এর ঘটনাকে আধুনিকীকরণের আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এগুলি হ'ল-গণতান্ত্রিক বিপ্লব, শিক্ষা বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লব। এই প্রতিটি বিপ্লবই, তাঁর মতে, পরস্পর নির্ভরশীল আধুনিকীকরণ জীবনের বস্তুগত মান উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যক্তি স্বাধীনতার অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটিয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে আধুনিকীকরণ অধিকাংশ মানুষকেই বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ করেছে, মানুষকে আরো উদ্বিগ্ন করেছে, নিত্য নতুন হতাশার সৃষ্টি করেছে। নৈতিকতার এক সংকট তৈরী হয়েছে আধুনিক সমাজে। প্রয়োজন নতুন ধরনের মানুষের, প্রয়োজন এক অভূতপর্ব নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কাঠামোর।

পারসন্‌স্‌-এর উপযোগীতাবাদ ও বিবর্তনবাদ বহু সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। রাল্‌ফ ডাহেরেনডর্ফ (Ralfp Dahrendorf), পিটিরিম সোরোকিন (P.Sorokin), আলভিন্‌ গুল্ডনার (Alvin Gouldner) প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকেরা পারসনস্‌ এর কঠোর সমালোচনা করেছেন। ডাহেরেনডর্ফের মতে, পারসন্‌স্‌-এর তত্ত্ব বড় বেশী বিমূর্ত (abstract) ও দর্শনতত্ত্ব ধর্মী বা পরম (Grand) তত্ত্ব। অধ্যাপক সোরোকিন এর মতে পারসন্‌স্‌-এর তত্ত্বের কোন দৃষ্টিবাদী ভিত্তি (empirical reference) নেই। গুল্ডনার এর মতে সামগ্রিকতাকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে পারসন্‌স্‌ ব্যক্তিকে অবহেলা করেছেন। অন্যান্য উপযোগীতাবাদীদের মতো তিনিও দ্বন্দ্ব, সংঘাত, আধিপত্য ইত্যাদি সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহকে অবহেলা করে ঐক্য, সংহতি ইত্যাদি বিষয়াদিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ ধরনের বহু সমালোচনা সত্ত্বেও পারসন্‌স্‌ যে আমেরিকান সমাজতত্ত্বে বিংশ শতকের সর্বাধিক প্রভাবশালী পথ প্রদর্শক, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

অনুশীলনী ঃ ১

১) পারসন্‌স্‌ এর মতে সামাজিক ক্রিয়ার চারটি প্রেক্ষাপট কি কি ?

.....

.....

.....

২) কিভাবে সামাজিক কাঠামো'র সৃষ্টি হয় ?

.....

.....

.....

১১.৪ রবার্ট কে মার্টন (Robert K Merton) (১৯১০-) ঃ

ট্যালকট পারসন্‌স্‌ ও পিটিরিম সোরোকিন এর ছাত্র রবার্ট কে মার্টন আধুনিক সমাজতত্ত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ নাম। কাঠামো-উপযোগীতাবাদী (structural functionalism) তত্ত্বে পারসনস্‌-এর নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হ'লেও বহুবিচারে মার্টনের অবদান অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছে। তত্ত্বগত দিক থেকে বিচার করলে পারসন্‌স্‌ ও মার্টনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু পার্থক্য রয়েছে। পারসন্‌স্‌ বিমূর্ত, পরম তত্ত্ব রচনা করে গেছেন ; যেখানে মার্টন তুলনামূলক মূর্ত, সুনির্দ্দিষ্ট মধ্য-মান তত্ত্বের (middle range theories) প্রবক্তা, অন্যদিকে মার্টনের মধ্যে পারসন্‌স্‌ এর মতো ঘোরতর মার্ক্সবাদ বিরোধিতা ও লক্ষ্য করা যায় না।

সমাজতত্ত্বে মার্টনের অবদান নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।

১১.৪.২ কাঠামো উপযোগীতাবাদ (Structural-Functionalism)

পারসন্‌স্‌-এর বিমূর্ত, পরম তত্ত্বকে তত্ত্ব না বলে বরং দার্শনিক বিন্যাস (Philosophical system) বলা উচিত বলে মনে করতেন মার্টন। সমাজতত্ত্বের এই ধরনের উচ্চমার্গী বিমূর্ত তত্ত্ব নিষ্ফলা। এর বিপরীতে নিম্নমার্গী দৃষ্টিবাদী (empirical) তত্ত্বও মার্টনের বিচারে ফলহীন। উচ্চ বা নিম্ন উভয়কেই বর্জন করে তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন এবং গড়ে তোলেন মধ্য-মান তত্ত্ব। যদি মধ্য-মান তত্ত্বও বিমূর্ত তথাপি তা' বাস্তব জগৎ বা দৃষ্টিবাদী জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত (পরম তত্ত্বের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য নয়), ফলে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী। মধ্য-মান তত্ত্বে তত্ত্ব (theory) ও গবেষণা (research) উভয়ের সহাবস্থান দেখা যায়।

নৃতত্ত্ববিদ ম্যালিনস্কি (B.Malinowski) বা র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (Radcliff Brown) এর মতো চিন্তাবিদেরা উপযোগীতাবাদী বিশ্লেষণের যে তিনটি মৌলিক নীতির কথা উল্লেখ করেছিলেন, মার্টন তার সমালোচনা করেন। প্রথমটি সমাজের উপযোগীতাবাদী বা ক্রিয়াবাদী ঐক্যের নীতি। এই নীতি অনুযায়ী সমাজের সমস্ত প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও অভ্যাসসমূহ সামগ্রিক অর্থে সামাজের পক্ষে এবং সমাজস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে উপযোগী বা কার্যকরী। এই নীতির মূল কথা-কোনও সামাজিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে ঐক্য বজায় থাকা আবশ্যিক। কিন্তু মার্টনের মত অনুযায়ী ক্ষুদ্র, সহজ, সরল প্রাচীন সমাজের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হ'লেও বৃহত্তর, জটিল, আধুনিক সমাজের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

দ্বিতীয় মৌলিক নীতি-সর্বজনীন (universal) উপযোগীতাবাদ। এই নীতি অনুযায়ী সকল প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির সমাজের পক্ষে উপকারী বা প্রয়োজনীয় ভূমিকা রয়েছে। মার্টনের মতে, এই নীতিও বাস্তব সম্মত নয়। সমস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোই সমাজের পক্ষে উপকারী ভূমিকা পালন করে না। বহু প্রথা, বিশ্বাস ও ধ্যান -ধারণা সমাজের পক্ষে উপকারী ভূমিকা পালন করে না। যেমন, পারমাণবিক অস্ত্র প্রসারের এই যুগে জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা সমাজের পক্ষে উপকার তো নয়ই, চরম ক্ষতিকরও হ'তে পারে।

অবশ্য প্রয়োজনীয়তা-তৃতীয় নীতি। সমাজের সকল প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বিষয়গুলি যেহেতু সমাজের পক্ষে উপকারী ভূমিকা রয়েছে অতএব সমাজের পক্ষে সেগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় । অন্য কোনও সামাজিক কাঠামো বা ক্রিয়া বর্তমানে বিরাজমান বা ক্রিয়ার তুলনায় অধিকতর কার্যকরী বা উপযোগী হ'তে পারে না। পারসন্স্-এর মতো মার্টনেরও এইখানেই আপত্তি। তাঁদের মতে, কোনও সমাজে বিভিন্ন রকম বিকল্প সামাজিক কাঠামো বা ক্রিয়ার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

উপরোক্ত মৌলিক নীতিগুলি (postulates) সমাজের অদৃষ্টিবাদী (nonempirical), বিমূর্ত তত্ত্ব কল্পনার ফল-বাস্তবসম্মত নয়-মার্টনের মুখ্য বক্তব্য ছিল এটাই। তাঁর মতে, তত্ত্বকে সর্বদাই দৃষ্টিবাদের কষ্টিপাথরে যাচাই করা উচিত।

মার্টনের মতে, ক্রিয়া বা উপযোগীতা (function) হ'ল সেই সমস্ত পরিলক্ষিত (observed consequences) ফলাফলসমূহ যেগুলি কোনও একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার অভিযোজন বা মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক (those observed consequences which make for the adaptation on adjustment of a given system)। কিন্তু কেবলমাত্র এই মানিয়ে নেওয়া বা অভিযোজনের বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদানের মধ্যে এক ধরনের মতাদর্শগত ঝোঁক (ideological bias) কাজ করে-যেন এগুলি সমাজের পক্ষে কাঙ্খিত। তবে মনে রাখা দরকার যে, কোনও একটি সামাজিক ঘটনা অপর কোনও সামাজিক ঘটনার পক্ষে ক্ষতিকারক প্রভাবও বিস্তার করতে পারে। কিন্তু কাঠামো-উপযোগীতাবাদী তত্ত্বের ইতিহাসের প্রথম দিকে এই বিষয়টি সম্পর্কে কোনও সচেতনতা ছিল না। এই অভাব পূরণের লক্ষ্যে মার্টন অপক্রিয়া (dysfunction)-র ধারণা গড়ে তোলেন। বিবিধ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সমূহ যেমন একে অপরের অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্টা থাকে তেমনি অনেক সময়ক্ষতিকারক প্রভাবও বিস্তার করে, ক্রিয়া'র পাশাপাশি অপক্রিয়ামূলক ভূমিকা বিরাজ করে। ক্রিয়া, অপক্রিয়া ছাড়াও মার্টন অনক্রিয়া'র (nonfunction) ধারণাও প্রবর্তন করেন। সেই সকল ক্রিয়া, যেগুলি কোন ব্যবস্থার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় বা গুরুত্বহীন, ভালোমন্দ কোনও প্রভাবই বিস্তার করে না সেগুলিকেই অনক্রিয়া বলা চলে। অনক্রিয়া'র কথা বাদ দিলে প্রশ্ন ওঠে ক্রিয়া ও অপক্রিয়া'র মধ্যে কোনটির পাল্লা ভারী ? উত্তর হিসাবে মার্টন মোদ্দা ভারসাম্য (net balance) এর ধারণা প্রচলন করেন। তবে প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, সমাজের বিভিন্ন অংশের ক্রিয়া, অপক্রিয়ার যোগ-বিয়োগ এর মাধ্যমে মোদ্দা ভারসাম্য নির্ণয় করার প্রচেষ্টা'র মধ্যে এক ধরনের অতি সরলীকরণের সমস্যা থেকে যায়।

এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে মার্টন "উপযোগীতাবাদী বিশ্লেষণের বিভিন্ন স্তর" (levels of functional analysis)- এর কথা বলেন। উপযোগীতাবাদী বা ক্রিয়াবাদীরা মূলত সামগ্রিক সমাজের প্রেক্ষাপটে তাঁদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন। কিন্তু মার্টনের মতে, বিভিন্ন স্তরে এই আলোচনা ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। কোনও সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠী- যে কোনটিই আলোচনার একক হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। সামগ্রিকতার পরিবর্তে কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ক্ষুদ্রতর কোনও বিষয় ও আলোচনার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হ'তে পারে।

উপযোগীতাবাদী আলোচনায় মার্টনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান প্রকট (manifest) ও প্রচ্ছন্ন (latent) ক্রিয়া বা উপযোগীতা'র ধারণা। সংক্ষেপে, কাঙ্খিত ফলাফলগুলিকে প্রকট উপযোগীতা ও অনাকাঙ্খিত ফলাফলগুলিকে প্রচ্ছন্ন উপযোগীতা বলে। ক্রিয়ার কাঙ্খিত ফলাফলের বিষয়ে প্রত্যেকে অবগত থাকলেও সমাজতাত্ত্বিকের কাজ অনাকাঙ্খিত ফলাফলকে গবেষণার মূল লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা। পিটার বার্জার (Peter L. Berger) একেই ভ্রান্তি মুক্তি (debunking) বলেছেন।

মার্টনের মতে, কোনও একটি বিষয় সামগ্রিক ব্যবস্থার বিচারে অপক্রিয়াশীল (dysfunctional) হলেও ব্যবস্থার অন্তর্গত কোনও একটি অংশের বিচারে ক্রিয়াশীল (functional) হ'তে পারে। তাঁর মতে, সামাজিক কাঠামোর সকল বিষয়ই সামাজিক ব্যবস্থার জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় নয়। আমাদের সমাজব্যবস্থার ক্ষতিকর কিছু অংশকে বিলুপ্ত করে দেওয়া যায়। মার্টনের এই ধরনের মতামত ক্রিয়াবাদী তত্ত্বকে তার রক্ষণশীলতা-দোষ থেকে মুক্ত করেছে ও সমাজ পরিবর্তনের দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

মার্টনের ক্রিয়াবাদী বা উপযোগীতাবাদী তত্ত্বের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ তাঁর " সামাজিক কাঠামো বিধিশূন্যতা (social structure and Anomie) তত্ত্ব। বিচ্যুত ব্যবহারের (deviant behaviour) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসের অনুসন্ধানও বিশ্লেষণ, এই তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য। কিভাবে সামাজিক কাঠামোর চাপে সমাজে কিছু মানুষ মান্যতাকারী (confermise) না হয়ে অমান্যকারী (non confermist) হয়ে ওঠে তার অনুধাবনই ছিল এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য। এই তত্ত্বে উদ্দেশ্য (goal) ও মাধ্যম (means) এই দু'টি ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো সমাজে কিছু উদ্দেশ্যকে ও সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার উপায় বা মাধ্যম বা পথকে বিধিসম্মত বা গ্রহণযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করে। উদ্দেশ্য ও পথের উপর নির্ভর করে পাঁচ ধরনের পরিস্থিতি বা পাঁচ রকমের অভিযোজন ঘটতে পারে। একটি স্থায়ী বা স্থিতিশীল সমাজে অধিকাংশ মানুষই উদ্দেশ্য ও পথ দু'টিকেই মেনে চলে। একে মান্যতার (confermity) পরিস্থিতি বলে। কিন্তু এমন কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন মানুষ উদ্দেশ্যগুলি চরিতার্থ করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত পথ বা প্রাতিষ্ঠানিক উপায়গুলিকে গ্রহণ করতে পারে ন। অর্থাৎ, উদ্দেশ্যগুলি চরিতার্থ করবার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উপায় বা পথের বদলে নতুন নতুন পথের আবিষ্কার করে। সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় পরিস্থিতির নবপ্রবর্তনের (innovation) পরিস্থিতির। তৃতীয় অভিযোজনের পরিস্থিতির নাম আচারপরায়ণতা (ritualism)। এক্ষেত্রে মানুষ প্রতিষ্ঠিত উদ্দেশ্যগুলির পরিবর্তে নতুনতর উদ্দেশ্য গ্রহণ করলেও প্রাতিষ্ঠানিক উপায়গুলিকে মেনে চলে। একই পথে বা উপায়ে কোনও কাজ করে চলাই আচারপরায়ণতা। চতুর্থত, পশ্চাৎ-অপসারণ (retreatism), যখন সমাজের মূল সর্বজনকাঙ্খিত উদ্দেশ্যগুলি বা সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যপূরণের উপায়গুলি, কোনটিই গ্রহণযোগ্য হয় না তখন মানুষ পালিয়ে বাঁচে বা পশ্চাৎ অপসারণ (retreatism) করে। ভবঘুরে, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি, মাদকাসক্ত ব্যক্তি এমনকি শিল্পীদের মধ্যেও এই ধরনের অভিযোজন দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজের লক্ষ্য বা পথ দু'টিকেই বর্জন করে তার পরিবর্তে নতুন লক্ষ্য ও নতুন পথের দিশা দেখানো সম্পূর্ণ নতুন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে-বিদ্রোহ বা বিপ্লবের (rebellion) পরিস্থিতির।

মার্টনের মতে, নিয়মহীনতা বা বিধিশূন্যতার (anomie) পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে তখনই যখন মানুষ প্রতিষ্ঠিত সামাজিক উদ্দেশ্যগুলি অর্জনে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ সামাজিক কাঠামোর একটি নির্দিষ্ট অবস্থান বিরাজ করার সুবাদেই কিছু মানুষ সামাজিক নিয়ম বা আদর্শ মেনে চলতে পারে না। ফলত, বিধিশূন্যতার মত অপক্রিয়া'র উদ্ভব ঘটে। এ প্রসঙ্গে মার্টনের মতামত সামাজিক স্তরবিন্যাস (stratification) তত্ত্বের বিরোধী। অন্যান্য উপযোগীতাবাদী তাত্ত্বিকদের তুলনায় মার্টনের প্রভেদ এখানেই যে, তিনি তাদের বিপরীতে সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যবস্থার সমালোচনা করেছিলেন।

অধ্যাপক গাই রচারের (Guy Rocher) মতে, মার্টন উপযোগীতাবাদের একজন মুখ্য সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ক্রিয়া বা উপযোগীতার একটি দৃষ্টিবাদী ও কার্যকরী ধারণা প্রদান করেছেন এবং এর মাধ্যমে উপযোগীতাবাদী তত্ত্বের এক নমনীয় রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। রচার ম্যালিনস্কির পরম (absolute)

উপযোগীতাবাদের বিপরীতে মার্টনের এই নমনীয় উপযোগীতাবাদী তত্ত্বকে আপেক্ষিক (relative) উপযোগীতাবাদ নামে অভিহিত করেছেন। আধুনিক ক্রিয়াবাদী (উপযোগীতাবাদী) তাত্ত্বিকদের অধিকাংশের মধ্যে মার্টনের এই আপেক্ষিক ক্রিয়াবাদের প্রভাবই অধিকতর লক্ষ্যণীয়। এই কারণেই উপযোগীতাবাদের সমর্থক ও বিরোধী উভয় পক্ষই উপযোগীতাবাদের আলোচনায় মার্টনের তত্ত্বকেই উক্ত তত্ত্বের মূল প্রতিনিধিত্বকারী বলে গণ্য করে।

অনুশীলনী ঃ ২

১) ট্যালকট পারসন্‌স্‌ ও রবার্টকে মার্টনের মধ্যে তত্ত্বগত দিক থেকে বিচার করলে কি কি মূল পার্থক্য রয়েছে বলে আপনি মনে করেন ?

.....

.....

.....

২) মার্টনের মতে ক্রিয়া, অপক্রিয়া ও অনক্রিয়া ধারণাগুলির অর্থ নিরূপণ করুন।

.....

.....

.....

.....

৩) বিধিশূন্যতা তত্ত্বে বিবিধ অভিযোজনের রূপগুলি কি কি ?

.....

.....

১১.৫ সি. রাইট মিল্‌স্‌ (C. Wright Mills) (১৯১৬- ১৯৬২) ঃ

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে অন্যতম বিতর্কিত সমাজতাত্ত্বিক চার্লস রাইট মিল্‌স্‌ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। প্রতিষ্ঠান বিরোধী, ক্ষণজন্মা এই সমাজতাত্ত্বিক খুব স্বাভাবিকভাবেই বহুল পঠিত এবং সমাজতত্ত্বে তাঁর অবদান সমসাময়িক বহু সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে যেমন প্রশংসাই তেমনি সমালোচিতও বটে। তিনি আধুনিক সমাজের একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন-যুক্তিহীন যৌক্তিকতা'র (rationality without reason) প্রবণতা। অর্থাৎ, মূলত অর্থহীন, অযৌক্তিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যৌক্তিক বা যুক্তিভিত্তিক পথ অবলম্বন করবার প্রবণতা। তিনি বর্তমান সময়কে আধুনিক থেকে উত্তর আধুনিক (post modern) পর্যায়ে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় একটি মধ্যবর্তী স্তর হিসেবে গণ্য করেছেন। সুদূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি আশাবাদী হ'লেও আশু ভবিষ্যতের ব্যাপারে তিনি কিছুটা হতাশাবাদী ছিলেন। আধুনিক পশ্চিমী সমাজে, বিশেষত আমেরিকান সমাজে, এক "নৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য" (moral uneasiness) লক্ষ্য করেছেন।

বর্তমান সময়ের মূল সমস্যাটা হ'ল এই যে, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মতো যুক্তিবাদ (rationalism) এখন আর স্বাধীনতার জন্ম দিতে পারে না। তাঁর এই ধারণা বর্তমান পশ্চিমী দুনিয়ার প্রচলিত দু'টি মূল দার্শনিক ধারার কোনওটির সঙ্গেও মেলে না। প্রচলিত দু'টি দার্শনিক ধারাকেই (উদারনীতিবাদ ও মার্ক্সবাদ) তিনি সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, উদারনীতিবাদ বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রাসঙ্গিক ও মার্ক্সবাদ বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণে যথেষ্ট নয়।

বর্তমান সমাজে স্বাধীন বুদ্ধিজীবিদের পরাজয়, মিল্‌স্‌-এর কাছে খুবই দুঃখজনক ছিল। অথচ বুদ্ধিজীবিরা এই সমাজে যথেষ্টই ক্ষমতাবান। বর্তমান সমাজের শ্রেষ্ঠ অংশ (এলিট, elite) ও সর্বসাধারণ (mass)- এই দু'টি অংশের ক্ষমতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্যের ধারণার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বুদ্ধিজীবিদের পরাজয়ের ব্যাপারে মিল্‌স্‌-এর যাবতীয় দুশ্চিন্তা। এলিট ও জনসাধারণ প্রসঙ্গে মিল্‌স্‌ বলেন, এটা ঠিক যে, মানুষ নিজেই তার ইতিহাস গড়ে। কিন্তু এও ঠিক যে, সব মানুষ এই ইতিহাস গড়ার ব্যাপারে সমান স্বাধীনতা পায় না। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, এলিটরা এ ব্যাপারে জনসাধারণের তুলনায় অধিকতর স্বাধীনতা পেয়ে থাকে। এলিটদের মধ্যে রয়েছে তুলনামূলকভাবে মুক্ত স্বাধীন বুদ্ধিজীবিরা ; যদি তারা নৈতিক নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয় তবে অন্যরাও স্বাভাবিক ভাবে ব্যর্থ হবে। মিল্‌স্‌ এর মতে, আধুনিক সমাজে ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটে চলেছে।

পরাজয় বা ব্যর্থতার এই কারণ নিহিত রয়েছে সমাজবিজ্ঞানীরা যে সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন সেই চিন্তা-ভাবনার তত্ত্বগত ও পদ্ধতিগত দুর্বলতায়। সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক দুর্বলতার তুলনায় পদ্ধতিগত দুর্বলতাই তাঁকে অধিকতর দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। মিল্‌স্‌ দৃষ্টিবাদী গবেষণার বিরোধী ছিলেন না, বরং তিনি নিজে বহু দৃষ্টিবাদী গবেষণার কাজ করে গেছেন। কিন্তু বিমূর্ত দৃষ্টিবাদে (abstracted empiricism) তাঁর আপত্তি ছিল।

মিল্‌স্‌ বৃহত্তর-সমাজতাত্ত্বিক (macrosociological) আলোচনায় কার্ল মার্ক্স ও ম্যাক্স হ্বেবারের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং ক্ষুদ্রতর-সমাজতাত্ত্বিক (microsocialogical) আলোচনায় বা সমাজমনস্তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ সিগমন্ড ফ্রয়েড (Sigmund freud) ও সমাজমনস্তাত্ত্বিক জর্জ হার্বার্ট মীড-এর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন. এই দুই এর মধ্যে মূলত মার্ক্স হ্বেবার কৃত মার্ক্সের মতবাদের দু'টি মূল পরিমার্জনকে গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমত, হ্বেবার মার্ক্সের অর্থনৈতিক-নির্ধারণতার (econimic determinism) বদলে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত সামাজিক নির্ধারণতার কথা বলেন ও দ্বিতীয়ত, হ্বেবার সামাজিক অবস্থান (status) ও মর্যাদার (prestige) অন্তভুর্ক্তির মধ্য দিয়ে মার্ক্স প্রদত্ত শ্রেণী-ধারণার সংস্কার সাধন করেন।

সমাজতত্ত্বে মিল্‌স্‌-এর নানাবিধ অবদান রয়েছে। এখানে মূলত তিনটি মুখ্য অবদানকে সংক্ষেপে উপস্থাপনা করার চেষ্টা করা হ'ল।

১১.৫.১ নব সমাজতত্ত্ব (New sociology)

সমসাময়িক সমাজতত্ত্বের মূলস্রোতের (mainstream) সীমাবদ্ধতা মিল্‌স্‌কে মানবতাবাদী সমাজতত্ত্বের (humanistic sociology) বিষয়ে উৎসাহিত করে তোলে। মূল স্রোতের সমাজতাত্ত্বিকদের বক্তব্য অনুযায়ী সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য হ'ল সমাজ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান অর্জন করা। নব সমাজতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য হ'ল

সামাজিক সমস্যার সঠিক অনুধাবন ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এর প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের কাজ করা। মিল্‌স্ সমসাময়িক সমাজতাত্ত্বিকদের (মূলত পেশাদারী সমাজতাত্ত্বিকদের) সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে, তাঁরা তাঁদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মূল্যবোধের ভূমিকাকে অবহেলা করেন। সমসাময়িক সমাজতাত্ত্বিক বা গবেষণার মূল সমস্যার সৃষ্টি হয় পৃষ্ঠপোষকের দিক থেকে। গবেষণার কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন সম্ভব নয়। ফলত বহু ক্ষেত্রেই পৃষ্ঠাপোষকের স্বার্থরক্ষার খাতিরে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ সামাজিক গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত হয় না। সমাজবিজ্ঞানে, অতএব, বাড়তে থাকে আমলাতান্ত্রিকতা। তিনি সমাজবিজ্ঞানীদের তাঁদের কাজের ভবিষ্যৎ ফলাফল বা প্রভাবের ব্যাপারে সচেতন থাকতে বলেন। পাশাপাশি তিনি তাঁদের "বৌদ্ধিক কারিগর" (intellectual craftsman) হয়ে উঠতে উৎসাহিত করেছেন। বড় বড় গবেষক দলের বিপরীতে তিনি ব্যক্তি বা ছোট ছোট গোষ্ঠীর উদ্যোগে গবেষণা কার্যকেই বেশী পছন্দ করতেন ; কারণ এক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা ও তজ্জনিত কোনও বাঁধা বা বিধিনিষেধ থাকে না ; ফলত, মুক্ত, স্বাধীন গবেষণা সম্ভব হয়।

১১.৫.২ ক্ষমতাবান এলিট (Power Elite)

মিল্‌স্-এর মতে, আমেরিকান সমাজে ক্ষমতা ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকার ও সামরিক সংগঠনগুলির শীর্ষ স্থানাধিকারী ব্যক্তিবর্গ বা এলিটদের মধ্যে বিরাজ করে। এই প্রতিটি ক্ষেত্রের এলিটরা সম্মিলিতভাবে ক্ষমতাবান এলিট সম্প্রদায় গঠন করে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি উপরোক্ত তিনটি এলিট সম্প্রদায়ের দ্বারা সম্মিলিত ভাবে গঠিত ক্ষমতাবান এলিটের অধীনস্থ থাকে। ক্ষমতাবান এলিটের উদ্ভব হয় প্রযুক্তি, আমলাতন্ত্রীকরন (bureaucratization) ও কেন্দ্রিকরণের (Centralization) দ্বারা। আধুনিক সমাজের ইতিহাস আসলে ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণেরই কাহিনী। ক্ষমতাবান এলিট সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসমূহের উপর নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার সুবাদে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে সক্ষম হয়। কোন ব্যক্তিগত গুণাবলীর কারণে নয়, সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় নিজেদের অবস্থানের কারণেই তারা ক্ষমতাবান। যেহেতু বর্তমান সমাজে কয়েকটি বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানের দখলেই যাবতীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে সেই কারণেই এই সকল প্রতিষ্ঠানের মুষ্টিমেয় কর্ণধারদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা বিরাজ করে। ক্ষমতাবান এলিটের বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে স্বার্থের সংঘাত হ'লেও এক সার্বিক ঐক্যের বাতাবরণে তারা ঐক্যবদ্ধ থাকে। এই ঐক্য দুটি কারণে বজায় থাকে বলে মিল্‌স্ মনে করেন। প্রথমত, তাদের একই ধরনের শ্রেণী অবস্থান, অর্থাৎ তারা সকলেই সমাজের উচ্চ শ্রেণীর সদস্য। ফলত, বিত্ত, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ-সমস্ত দিক থেকেই তাদের মধ্যে একটা মিল পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, তারা একই সভা-সমিতির সদস্য হওয়ার সুবাদে পারস্পরিক মেলামেশার মধ্য দিয়ে নিজেদের সাধারণ অনুভূতিকে (common feeling) টিকিয়ে রাখে।

মিল্‌স্-এর মতে, ক্ষমতাবান এলিটরা অনৈতিকতার দোষে দুষ্ট। ব্যক্তিগত দুর্নীতি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি নয়, প্রাতিষ্ঠানিক আমলাতন্ত্রের নৈতিক অসংবেদীতার (moral insensitivity) কারণেই তাদের মধ্যে অনৈতিকতা দোষ দেখা যায়। তাঁর মতে, ক্ষমতাবান এলিট সচেতন জনগণের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। সত্যিকারের গণতন্ত্র তখনই সম্ভব হবে যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মানুষেরা জ্ঞানী-গুণী জনের (men of knowledge) প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। সম্ভবত, জ্ঞানী-গুণীজন বলতে তিনি বুদ্ধিজীবিদের কথাই বলতে চেয়েছেন।

১১.৫.৩ সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা (Sociological Imagination)

বিবিধ ব্যক্তির অন্তর্গত (আভ্যন্তরীণ) ও বহির্গত জীবনের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা তার ধারককে (সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা প্রাণ ব্যক্তিকে) এই বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটিকে বুঝতে বা অনুধাবন করতে সাহায্য করে। মানুষ কিভাবে তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার গুরুভারে (Welter) নিজের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ভ্রান্ত চেতনার (false consciousness) শিকার হয়ে পড়ে, অর্থাৎ নিজের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করতে থাকে- তা বুঝতে সাহায্য করে সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা। মানুষ নিজেকে তার যুগের (সময়কাল) মধ্যে প্রোথিত করেই তার নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে বুঝতে পারে এবং তার ভবিষ্যৎকে অনুমান করতে পারে বা পরিমাপ করতে পারে। অর্থাৎ, কোনও ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিক অন্যান্য ব্যক্তিদের জীবন সম্পর্কে সচেতন হওয়ার মধ্য দিয়েই নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের সুযোগ (চাওয়া-পাওয়া life chances) সম্বন্ধে অনুধাবন করতে পারে। প্রতিটি ব্যক্তিই একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট সমাজে তার জীবন অতিবাহিত করে। শুধুমাত্র তার বেঁচে থাকার মধ্য দিয়েই বা জীবন কাঠানোর মধ্য দিয়ে সে ইতিহাস ও সমাজে, খুব সামান্য পরিমাণে হ'লেও, তার অবদান রেখে যায়, যদিও সে নিজেও ইতিহাস ও সমাজেরই ফসল। মিল্‌স্‌-এর মতে, সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা আমাদের ইতিহাস ও আত্মজীবনী বা জীবন-কথা (biography) ও উভয়ের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বুঝতে সাহায্য করে।

সমাজ প্রসঙ্গে চিন্তাভাবনা বা কল্পনা করতে গিয়ে সমাজতাত্ত্বিকেরা তিন ধরনের প্রশ্ন নিয়ে চর্চা করেন। প্রথমত, এই সমাজের (উক্ত সমাজের) কাঠামোটি কেমন? এর বিভিন্ন অংশগুলি কি কি? তারা কিভাবে পরস্পর সম্পর্কিত? দ্বিতীয়ত, মানব ইতিহাসে এই সমাজের স্থান কোথায়? কিভাবে এই সমাজ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে? সামগ্রিক মানবতার ইতিহাসে এই সমাজের স্থান কোথায়? ইতিহাসের পথ বেয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ে গড়ে উঠেছে এই সমাজ। এই সময়ের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলিই বা কি কি? অন্যান্য সময়ের সঙ্গে তার প্রভেদই বা কি? তৃতীয়ত, এই সময়ে ও এই সমাজে কি কি ধরনের পুরুষ ও মহিলা বিরাজমান? অন্যান্য কি কি ধরনের মানুষেরই বা আবির্ভাব ঘটতে চলেছে? বর্তমান সমাজের মানুষদের যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের চরিত্র ও বিভিন্ন রকমের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার দ্বারা মানব প্রকৃতি' (human nature) সম্বন্ধে কি ধরনের ধারনা করা যাচ্ছে?

আলোচ্য বিষয়বস্তু কোনও বৃহদাকার রাষ্ট্র বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্ষুদ্র সাহিত্যকর্ম, পরিবার বা কারাগার যাই হোক না কেন-দক্ষ সমাজ-বিশ্লেষক (সমাজতাত্ত্বিক) এই সমস্ত প্রশ্নরই উত্তর খোঁজেন। মিল্‌স্‌-এর মতে, কল্পনা আসলে চিন্তায় এক পরিপ্রেক্ষিত থেকে অন্য পরিপ্রেক্ষিতে যাওয়ার ক্ষমতা-রাজনৈতিক থেকে মনস্তাত্ত্বিক, একটি পরিবারের আয়-ব্যয়ের হিসেব থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আয়ব্যয়ক (budget), তৈল শিল্প থেকে আধুনিক কবিতা-এক পরিপ্রেক্ষিত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য এক পরিপ্রেক্ষিত।

সমাজতাত্ত্বিক কল্পনায় সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল ব্যক্তিগত 'অসুবিধা' (personal trouble) ও ব্যাষ্টিগত বা সমষ্টিগত 'সমস্যা'র (issue) মধ্যে পার্থক্যকরণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ব্যক্তির অসুবিধা (the personal troubles of milieu) ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে জনগণের সমস্যা (the public issues of social structure)। উদাহরণস্বরূপ বেকারত্বর কথা বলা যেতে পারে। এক কোটি মানুষের একটি মহানগরীতে যদি একজন লোক বেকার থাকে তবে সেটা তার ব্যক্তিগত 'অসুবিধা' এবং তার দূর করতে ঐ ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি নজর দেওয়া উচিৎ। কিন্তু ঐ এক কোটি মানুষের মধ্যে যদি ১০ লক্ষ লোক বেকার থাকে তবে তা' একটি 'সমস্যা'। সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই তার সমাধান অনুসন্ধান করতে হবে। বেকারত্বের উদাহরণ ছাড়াও মিল্‌স্‌ এ প্রসঙ্গে যুদ্ধ, বিবাহ, নগর সমাজ ইত্যাদির উদাহরণ দিয়েছেন।

মিল্‌স্‌-এর মতে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলিকে বুঝতে গেলে আমাদের আরও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে। পারিপার্শ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলি যে পরিমাণে আকার আয়তনে বাড়তে থাকে এবং নিজেদের মধ্যে জটিলতার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে থাকে সেই পরিমাণেই কাঠামোগত পরিবর্তনের বিভিন্নতাও বাড়তে থাকে। সামাজিক কাঠামোর ধারণা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সুচারুরূপে তা' ব্যবহার করার অর্থই হ'ল বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রের মধ্যেকার সম্পর্কগুলিকে সঠিকরূপে অনুধাবন করতে পারা। যে ব্যক্তি তা' করতে পারে সেই ব্যক্তিই সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার ধারক।

মিল্‌স্‌ সমাজতত্ত্বের আলোচনায় কারিগরী দক্ষতার তুলনায় সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি মানবতাবাদী ছিলেন সৎ ব্যক্তি ও বহু সৎ ব্যক্তির সমাহারে একটি সৎ সমাজ গড়ে তোলাই সমাজবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য বলে তিনি মনে করতেন। এবং তা' তখনই সম্ভব হবে যখন ব্যক্তিগত 'অসুবিধা' ও সমষ্টিগত 'সমস্যা'র সম্পর্ক নিরূপণ করা যাবে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত অসুবিধা কি ভাবে সমষ্টিগত সমস্যার সঙ্গে যুক্ত, তা বোঝা যাবে।

মার্ক্সবাদী তত্ত্বের বিরোধী মিল্‌স্‌ কিন্তু মার্ক্সবাদকে কর্মপন্থা (method of work) হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি হ্বেবার কৃত পরিমার্জিত মার্ক্সবাদকে গ্রহণ করলেও ধ্রুপদী উদারনৈতিক হ্বেবারের হতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি গ্রহণ করেছেন। আধুনিক আমেরিকান সমাজতত্ত্বের মূল্যবোধ-নিরপেক্ষতা আসলে একটি মতাদর্শগত মুখোশ। মূলত তিনি ছিলেন স্বপ্নকাল্পনিক (utopian) সমাজ সংস্কারক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার মধ্য দিয়েই ভাল (good) সমাজ গড়ে তোলা যায় এবং এখনও ভালো সমাজ না তৈরী করতে পারাটা আসলে জ্ঞানী মানুষদেরই ত্রুটি।

অনুশীলনী ঃ ৩

১) নব সমাজতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য কি বলে আপনি মনে করেন?

.....

.....

.....

২) ক্ষমতাবান এলিটের মুখ্য অংশীদার কারা?

.....

.....

.....

.....

৩) ব্যক্তিগত 'অসুবিধা' ও সমষ্টিগত 'সমস্যা'র প্রভেদের একটি উদাহরণ দিন।

.....

.....

১১.৬ সারাংশ

এই এককে আমরা বিংশ শতাব্দীর তিনজন প্রথিতযশা আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিকের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই তিনজনের মধ্যে ট্যালকট পারসন্‌স্ ও রবার্ট কে মার্টন আধুনিক কাঠামো-উপযোগীতাবাদী তত্ত্বের সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি হ'লেও তৃতীয়জন, অর্থাৎ সি. রাইট মিল্‌স্ এই ঘরানার চিন্তাবিদ নন। পারসন্‌স্-এর সামাজিক বিন্যাসের কাঠামোগত ও উপযোগীতা আলোচনার পাশাপাশি কর্তার পাঁচ ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা পরিবর্তনশীল ধরনের আলোচনাও করা হয়েছে। রক্ষণশীলতার দোষে অভিযুক্ত পারসন্‌স্ কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়েও তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

পারসন্‌স্-এর বিমূর্ত, অতিদার্শনিক পরম তত্ত্বের বিরুদ্ধে মার্টন মধ্যমান তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। তিনি প্রথম যুগের উপযোগীতাবাদী তাত্ত্বিকদের সমালোচনা করে ক্রিয়া, অপক্রিয়া, অনক্রিয়া, প্রকট ক্রিয়া ও প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া ইত্যাদি ধারণার প্রবর্তন করেন। বিধিশূন্যতার তত্ত্বের মধ্য দিয়ে তাঁর এই উপযোগীতাবাদী তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেন। সংক্ষিপ্ত অবসরে উপরোক্ত সমস্ত বিষয় এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

পারসন্‌স্-মার্টন-এর মূলস্রোতের সমাজতত্ত্বের বিরুদ্ধে মিল্‌স্ নব সমাজতত্ত্ব প্রণয়ন করেন। পাশাপাশি ক্ষমতাবান এলিট প্রসঙ্গে তঁকে পূর্ববর্তী এলিট তাত্ত্বিক মস্কা-মিশেলস্-প্যারেটোর এলিট তত্ত্বের কাছাকাছি নিয়ে আসে, যদিও মিল্‌স্-এর দৃষ্টিভঙ্গীর এলিট স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্যণীয় যখন তিনি ক্ষমতাবান এলিটদের অনৈতিকতার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন। আধুনিক সমাজে বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকায় মিল্‌স্ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি তাঁদের যান্ত্রিকতা বর্জন করে সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে আহ্বান জানান। নব সমাজতত্ত্ব ক্ষমতাবান এলিট তত্ত্বের পাশাপাশি মিল্‌স্-এর সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার আলোচনাও করা হয়েছে এই এককে।

১১.৭ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ

১) ট্যালকট পারসন্‌স্-এর সামাজিকবিন্যাস তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।

২) রবার্ট কে. মার্টন-এর মধ্য-মান তত্ত্বটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

৩) সি. রাইট মিল্‌স্-এর সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা ধারণাটি বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১) ট্যালকট পারসন্‌স্-এর পরিবর্তনশীল ধরন পাঁচটির উল্লেখ করুন।

২) পারসন্‌স্-এর কাঠামো উপযোগিতাবাদী তত্ত্ব কি ভাবে সমালোচিত হয়েছে? সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৩) প্রচলিত কাঠামো-উপযোগীতাবাদী তত্ত্বের মার্টন কি কি সমালোচনা করেছেন? সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

৪) সি. রাইট মিল্‌স্-এর মতে ক্ষমতাবান এলিট-এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্য বজায় থাকার মূল কারণগুলি কি কি?

বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নাবলী ঃ

শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

ক) ড্যাহেরেনডর্ফ এর মতে পারসন্‌স্‌-এর তত্ত্ব বড় বেশী———— (মূর্ত/বিমূর্ত)

খ) গোষ্ঠী নামক কাঠামোগত উপাদান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে———— কার্য সম্পূর্ণ করে। (লক্ষ্যপূরণ/অভিযোজন)

গ) সমাজতাত্ত্বিকের কাছে ———— কে গবেষণার মূল লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। (প্রকট ক্রিয়া/প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া)

ঘ) সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে ———— দুর্বলতাই সি. রাইট মিল্‌স্‌-এর কাছে অধিকতর উদ্বেগজনক ছিল। (তত্ত্বগত / পদ্ধতিগত)।

১১.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী ঃ ১

(১) জৈবিক প্রেক্ষাপট, মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট, সামাজিক প্রেক্ষাপট ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট।

(২) পারসন্‌স্‌-এর মতে, প্রাতিষ্ঠানিকীরণ (institutionalization) ফলে সৃষ্টি হয় সামাজিক কাঠামোর।

অনুশীলনী ঃ ২

(১) পারসন্‌স্‌ বিমূর্ত, পরম তত্ত্ব রচনা করেছেন, যেখানে মার্টন তুলনামূলক মূর্ত, সুনির্দিষ্ট মধ্য-মান তত্ত্বের প্রবক্তা এবং মার্টনের মধ্যে পারসন্‌স্‌-এর মতো ঘোরতর মার্ক্সবাদ বিরোধিতা দেখা যায় না।

(২) মার্টনের মতে, ক্রিয়া (function) হ'ল সেই সমস্ত পরিলক্ষিত ফলাফল সমূহ (observed consequences) যেগুলি কোনও একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার অভিযোজন বা মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক। অন্যদিকে, উক্ত পরিলক্ষিত ফলাফলসমূহ যদি অভিযোজন বা মানিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে, ব্যবস্থার বিনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় তবে তাকে অপক্রিয়া (dysfunction) বলে।

অনক্রিয়া (nonfunction) হ'ল সেই সমস্ত ক্রিয়া, যেগুলি কোনও ব্যবস্থার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় বা গুরুত্বহীন-ভালো মন্দ, উপকারী-অপকারী-কোনও প্রভাবই বিস্তার করে না।

(৩) বিধিশূন্যতা তত্ত্বে মার্টন পাঁচ ধরনের অভিযোজনের কথা বলেন। সেগুলি হ'ল। (১) মান্যতা (confermity), (২) নবপ্রবর্তন (innovation), (৩) আচারপরায়ণতা (ritualism), (৪) পশ্চাৎ-অপসারণ (retreatism) ও (৫) বিদ্রোহ (rebellion)।

অনুশীলনী ঃ ৩

(১) সামাজিক সমস্যার সঠিক অনুধাবন এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের কাজ

করাই অধ্যাপক সি. রাইট মিল্‌স্‌ প্রণীত নব সমাজতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য।

(২) ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকার ও সামরিক সংগঠনগুলির শীর্ষ স্থানাধিকারী ব্যক্তিবর্গ, মিল্‌স্‌-এর মতে, ক্ষমতাবান এলিটের মুখ্য অংশীদার।

(৩) এ প্রসঙ্গে বেকারত্ব'র ধারণার উল্লেখ করা যেতে পারে। এক কোটি মানুষের একটি মহানগরীতে যদি একজন লোক বেকার থাকে তবে সেটা তার ব্যক্তিগত 'অসুবিধা' এবং তা দূর করতে ঐ ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি নজর দেওয়া উচিৎ। কিন্তু ঐ এক কোটি মানুষের মধ্যে যদি বেকার সংখ্যা ১০ লক্ষ হয় তবে তা' একটি 'সমস্যা'। সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই তার সমাধান খোঁজা উচিৎ।

রচনাত্মক প্রশ্নাবলীঃ

(১) ১১.৩.১ দেখুন

(২) ১১.৪.১ দেখুন।

(৩) ১১.৫.৩ দেখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১) ক) আবেগ সর্বস্বতা বনাম আবেগহীনতা (affectivity versus affective neutrality)

খ) সুনির্দিষ্টতা বনাম পরিব্যাপ্ততা (specificity versus diffuseness)

গ) সর্বজনীনতা/সর্বব্যাপীতা বনাম বিশেষতা/স্বতন্ত্রতা (universalism versus particularism)

ঘ) আরোপ বনাম অর্জন (ascription versus achievement)

ঙ) আত্ম বনাম গোষ্ঠী (self versus collectivity)

২) ১১.৩ এর শেষ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩) ম্যালিনস্কি বা র‍্যাডক্লিফ ব্রাউনের মতো চিন্তাবিদেরা উপযোগীতাবাদী বিশ্লেষণের যে তিনটি মৌলিক নীতির কথা বলেছিলেন, মার্টন তার সমালোচনা করেন। প্রথম নীতি-উপযোগীতাবাদী ঐক্যের নীতি বা ক্রিয়াবাদী ঐক্যের নীতি। এই নীতি মূল কথা- কোনও সামাজিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে ঐক্য বজায় থাকা আবশ্যিক বা স্বাভাবিক। মার্টন মনে করেন যে, ক্ষুদ্র, সহজ, সরল, প্রাচীন সমাজের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হ'লেও বৃহত্তম, জটিল আধুনিক সমাজের ক্ষেত্রে তা' অপ্রযোজ্য। দ্বিতীয় নীতি-সর্বজনীন উপযোগীতাবাদ-সকল প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির সমাজের পক্ষে উপকারী বা প্রয়োজনীয় ভূমিকা রয়েছে। মার্টনের মতে, এই নীতিও বাস্তব সম্মত নয়। বহু প্রথা, বিশ্বাস ধ্যান ধারণা সমাজের পক্ষে উপকারী ভূমিকা পালন করে না। তৃতীয়ত, অবশ্য প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগীতাবাদী অবশ্য প্রয়েজানীয়তা-সমাজের সকল প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বিষয়গুলির যেহেতু সমাজের পক্ষে উপকারী ভূমিকা রয়েছে অতএব সমাজের পক্ষে সেগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ, বিকল্প সামাজিক কাঠামোর কল্পনা অবাস্তব। পারসন্‌স্‌-এর মতো মার্টন, ও মনে করেন, তা

ঠিক নয়। তাঁদের মতে, কোনও সমাজে বিভিন্ন রকম বিকল্প সামাজিক কাঠামো বা ক্রিয়ার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

(৪) ক্ষমতাবান এলিটের বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে ঐক্য বজায় থাকে মূলত দু'টি কারণে ; প্রথমত, তাদের একই ধরনের শ্রেণী অবস্থান, অর্থাৎ তারা সকলেই সমাজের উচ্চশ্রেণীর সদস্য। ফলত, বিত্ত, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ-সমস্ত দিক থেকেই তাদের মধ্যে একটা মিল পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, তারা একই সভাসমিতির সদস্য হওয়ার সুবাদে পারস্পরিক মেলামেশার মধ্য দিয়ে নিজেদের সাধারণ অনুভূতিকে (common feeling) টিকিয়ে রাখে।

বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নাবলী ঃ

ক) বিমূর্ত ; খ) লক্ষ্যপূরণ ; গ) প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া ; ঘ) পদ্ধতিগত।

১১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Ritzer George : Classical Sociological Theory, New York, The McGraw-Hill Companies, Inc., 1996.

(২) Coser, Lewis A.: Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Sociological Thought, Jaipur, Rawat Publications, 1996

(৩) International Encyclopedia of Social Sciences, Vol. 10 (1968), Vol. 18 (1979) New York and London, macmillan and the Free Press.

(৪) Rocher, Guy : A General Introduction to Sociology: A theoretical perspective, Calcutta, Academic Publishers, 1990

(৫) Giddens, Anthony : Human Societies: A Reader, Cambridge, Polity Press, 1992.

একক ১২ ❐ রামমোহন, ভূদেব, ঈশ্বরচন্দ্র

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য
১২.২ প্রস্তাবনা
১২.৩ সমাজবিজ্ঞানের সূত্রপাত ঃ প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে
১২.৪ রামমোহন রায়
১২.৫ ভূদেব মুখোপাধ্যায়
১২.৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে আপনারা প্রথমেই সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সূত্রপাত সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাবেন। জানবেন কি অবস্থায় প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সমাজচিন্তা গড়ে উঠেছিল। অতঃপর এই এককে তিনজন বিশিষ্ট ভারতীয় সমাজচিন্তানায়ক সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পাঠ নেবেন। আপনার জানবেন রামমোহন, ভূদেব ও ঈশ্বরচন্দ্র কিভাবে একইসঙ্গে সমাজসংস্কারক ও সমাজচিন্তানায়কের ভূমিকা পালন করেছেন।

১২.২ প্রস্তাবনা

পশ্চিমে সমাজতন্ত্রের সূত্রপাত হয়েছে প্রধানত শিল্পবিপ্লবের পটভূমিতে। আর ভারতবর্ষে সমাজ-চিন্তার উদয় হয়েছে পশ্চিমের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে। উনবিংশ শতকের বাঙালী চিন্তানায়কগণ এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিকমনস্ক মানুষ হিসাবে রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁর পর পরই ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজসংস্কারক ও চিন্তানায়কগণ ভারতীয় সমাজ চিন্তার ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন। এই তিন জনকে আমরা তাই ভারতীয় সমাজতত্ত্বের / সমাজবিজ্ঞানের তিন পথিকৃৎ বলে গণ্য করতে পারি।

১২.৩ সমাজ বিজ্ঞানের সূত্রপাত : প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে

ভারতের আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার সূত্রপাত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভিঘাতে। অবশ্য প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের শাস্ত্রকার, মহাকাব্য রচয়িতা, তত্ত্বজ্ঞানীদের লেখায় এবং বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় আন্দোলনের প্রবক্তা ও পরিচালকদের রচনা ও আলোচনায় সমাজ ও সংস্কৃতির নানা দিকের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এইসব বিচার বিশ্লেষণের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তির তুলনায় পরম্পরাগত মূল্যবোধ ও সমাজ ব্যবস্থার যথার্থ সম্পর্কে আস্থার প্রকাশই বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম সংস্কৃতির সাথে সংঘর্ষের ফলে এই আস্থায় চিড় ধরেছিল এবং সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে

নতুন ধরণের চিন্তা-ভাবনা দেখা দিয়েছিল। প্রতীচ্যে জ্ঞানচর্চ্চার স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে সোসিওলজি বা সমাজতত্ত্বের আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা উনবিংশ শতাব্দীতেই। যদিও তাদের পরিপ্রেক্ষিত ছিল ভিন্নতর। পশ্চিমী সমাজ ও ভারতীয় সমাজের বিবর্তন ও বিকাশে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তার ছাপ পড়েছিল ঐ দুই ক্ষেত্রের সমাজবিজ্ঞান বিকাশের উপরেও।

পাশ্চাত্যে সমাজবিজ্ঞানের সূচনা ও বৈশিষ্ট্য :

চার ধরনের বিপ্লবের ফলে পশ্চিমের বিশেষতঃ ইউরোপের সমাজ কাঠামো ও মূল্যবোধে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটেছিল। অনুরূপ বিপ্লব প্রাচ্যের সমাজগুলিতে সমকালে ঘটেনি। এগুলি হল (১) বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে, (২) বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে, যার প্রকাশ রেনেসাঁস ও পুর্নজাগরণ এবং মানবতাবাদের উদ্বোধনে (৩) ফরাসী বিপ্লবের মত রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক ঘটনায় এবং (৪) শিল্পবিপ্লবে।

(১) বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে

চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই ইউরোপের উৎপাদকেরা বিশেষতঃ বণিকজন তাদের পণ্যের জন্য নতুন নতুন বাজারের খোঁজে তাদের নিজ দেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরে স্থলপথে ও জলপথে নতুন নতুন দেশ ও মানবগোষ্ঠী আবিষ্কারের ঝুঁকি নিয়েছিল। তারা ধীরে ধীরে সেই সব দেশে নিজেদের বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিল আর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই সেখানে ইউরোপীয় বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।

(১) বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে পুনর্জাগরণ ও বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

পশ্চিমী জগতের ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী মধ্যযুগে চার্চ এর ধর্মগুরু বা পাদ্রীদের কঠিন শাসনে মানুষের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা ও সৃষ্টিশীলতা প্রবলভাবে ব্যাহত হয়েছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎসস্বরূপ গ্রীক সভ্যতার উৎকর্ষের মূলে নিহিত ছিল মানবতাবাদ। এই মানবতাবাদ পশ্চিমী মানুষের বোধে নতুন করে প্রতিভাত হল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। এই প্রক্রিয়া ও ঘটনা রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণ ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত, যুক্তিসিদ্ধ মননে ঋদ্ধ, নিত্যনবসৃষ্টি অভিলাষী, নতুন নতুন আবিষ্কারের প্রয়াসী ব্যক্তি মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি, তার সচেতনতা, সাহস ও কর্মোদ্যোগই এই পুনর্জাগরণের মূল কথা। এর ফলেই চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও সাহিত্যে দেখা দিল নব নব সৃষ্টির উল্লাস। আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা দিল নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ লব্ধ এবং যুক্তিবিচার সিদ্ধ তথ্য ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী সমস্ত ধরণের প্রচলিত মতবাদ, গোঁড়ামি ও অন্ধ বিশ্বাসকে অতিক্রম করার প্রয়াস। দৈবকরুণা বা প্রাকৃতিক শক্তির দাসত্ব ঘুচিয়ে মানুষ প্রকৃতির নানা দিকের উপরে নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা শুরু করল আপন বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে।

(৩) ফরাসী বিপ্লব ও রাজনৈতিক সামাজিক পরিবর্তন

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের ফলে প্রথমে ফ্রান্সে এবং পরে ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটল। রাজতন্ত্র, পাদ্রীতন্ত্র ও অভিজাতবর্গের জায়গায় স্বার্থ নির্ভর সামন্ততন্ত্রের জায়গায় এল সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাত্রমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও মানবতাবাদ। সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ উদ্যোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকার সর্বপ্রথম স্বীকৃতি পেল এই ফরাসী বিপ্লবের ফলেই। একই সঙ্গে পুরোনো সমাজব্যবস্থা ও মূল্যবোধকে শাশ্বত বলে মেনে নিতে অস্বীকার করল মানুষ। যুক্তির আলোকে (এনলাইটেনমেন্ট) প্রদীপ্ত মন নিয়েই সব কিছুকে বিচার করতে

হবে। এই বিচারে অনুত্তীর্ণ, সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান বা আদর্শকে বিসর্জন দিতে হবে নির্দ্বিধায়। আবার এই প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠায় একধরনের কালাপাহাড়ি মনোভাবেরও জন্ম হল যা পুরাতন সব কিছুকেই জীর্ণ বলে বর্জন করতে উদ্যোগী হল। সামাজিক অস্তিত্বের নিরাপত্তাবোধ বিপন্ন হয়ে পড়ল। তাই নতুন ব্যবস্থা ও মূল্যবোধের গুরুত্ব অস্বীকার না করেও পুরাতনের যে অংশ মানুষ ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে তার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার নায়কগণ। নূতন ও পুরাতনের এই দ্বন্দ্ব আরও প্রখর হল শিল্পবিপ্লবের ফলে।

(৪) শিল্প বিপ্লব

মোটামুটিভাবে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয়েছিল এবং তা দ্রুত প্রতীচ্যের অন্যান্য দেশগুলিতেও সংঘটিত হয়েছিল। শিল্পবিপ্লবের আগে ছিল হস্তচালিত সরল যন্ত্রপাতি এবং প্রাণীশক্তি ও কায়িকশক্তি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা। এগুলির জায়গায় এল বাষ্পচালিত জটিল ও আগের তুলনায় অধিকতর উৎপাদনক্ষম ও বেগবান যন্ত্রপাতি এবং বৃহত্তর আয়তনবিশিষ্ট এবং উন্নততর উৎপাদন কাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থা। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কৃষিভিত্তিক ও গিল্ড বা কারিগরগোষ্ঠী/শ্রেণী নির্ভর শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হল পুঁজির ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উৎপাদন ব্যবস্থা। পূর্বে কৃষক ও শ্রমজীবী কারিগররা স্থায়ীভাবে বাঁধা ছিল জমিদার ও গিল্ড অধিপতিদের সাথে। নতুন ব্যবস্থায় তত্ত্বগতভাবে শ্রমিক সর্ব্বোচ্চ মূল্য প্রদানকারী মালিকের কাছে তার শ্রম বিক্রয়ের স্বাধীনতা অর্জন করল। সাথে সাথে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যূথবদ্ধতার উপরে স্থান পেল। অন্যদিকে মুনাফালোভী পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমিকদের ক্রমাগত শোষণের ফলে সমাজে দেখা দিল অশান্তি এবং শ্রমিক ও মালিকের দ্বন্দ্ব। ক্রমে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজতন্ত্রের সূচনা দেখা দিল।

উপরে আলোতিত চার প্রকারের বিপ্লবের ফলে পশ্চিমী দুনিয়ার সাবেকী সমাজকাঠামো ও সংস্কৃতি (মূল্যবোধ, আদর্শ ও বিশ্বাস) নতুন নতুন চিন্তাধারা ও ব্যবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। ভেঙ্গে পড়া পুরোনো ব্যবস্থার নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা আর রইল না। আবার নবজাত ব্যবস্থার জটিলতা ও প্রবল গতিশীলতার চরিত্রও সম্যক বোধগম্য হচ্ছিল না প্রতিটি ক্ষেত্রে। নূতন ও দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল সমাজের গতিময়তার সাথে সমাজের সুস্থিতি ও শৃঙ্খলা কীভাবে মেলানো যাবে, নতুন সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সমাজ সংহতির সমন্বয় কীভাবে সম্ভবপর হবে, শ্রেণীদ্বন্দ্বের সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে—এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই প্রতীচ্যে জন্ম হয়েছিল সোসিওলজি বা সমাজবিজ্ঞানের। আর জ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটির প্রধান হাতিয়ার ছিল মানুষের মুক্ত বুদ্ধি ও শক্তির উপরে আস্থা এবং যুক্তি নির্ভর বিচার ও বিশ্লেষণ প্রণালী। সমাজ ও সংস্কৃতিকে বস্তুনিষ্ঠ বা বিষয়নিষ্ঠ (objective) দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা শুরু হল।

ভারতে সমাজ বিজ্ঞান : সূচনা ও বৈশিষ্ট্য

পশ্চিমের (ইউরোপের) সাথে ভারতবর্ষের যোগাযোগ তীব্রতর হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসনের পত্তনের ঠিক পর থেকেই। এর আগের কয়েকটি শতকে পশ্চিমের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আমূল ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন ঘটে গিয়েছিল। অনুরূপ পরিবর্ত্তন ভারতে ঘটে নি। ভারতবর্ষে সমাজ ও মূল্যবোধের পরম্পরা বা ঐতিহ্যের চাপ অব্যাহত ছিল। তার মুখ্য চারটি কারণ হল—

ক) কৃষি নির্ভর অর্থনীতি

খ) এক প্রকার স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজ। যা অবশ্য কখনই সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না।

(গ) বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজশাসন যাতে জন্মগত জাতি (কাস্ট)-র কর্ম বিভাজন ও অধিকারভেদ যুক্ত হয়েছিল যজমানি ব্যবস্থার সাথে, যার ফলে আর্থিক ক্ষেত্রে জাতিগুলির পরস্পর নির্ভরশীলতা নিশ্চিত হয়েছিল।

ঘ) পুনর্জন্ম ও কর্মবাদ এর ভাবগত ধারণা।

উপরোক্ত চারটি কারণে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি এক ধরণের স্থায়িত্ব লাভ করেছিল যা ক্রমে স্থবিরত্বে পর্যবসতি হয়। পরম্পরাগত সমাজব্যবস্থা ও মূল্যবোধের প্রতি সাধারণ মানুষের প্রশ্নহীন আনুগত্যের সুযোগ নিয়ে নানা ধরণের অমানবিক কুপ্রথা চালু ছিল সমাজে—যেমন অস্পৃশ্যতা, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ নিষেধ, পুরুষদের বিশেষতঃ কুলীনদের বহুপত্নী গ্রহণের প্রথা ইত্যাদি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাধারণের জন্য শিক্ষার অভাব। এই অচলায়তনের বিরুদ্ধে প্রথম বড় আঘাত এল ব্রিটিশ শাসনকালে। ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সমাগত প্রতীচ্যের দর্শন ও বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও মানবতাবাদ এদেশের সংস্কৃতিতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করল। আর ঔপনিবেশিক শক্তির অর্থনৈতিক স্বার্থে তথাকথিত স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামসমাজভিত্তিক অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থা ভাঙতে শুরু করল। টলিয়ে দিল।

প্রচলিত ধ্যানধারণা, সামাজিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা শুরু হল রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) প্রমুখ চিন্তানায়ক ও সমাজসংস্কারকদের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে। এরা কেউই প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে সোসিওলজিস্ট বা সমাজতাত্ত্বিক ছিলেন না। কারণ এঁদের জন্মকালে সমাজবিজ্ঞান বা সোসিওলজি জ্ঞানচর্চ্চার আলাদা শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি এদেশে, এমন কি পশ্চিমেও। কোনও রকম সংস্কারের বশবর্তী না হয়ে মুক্ত বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে সমাজ ও সংস্কৃতির সমালোচনা করার ক্ষমতা ও শৈলীই সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম প্রাথমিক উপাদান। তাই এ কথা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক নয় যে প্রচলিত সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এই ধরণের মনীষীরা যে সব প্রশ্ন তুলেছেন, যে ধরণের সমালোচনা করেছেন তার দ্বারাই ভারতের আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক চর্চ্চার বীজ বপন করা হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে এই পুরোনো সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনার ধারা আরও বেগবতী হয়। এঁদের চিন্তাধারা ও কর্মক্ষেত্র অবশ্যই সমাজতাত্ত্বিকের গণ্ডী পেরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে প্রাতিষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের উপর এঁদের প্রভাব পড়ল গভীরভাবে।

বাঙালি তথা ভারতীয় সমাজে ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্রে এল নতুন জোয়ার বা এক প্রকার নবজাগরণ। প্রচলিত ধ্যানধারণা ও প্রথা-প্রতিষ্ঠানকে নির্বিচারে গ্রহণ না করে বিজ্ঞানসম্মত মানবতাবাদ (সায়েন্টিফিক হিউম্যানিজম)-এর আলোকে সেগুলিকে পরীক্ষা করতে প্রয়াসী হল পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানের সদ্য আলোকপ্রাপ্ত যুক্তিবাদী মানুষ। মূঢ়তা ও অন্ধতাপ্রসূত বিধি-প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে সমাজজীবনকে সুস্থ সবল করার প্রচেষ্টা শুরু হল।

কিন্তু রক্ষণশীলরা সহজে এ পরিবর্ত্তন মেনে নেয়নি। তদুপরি সমাজ সমালোচনার প্রথম প্রচেষ্টার উচ্ছ্বাসে ইংরেজী শিক্ষিত নব্য যুবকবৃন্দের একাংশ, যেমন হিন্দু কলেজ কেন্দ্রিক ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী, কিছু কিছু বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলল। ফলে রক্ষণশীল সমাজ প্রবলতরভাবে বিরূপ হয়ে পড়ল নতুন শিক্ষা ও সমাজভাবনা সম্পর্কে। প্রতীচ্য থেকে আগত আধুনিকতার সঙ্গে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রচণ্ড সংঘাতে আধুনিকতার গতি ব্যাহত হল। চিন্তাক্ষেত্রে বিকাশশীল, আধুনিকতাকে সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মোদ্যোগ, অর্থনৈতিক ও রাজনেতিক স্বাধীনতার অভাব ও আধুনিকতার রুদ্ধগতির একটা বড় কারণ ছিল। পাশাপাশি আধুনিকতার নামে পরম্পরাগত

সমাজশৃঙ্খলাকে ঢাকীশুদ্ধ বিসর্জন দেওয়াকে অযৌক্তিক বলে মনে করেছিলেন বেশ কিছু চিন্তাশীল মানুষ। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজকল্যাণের সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টাকে ফিরে দেখাতে চাইলেন তাঁরা। এদেশে বিদেশী শাসকদের অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক লুণ্ঠণের ব্যাপারটাও তাঁরা তুলে ধরার চেষ্টা করলেন। আমাদের নিজেদের সমাজ ও মূল্যবোধকে ব্রিটিশ শাসক ও তার অনুগামী বা সমর্থক পশ্চিমী পণ্ডিতবর্গের কাছ থেকে পাওয়া দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করার (ওরিয়েন্টালিজম) যৌক্তিকতা সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠল। ভারতীয় সমাজতত্ত্ব আজও এই সমস্ত সমস্যার সমাধ্যনে ব্যস্ত। ভারতে ঐতিহ্য ও আধুনকিতার মিথষ্ক্রিয়ার স্বরূপ উন্মোচন আজকের দিনেও ভারতীয় সমাজতত্বের একটি মুখ্য কর্ত্তব্য। এ কাজ যাঁদের হাতে শুরু হয়েছিল তাঁদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিতি একান্ত প্রয়োজনীয় এদেশের সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে। এই সঙ্গে স্মরণীয় ভারতপ্রেমিক বিদেশী পন্ডিত ও গবেষকবর্গ, এশিয়াটিক সোসাইটী ও বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এ্যাসোসিয়শনের মত আলোচনা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী আমলাদের প্রতিবেদন। এছাড়া সেন্সাস বা জনগণনার প্রতিবেদন এদেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যে মূল্যবান তথ্য ও বিশ্লেষণ প্রদান করেছে তা ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের তথ্যগত বা বস্তুগত (এম্‌পিরিকাল) ভিত্তিগঠনে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। Coser, L.A. *Masters of Sociological Thought,* Jaipur 1988

২। ঘোষ, বিনয়— বাংলার নবজাগৃতি কলিকাতা

৩। পোদ্দার, অরবিন্দ — *Renaissance in Bengal* : Quests & Confrontations. Simla : 1970.

১২.৪ রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)

ভারতে আধুনিকতার উদ্‌গাতা রামমোহন

ভারতবর্ষের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভকালেই এসেছেন রামমোহন রায়। আধুকিতার প্রধান লক্ষণ ব্যক্তিচেতনার জাগরণ যা পশ্চিমে দেখা গিয়েছিল মধ্যযুগের অবসানে রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণের ফলে— ব্যক্তিচেতনার জাগরণ বলতে অবশ্য নিজের স্বার্থবুদ্ধিকে প্রবল করে তোলা ও তার চরিতার্থতা সাধনকে বোঝায় না। নিজের মন, বোধ, বুদ্ধির সবটাই গীর্জা বা পুরোহিততন্ত্র বা সমাজপতিদের কাছে বাঁধা না রেখে সমস্ত কিছুকেই নিজের বোধ বুদ্ধি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ও সেই অনুযায়ী কাজ করার যোগ্যতা অর্জন ও উদ্যোগ গ্রহণের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিচেতনার জাগরণ ও আধুনিকতার সূচনা হয়। আধুনিকতার প্রাক্কালে মানুষ নিজেকে জানত সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর একজন বলে, কোনও চার্চ বা ধর্মসঙ্ঘের অনুগামী বলে। তার নিজের কোনও আত্মিক পরিচয় ছিল না। রামমোহনের আবির্ভাবকালে ভারতবাসীদের মধ্যে কেউ ছিল হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ শূদ্র, কেউ বা অস্পৃশ্য, কেউ শক্তি, কেউ বৈষ্ণব, কেউ বা সুন্নী। মানুষ জানত এই রকমই তার পরিচয়। এর অবসান তখনই সম্ভব যখন আপন চিন্তা ও কর্মের উপর ব্যক্তির নিজের বিচার বুদ্ধি ও যুক্তির সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আমাদের দেশে এই প্রক্রিয়া মূর্ত হয় প্রথম রামমোহনের ক্ষেত্রে। ভারতের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রামমোহন বলেছিলেন যে উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে "আমি নিজের বিবেকের দ্বারাই চালিত হয়েছি, অভিজ্ঞতার ও চিন্তার দ্বারা চালিত হয়েছি" (I have been guided only by my conscience and the impressions left on my mind by long experience and reflections)।

ব্যক্তিমনের স্বতন্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ বিচারক্ষমতা এবং মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিকতার ভিত্তিতেই রামমোহন ধর্ম, ধর্মশাস্ত্র ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লষণ করতে পেরেছিলেন।

জাতিভেদের কুফল

রামমোহন স্পষ্ট করে দেখালেন যে তাঁর সময়ে ভারতবর্ষে হিন্দুদের ধর্মভাবনা, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার ও সামাজিক ব্যবস্থা নতুন জীবন স্বপ্নের উপযোগী নয়। তিনি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর সমকালে হিন্দুদের ধর্ম ব্যবস্থা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তা করছে না। জাতিভেদের বৈষম্য জনগণের মধ্যে অসংখ্য ভাগ ও বিভাগের সৃষ্টি করেছে। তার ফলে এদেশের অধিবাসীরা স্বাদেশিকতার বোধ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অসংখ্য ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান এবং শুচিতা রক্ষার জন্য রীতি-রেওয়াজ মেনে চলতে গিয়ে যে কোন প্রকার কঠিন কাজ করার শক্তি ভারতবাসীরা হারিয়ে ফেলেছে। নবযুগের সুযোগের সদ্ব্যবহার এবং সামাজিক হিতের জন্যই হিন্দুদের ধর্মসংক্রান্ত ধ্যানধারনা, আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন দরকার।

প্রচলিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান,আচার-অনুষ্ঠান ও পুরোহিততন্ত্রের দুষ্ক্রিয়া

সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তাই রামমোহন সমাজ পরিবর্তনের প্রস্তুতি হিসাবে দেশবাসীকে শাস্ত্রচর্চায় উদ্বুদ্ধ করে সত্য প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। বেদান্তের অনুবাদও বিতরণ করেছিলেন। গুরুগিরির ব্যবসায় নিযুক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মুখের কথাকে শিরোধার্য না করে

জিজ্ঞাসুর আপন অনুভব ও যুক্তির সাহায্যে শাস্ত্রকে বোঝার ও বিশ্লেষণ করার ওপর জোর দিয়েছিলেন রামমোহন। তিনি দেখিয়েছিলেন নানারকম আচার অনুষ্ঠানের বিধান দিয়ে, বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার নির্দেশ দিয়ে, পালপার্বণ দুর্গোৎসবের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা কীভাবে সরল বিশ্বাসী অজ্ঞ জনসাধারণকে প্রতারণা করে, শোষণ করে। এই কারণেই তিনি পৌত্তলিকতা ও পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

সতীদাহ নিবারণের জন্য তাত্ত্বিক ও প্রয়োগগত প্রচেষ্টা

সতীদাহ নিবারণের জন্য আন্দোলন রামমোহনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। মৃত স্বামীর চিতায় সদ্য বিধবার প্রাণ বিসর্জনের যে অমানবিক প্রথা হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তা রদ করার জন্য তিনি সমাজের রক্ষণশীল অংশের সঙ্গে শাস্ত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। রক্ষণশীলদের জোরালো সমর্থনে এই নারীহত্যা বঙ্গদেশে প্রবল আকার ধারণ করেছিল। আর ব্রিটিশ শাসকরাও দেশীয় লোকেদের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কায় এই ব্যবস্থার অবসানে নিশ্চেষ্ট ছিলেন। নারীসত্বা বিধ্বংসী এই ব্যবস্থা রদের অনুকূলে একদিকে দেশবাসীর ও অন্যদিকে বিদেশী শাসকবর্গের মতামতকে প্রভাবিত করার জন্য রামমোহন তিনখানি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। তিনি শাস্ত্রের বচনসমূহ উদ্ধৃত করে, তাদের যুক্তিনিষ্ঠ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন যে ধর্মশাস্ত্রে সতীদাহ প্রথার অনুমোদন মেলে না বরং তার বিপরীত কথাই শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

তিনি আরও দেখালেন সতীদাহ প্রথার মধ্যে বিধবা নারীদের ভরণপোষণে তাদের আত্মীয়স্বজনের বিমুখতা ও তাদের সম্পত্তির ওপরে আত্মীয়স্বজনের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাই প্রকট হয়।

এই প্রথা রদের জন্য ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিঙ্কের উদ্যোগে সতীদাহ প্রথা নিরোধ আইন পাশ হয়। এই আইন রদের জন্য রক্ষণশীলরা সরকারের কাছে আবেদনপত্র পেশ করলে তার বিরোধিতায় রামমোহন সরকারকে অভিনন্দন জানান। সতীদাহ নিরোধ আইন নিয়ে মামলা শেষ পর্যন্ত প্রিভি কাউন্সিলে যায়। সেখানে শুনানীর সময় রামমোহন উপস্থিত ছিলেন। প্রিভি কাউন্সিল ১৮৩২ সালে আইনটির বৈধতা স্বীকার করে নেন। সতীহাদ নিবারণের জন্য দীর্ঘ দুই দশক ধরে রামমোহনের তত্ত্বগত আলোচনা ও বাস্তবে নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অন্ততঃ একটা কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। সমাজ পর্যবেক্ষণ ও সমালোচনায় কুশল এই তাত্ত্বিক সমাজের অসুবিধা নিরাকরণের জন্য উপযুক্ত বাতব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

নারীর মর্যাদা, সম্পত্তির অধিকার রক্ষা ও বহুবিবাহ রোধের চেষ্টা

পরম্পরাগত সমাজে সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে নারীরা যে চরম বঞ্চনার শিকার হয়েছিলেন রামমোহন তারও প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। পুরুষদের বহুবিবাহ করার অধিকারের মধ্যে তিনি দেখিয়েছিলেন নারীর মর্যাদাহানির আর একটি দুঃখজনক উদাহরণ। তাই এই প্রথা যাতে বন্ধ হয় তার জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষা ও অন্য ধরণের অধিকার থেকে বঞ্চনাই আমাদের দেশে মেয়েদের সামাজিক হীনাবস্থার কারণ বলে তিনি নির্দেশ করেছেন।

সংস্কৃতির পরিবর্ত্তনের পাশ্চাত্য শিক্ষার ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন

তীক্ষ্ণ সমাজ বিশ্লেষণের সাহায্যে রামমোহন বুঝেছিলেন যে এদেশে গতানুগতিক চিন্তাধারা ও প্রথার প্রতি অন্ধ আনুগত্যের অবসানের জন্য ইউরোপের তুলনামূলকভাবে উদার ও যুক্তি নির্ভর শিক্ষার প্রয়োজন। তাই সংস্কৃত ও শাস্ত্র ও বেদান্ত চর্চার বদলে পাশ্চাত্যের গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, এবং অন্যান্য

কার্যকরী বা জনহিতকার শিল্পচর্চার ব্যবস্থা করার জন্য শাসকবৃন্দকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন রামমোহন। এই কারণেই সংস্কৃতি শিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপনের বিরোধী ছিলেন তিনি। তবে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রচলিত চতুষ্পাঠীগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করার জন্য তিনি সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিলেন।

রামমোহন নিজেকে ভূম্যধিকারী অভিজাতদের একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু বিষয়ীগত দৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রেণীস্বার্থকে অতিক্রম করে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করার ফলেই কোম্পানীর শাসনকালে ভূমি ব্যবস্থা ও চাষীদের অর্থনৈতিক দুর্দশা সম্বন্ধে তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণে সক্ষম হয়েছিলেন রামমোহন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ সংশোধনের উদ্দেশ্যে ১৮৩১ সালে বৃটিশ সরকার একটি সমীক্ষা অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করেন। সেই উপলক্ষ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির কাছে তাঁর লিখিত সাক্ষ্য ও প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন যে ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারী প্রথা ও দক্ষিণ ভাতের রামতওয়ারী বন্দোবস্ত উভয়ই ছিল সবল কর্ত্তৃক দুর্বলকে শোষণের পন্থা—একটিতে জমিদারের হাতে চাষী নির্যাতিত হয়েছে, অন্যটিতে সরকারী কর্মচারীর, যেমন জরীপকারী ও রাজস্ব আদায়কারীর, হাতে। সরকার জমিদারদের ক্ষেত্রে রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট হার স্থির করে দিয়ে তাদের অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। অনুরূপ সহানুভূতির সঙ্গে চাষীদের অবস্থা কেন বিবেচনা করা হয়নি তা তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি। জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে চাষীদের নানাধরণের অত্যাচার, হেনস্থা, শোষণের, বঞ্চনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিনির্ভর সমালোচনা করেছিলেন তিনি। আর এই অব্যবস্থা ও দুর্দশার প্রতিকারের পথ নির্দেশও করেছিলেন রামমোহন। রামমোহন নিজে কিন্তু নির্যাতিত দরিদ্র কৃষকদের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন নগরবাসী উচ্চবিত্ত শ্রেণী লোক। তিনি ভূসম্পত্তির মালিকও হয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও অশেষ সহানুভূতির সঙ্গে তিনি দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর বাস্তব অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণে সক্ষম হয়েছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে অতীব কাখিত। শুধু তাই নয়, অর্থনীতিবিদ্ ভবতোষ দত্তের মতে রামমোহনের হাতে "ভারতের অর্থনীতি আলোচনা একটা বৈজ্ঞানিক রূপ পরিগ্রহ করল। এও উল্লেখযোগ্য যে তাঁর সমস্ত প্রস্তাবের মধ্যেএকটি স্বচ্ছন্দ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তাহলে চাষীর খাজনারও চিরসথায়ী বন্দোবস্ত হোক। যদি চাষীর খাজনা আর না বাড়ানো হয়, তাহলে জমিদারের দেয় রাজস্ব কিছু কমানো হোক। যদি এর ফলে সরকারী আয়-ব্যয় ঘাটতি পড়ে, তাহলে নতুন শুল্ক বসানো হোক এবং ভারতীয় কর্মচারী অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত করে ব্যয় কামানো হোক। ব্যয় কমানো হোক দেশের প্রশাসনে, ব্যয় কমানো হোকবিদেশে পেনসন সুদ ইত্যাদির অপচয় হ্রাসে। দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি ব্যয় করা হোক দ্রুত হারে এবং এর জন্য ইংরেজদের এখানে আমন্ত্রণ করা হোক প্রশাসক রূপে নয়, আর্থিক উন্নতির পরিদর্শক স্থায়ী বাসিন্দা রূপে। যুক্তিধারা চলে এসেছে এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে। এখানেই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী মনের পরিচয়।"

বিভিন্ন ধর্মমতের যুক্তিসিদ্ধ ও তুলনামূলক আলোচনা

রামমোহন বিভিন্ন ধর্মের মূল গ্রন্থগুলি পাঠ ও বিশ্লেষণ করে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের সূত্রপাত করেছিলেন এদেশে। তাঁর মতামত বর্তমান যুগে ধর্মের সমাজতত্ত্বের পক্ষেও গুরুত্বপূর্ণ। কিশোর বয়স থেকেই তিনি হিন্দুদের পৌত্তলিকতা নানা গবেষণা এবং বিভিন্ন ধর্মমতের আলোয় পৌত্তলিকতাকে যাচাই করেছিলেন। তাঁর আরবী ভাষায় রচিত "মানজারাতুল, আদিয়ান্" "নানা ধর্মসম্বন্ধে আলোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধটি আজ আর পাওয়া যায় না। তাঁর ফারসী ভাষায় রচিত"তুহফ্ত-উল-মুওয়াহিদ্দিন" নামে পুস্তিকাটিতেও তিনি একাধিক ধর্মমত ও ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এবং ধর্মীয় তত্ত্ব ও আচার অনুষ্ঠান বিশ্লেষণে যুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আলোচনা

করেছেন। এই রচনায় ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন রামমোহন।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রচেষ্টায় রামমোহন

রামমোহন বুঝতে পেরেছিলেন যে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা যাতে লোকহিতকে অবজ্ঞা না করতে পারে তার জন্য মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরী। স্বাধীন সংবাদপত্র শাসক ও শাসিত উভয়ের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ। নিজে তিনি একাধিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রেস রেগুলেশন' কার্যকরী করা হলে রামমোহন তার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ফারসী ভাষায় তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেন। বিশ্বের যে কোনও জায়গায় যে কোনও ধরণের স্বৈরাচারের বিরোধী ছিলেন তিনি। প্রকৃত গণতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী হতে পারে না এই বিশ্বাসেই তিনি স্বদেশে গণতান্ত্রিক ব্রিটিশদের শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন পশ্চিমী সভ্যতার ও সংস্কৃতির অভিঘাতে এদেশের জনগণের পরম্পরাগত ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসের অচলায়তন থেকে মুক্তি ঘটবে এবং তারা চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা লাভ করবে।

হিন্দু মুসলমান সব ধরণের ভারতীয়দের তুলনায় নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের যে দাবী খ্রীষ্টান পাদ্রী বা ইউরোপীয় আধিকারকরা করত রামমোহন সারা জীবন তার প্রতিবাদ করে গেছেন। প্রকৃত উদারনৈতিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও পরমতসহিষ্ণু রামমোহন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার যুক্তিভিত্তিক মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন সামাজিক সংরচনায়। এই মেলবন্ধনের সাধনের জন্য রামমোহনের ধারণা ও পদ্ধতি ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের প্রণিধানযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Datta Gupta, Bela *sociology in India,* Calcutta 1972.
2. Poddar, Arabinda, *Renaissance inBengal : Quests and Confrontations 1800-1860.* simla : 1970.
3. Ray, Raja Rammohun *Selected works of Raja Rammohan* New Delhi : 1977.

১২.৫ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪)

প্রস্তাবনা : ভারতে সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশে যে কয়জন পথিকৃৎ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজ সম্বন্ধে প্রযোজ্য সর্বজনীন সাধারণ সত্যের প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা এ সম্বন্ধে এদেশে তিনিই সর্বপ্রথম চিন্তা ভাবনা করেন।

উদ্দেশ্য : এককের এই অংশটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

৩÷১ — ভূদেবের জীবনের মুখ্য কয়েকটি দিক

৩÷২ — সমাজতত্ত্বের সম্ভাবনা বিচার

৩÷৩ — সমাজ ও তার ইতিহাসের পদ্ধতি

৩÷৪ — ভারতীয় সমাজের

ক) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ

খ) দেশের বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের যোগাযোগের জন্য একটি জাতীয় ভাষা

গ) বর্ণভেদ প্রথার সমর্থন ও অস্পৃশ্যতার বিরোধীতা

ক:৩:১ — ভূদেবের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা

জন্ম, শিক্ষা এবং মানসিকতায় ভূদেব রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সামাজের একাত্ম ছিলেন। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ মুখোপাধায় সংস্কৃতে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। এই দৃঢ়চেতা ব্রাহ্মণ এক বিদেশী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। তাদের ইচ্ছানুযায়ী নিজের সমাজের নিন্দাবাদ করতে অস্বীকার করে তিনি দারিদ্র্য বরণ করেন। কিন্তু পুত্রের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যাপারে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। নয় বছর বয়সে ভূদেব কলিকাতা গর্ভমেন্ট সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। সেখানে সাহিত্য শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে ইংরেজী শেখার জন্য শেষ পর্যন্ত হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন বারো বছর বয়সে। তখন সেখানে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রাধান্য। খাদ্য ও পানীয় বিষয়ে হিন্দু আচারের প্রকাশ্য বিরোধিতা করত তারা। তাঁর পুত্র ও হয়ত নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করবে— বিশ্বনাথ এই উদ্বেগ প্রকাশ করায় ভূদেব প্রতিজ্ঞা করেন যে পিতার সামনে গ্রহণ করতে পারবেন না এমন কোনো খাদ্য তিনি কোনওদিন স্পর্শ করবেন না। এই প্রতিজ্ঞা ভূদেব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তাঁর কঠোর নিষ্ঠা ও আত্মসংযমের কথা সমকালীন বন্ধুরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের প্রভাবে পৌত্তলিকতায় অনাস্থা প্রকাশ করে ভূদেব গৃহে নিত্য পূজায় অংশ গ্রহণ করতে আপত্তি জানালে বিশ্বনাথ বিচলিত হন বটে। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ ভূদেবকে অবিশ্বাস সত্ত্বেও নিত্যপূজা করতে বাধ্য করেন নি। দীর্ঘদিন ধৈর্য্যের সাথে প্রতীক পূজার তত্ত্ব সম্পর্কে পুত্রের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। পুত্র কলেজে যে সমস্ত বিষয় শিখে আসতে তাদের অনুরূপ ভাব ও ভাষা সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উদ্ধৃত করে শোনাতেন পণ্ডিত বিশ্বনাথ। হিউম, টম পেইন এবং গিবন পড়ার ফলে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি ভূদেবের আকর্ষণ কমে যায়, তার উপর বিশ্বনাথের সূক্ষ্ম প্রচেষ্টার ফলে পিতৃপুরুষের ধর্মে তাঁর আস্থা ফিরে আসে। কুলধর্ম অনুযায়ী তন্ত্রমতে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা গ্রহণ করায় ঐ আস্থা দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল।

১৬ বছর বয়সে ভূদেবের বিবাহ হয়। ভূদেবের বালিকা বধূ শ্বশুরকূলে তাঁর পূর্বগামিনীদের মত আদর্শ গৃহিনী

ও স্বামীর প্রিয় সহচারীরূপে বিকশিত হয়েছিলেন। ভূদেবকেও তাঁর পিতা ও পিতামহের মত মধ্যবয়সে পত্নীবিয়োগের শোক সহ্য করতে হয়। তাঁদের মত তিনিও আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন নি। নিজের পরিবারের বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতার কারণেই সমাজসংস্কারকদের বাল্য বিবাহ রোধ ও বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে তিনি উৎসাহ দেখাতে পারেন নি।

হিন্দু কলেজে বিভিন্ন পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন ভূদেব। কলেজের পড়াশোনা শেষ করে প্রথমে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন তিনি। এক বছর পরেই তিনি ফরাসী চন্দননগর সেমিনারী নামে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। কিন্তু পরিবারের আর্থিক অনটন দূর করার জন্য তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার দ্বিতীয় শিক্ষকপদে যোগাদন করেন। এখানে ইসলাম সংস্কৃতি ও মুসলমান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাঁর গভীর ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। মুসলিম সংস্কৃতি ও মুসলমানদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ এর অন্যতম কারণ। এই পদ থেকে আপন যোগ্যতাবলে তিনি শিক্ষা বিভাগের স্কুল পরিদর্শক এবং শেষ পর্যন্ত বেঙ্গল এডুকেশনার সার্ভিসের প্রথম শ্রেণী পদাধিকারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠি করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লেফ্‌টেনেন্ট গর্ভনরের কাউন্সিল বা পরিষদের সদস্য হন। গুরুত্বপূর্ণ সরকারী শিক্ষাবিষয়ক বহু রিপোর্টের তিনি রচয়িতা। ভারত সরকারের দ্বারা গঠিত হান্টারের শিক্ষা কমিশনের সদস্য ছিলেন ভূদেব। তাঁর সম্পাদিত 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার','এডুকেশন গেজেট' বাংলার তখনকার সামাজিক ও অন্য নানাধরণের ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য দর্পণ ও যুক্তিসিদ্ধ সমালোচনার উজ্জ্বল উদাহরণ। তাঁর রচিত **সামাজিক প্রবন্ধ** ইত্যাদি গ্রন্থগুলি এদেশে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সূচনা করেছিল।

ক:৩:২ — (১) ঐতিহ্যের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যায় ভূদেব

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সমাজবীক্ষার যে সমালোচনাত্মক ধারা গড়ে তুলেছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় সেই ধারাকে অনুসরণ করেন নি। তিনি ব্যক্তিগত জীবনচর্যায় এবং জনসমাজে আলাপ আলোচনায় সনাতন ধর্মশাসিত হিন্দুসমাজের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। বস্তুতঃ ভূদেবের সমাজ দর্শনে আমরা ঐতিহ্যের সানুরাগ কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ সমালোচনা পাই। হিন্দু কলেজের পাশ্চাত্য ভাবধারায় আপ্লুত্য নব্য ইংরাজী শিক্ষিতদের হিন্দু রীতিনীতির বিদ্বিষ্ট সমালোচনা এক বিষম সঙ্কটের সৃষ্টি করেছিল। স্বাতন্ত্র্য ও স্বাজাত্যাভিমান হারিয়ে দেশের একাংশ বিদশী শাসকবর্গ ও তাদের আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধ অনুকরণকারীতে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ঐতিহ্য বা পরম্পরাকে নির্বিচারে বিসর্জন না দিয়ে তার গতিপ্রকৃতি বুঝে সমাজ সংগঠনের প্রচেষ্টা তাই ভূদেবের কাছে অত্যাবশ্যক বলে মনে হয়েছিল।

ক:৩:২ — (২) ভূদেবের চিন্তায় পুনরুজ্জীবনবাদের অনুপস্থিতি

ঐতিহ্যের বিশেষতঃ সনাতন ধর্ম ও হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের সানুরাগ কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ এই ব্যাখ্যায় ভূদেব পুনরুজ্জীবনবাদকে আদৌ গুরুত্ব দেন নি। পাশ্চাত্য রীতিনীতির অন্ধ ভক্তরা হিন্দু রীতিনীতির বিদ্বিষ্ট সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। এটি একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী ভারতীয় হিন্দুরাই শ্রেষ্ঠ আর্য, শুধু তাই নয় তারা প্রকৃত আর্য রক্তের অধিকারী। এই মতানুসারে প্রচলিত হিন্দু রীতিনীতিগুলি যুক্তিসঙ্গত তো বটেই, তাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে। আধুনিক পদার্থ বিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্বের (যেমন ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম বা বিদ্যুচ্চম্বক তত্ত্বের) অপব্যাখ্যা দিয়ে এইসব মতবাদ উপস্থাপন করা হত। ভূদেব এই ধরণের মতামত সমর্থন করেন নি। তিনি মনে করতেন ভালমন্দ বিচার না করেই সবকিছু গ্রহণ করাও যেমন, তেমনই কোনো পরিবর্ত্তন

মেনে না নেওয়াও কুসংস্কার পদবাচ্য। আর তাঁর মতে হিন্দু ধর্ম বা হিন্দুদের সমাজ অধঃপাতিত বা মুমূর্ষ হয়ে পড়ে নি কখনও। অতএব হিন্দুধর্ম বা সমাজের পুনরুজ্জীবনের কথাই ওঠে না। হিন্দু সমাজ স্থানু বা অনড় ছিল না। ভূদেব দেখিয়েছেন যে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত অবস্থাকে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। নতুন নতুন প্রয়োজন অনুসারে পণ্ডিতরা বার বার শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। উন্নতির পথ খুঁজতে গেলে এই সুপরীক্ষিত পথের কথা ভুললে চলবে না। বস্তুতঃ ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা মাত্রই অবৈজ্ঞানিক নয়। ভারতীয় ঐতিহ্যের পর্যালোচনা করতে গিয়ে পাশ্চাত্যের মূল্যায়ন ভূদেবকে ব্রতী হতে হয়েছিল। এটা ঠিক যে এই মূল্যায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য ধর্মের অর্থাৎ খ্রীষ্ট ধর্মের তুলনায় হিন্দু ধর্মের উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু মূল্যায়নের মানদন্ডটা কী হবে?

রাজনারায়ণ বসু পাশ্চাত্যের মানদন্ডে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছিলেন। ভূদেব এই প্রচেষ্টাকে ত্রুটিযুক্ত মনে করেছিলেন। হিন্দু ধর্মকে বুঝতে হলে এই ধর্ম কীভাবে যুগযুগান্ত ধরে এদেশের মানুষকে বন্ধনে বেঁধে রেখেছে এবং তাদের একজাতিত্বভাব রক্ষা করেছে সেটা বুঝতে হবে। ভারতবাসীর বিশেষতঃ হিন্দুদের জাতীয়ভাব বুঝতে হবে এবং সেটা করতে হলে তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস তাদের দিক থেকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। অন্য ধর্ম ও সমাজের সঙ্গে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের তুলনা করা প্রয়োজন। কিন্তু কীভাবে এই তুলনা সম্ভব সেই সম্পর্কে ভূদেবের চিন্তাভাবনা এদেশে সমাজতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৩:২ — (৩) সমাজ ও ঐতিহ্যের বিশ্লেষণে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ এবং সর্বদেশ-সাধারণ সমাজতত্ত্বের সম্ভাব্যতা বিচার

এদেশে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম সরাসরি সমাজের ও সংস্কৃতির প্রকৃতি, পরিবারের মত সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সমাজের আচার-অনুষ্ঠানের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে সুগ্রথিত প্রবন্ধাবলী রচনা করেন। এগুলিই **সামাজিক প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ** এবং **আচার প্রবন্ধ** শীর্ষক গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর **বিবিধ প্রবন্ধ**-তে ও সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে গভীর আলোচনা পাওয়া যায়। অবশ্য এই প্রবন্ধ ও গ্রন্থের মূল্য উপজীব্য ভারতীয় সমাজের জাতীয়ভাব এবং এই জাতীয়ভাবের সৃষ্টিতে সনাতন ধর্মের ভূমিকা। এই আলোচনা করতে গিয়ে ভূদেব ভারতের সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে অন্যান্য দেশের সমাজব্যবস্থার সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আলোচনা করেছেন এবং হিন্দু ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের তুলনা করেছেন। এতৎ সত্ত্বেও কিন্তু ভূদেব তাঁর অসীম প্রজ্ঞা দ্বারা বুঝেছিলেন যে তাঁর **সামাজিক প্রবন্ধ** বা অন্য গ্রন্থগুলি 'সর্বদেশ-সাধারণ সমাজতত্ত্বের' আদর্শ উদাহরণ নয়।' বিভিন্ন দেশের সামাজিক ব্যবস্থা আচার আচরণ, ধ্যান ধারমার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য আহরণ করে সেগুলিকে সম্যকভাবে বিশ্লেষণ করার পরেই এই ধরণের সমাজতত্ত্বের গ্রন্থ রচনা সম্ভব। যে কোনও দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির যথার্থবোধের জন্য সেখানকার ধর্ম, সমাজ, পারিবারিক ব্যবস্থা, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য (অর্থাৎ বাস্তবে পরম্পরাক্রমে যা ঘটেছে ও ঘটছে তার প্রকৃত বৃত্তান্ত বা খোঁজখবর) এর প্রয়োজন। এর জন্য চাই মুক্ত দৃষ্টি। অথচ ভূদেব লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর সময়ে তাঁর সমাজের ইংরাজী শিক্ষিত অনেকের মধ্যেই এই সম্পর্কে তথ্যজ্ঞান ছিল অস্ফুট। পাশ্চাত্য প্রভাব তাঁদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাই তাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থার মূল যে যুগযুগান্তব্যাপী ঐতিহ্যের মধ্যে প্রোথিত সেই ঐতিহ্যের পরিশ্রমসাধ্য বিশ্লেষণের চেষ্টা না করে তাকে সদ্য জানা পশ্চিমী সমাজব্যবস্থা ও ধর্মের তুলনায় হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল তারা। চল্‌তি হাওয়ার পন্থী এই নব্য ইংরেজী শিক্ষিতরা পরম্পরাগত ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার উল্লঙ্ঘনকেই প্রগতি বলে মনে

করেছিল। কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খলতা কখনও কোনও মঙ্গল সাধন করে না। আধুনিক সমাজতত্ত্বের ভাষায় বলা যায় যে ভূদেব পরম্পরাগত সমাজের ও মূল্যবোধের ক্রিয়াত্মক দিকটি দেখাতে চেয়েছিলেন। প্রত্যেক দেশের ধর্ম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আচার অনুষ্ঠান সেই দেশের জনসমষ্টির ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বা পরিবেশগত অভিজ্ঞতার উপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই অভিজ্ঞতার দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন হয়। কোনো বিশেষ জনসমষ্টির ঐতিহাসিক, পরিবেশগত ও অন্যবিধ অভিজ্ঞতা যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয় তাদের ঐতিহ্যের মধ্যে। এই ঐতিহ্যই তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য। এই স্বাতন্ত্র্যই জাতি হিসাবে তাদের বিশিষ্ট পরিচয়। পরানুচিকীর্ষার ফলে এই ঐতিহ্যের অবমাননা বা ধ্বংসসাধন জাতির স্বাতন্ত্র্যের বিলোপ সাধন করে। জাতীয়তাবোধের এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠভূমির অন্যতম প্রথম বিশ্লেষণকারী ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাই সমাজ সংস্কারের নামে কালাপাহাড়ি মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেছেন। সমাজের কোনও প্রতিষ্ঠান বা আচার অনুষ্ঠান বদলানোর চেষ্টা করার আগে জনসমষ্টির জাতীয়ভাব ও সমাজের ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার ক্রিয়া ও দুষ্ক্রিয়া ও প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনের ক্রিয়া ও দুষ্ক্রিয়াকে বিচার করে দেখতে হবে। ভারতীয় সনাতন ধর্ম পরিচালিত হিন্দু সমাজের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ভূদেব এইটিই দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন।

৩:২ — (৪) পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ ও আচার প্রবন্ধ-এ প্রকাশিত ভূদেবের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার অখণ্ডতা

একথা সত্যি যে আজকাল আমরা সমাজতত্ত্ব বা সমাজবিজ্ঞান বলতে যা বুঝি ভূদেবের **সামাজিক প্রবন্ধ** সেই জাতীয় গ্রন্থ নয়। কিন্তু এই গ্রন্থটি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট **পারিবারিক প্রবন্ধ** এবং **আচার প্রবন্ধ**-এর মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের বহু গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের সন্ধান মেলে। বর্তমান অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে পরিবারই বৃহত্তর সমাজের ভিত্তি বলে পরিগণিত হয়। সমাজ আন্তঃমানবিক সম্পর্কের জটাজাল। আর এই সমাজের সদস্যদের সেই পারস্পরিক অধিকাংশ সম্পর্কের উদ্ভব ও বিকাশ পরিবারের মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-পরিজনের জ্ঞাতি বা রক্ত সম্পর্ক, বিবাহ ও কুটুম্ব সম্পর্ক এবং কর্ত্তব্য সম্পর্কের মধ্যে থেকেই হয়। পরিবার সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সমাজ অঙ্গী। এই দিক থেকে পরিবারকে কেন্দ্র করে ভূদেবের সমাজ সম্পর্কিত ভাবনা খুবই যুক্তিযুক্ত। তাই তাঁর **পারিবারিক প্রবন্ধ সামাজিক প্রবন্ধেরই** অঙ্গবিশেষ। ভূদেব নিজে বলেছেন যে **পারিবারিক প্রবন্ধের** অনেক জায়গাতেই সামাজিক প্রভাব চলে এসেছে। বিশেষতঃ 'ধর্মচর্চা' এবং 'সন্তানের শিক্ষা' এই দুটি প্রবন্ধে তিনি যা লিখেছেন তাতে "সমাজকেই প্রধানতম উদ্দেশ্য" বলে বিবেচনা করা হয়েছে। **পারিবারিক প্রবন্ধ** লিখতে গিয়েই ভূদেব **সামাজিক প্রবন্ধ** রচনায় অনুপ্রাণিত হন। **সামাজিক প্রবন্ধ**-তে ইংরেজরা এদেশের শাসনক্ষমতা অধিকার করার পরে এদেশীয়দের জাতীয়ভাবের উদ্বোধন, সংরক্ষণ ও প্রসার এই বিষয়ই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। **পারিবারিক প্রবন্ধ**-তে ও নানা স্থানে এই ভাবই প্রধান হয়ে উঠেছে।

সামাজিক প্রবন্ধ-তে ভূদেব ভারতীয় বিশেষতঃ হিন্দু ধর্ম ও সমাজের সঙ্গে অন্যান্য দেশ ও জনগোষ্ঠীর ধর্ম ও সমাজের তুলনা করেছেন। **পারিবারিক প্রবন্ধ** ও **আচার প্রবন্ধ** কিন্তু বিশেষ করে হিন্দু সমাজের জন্য লিখিত হয়েছিল। এই দুই রচনাকে বাঙালি হিন্দু গৃহস্থের অবশ্য পালনীয় গৃহ্যসূত্র বলা যেতে পারে। প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম বাঙালি হিন্দু গৃহস্থের যে ভাবে বোঝা উচিত সেই ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে এই দুই গ্রন্থে। পার্থক্য শুধু এই যে **আচার প্রবন্ধ**-এর মূল হিন্দুশাস্ত্র, **পারিবারিক প্রবন্ধ**-এর মূল বাঙালি হিন্দুর দেশাচার

পারিবারিক প্রবন্ধ-তে ভূদেব বাঙালি হিন্দুর পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছেন। তাঁর নিজের জীবন অভিজ্ঞতা এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির দৃঢ় ভিত্তি। বিবাহ, দাম্পত্য সম্পর্ক, পিতামাতা,

পুত্রকন্যা, পুত্রবধূ, অন্যান্য সামাজিক কর্তব্য কেনো কিছুই ভূদেবের দৃষ্টি এড়ায়নি। পারিবারিক জীবনে মোটামুটি রক্ষণশীল হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তিনি সংস্কার মুক্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন।

উদাহরণ স্বরূপ একান্নবর্তী পরিবার বা যৌথ পরিবারের এক আদর্শ চিত্র ভারতীয় সমাজের অধিকাংশ গবেষকই আজও অঙ্কন করেন। ভূদেব কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। একান্নবর্তিতার গুণ হল- এর ফলে বশ্যতা বা আনুগত্য, ত্যাগশীলতা, সমদর্শিতা জন্মায়। কিন্তু ভূদেবের মতে অনেক ক্ষেত্রে একান্নবর্ত্তিতার মূল কারণ দরিদ্রতা। এর ফলে একজনের উপর নির্ভরশীলতা জন্মায় এবং পরিবারের অন্যান্যের মধ্যে উপার্জন করার ইচ্ছা কমে আসে। সেই জন্য তিনি বঙ্গদেশে প্রচলিত দায়ভাগ ব্যবস্থার প্রশংসা করে সেই অনুযায়ী পিতার সম্পত্তি ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে তাদের স্বাধীনভাবে চলা সুযোগ দানের কথা বলেছেন। বিরোধের উৎসে সম্পত্তি। সম্পত্তির সুষ্ঠু বন্টনের পর ভাইদের মধ্যে সম্প্রীতি আরও বেশী করে বজায় থাকে। তবে তিনি পিতার সম্পত্তিতে কন্যাদের অধিকার স্বীকার না করে পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন।

বাঙালির সমাজজীবনে দুটি বড় সম্পর্ক হল ১) জ্ঞাতিত্ব এবং ২) কুটুম্বিতা। জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কে ভূদেব বলেছেন ইহলৌকিক স্বার্থ সম্বন্ধই জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কের অবনতি ঘটায় আর সম্মত্তিই হল সেই স্বার্থ। তাই সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়াই উচিত। একে জ্ঞাতিপালনে পরাঙ্মুখতা বলা চলে না। তেমনই কুটুম্বতা সম্পর্কটিও বেশ জটিল। এই জটিলতার সমাধানের জন্য ভূদেবের সযৌক্তিক পরামর্শ এই যে কন্যা-সম্প্রদাতা এবং কন্যাগ্রহীতা দুই কুটুম্বকেই সমান চোখে দেখতে হবে, সমান মর্যাদা দিতে হবে। কুটুম্বরা কুটুম্বের গৌরব চান। তাই গৌরব বৃদ্ধিকারক কাজে সর্বদা কুটুম্বদের সঙ্গে পরামর্শ করে চললেই এ সম্পর্ক বজায় থাকে। ভূদেব এখানে কন্যাগ্রহীতার শ্রেষ্ঠত্বের পরম্পরাগত ধারণাকে সমর্থন করেননি আদৌ।

আচার প্রবন্ধ মূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে নিত্যাচার প্রকরণ, আর এক ভাগে নৈমিত্তিক আচার প্রকরণ। নিত্যাচার প্রকরণে হিন্দু গৃহস্থের দৈনন্দিন করণীয় কর্মের তালিকা ও তার বিশ্লেষণ আর নৈমিত্তিকাচার প্রকরণে কোনো হেতুর অবলম্বনে বা উপলক্ষে যে সকল অনুষ্ঠান করণীয় তার বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এতে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ্য আচারবিধির কথাই আলোচিত হয়েছে। যুগধর্মের প্রভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীর যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করণীয় অনুষ্ঠানের সময়সূচীর কিছু পরিবর্ত্তন হতে পারে। কিন্তু তা বলে সেগুলিকে বর্জন করার কথা বলেননি ভূদেব। এখানে ভূদেব সময়োচিত পরিবর্তনের গুরুত্ব বুঝতে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু নৈমিত্তিক আচার প্রকরণে হিন্দুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত করণীয় অনুষ্ঠানের (যেগুলিকে আজ rites de passage বা life cycle rituals বলা হয়) যে ব্যাখ্যা ভূদেব করেছেন তা সত্যিই সুন্দর ও যুক্তিগ্রাহ্য। পরিবর্তন সত্ত্বেও সামাজিক হিন্দুর জীবনে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধ নির্দেশিত পথেই চলেছে। এদেশের পরম্পরাগত সমাজ দৃষ্টির সম্পূর্ণতা এই সব অনুষ্ঠানে সুন্দরভাবে প্রকাশিত। সমস্ত শুভকর্মের সূচনায় বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে পিতৃ-পুরুষের যে স্মরণ অনুষ্ঠান হয় তার আধ্যাত্মিক মূল্যকে গুরুত্ব না দিলেও এর যে একটি বিশেষ হার্দিক মূল্য আছে এবং, এটা যে পারিবারিক সংহতিকে দৃঢ় করে একথা অনস্বীকার্য।

সামাজিক প্রবন্ধ

পারিবারিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ এবং **সামাজিক প্রবন্ধ**— এই তিনটি গ্রন্থের প্রধান কথা হল ভারতীয়দের বিশেষ করে হিন্দুদের ধর্মকে কী করে রক্ষা করা যায় ও সুদৃঢ় করা যায়। ধর্মের দুটি দিক ÷ একটি হল আধ্যাত্মিকতা (spirituality), আর একটি হল সমাজের সদস্যদের পারস্পরিক কর্ত্তব্যের অলঙ্ঘনীয় শৃঙ্খলা

(duties and code of conduct)। ভূদেবের মতে ধর্মই সামাজিক স্থিতি এবং বৃদ্ধির একমাত্র কারণ। দুর্বল ভারতসমাজেরও বলবৃদ্ধির একমাত্র উপায় ধর্মবৃদ্ধি। ধর্ম বলতে কর্মকেই বোঝায়। যে কর্ম দ্বারা (ক) সাক্ষাৎভাবে কিংবা পরম্পরাক্রমে পরার্থপরতা প্রবল হয়, (খ) সম্মিলনের ঘনিষ্ঠতা জন্মায়, (গ) আত্মসংযম বর্ধিত হয় এবং (ঘ) পাশবভাবের হ্রাস হয় সেটাই ধর্মসম্মত কার্য। নিজেদের সমাজের মধ্যে সহানুভূতি বিস্তারে যা ব্যাঘাত ঘটায় ও মনের সংকীর্ণতার জন্ম দেয় এবং বিলাস বাসনাকে বাড়িয়ে দেয় তা কখনই ধর্মকার্য হতে পারে না।

ধর্মের সঙ্গে সামাজিক সংহতির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের সমাজতাত্ত্বিক সূত্রটি ভূদেবের আলোচনায় সুপরিস্ফুট। তিনি ভারতসমাজের দুর্বলতার দুটি মূল কারণের কথা বলেছেন ÷ ১) বিদ্যাহীনতা ২) ধনহীনতা। ভূদেব দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন যে ইংরেজ শাসনে দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার ফলে শিক্ষার বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বাস্তবে কমে গিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ইংরেজরা এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের জন্য যথোচিত চেষ্টা করে নি কারণ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার হলে দেশে কলকারখানা বাড়ত এবং যুক্তিবাদী মনোভাবের বিকাশ ঘটত। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। সত্যিকারের বিজ্ঞান-শিক্ষিত মানুষেরা দেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রীয় মত ও বিধির যুক্তি সম্মত আলোচনার ফলে সেগুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হত। আর্যশাস্ত্রে "ভৌতিক শক্তির প্রভাব এবং মনুষ্যের সাধন প্রচেষ্টার প্রভাব" স্বীকার করা হয়েছে। যদিও তিনি পুনরুজ্জীবনবাদের মত এক জায়গায় বলেছেন যে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নব আবিষ্কৃত বহু তথ্য আর্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি কখনই গোঁড়া রক্ষণশীল ছিলেন না। বিজ্ঞানপ্রেমী ভূদেব পরিষ্কার বলেছেন যে ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্যা শিক্ষা করা এবং কলকারখানা স্থাপন করা ভারতবাসীদের ঐহিক কল্যাণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য (১) বাইরে থেকে বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিদ্‌কে আনা যেতে পারে অথবা (২) বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশল শিখে আসার জন্য এদেশের লোককে বিদেশে পাঠানো যেতে পারে। কালাপানি পার হওয়া সম্পর্কে রক্ষণশীলদের গোঁড়ামি ও আপত্তিকে ভূদেব আদৌ গুরুত্ব দেননি। তাঁর মতে এদেশে শিল্পবিদ্যাকে নিয়ে আসার জন্য বিদেশযাত্রা সমাজকে ভালবাসা এবং তা লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ নয়। হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ প্রকৃত সৎকাজের বিরোধী নয়।

ধনহীনতার প্রতিকারের জন্য তিনটি উপায় হল ÷ ১) ব্যয় হ্রাস, ২) ক্ষতির নিবারণ, ৩) আয়ের বৃদ্ধিসাধন। আর ভূদেবের মতে এই তিনটি উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করতে প্রয়োজন "১) বিলসিতার লাঘব, ২) অকার্যে অর্থব্যয় পরিহার, ৩) বৈদেশিক দ্রব্যাদির ক্রয় লাঘব, ৪) দেশীয় সালিশের দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি, ৫) যৌথ কারবারের দ্বারা শিল্পের এবং বাণিজ্যের উন্নতি।" এদেশের তথাকথিত অভিজাত ও শিক্ষিতবর্গের অন্ধ পরানুচিকীর্ষা যে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার পরিপন্থী এই সত্য ভূদেবের শিক্ষা, অর্থনীতি ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে স্পষ্ট এবং এটা তাঁর গভীর সমাজতাত্ত্বিক মননের পরিচয়। একই সঙ্গে এটা তাঁর গভীর স্বদেশচেতনার ও জাতীয়তাবোধের পরিচয়।

জাতীয়তাবোধ প্রবুদ্ধ ভূদেব তাঁর স্বদেশবাসীর জাতীয়ভাব বিকাশের জন্য যে ধাপগুলির কথা বলেছেন তার থেকে অন্যান্য সমাজের তুলনায় হিন্দু সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিটি ভারতবাসীর চিত্তের উৎকর্ষের জন্য প্রয়োজন জাতীয়ভাবের উপলব্ধি। এর জন্য দরকার ১) নিজের প্রতি অনুরাগ, ২) নিজ পরিবারের পতি অনুরাগ, ৩) বন্ধু-বান্ধব স্বজনের প্রতি অনুরাগ, ৪) স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ, ৫) নিজ প্রদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ। এই পাঁচটি ধাপ উত্তীর্ণ হলে স্বজাতিবাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এর উদাহরণ গ্রীক ও রোমীয়দের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু অগস্ত কঁৎ স্বজাতি থেকে খুব বেশী রকম আলাদা নয় এমন জাতির লোকদের প্রতি সৌভ্রাতৃত্যের কথা বলেছেন, ৮) যীশু এব মহম্মদের মধ্যে মানবমাত্রের প্রতি অনুরাগের কথা বলেছেন, ৯) বৌদ্ধরা জীবনমাত্রের প্রতি অনুরাগের কথা বলেন, কিন্তু এই সীমাকেও ছাড়িয়ে ১০) সজীব

নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ তথা সেই প্রকৃতিতে সর্বব্যাপী সত্তার প্রতি অনুরাগের কথা চিন্তা করেছে আর্যরা। ভূদেবের মতে ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধ তাদের সুমহান সংস্কৃতিতেই নিহিত। পরানুচিকীর্ষা ও স্বাতন্ত্র্য বিসর্জনে ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতার আকাঙ্খার বিকাশ সম্ভব নয়। আবার ভারীতয়দের এই ঐতিহ্যলালিত জাতীয়তাবোধ ও স্বজাতিবাৎসল্য কখনই পরজাতি বিদ্বেষ ও পরজাতি পীড়নকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। আন্তর্জাতিক প্রীতি ও সখ্য ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ

ভূদেবের উদার ও যুক্তিবাদী চিন্তায় হিন্দুদের সাথে মুসলমান ও খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের ভারতবাসীরাও ভারতীয় সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। হিন্দুদের বিচ্ছেদপ্রবণতা ও স্বজাতিবিদ্বেষ মুসলমানদের মধ্যে নেই। মুসলমানদের ঐক্যানুভূতি শিক্ষনীয়। ভূদেব ইঙ্গিত করেছেন যে ইংরেজরা মুসলমানদের মধ্যে নেই। মুসলমানদের ঐক্যানুভূতি শিক্ষনীয়। ভূদেব ইঙ্গিত করেছেন যে ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল যে হিন্দু এবং মুসলমান একত্রিত হলে ভারতীয় সমাজ শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং সেই কারণেই তারা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে সদা সচেষ্ট। সুতরাং হিন্দু এবং মুসলমান দুই সম্প্রদায়কেই এই বিভেদ নীতি এবং অনৈক্যের কুফল সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলেন **সামাজিক প্রবন্ধ**-তে জাতীয়ভাব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে। এই স্বধর্মনিষ্ঠ আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ মুসলমান শাসকদের প্রতি ভারতবাসীর ঋণের কথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন। মুসলমান শাসনে ভারতবর্ষ একটি সাধারণ হিন্দী ভাষা বা হিন্দুস্তানী ভাষা লাভ করেছে। ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ করে হর্ম্মশিল্পে সৌন্দর্য্যের নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে এবং সাধারণভাবে সমাজ জীবনে সৌজন্য রীতির একটি প্রশংসনীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

তাঁর আর একটি গ্রন্থ **স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস**-এ ভূদেব লিখেছেন ভারতভূমি যদিও "হিন্দুজাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি", যদিও হিন্দুরাই এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন, তথাপি "মুসলমানেরাও ভারতভূমির কাছে পর নহেন।" ভারতবর্ষ মুসলমানদেরও "আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানরাও ইহার পালিত সন্তান।" তিনি প্রশ্ন করেছেন "এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক হয় না?" তার উত্তর অবশ্যই হয় সকলের শাস্ত্রমতেই হয়।" তিনি কাতরভাবে দেশবাসীকে জিজ্ঞাসা করেছেন আমরা কি চিরকালই জ্ঞাতিবিরোধে আপনাদিগকে সর্বস্বান্ত এবং অপরের উদর পূরণ করিব? অপর অর্থাৎ বৃটিশরাজ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে ও বাড়িয়ে দিয়ে এবং সেই বিরোধের সুযোগ নিয়ে ভারতবাসীকে শোষণ করে নিজেদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধন করছিল। **সামাজিক প্রবন্ধ**-তে ভূদেব ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষণের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন সুচতুরভাবে। দাদাভাই নওরোজির 'ড্রেন থিওরি' (বাধ্যতামূলকভাবে ভারতীয় সম্পদের ব্রিটেনে অভিগমন) ও রমেশ দত্তের ডিইনভাস্ট্রিয়ালাইজেসন (ভারতে শিল্পায়নের বিনাশ) তত্ত্বের সঙ্গে ভূদেবের তত্ত্বের ও বিশ্লেষণের গভীর সাদৃশ্য চোখে পড়ে। আরও উল্লেখ্য বিষয় এই এই যে ভূদেব রীতিমত প্রচুর তথ্য (data) সহযোগে ইংরেজদের দ্বারা ভারতীয় সম্পদের লুণ্ঠনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। সেইসব তথ্য আবার কোম্পানীর দেওয়া সরকারী নথি থেকেই তুলে ধরেছিলেন তিনি। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তাত্ত্বিক ও দার্শনিক চিন্তাপ্রবাহের সাথে সাথে তথ্যের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে। ভূদেবের প্রচেষ্টা এই দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূণ।

সার্থক সমাজবিশ্লেষণ সমস্যার মূলেরই সন্ধান দেয় না তার মূলোচ্ছেদেরও উপায় নির্দেশ করার চেষ্টা করে। ভূদেবও তাই ব্রিটেনের উদাহরণ দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে সেখানে যেমন ধর্মভেদ জাতীয়ভাবের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন ভারতবর্ষেও সেইরকমটি হতে চলেছে। তিনি আশা করেছেন হিন্দু এবং মুসলমান ক্রমে ক্রমে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হয়ে চলবে। ভূদেবের এই আশা পূর্ণ হয়নি। কিন্তু ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের সঙ্গে ভূদেবের প্রত্যাশা সঙ্গতিপূর্ণ।

দেশের বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের যোগাযোগের জন্য একটি জাতীয় ভাষা

ভারতবাসীর জাতীয় ঐক্য নিশ্চিত কীভাবে করা যায় সেটি ছিল ভূদেবের সমাজ বিশ্লেষণের একটি প্রধান লক্ষ্য। এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে হিন্দীভাষার চর্চা ও ঐ ভাষায় ভাবের ও সংবাদের আদানপ্রদান। ভূদেব লক্ষ্য করেছিলেন যে ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে "হিন্দী-হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমানদিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশব্যাপক।" তাঁর অনুমান ছিল এই হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষাকে অবলম্বন করেই ভবিষ্যতে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকবে। খণ্ডিত ভারতে তাঁর এই অনুমান সত্য হয়েছে।

বিহারের হিন্দীভাষার বিদ্যালয়গুলি তাঁর উৎসাহে সংখ্যায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আদালাত ও অফিস কাছারীতে ফারসীর বদলে হিন্দীর চল ও কায়েমী বর্ণলিপির ব্যবহার তাঁরই প্রচেষ্টায় শুরু হয়েছিল। এ বিষয়ে তাঁর সন্তুষ্টি ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি শুধু বিনয়ই প্রকাশ করেননি অসাধারণ সমাজবোধ বা সমাজতাত্ত্বিক বোধেরও পরিচয় দিয়েছিলেন। সমাজ পরিবর্ত্তন কোনও ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় হয় না। "যে সকল শক্তিতে মনুষ্যসমাজে প্রধান প্রধান পরিবর্তনগুলি সংঘটিত হইয়া থাকে সেই কালসহকারে এই (অর্থাৎ হিন্দী ভাষার ব্যাপক প্রচলনের) দিকে ঝুঁকিয়াছিল। সেই ঝোঁকটি সুপরিস্ফুটরূপে আমার অন্তঃকরণে উদ্বুদ্ধ হয়। সুবিধা থাকায় আমি সেই দিকে চেষ্টা করিতে থাকি।"

বর্ণভেদ প্রথার সমর্থন ও অস্পৃশ্যতার বিরোধ

জাতীয় ঐক্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় হিন্দী ভাষার অধিকতর প্রচলনের জন্য বিভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিকদের নিজ নিজ বর্ণের মধ্যে প্রদেশ নির্বিশেষে বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন ভূদেব। অর্থাৎ ভূদেব বর্ণ ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তিনি একই বর্ণের বিভিন্ন অবস্থার লোকেদের ভেদকে অথবা একই বর্ণের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের ভাষাগত বা প্রদেশগত পার্থক্যকে জাতিভেদের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করেননি। কালক্রমে কোনও একটি বর্ণের মধ্যে এই ধরণের পার্থক্য লুপ্ত হবে এমনটি মনে করেছিলেন তিনি। ভূদেব সাম্যকে স্বাভাবিক বলে মনে করেননি। সামাজিক বৈষম্যকে সর্বজনীন ও সর্বকালীন বলে মনে করেছিলেন তিনি। হিন্দুদের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পার্থক্যকে তাই স্বাভাবিক বলেই মনে করেছিলেন তিনি। তাঁর মতে বর্ণভেদ গুণগত ও সংস্কারগত, শুধুমাত্র বৃত্তিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, নয়। আর এই বর্ণ ব্যবস্থার ফলেই হিন্দুদের ক) স্বাতন্ত্র্য ও খ) আভিজাত্যবোধ এবং গ) অভিজাতদের প্রতি সাধারণ মানুষের সম্ভ্রম বোধ-এর স্বাভাবিক বিকাশ হয়েছিল। এই বর্ণব্যবস্থাই ভারতীয় হিন্দুদের সর্বগ্রাসী ও স্বাতন্ত্র্যবিনাশী পশ্চিমীভবনের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সমাজবন্ধনকে দৃঢ় করেছিল।

উদারমানা এই ব্রাহ্মণ বর্ণব্যবস্থাকে সমর্থন করলেও অস্পৃশ্যতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। এমন কি, হিন্দুদের উপর সাম্যধর্মী মুসলমান শাসনকে এই পাপের ঈশ্বরপ্রেরিত প্রায়শ্চিত্ত বলেও বর্ণনা করেছেন।

উপসংহার

১. ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই দেশে সর্ব প্রথম সমাজতত্ত্বের সম্ভাবনা ও অনুসরণযোগ্য পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করেছিলেন।

২. বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বোঝার উপরে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

৩. ইংরাজীতে শিক্ষিত গোষ্ঠীদের পরানুচিকীর্ষা এবং আপন সমাজ ও সংস্কৃতির বিদ্বেষমূলক সমালোচনার উত্তরে ভূদেব ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পরম্পরার বৈশিষ্ট্য ও প্রাণশক্তিকে ব্যাখ্যা করতে উদ্যোগী হন।

৪. ভূদেব **সামাজিক প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ** ও **আচার প্রবন্ধ**-এ হিন্দুদের সমাজ জীবন ও ব্যক্তি জীবনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখান এবং ভারতীয়দের জাতীয়ভাবের উপাদানগুলি পরীক্ষা করেন। হিন্দু সমাজের শক্তি ও দুর্বলতা, জীবনধারা ও মূল্যবোধ বোঝানোর জন্য সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনামূলক আলোচনার পথিকৃৎ ভূদেব।

৫. ভূদেব ভারতীয়দের বৈচিত্র্যে মধ্যে ঐক্যের সূত্র সন্ধান করে ভারতীয় সংস্কৃতিতে মুসলমানদের অবদান, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, জাতীয় ভাষা রূপে হিন্দু ভাষার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

ভূদেব সামাজিক বৈষম্যকে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করতেন। বর্ণ ব্যবস্থায় তাই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি অস্পৃশ্যতাকে বর্ণ ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য বলে কখনই বিবেচনা করেন নি।

গ্রন্থপঞ্জী

১। চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার (সম্পা) **সামাজিক প্রবন্ধ : ভূদেব মুখোপাধ্যায়।** কলিকাতা ১৯৮১

২। লাহিড়ী, শিপ্রা **ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য ;** কলিকাতা ১৯৭৬

৩। Raychaudhuri, Tapen **Europe Reconsidered : Perceptions of the west in Nineteenth Century Bengal;** Delhi 1988.

১২.৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

উদ্দেশ্য

ক একের এই খণ্ডটি পাঠ করলে আপনারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করবেন।

২.১ বিদ্যাসাগরের জীবনে কয়েকটি মুখ্য ঘটনা

২.২ বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রবাহের প্রধান তিনটি ধারা

২.৩ সমাজসংস্কারে বিদ্যাসাগরের সমাজ বিশ্লেষণ ও কর্মোদ্যোগ

২.৪ বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের প্রধান চারটি ধারা

২.৫ বিদ্যাসাগর কীভাবে দেশাচারে স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান যথার্থভাবে প্রয়োগ করে এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে তথ্য সংগ্রহ করেও সেই তথ্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা

২.৬.ক শিক্ষা সংস্কারের দ্বারা বাঙালির মননে আধুনিকতার উদ্বোধনে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা

২.৬.খ. শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের প্রয়াস

২.৭ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে বিদ্যাসাগেরর প্রয়াস

২.৮ বিদ্যাসাগরের ধর্ম নিরপেক্ষতা ও উদারমানবতাবাদ

প্রস্তাবনা :

ভারতীয় সমাজকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণের প্রচেষ্টায় রামমোহন রায়ের পরেই বিদ্যাসাগরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২.১ বিদ্যাসাগরের জীবনের কয়েকটি মুখ্য ঘটনা

বীরসিংহ গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কঠোর দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করে বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত হন। পরবর্ত্তীকালে নিজের চেষ্টায় ইংরাজী ভাষা ব্যবহারেও যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদনগুলির বিস্ময়কর সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। আপন প্রতিভা ও কর্মোদ্যোগে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিত থেকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃপক্ষের সাথে মতান্তরের জন্য চাকুরী পরিত্যাগ করে লেখক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকের স্বাধীন বৃত্তিতে অসামান্য কুশলতার পরিচয় দেন। কিন্তু ব্যক্তিগত উন্নতির উদাহরণ হিসাবে নয়, আপন সমাজের যুক্তিবাদী কিন্তু সহৃদয় সমালোচনা ও আধুনিক কালের উপযোগী সমাজ সংস্কারের জন্যই চিরস্মরণীয় বিদ্যাসাগর।

২.২ বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রবাহের প্রধান তিনটি ধারা

পরম্পরাগত সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতির বিশ্লেষণ ও তার পরিবর্ত্তনের জন্য বিদ্যাসাগরের প্রয়াস প্রধানতঃ

তিনটি ক্ষেত্রে দেখা যায়—(১) সমাজক্ষেত্র, (২) শিক্ষাক্ষেত্র এবং (৩) সাহিত্যক্ষেত্র।

সমাজক্ষেত্রে বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিরোধ ও বাল্যবিবাহ রদের জন্য বিদ্যাসাগর আজীবন সংগ্রাম করেছেন নানাবিধ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। পুস্তকরচনা ও প্রকাশ, সংস্কৃত কলেজে নতুন পাঠক্রম প্রণয়ন ও প্রচলন, স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

শিক্ষাবিষয়ক ও সমাজসংস্কারমূলক গ্রন্থরচনার সূত্রে সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন বিদ্যাসাগর। পরে সংস্কৃত ও বিদেশী গ্রন্থের ভাব অলম্বনে সাহিত্যগুণ সম্পন্ন গ্রন্থ ও রচনা করেন বিদ্যাসাগর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।" সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্য কীভাবে একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছিল বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিতে। এটি নিঃসন্দেহে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক।

২.৩ সমাজসংস্কারে বিদ্যাসাগরের সমাজভাবনা ও কর্মোদ্যোগ

বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রচেষ্টা। তিনি নিজেই বলেছেন, "বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।" একমাত্র পুত্র নারায়ণের বিধবাবিবাহের সমর্থনে লেখা পত্রে তিনি এই মন্তব্য করেন। এজন্য তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে তৈরী ছিলেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি নির্ভীকভাবে ঘোষণা করেছিলেন ÷ "আমি দেশাচারের দাস নহি, নিজের বা পরের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক মনে করিব তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"

তার এই ঘোষণায় একদিকে পরম্পরাশাসিত সমাজের স্থবিরত্বের মূল কারণ অর্থাৎ দেশাচারের দাসত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে। অন্যদিকে এর মধ্য দিয়ে সমাজ ও সংস্কারের জন্য এই দাসত্ব মোচনের গুরুত্ব ও সংকল্প ঘোষিত হয়েছে। এই সংকল্প রেনেসাঁস বা বিচারশীল ও সৃষ্টিশীল মানবতার নবজাগরণ সম্ভূত জ্ঞান-বুদ্ধি-চৈতন্যে প্রবুদ্ধ মানবহৃদয়ের প্রতিজ্ঞা। রেনেসাঁসের ফলেই জন্ম হল আধুনিক মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও জ্ঞান, প্রেম ও কর্মে গঠিত এই ইনটিগ্রেটেড পার্সনালিটি, বা সুসংহত ব্যক্তিত্ব, 'অখণ্ড মানবতা', 'অক্ষয় পৌরুষ' যা জীর্ণ পুরাতনকে বিসর্জন দিয়ে যুগোপযোগী এবং ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে হিতকর ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনে যে কোনও ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। বিদ্যাসাগর এই অর্থে আধুনিক মানুষ। তাঁর মধ্যে আধুনিক মনন ও কর্মের এই শক্তি ছিল বলেই তিনি সমাজের বিধি ব্যবস্থাকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে পারেন নি। সমাজকে তিনি অকারণে বা মূঢ়ের মত আঘাত করতে যান নি। সমাজের প্রচণ্ড শক্তি সম্বন্ধে তাঁর গভীর বাস্তব জ্ঞান ছিল প্রভূত পরিমাণে। কিন্তু তাঁর এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও ছিল যে সমাজ অনড়, স্থানু ব্যবস্থা মাত্র নয়, সমাজ চলমান। তার চলার পথে মাঝে মাঝে মূঢ়তা ও অন্ধতা জমে ওঠে, শুষ্ক আচারের মরুবালুরাশি বিচারের স্রোতঃপথ গ্রাস করে ফেলতে চায়। প্রয়োজনমত সেগুলিকে সবলে দূর করে দিয়ে সমাজের চলার পথকে সুগম করে তোলা এবং সমজজীবনকে সুখ করে তোলাই সমাজধর্ম পালন। আর এইরকম সুচিন্তিত পথে সমাজ সংস্কারই প্রকৃত সমাজসেবা।

মানবীয় প্রয়াসে সমাজ পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর এই বোধ তাঁর সময়ে এদেশে খুব বেশী লোকের ছিল না। একথা সত্যি যে সমাজের বিভিন্ন অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সনাতন সমাজের ধ্যান ধারণা ও বিধিব্যবস্থা নিয়ে ডিরোজিওর ভাবশিষ্য ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর কঠোর সমালোচনা কলকাতার ভদ্র সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। তবুও দেশের অধিকাংশ লোকই মনে করত যে

সমাজের প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তনীয়। তাই বিদ্যাসাগর তাঁর সমাজ সংস্কারের পথে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই বাধা দূর করার জন্য তিনি চারধাপে বিন্যস্ত কর্মধারা গ্রহণ করেছিলেন।

২.৪ বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার প্রয়াসের চারটি ধাপ

প্রকৃত সমাজ সংস্কারকের মত বিদ্যাসাগরকে বুঝতে হয়েছে তখনকার সমাজের অবস্থা। তাঁকে মনে রাখতে হয়েছে সমাজের প্রভাবশালী অংশের কথা। তাঁকে খুঁজতে হয়েছে সেই ধরণের যুক্তির কর্মকৌশল ও প্রচার পদ্ধতি যার দ্বারা তাদেরকে সংস্কারমুখী করে তোলা হয়। কোনও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যদি সমাজকর্তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করা যায় তবে সংস্কারের জন্য আপামর জনসাধারণের সমর্থন আদায় করা যাবে। এখন, সমাজপতি ও সাধারণ মানুষ উভয়ের কাছেই সদ্‌যুক্তি তো প্রধান কথা নয়, তাদের কাছে যা শাস্ত্র আছে তা-ই ধর্ম, তা-ই যুক্তি। বিদ্যাসাগর তাই চরম নব্যপন্থীদের মত শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করেন না। বরং গভীরভাবে শাস্ত্রকে অধ্যয়ন করে শাস্ত্র থেকে দেশাচারের বিরুদ্ধে যুক্তি খোঁজেন এবং তার সংস্কারের সমর্থনে শাস্ত্রবচনের সন্ধান করেন তিনি। এই কারণেই বিদ্যাসাগর **বিধবা বিবাহের** প্রস্তাবের অবসানের জন্য বলেন, "বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম, ইহার মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে আবশ্যক।" বিদ্যাসাগরের সংস্কার প্রচেষ্টার প্রথম ধাপ তাই শাস্ত্রবিচার ও পণ্ডিতদের অনুমোদন। দ্বিতীয়তঃ, প্রভাবশালী জমিদার, ধনী, মানী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারা সেই শাস্ত্রানুমোদিত সংস্কারের সমর্থন সংগ্রহ করে সরকারের কাছে আইন প্রণয়নের জন্য আবেদনপত্র পেশ করা। তৃতীয়তঃ, সরকারকে আইন প্রণয়নে প্রভাবিত করা। চতুর্থতঃ, আইন বিধিবদ্ধ হলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই নতুন বিধিকে কার্যকরী করে তা হিন্দু সমাজের দ্বারা সাধারণভাবে গ্রাহ্য করা। বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তনে এই শেষ কার্যে বিদ্যাসাগর পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেছিলেন—বিদ্যাসাগর জীবনীর তা শ্রেষ্ঠ ঘটনা।

২.৫ দেশাচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের শাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োগ ও তথ্যাবলীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রধান বাধা ছিল—ধর্ম নয়, শাস্ত্র নয়, দেশাচার। বিদ্যাসাগর এ কথা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। বস্তুতঃ এই ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্লেষণ ও আলোচনায় এক প্রখর সমাজতাত্ত্বিক বোধ (সোসিওলজিকাল আণ্ডারস্ট্যান্ডিং) এর পরিচয় পাওয়া যায়। 'বিধবাবিবাহ—দ্বিতীয় পুস্তক'-এ বিদ্যাসাগরের কাতর মন্তব্য "ধন্য রে দেশাচার। তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা। তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস! তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিস, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে, ধর্মও অধর্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্মও ধর্ম বলিয়া মান্য হইতেছে।" 'লোকাচারের দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খল' এর ধারণার সঙ্গে ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক এমিল দুরক্যাঁর (emile durkheim এর) 'সামাজিক ঘটনা' (সোশ্যাল ফ্যাক্ট) সম্পর্কিত প্রত্যয়ের গভীর সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। বিদ্যাসাগর তাঁর নিপুণ বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন কীভাবে লোকাচারের যুক্তিহীন অনুশীলন ও অভ্যাস সমাজের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনে প্রতিবন্ধকতা ও অন্যান্য অনর্থের সূচনা করে। এই ক্ষেত্রে তাঁর ধারণার সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক ডেনিস রং (Denis wrong) এর মাত্রাতিরিক্তভাবে সামাজিকীকৃত মানুষ (Oversocialised Conception of man) এর ধারণার বিস্ময়কর মিল দেখা যায়।

বিদ্যাসাগর দেখিয়েছিলেন ঐতিহ্যের নির্বিচার ও সার্বিক বিসর্জন প্রকৃত সমাজদৃষ্টির ও সমাজতাত্ত্বিক বোধের পরিচায়ক নয়। অবস্থাবিশেষে ও প্রয়োজনমত ঐতিহ্যের বিশেষ বিশেষ উপাদানকে সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন

ঐতিহ্যশাসিত সমাজের অযৌক্তিক ও ক্ষতিকর বিধিব্যবস্থার যুক্তিসম্মত পরিবর্ত্তনের জন্য। শাস্ত্রকে মেনে চলে বলে যে ভারতীয় সমাজ দাবী করে সেই সমাজের যুক্তিহীন লোকাচারকে বদলানোর জন্য শাস্ত্রবচনের সাহায্য নেন বিদ্যাসাগর। তাই অমানবিক লোকাচারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত তথ্য ও যুক্তির সন্ধানে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর অশেষে ক্লেশ স্বীকার করে শাস্ত্রসাগর মন্থন করেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব, স্কন্দপুরাণ, প্রয়োগপারিজাতধৃত স্মৃতি প্রভৃতি উৎস থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করলেন যে দেশাচার বা শিষ্টাচার অথবা লোকাচার কখনও শাস্ত্র অপেক্ষা প্রবলতর যুক্তি বা প্রমাণ হতে পারে না। শাস্ত্র ও লোকাচারের মধ্যে বিরোধ ঘটলে শাস্ত্রকেই মানতে হবে।

বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়েই এই মত প্রতিষ্ঠা করলেন যে কলিযুগে পরাশরসংহিতাই বিশেষভাবে মান্য এবং পরাশরসংহিতায় বিধবা বিবাহের অনুমোদন রয়েছে। যে পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য ও সততার সঙ্গে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করেছেন তা পণ্ডিতবর্গের মধ্যেও দুর্লভ। তিনি একই সঙ্গে সদ্‌যুক্তি ও তর্ক বুদ্ধির মিলনে এবং শাস্ত্রপ্রমাণের প্রয়োগে প্রাক্তন সমাজচিন্তাকে যতটা সম্ভব যুগোচিত করে তুলতে প্রাণপন চেষ্টা করেছেন।

এই প্রচেষ্টা বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তনের মত বহুবিবাহ রোধের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন শাস্ত্র পর্যালোচনা করে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করলেন যে "যদৃচ্ছাক্রমে মত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না।" বহুবিবাহ রচিত হওয়া উচিৎ কিনা পুস্তকে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে বল্লালী আমলে প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য প্রথার অপকর্ষের সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করেন তিনি।

শুধু তা-ই নয়, কুলীন প্রথা ক্রমশঃ হীনবল হয়ে পড়েছে এই দাবীর অসারত্ব প্রমাণ করার জন্য বিদ্যাসাগর বাস্তব সমাজজীবন থেকে বিপুল তথ্যের অবতারণা করলেন। শুধু হুগলী জেলা আর জনাই গ্রাম থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে বহুবিবাহ বিশারদ কুলীন ব্রাহ্মণদের নামধামশুদ্ধ তালিকা পেশ করলেন। বস্তুনিষ্ঠ ও প্রয়োগবাদী (empirical) সমাজসমীক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এটি।

একইরকম ভাবে বিধবাবিবাহ সম্পর্কে বিরূপ লোকমতের বিরোধিতা করে সমাজজীবন থেকে একাধিক বাস্তব দৃষ্টান্ত দাখিল করে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে লোকাচার অপরিবর্ত্তনীয় নয় মোটেই, সমাজের যে কোনও ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে লোকাচারের পরিবর্ত্তন ঘটে চলে। যেমন, বিদ্যাসাগরের সময়ে বৈদ্যরা উপবীত ধারণা করত এবং তারা মৃতশৌচ পালন করত ১৫ দিন। কিন্তু তার আগে বৈদ্যদের উপবীত ধারণা করার বিধি বা লোকাচার ছিল না এবং লোকাচার অনুযায়ী তাদের অশৌচ কাল ছিল একমাস। বিদ্যাসাগরের প্রশ্ন—যদি এসব ক্ষেত্রে লোকাচারের পরিবর্ত্তনে সমাজের আপত্তি না হয়ে থাকে তাহলে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে সমাজ অনড় মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে কেন? শুধু যুক্তিতর্ক নয়, কেবলমাত্র তত্ত্বব্যাখ্যার দ্বারা নয়, সাথে সাথে সমাজজীবন থেকে বাস্তব দৃষ্টান্ত ও তথ্য প্রয়োগ করে বস্তুনিষ্ট, তথ্যভিত্তিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সূত্রপাত স্পষ্ট লক্ষণীয় বিদ্যাসাগরের সমাজ বিশ্লেষণে।

একই যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বাল্যবিবাহের মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক ত্রুটিগুলি দেখিয়েছেন বিদ্যাসাগর। মহাকাব্য ও পুরাণে কাহিনী এবং বিবাহ সম্পর্কিত শাস্ত্রোক্ত বিধি পর্যালোচনা করে তিনি এই মত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যে, "পূর্বকালে প্রায় সবজাতি মধ্যেই অধিক বয়সে দারক্রিয়া (অর্থাৎ বিবাহকার্য) সম্পন্ন হইত।" উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগরের তত্ত্ববিশ্লেষণ, তথ্য সন্নিবেশ ও সমালোচনী দৃষ্টির যথার্থ প্রয়োগ নিঃসংশয়ে এদেশে সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনার ভিত্তি স্থাপন করেছিল একথা বোধ হয় বলা যায়।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের সমাজ বিশ্লেষণের প্রধান লক্ষ্য ছিল এই বিশ্লেষণের ফলে প্রকটিত সামাজিক ত্রুটি ও সমস্যাকে অতিক্রম করা, সমাজকে যুক্তি ও সমাজহিতের নীতি অনুযায়ী বদলানো। এই বদলানোর জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন তিনি। এখানেই তাঁর অজেয় পৌরুষের কঠিন পরীক্ষা দিয়েছিলেন তিনি। বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন ও বহুবিবাহ রোধ এই দুই ক্ষেত্রেই জনমত সংগঠনের পাশাপাশি আইন প্রণয়নও চেয়েছিলেন তিনি। তার জন্য আবেদনপত্রগুলিতে কয়েক সহস্র লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। বিরোধীরাও সমসংখ্যক বা আরও বেশী স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন করেছিল সরকারের কাছে বিধবাবিবাহ অনুমোদন করে আইন যাতে না হয় তার জন্য। বহু অপবাদ ও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল বিদ্যাসাগরকে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আইন যাতে পাশ হয় তার জন্য। বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আইন প্রচলিত হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বহুবিবাহ রোধের জন্য সরকারী আইন প্রণয়ন শেষ পর্যন্ত হয় নি। শেষ পর্যন্ত ভারত স্বাধীন হবার পরে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন প্রণীত হয়। তার আগে পর্যন্ত কিন্তু বিদ্যাসাগর বিরোধীদের কথা সত্য হয় নি—বহুবিবাহের কুপ্রথা আপনা আপনি উঠে যায় নি। বিধবা বিবাহের আইন প্রণয়ন হবার পর বাস্তবে এই বিবাহের যাতে চল হয়, সমাজ তার জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগ নেন তিনি। এর জন্য সাধারণ মানুষের শুভেচ্ছা পেলেও বিদ্যাসাগরকে নানারকম মানসিক অত্যাচার এমন কি শারীরিক পীড়নের ভয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই বিষয়ে নানাভাবে প্রতারিতও হয়েছিলেন তিনি। লোকভয়ে ও প্রতারণায় তিনি কিন্তু দমেন নি। নিজের ছেলের বিধবাবিবাহের প্রস্তাবকে অকুণ্ঠ সমর্থন ও আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন তিনি। পরিবর্তনের জন্য এই অসংকোচ ও নির্ভীক কর্মোদ্যোগ বিদ্যাসাগরের আধুনিক মনের, বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদের পরিচায়ক।

বস্তুতঃ বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ প্রথা ও বাল্যবিবাহ রোধের জন্য সকল প্রচেষ্টাতেই হৃদয়ধর্মে উদ্‌বুদ্ধ প্রাণধর্মে প্রবল মানবতাবাদী বিদ্যাসাগরের পরিচয় পাই আমরা। এইসব প্রয়াসের মধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ করি স্ত্রী জাতির অধিকারের সংগ্রাম। এই সংগ্রামও কিন্তু মানবাধিকার (রাইট্‌স্ অব ম্যান) অর্জনকল্পে আধুনিক মানুষের সংগ্রামের মুখ্য এক রূপ। তবে এই বিষয়ে বিদ্যাসাগর বোধ হয় সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানের চেয়ে বেশী করে পরিচালিত হয়েছিলেন তাঁর হৃদয়াবত্তার দ্বারা— অভিজ্ঞতালব্ধ আন্তরিক আবেগের দ্বারা। তিনি শুধুই বুদ্ধিচালিত, যুক্তিচালিত মানবতাবাদী নন— যেমন প্রধানতঃ ছিলেন (যদিও পরমার্থ বিশ্বাসী) রামমোহন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিপীড়িত স্ত্রীজাতির বিবিধ অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন, বঞ্চিত স্ত্রীজাতির আবেগঅনুভূতির সঙ্গে একাত্মতা (empathy) স্থাপন করতে পেরেছিলেন। এই একাত্মতাই তাঁর সমাজসংস্কারের সংগ্রামের প্রেরণা। তাঁর অক্ষয় মনুষ্যত্ব নিয়ে, অজেয় পৌরুষকে হাতিয়ার করে এগিয়ে গিয়েছিলেন এই সমাজকে স্ত্রীজাতির বাসযোগ্য করে তোলার কাছে আধুনিক মানবতার অগ্রদূত বিদ্যাসাগর।

২.৬.ক. শিক্ষা সংস্কারে আধুনিকতার ভগীরথ বিদ্যাসাগর

স্ত্রী জাতির অবস্থার উন্নতির জন্য, সাধারণভাবে সমাজের মূল্যবোধের পরিবর্ত্তনের জন্য আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন বিদ্যাসাগর। ইউরোপীয় সভ্যতার আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান এদেশের মানুষের মধ্যে না ছড়িয়ে দিতে পারলে রক্ষণশীলতার অচলায়তন ভাঙ্গা যাবে না বলে মনে করেছিলেন তিনি। বস্তুতঃ শিক্ষাকেন্দ্রে তাঁর সমস্ত সংস্কারকর্মের মূল উদ্দেশ্যই ছিল সনাতনপন্থী সামাজিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির পরিবর্ত্তন সাধন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েই তিনি কলেজের পরিচালন ব্যবস্থায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন আনলেন। অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা, পাঁজিকে অনুসরণ না করে ছাত্র সাধারণের পক্ষে সুবিধাজনক ছুটির সঠিক নিয়ম প্রবর্ত্তন, আগের মত শুধু ব্রাহ্মণ বৈদ্যই নয় উচ্চবর্গের সমস্ত হিন্দু শিক্ষার্থীর কলেজে প্রবেশাধিকার প্রদান প্রভৃতি তার উদাহরণ। তবে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার শিক্ষানীতির পরিবর্ত্ত।

তিনি চেয়েছিলেন সংস্কৃতের জ্ঞানভান্ডার ও ইংরাজী জ্ঞানসম্ভারের সম্মিলিত সম্পদে ঐ কলেজের ছাত্রদের সমৃদ্ধ করে তুলতে যাতে তাঁরা বিশেষভাবে ভারতীয় ভাষাগুলিকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার দানে পরিপুষ্ট করে তুলতে পারেন। আধুনিক যুগের বিজ্ঞান ও আধুনিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদে চরমসীমায় যেতেও কুণ্ঠিত বোধ করেন নি। কোম্পানীর সদস্যের শিক্ষাপরিষদের কাছে এক চিঠিতে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছিলেন ÷

কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য বেদান্ত না পড়িয়ে উপায় নেই। .....বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নেই। .....সংস্কৃতে যখন এগুলি শেখাতে হবে, এদের প্রভাব কাটিয়ে তুলতে ইংরেজীতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ানো দরকার।

বিদ্যাসাগরের মতে মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, **দেশের কুসংস্কারের কবল থেকে মুক্তি** শিক্ষকদের এ গুণগুলি থাকা চাই। গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জনের জন্যই ছাত্রদের ইংরাজী ও সংস্কৃতি দুই ভাষায় বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে পড়তে হবে। দুই সূত্র থেকে প্রাপ্ত তত্ত্ব ও তথ্যের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা তারা আপন বিচার বুদ্ধিকে যুক্তি বোধকে শানিত করতে পারবে। তাঁর এই শিক্ষানীতি রূপায়ণের জন্যও বহু প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে বিদ্যাসাগরকে যেখানে কিছুতেই তিনি নিজের কোনও নীতিকে বাস্তবে রূপদান করতে পারেন নি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অযৌক্তিক ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সেখানে তিনি যুক্তিচালিত বিবেক ও কর্ত্তব্যবোধের তাড়নায় উচ্চ বেতনের সরকারী চাকুরী এক কথায় ছেড়ে দিয়েছেন একাধিকবার।

বিদ্যাসাগরই সময়োপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতির প্রথম ব্যাখ্যাকার। তাঁর প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতির প্রাণবস্তু আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান। কুসংস্কারের কবল থেকে মুক্তির জন্য দরকার আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিতি। তার বাহন হবে মূলতঃ জাতীয় (বিদ্যাসাগরের কাছে বাংলা) ভাষা। জাতীয় ভাষার সম্যক উন্নয়ন করতে হবে যাতে তা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বাহন হয়ে উঠতে পারে। সে জ্ঞান আহরণ করতে হবে ইংরেজী (ইংরেজিই তখন পাশ্চাত্য জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার) ভাষা ও সাহিত্য থেকে। আর দেশজ ভাষার সবল, স্বচ্ছ ও সাবলীল রচনারীতি আয়ত্ত করার জন্য সংস্কৃতের সহায়তা দরকার যদিও দেশজ ভাষা সবলতা অর্জন করলে সংস্কৃতের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে। এই জ্ঞানচর্চ্চার ক্ষেত্রে এই ত্রিভাষা নীতিতে ইংরাজীতে দৌত্য অস্বীকার না করলেও ইংরাজী ভাষার দাসত্বকে স্বীকার করবে না। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করতে হলে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করতে হবে এই বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যাসাগরের ছিল।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা সুগম করার জন্য বিদ্যাসাগর নূতন প্রণালী বা কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন। সেই কৌশল ব্যবহার করে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উপক্রমনিকা রচনা করেছিলেন শিক্ষার্থীদের জন্য। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, বুদ্ধি, ভাষাবোধ ও শিক্ষামানের কথা বিবেচনা করে বাংলায় রচিত তাঁর শিশুপাঠ্য গ্রন্থগুলি একদিকে যেমন তাঁর বাস্তববোধ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক তেমনই অন্যদিকে তা পাঠ্য রচনা রীতিতে তাঁর নিপুণ কুশলতার পরিচয়বাহী। 'বর্ণপরিচয়' এ বর্ণজ্ঞান থেকে শিশু বা নিরক্ষরকে পদে পদে তিনি হাতে ধরে নিয়ে যান। এভাবে বাংলাভাষার বর্ণবোধের শব্দমালাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুসম্বদ্ধ করা বিদ্যাসাগরেরই কীর্তি। দ্বিতীয় ধাপে 'কথামালার নীতিমূলক গল্প, তৃতীয় ধাপে 'চরিতাবলী'-র দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামের সফল শিক্ষোন্নত পুরুষদের জীবনী, আর পরবর্তী ধাপে 'বোধহয়'-এ ঐহিক পদার্থ সমূহের আবশ্যিক জ্ঞানের পরিবেশন বিদ্যাসাগরের সুশৃঙ্খল শিক্ষাচিন্তার পরিচায়ক। শেষ পর্যন্ত উৎসুক শিক্ষার্থীকে 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি সাহিত্যকৃতির চিরন্তন রসসম্পদের দুয়ারে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেন তিনি। আধুনিক সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে ঐহিক জীবনের কথাই

মুখ্য বিদ্যাসাগরের এ গ্রন্থগুলিতে। আধুনিক জীবন ; পৃথিবীর জ্ঞান ; বৈজ্ঞানিকদের জীবন সংগ্রাম ; অখ্যাত দরিদ্র মানুষদের শিক্ষা, পরিশ্রম ও স্বকীয় উদ্যোগের সাহায্যে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ, ব্যক্তির জয়গানের সঙ্গে বিচারবুদ্ধি ও বিবেকের উদ্বোধন, পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণনীতির বোধ জন্মানো এই সবই ছিল এই সব গ্রন্থের মূল কথা এবং বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতির ভিত্তি। আজও এই ভিত্তি অপরিত্যাজ্য। অবশ্যই একালের দৃষ্টি অনুযায়ী রঙে রসে ছবিতে ছড়ায় সঞ্জীবিত করে এই বাস্তব শিক্ষাকে মনোরঞ্জন করার প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়।

২.৬.খ. শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস

বালিকা বিদ্যালয় আয়োজনের মাধ্যমে নারী সমাজের উন্নতির ভিত্তিস্থাপন তথা বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে জনশিক্ষার আয়োজন বিদ্যাসাগরের জীবনের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চেয়েছিলেন সুবিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত বাংলা শিক্ষা যাতে ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিতের সাথে সাথে আধুনিক গণিত, পদার্থবিজ্ঞা, শারীরতত্ত্ব ইত্যাদি শেখারও ব্যবস্থা থাকবে ঐহিক জীবনে শ্রীবৃদ্ধি লাভের উপায় হিসাবে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকলীন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনস্পেক্টার অব কলেজের দায়িত্ব পেয়ে অতি অল্প সময়েই ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় ও ২০টি মডেল স্কুল স্থাপনার ব্যবস্থা করেন তিনি। অবশ্য, পরবর্ত্তীকালের ব্রিটিশ আমলাদের ও এদেশীয় অভিজাতবর্গের উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে এগুলি বন্ধ হয়ে যায়। তবে বেথুন কলেজের সম্পাদক রূপে কলেজের জন্য নিয়মিত ছাত্রীসংগ্রহে ও সুশৃঙ্খল পরিচালনার ব্যবস্থা করায় এবং মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজকে গড়ে তোলায় বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত প্রয়াস চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে। নারীর উন্নতি বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রধান ধ্যান, সমস্ত সামাজিক প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দু। জীবনর শেষ পর্যায়েও (১৮৯০) তিনি বীরসিংহ গ্রামে স্থাপন করেন, 'ভগবতী বিদ্যালয়' আর কার্মাটারে চালাতেন পাঠশালা। যতক্ষণ পর্যন্ত কিছুমাত্র শারীরিক সামর্থ্য অবশিষ্ট ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজ ছিল তাঁর সাধনার ক্ষেত্র। মেট্রোপিলটান কলেজই বাঙালী পালিত প্রথম বেসরকারী কলেজ যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এক শ্রেষ্ঠ কলেজে পরিণত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের পরিচালন-নৈপুণ্যে ও আন্তরিক নিষ্ঠায়। বিদ্যাসাগর অবশ্য পরবর্ত্তী কালে বুঝতে পেরেছিলেন এদেশীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকের উদ্দেশ্য হয়ে উঠছিল লেখাপড়া শিখে গাড়িঘোড়া চড়া, ভারতীয় সমাজকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকিত করে আধুনিক পৃথিবীতে জীবন্ত গতিবেগ সম্পন্ন সমাজ রূপে গড়ে তোলা নয়— এমনকি স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে নারীর অবনত সামাজিক স্থিতির উন্নতিসাধনও নয়। কিন্তু তাঁর সমাজ বিশ্লেষণে তিনি বুঝেছিলেন আধুনিক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে ভারতীয় সমাজকে জনশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার অগ্রসর হতে হবে এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে করায়ত্ব করতে হবে। এবং বহু ব্যর্থতাবোধ সত্ত্বেও এই প্রচেষ্টায় আজীবন ব্রতী ছিলেন বিদ্যাসাগর।

২.৭ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে বিদ্যাসাগরের অবদান

সাহিত্য সৃষ্টি বিদ্যাসাগরের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। তবু তিনি জানতেন প্রাঞ্জল, মার্জিত বাংলা না হলে পাঠ্যপুস্তকও নীরস ও অপাঠ্য হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীর বয়স ও বুদ্ধির মান অনুযায়ী শিক্ষনীয় বিষয়কে বিশুদ্ধ মার্জিত এবং সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। পুস্তক রচনায় সেটাই হল মুখ্য শিল্প। আর এ শিল্পের উৎকর্ষ আমরা প্রথম দেখি বিদ্যাসাগরের মধ্যে। এদিক থেকে তিনি যুগান্তকারী সংস্কারক।

বিদ্যাসাগরের রচনার দ্বিতীয় বিভাগ সমাজ সংস্কারমূলক রচনা। তার দুটি ভাগ— প্রচারমূলক বিচার প্রধান লেখা এবং বেনামীতে প্রচার ভিত্তিক লেখা। বিদ্যাসাগরের রচনাবলী যেগুলি প্রথমোক্ত শ্রেণীতে পড়ে সেগুলিও সফল হয়েছে কারণ তাঁর এইসব বুদ্ধিগ্রাহ্য রচনাও নীরস নয়। বরং যুক্তির দীপ্তি, চিন্তার সর্বব্যাপী শৃঙ্খলাবোধ, রুচির ও ভাষার মার্জিত সংযম এবং উদ্দেশ্যের গাম্ভীর্যে (seriousness) এগুলি সমুজ্জ্বল। উপরন্তু আবেগের স্পর্শ

লাগাতে এই বুদ্ধিগ্রাহ্য লেখাও যে কত অমোঘ ও হৃদয়স্পর্শী হতে পারে তা তাঁর বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক-এ সুস্পষ্ট। আবার প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত কৌতুকব্যঙ্গে মুখর উল্লাসিত বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনাগুলির ভাষাও সরস, সতেজ চলিত ভাষার আদি সংস্করণ। তাঁর এই রচনাগুলি ও রসবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

তাঁর প্রবন্ধগুলি যেমন 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক প্রবন্ধ, চিন্তার স্বচ্ছতায়, বুদ্ধির ও বিদ্যার সুস্থিত আয়োজনে এবং ভাষার মার্জিত শ্রীতে উপভোগ্য এবং বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁর সংকলিত ও সম্পাদিত বিভিন্ন গ্রন্থের বিজ্ঞানপগুলি বৈজ্ঞানিক সমালোচনা দৃষ্টির সুদৃষ্টান্ত।

আর সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি বাল্মীকি ও কালিদাস ও ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি সেক্সপীয়র-এর রচনার ছায়া অবলম্বনে রচিত সাহিত্যকর্মগুলি যথা, 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা', 'ভ্রান্তি বিলাস' সাহিত্যিক ও গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগরের যুগোপযোগী রসবোধের সুষমামণ্ডিত উদাহরণ।

শিক্ষাপ্রয়াসে বিদ্যাসাগর আশানুরূপ সাফল্য পান নি অথচ এখনও তাঁর শিক্ষানীতি অপ্রাসঙ্গিক নয়। সমাজ সংস্কারে তাঁর সাফল্য আরও কম। কিন্তু যে সাহিত্য কর্মে বিদ্যাসাগর বিশেষ আত্মনিয়োগ করতে পারেন নি আজকে বিচারে সেখানেই তাঁর সাফল্য অবিসংবাদিত এবং শাশ্বত। রবীন্দ্রনাথ তাই বোধ হয় বলেছেন, "তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা।"

২.৮ ধর্ম নিরপেক্ষ উদার মানবতাবাদের প্রতিভূ বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসগারের অপরিসীম মানবদরদের বহু কাহিনী প্রচলিত। তাদের অধিকাংশেরই ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। এদের মধ্যে মাত্র কয়েকটিকে বেছে নিলেও সেগুলির মধ্যে সর্বমানবের প্রতি তাঁর সত্যিকারের সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ১৮৬৭ সালের সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষে পীড়িত মানুষদের সাহায্যের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে লঙ্গরখানা খোলেন বিদ্যাসাগর। এইখানে বিভিন্ন জাতপাতের মানুষ আশ্রয় পেয়েছিল এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত আশ্রিতদের ব্যক্তিগত সেবায় তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ। দুই, ১৮৬৮ সালে তিনি কয়েক সপ্তাহের জন্য বর্ধমানে যান বায়ু পরিবর্তনের জন্য। তাঁর বাসার কাছেই ছিল মুসলিমদের একটি বস্তি। প্রথমে বস্তির শিশুদের সঙ্গে, পরে তাদের বাবাদের সঙ্গে হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে বিদ্যাসাগরের। তিনি ভালরকম অর্থ সাহায্য করেন দরিদ্র মুসলিম বস্তিবাসীদের। পরের বছরেই যখনই ওই বস্তিতে কলেরা দেখা দেয় তখন মুসলিম শিশুদের অকুণ্ঠচিত্তে কোলে তুলে নেন বিদ্যাসাগর। তাঁর যজ্ঞোপবীত অপবিত্র হয়ে যায়নি তাতে। শেষতঃ, জীবন সায়াহ্নে তিনি কার্মাটারে কালযাপন করেন আদিবাসী সাঁওতালদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। এদেশের জনসমাজের অবহেলিত গোষ্ঠীসমূহের একাংশের এই মানুষগুলিকে আন্তরিকভাবে আপন করে নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তাদের উন্নতিকল্পে বিদ্যাসাগরের সাহায্য প্রদানের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের জন্য কার্মাটারে বিদ্যালয় স্থাপন। বিভিন্ন জাতগোষ্ঠী, ধর্মীয় সম্প্রদায় ও নৃজাতির সমন্বয়ে গঠিত যে ভারতীয় সমাজ তাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে তার প্রকৃতি যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই এই সমাজের যোগ্য সদস্য হবার প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। প্রকৃত ধর্ম নিরপেক্ষ আধুনিক মানুষ হিসেবে জাতপাত, ধর্ম সম্প্রদায় ও নৃজাতি (ethnic group) সংক্রান্ত ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। বিদ্যাসাগরের এই সমাজবীক্ষা ও জীবনচর্যা ভারতীয় সমাজতত্ত্বের ছাত্রদের কাছে বিশেষ মূল্যবান।

গ্রন্থপঞ্জী

১। ঘোষ, বিনয় **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**। কলিকাতা ১৯৭০

২। Poddar, Arabinda **Renaissance in Bengal : Quests & Confrontations** simla 1970

৩। বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র **বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ** (১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড) কলিকাতা ÷ সাক্ষরতা প্রকাশন ÷ ১৯৭২

একক ১৩ ❐ বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ

গঠন

১৩.১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৩.২ স্বামী বিবেকানন্দ

১৩.১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রস্তাবনা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মূলতঃ সাহিত্যিক রূপেই বাঙালির কাছে পরিচিত। তিনি বাংলার প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা ছিল বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন। সাথে সাথে তাঁর বিবেচনায় হিন্দু ঐতিহ্যের যা শ্রেষ্ঠ অংশ, তার উপরে ভিত্তি করে দেশবাসীকে জাতীয় চেতনায় উদ্দীপিত করাও তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল। আপন সমাজের ঐতিহ্যের বিশ্লেষণে ও সমসাময়িক দেশ ও কালে স্বদেশবাসীর ও ব্রিটিশ শাসকদের আচরণের যুক্তিশাণিত ও বিদ্রুপাত্মক সমালোচনায়ও তিনি দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর বিশ্লেষণ ও সমালোচনা এদেশে সমাজতত্ত্বের বিকাশে বিশেষ সহায়তা করেছিল। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব যা পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় সমাজ ও সমাজতত্ত্বকে চিহ্নিত করেছে তা বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল।

উদ্দেশ্য : এই এককটিতে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পর্যালোচনার জন্য আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক পরিবেশ ও তাঁর জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

বঙ্কিমচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেছিলেন মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে। ইংরাজী শিক্ষা ও সরকারী চাকুরীর সুবাদে নবসৃষ্ট মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে তাঁর পরিবার খাতির পেয়েছিল। বঙ্কিমের পিতা ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পেয়েছিলেন যদিও বেশ পরিণত বয়সে। তাঁর সরকারী চাকুরীতে বদলির কারণে বঙ্কিমের শিক্ষায়তনের পরিবর্তন ঘটে। তাঁর শিক্ষাজীবনে ইংরাজী শিক্ষারই প্রাধান্য ছিল যদিও তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পাঠ নেন। প্রথমে হুগলী কলেজ ও পরে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। মেধাবী ছাত্র বঙ্কিম একাধিক বৃত্তিলাভ করেছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্বদ্যিালয়ের প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থীদের দলে তিনি ছিলেন। পাঠ্যক্রমে প্রকৃতি বিজ্ঞান সহ নানা ধরণের বিষয় ছিল। পরের বছর ঐসব বিষয় নিয়েই কলকাতা বিশ্বদ্যিালয়ের প্রথম দুইজন স্নাতকের একজন হন বঙ্কিমচন্দ্র। পরে তিনি আইনের পড়া চালিয়ে যান। পড়তে পড়তেই তিনি ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পাওয়ায় তাঁর কলেজজীবনে ছেদ পড়ে।

দীর্ঘ ৩৩ বৎসর কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করলেও বঙ্কিচমন্দ্র তাঁর সরকারী চাকরিতে শ্লাঘা অনুভব করেননি। সরকারি চাকুরে হিসাবে চাকরি বজায় রাখা এবং তার জন্য আমলাদের বিরাগভাজন না হওয়ার সচেতন প্রচেষ্টা বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বের একটা বিশেষ দিক ছিল এবং সেটা তাঁর বিরক্তির একটা প্রধান কারণও ছিল। 'আনন্দমঠ' প্রসঙ্গে সরকারের বিরূপতা দূর করার জন্য তাঁকে রীতিমত কষ্ট করতে হয়েছিল। এই উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে

যেখনে ইংরেজ শত্রুর কথা ছিল পরবর্ত্তী সংস্করণে সেখানে 'যবন' শব্দটি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। ঔপনিবেশিক শাসনে পরাধীন এলিট গোষ্ঠীর অন্য অনেকের মতই বঙ্কিমের পক্ষে সম্ভব হয় নি এদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তার নিয়ে কিছু লেখার বা তার সমালোচনা করার। বাংলা গভর্নমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী পদে উন্নীত হওয়ার মাত্র চার মাসের মধ্যেই সে পদের বিলোপের ফলে তিনি যখন ফের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে বহাল হন তখনও তিনি মুখ বুঁজে সে ব্যবস্থা মেনে নেন। আবার অযাচিতভাবে তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করা হলে তা তিনি প্রত্যাখ্যানও করেন নি। বোধ হয় সেখানেই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ট্র্যাজেডি এবং এই বিষাদ বোধ তাঁর পারিপার্শ্বিকের মূল্যায়নে প্রভাব ফেলেছিল।

এই ট্র্যাজেডি বঙ্কিমের একার ছিলনা। ১৮৫০ সাল থেকেই শিক্ষিত বাঙালী ও ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের আনুকূল্যের ভাঁটা পড়ে। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে শিক্ষিত বাঙালী ও ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের গভীর সন্দেহ ও বিরূপতার সৃষ্টি হয়। নানা রকম নূতন নূতন করের চাপ, খাদ্য শস্যের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, তুলার মূল্য হ্রাসের ফলে তুলাচাষীদের সর্বনাশা পরিস্থিতি এবং উপর্যুপরি আকালের ফলে সাধারণ ভারতীয়দের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। বিভিন্ন জায়গায় কৃষকরা বিদ্রোহও করে। আর কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বশীল পদ থেকে মধ্যবত্তি শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই আন্দোলন গণআন্দোলন বা ব্রিটিশ শাসনের অবসানের জন্য জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে পরিণত হয়নি। সরকারকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাথে সঙ্গত ও যুক্তিসহ আপোষে বাধ্য করা ছিল এর উদ্দেশ্য। অবশ্য, এই আন্দোলন স্বাজাত্যবোধ, ঐক্যবোধ, জাতীয়দম্ভ ও শ্রেষ্ঠতাবোধ এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস-এর সূচনা করে। কিন্তু পরাধীনতার করুণ কঠোর বাস্তব এই আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ও স্বাজাত্যবোধকে পদে পদে আহত করেছিল। তারই সঙ্গে ইউরোপীয় জীবনধারার অনুচিকীর্ষা একশ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত বাঙালীকে এ দেশের ঐতিহ্যের প্রতি বিমুখ করে তুলেছিল। আর ব্রিটিশের রচিত এদেশের ইতিহাসই পড়ত এদেশের লোক। ইতিহাসে পশ্চিমী সভ্যতার গুণকীর্তন ও এদেশের ঐতিহ্যের অবমাননাই ছিল সেই ইতিহাসের প্রতিপাদ্য। এই সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আবহে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজবীক্ষা গড়ে উঠেছিল।

কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে বঙ্কিম নিজের অধ্যাবসায়ে ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ করেছিলেন। যৌবনে লব্ধ জ্ঞানকে তিনি সারাজীবন ধরেই সমৃদ্ধতর করেছিলেন। সাহিত্যে সেক্সপীয়ার, বায়রন, এবং সাদি, টমসন এবং ক্যাম্বেল তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে সাহিত্যসভায় দান্তে, গ্যেটে, য়ুগো এবং বালজাক কে নিয়ে তর্কযুদ্ধ হত। তিনি ফরাসীভাষা জানতেন এবং লাতিন ও আরবী ভাষাও শিখেছিলেন। পাশ্চাত্য দর্শনের যে অংশটি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন তা হল হিউম, বেন্থাম, জেমস মিল, অগস্ত কোঁৎ ও জন স্টুয়ার্ট মিল এর দার্শনিক চিন্তাভাবনা। ইউটিলিটা রিয়ানিজম্ বা উপযোগবাদ এবং কোঁৎ-এর পজিটিভিজম্ বা প্রত্যক্ষবাদ এবং মানবতাবাদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বঙ্কিমের ইতিহাস চর্চার প্রধান সহায়ক ছিলেন বাক্‌ল এবং লেকি। মেকলের গর্বোদ্ধত ইতিহাস আলোচনার সমালোচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মানসিকতার কথা তাঁর লেখায় বারবার এসেছে। এ ব্যাপারে তাঁর চিন্তায় তাঁর যুগেরই প্রতিফলন ঘটেছে। এ মানসিকতার প্রধন উদ্‌গাতা ছিলেন বেকন ও জর্জ কুম্বের ভক্ত অক্ষয় দত্ত। ছাত্রাবস্থা থেকেই প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রতি বঙ্কিমের আগ্রহ ছিল। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত সাধারণের জন্য লেখা এগারোটি বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ এবং বিজ্ঞান ঘেঁষা দার্শনিক প্রবন্ধগুলির জন্য তিনি ডারউইন, হাক্সলি, টিণ্ডার, লাকিয়ার

প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। প্রথম জীবনে বঙ্কিমের নাস্তিকবাদের পিছনে পশ্চিম থেকে আগত বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা অন্যতম সম্ভাব্য কারণ ছিল। পরে তিনি আস্তিক হন, তবে সারাজীবনই তিনি যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে বিষয় সমূহের ব্যাখ্যা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মুক্তিবুদ্ধি জিজ্ঞাসার তিনটি পর্ব :

নানা অসুবিধার মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র চাকুরী জীবনে এবং সাহিত্য কর্মে স্বাধীন মানসিকতার উজ্জ্বল সাক্ষর রেখেছেন। যতই আকর্ষক হোক না কেন, যাচাই না করে কোনও মত বা আদর্শ গ্রহণ করতে তিনি রাজী হননি কখনও। তাই যুক্তিবাদী অন্বষার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব দার্শনিক মতবাদ আয়ত্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন তিনি। নিজের সৃষ্ট মত বা ধারণা ছাড়া কোন কিছুই নির্বিচার গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না তিনি। একদিকে তাঁর জিজ্ঞাসার স্বাধীনতা থেকেই বিনা বিচারে মহামহোপাধ্যায়দের অভিমতরে নিকট নিজস্ব বিচার বুদ্ধি বিসর্জন দিতে চাননি তিনি। অন্য দিকে যেসব পাশ্চাত্য দার্শনিকের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাদের মতবাদও তিনি সমালোচকের দৃষ্টি থেকে দেখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মুক্তবুদ্ধির এই উন্নত মস্তক প্রতিজ্ঞাই আমাদের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার।

বঙ্কিমচন্দ্রের বুদ্ধি, পঠন ও অভিজ্ঞতায় পরিশীনিত চিন্তার জড়ত্ব ছিল না সেই চিন্তা ছিল সজীব ও পরিবর্ত্তনশীল। বঙ্কিমমানসের গতিশীলতায় তিনটি পর্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্বে আমরা তাঁর অপরিমেয় প্রাণপ্রাচুর্য ও আনন্দবেগের পরিচয় পাই। দ্বিতীয় পর্বে এর সাথে নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ক্ষমতা সংযোজিত হয় এবং এই পর্বেরই শেষ দিকে বঙ্কিমমানসের দুটি স্বতন্ত্র ধারার অর্থাৎ মনের অতীত আকর্ষণ এবং চোখে সম্মুখ দষ্টির সমন্বয় সাধিত হয়। ফলে তৃতীয় পর্বে প্রাণপ্রাচুর্য এবং আনন্দবেগ এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তির সঙ্গে তাঁর নব আবিষ্কৃত সমন্বয়ের প্রচার সংযুক্ত হয়। এর ফলে তাঁর চিন্তাধারায় অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যও দেখা যায়।

বৈজ্ঞানিক মনোভাবের গুরুত্ব

নানা বৈপরীত্য সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় বৈজ্ঞানিক মনোভাব আগাগাড়োই উপস্থিত। 'বঙ্গদর্শনে'র পাতায় বিবৃত উনিস শতকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চিন্তার বিষয়গুলি যা 'বিজ্ঞানরহস্য'-কে সঙ্কলিত হয় তা বঙ্কিমের বিজ্ঞানমনস্কতার উজ্জ্বল উদাহরণ। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় আত্মসন্তুষ্টির স্থান ছিল না। তিনি জোর দিয়েছিলেন প্রমাণের উপর। এমন কি ঋষিবাক্যকেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রমাণ না থাকলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। আধুনিক মানুষের চাইতে ঋষিরা চিন্তায় অধিকতর দক্ষ একথা বঙ্কিমচন্দ্র মানতে অস্বীকার করেছিলেন প্রবলভাবে। তিনি বলেছেন, "বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিতেছেন আমি যাহা তোমার কাছে প্রতিপন্ন করিব, তুমি তাহাই বিশ্বাস করিও, তাহার তিলার্ধ অধিক বিশ্বাস করিলে তুমি আমার ত্যাজ্য।" নির্বিচারে কোনও কিছুকেই গ্রহণ করা প্রবল ভ্রান্তি। সংশয় থেকেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। আর বঙ্কিমের সমাজ ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ যুক্তিবাদী মনের সংশয় ও জিজ্ঞাসার চিহ্ন বহন করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকর্মের সমাজতাত্ত্বির প্রেক্ষা

বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজতত্ত্ব চর্চা ঃ বঙ্কিমচন্দ্র কোঁৎ-এর মতামতের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধে তিনি "বঙ্গদর্শনের জন্য **সমাজতত্ত্ব**" লিখতে বসার কথা বলেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত সমাজতত্ত্বের সম্ভাবনা ও তার পদ্ধতি নিয়ে আলাদাভাবে কিছু লেখেননি। অবশ্য বাংলার ইতিহাস বা বাঙালি সমাজের ইতিহাস লেখার প্রয়োজনীয়তা ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি।

বেঙ্গল সোশ্যাল সায়ান্স এ্যাসোসিয়েশনে বঙ্কিমচন্দ্র ''On the Origin of Hindu Festivals'' এবং A Popular Literature for Bengal'' নামে দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। অ্যাসোসিয়েশনের কার্য বিবরণীতে ঐ দুটি প্রবন্ধ যথাক্রমে ১৮৬৯ এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধে তিনি উৎসবগুলির শ্রেণী বিভাগের চেষ্টা করেন ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা ব্যাখ্যা করেন। ঐতিহাসিক সূত্র থেকে উৎসায়িত কোনও উৎসব তিনি হিন্দুদের মধ্যে দেখতে পাননি। হিন্দুদের চিন্তা জগতে ঐতিহাসিক অনুষঙ্গের অভাবই এর কারণ। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি বাঙালির জনজীবনে বাংলা ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে এক যুক্তিবহ বিশ্লেষণ। যেহেতু ''দেশের জনসাধারণ ইংরেজি ভাষাবোধে একেবারেই বধির'' ইংরেজি ভাষায় মত বা আদর্শ প্রচার করলে ''জাতিব্যাপী বিরাট কাজের সূচনা কিছুতেই সম্ভবপর'' হবে না। কোনও বড় ভাবের কথা বাংলা ভাষায় বাঙালিদের বোঝাতে পারলে সে ভাব তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করবে এবং বিরাট ভাবের ঢেউ তুলতে পারবে। এই কারণেই সামাজিক দিক থেকে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি ও বিস্তৃতি অত্যন্ত আবশ্যক। ''সে সাহিত্য জাতির সাহিত্য জনসাধারণের সাহিত্য হইবে।''

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ ও তার পরিবর্ত্তনের যোগের এই বোধ বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত সাহিত্যকৃতিতেই বর্ত্তমান। তাঁর মতে ''সাহিত্যও নিয়মের ফল।... সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজ বিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্ম বিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে।'' বঙ্কিমের এই অভিনব ও বিস্ময়কর উপলব্ধির মধ্যে একটি বিষয়গত সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত সুস্পষ্ট। বস্তুতঃ বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির বহু চরিত্রের দ্বান্দ্বিক ও প্রতিবাদী সত্তায় তাঁর যুগের দ্বন্দ্ব ও সমস্যা প্রকটিত। যেমন 'দুর্গেশনন্দিনী'তে আয়েষা যখন জগৎ সিংহকে প্রাণেশ্বর বলে ঘোষণা করে, 'বিষবৃক্ষ'তে সূর্যমুখীর প্রতিবাদী সত্তা যখন কুন্দ-নগেন্দ্রনাথের বিয়ের পর গৃহত্যাগী হয়, ভ্রমর যখন গোবিন্দলালকে চিঠিতে জানায় যে যতদিন সে গোবিন্দলালের প্রতি ভক্তির যোগ্য ততদিন তারও (অর্থাৎ ভ্রমরেরও) ভক্তি, ইত্যাদি, তখন এই চরিত্রগুলি প্রচলিত সামন্ত্রতান্ত্রিক তথা সাবেকী পারিবারিক সম্পর্ক অতিক্রম করে, এবং ইউরোপীয় রেনেসাঁস-উত্তর নারীদের স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা মাঝে মাঝে আপ্তবাক্য পাই। যেমন 'কপালকুণ্ডলায় পাই 'পরের কাষ্টাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?'' এইসব বাক্যে মানুষের জীবনের অপার রহস্যের ইঙ্গিত থাকে, কখনও কখনও সমাজরহস্যের দ্যোতনাও লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রগণ্য প্রাবন্ধিকও বটে। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ ১৮৭২ সালে। বঙ্কিম সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের ফলে ''বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল''। রবীন্দ্রনাথের এই প্রশংসাবাক্য থেকেই বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানের গুরুত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র এ পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর জন্য বলেছিলেন যে সুশিক্ষিত বাঙালি বাংলা রচনার প্রতি অনাগ্রহ দেখালে বাঙালির উন্নতি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন সেকালের শিক্ষাব্যবস্থায় জনসাধারণের কোনও গুরুত্ব ছিল না। 'ফিলটার ডাউন' (অর্থাৎ অল্পসংখ্যক উচ্চবর্গকে শিক্ষিত করলেই তাদের স্তর থেকে শিক্ষার ধারা চুঁইয়ে নীচে পড়ে নিম্নবর্গকেও শিক্ষিত করবে) পদ্ধতির শিক্ষাব্যস্থাকে তিনি ধিক্কার জানিয়েছিলেন। সভ্যতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান বিস্তারের জন্য শিক্ষিত বাঙালিকে বাঙালির জন্য বাংলা, ভাষায় লিখতে হবে। 'বঙ্গদর্শন' সেই কাজটা শুরু করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও ব্যঙ্গাত্মক রসরচনা ও প্রবন্ধের সাথে সাথে

সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাহিত্যিক বিভিন্ন বিষয়ে অন্যান্য লেখকের সুখপাঠ্য ও যুক্তিবহ, রচনা ও সমালোচনা 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিহাস, প্র-তত্ত্ব, সঙ্গীত, সাহিত্য সমালোচনা, বিজ্ঞান বিষয়ে নানা রচনা 'বঙ্গদর্শন-এ মুদ্রিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সতর্ক সম্পাদনায় সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে বাংলা প্রবন্ধের উৎকর্ষের একটা মান নির্ণীত ও প্রতিষ্ঠিত হল 'বঙ্গদর্শন' এর মাধ্যমে। বঙ্কিমচন্দ্র একসময়ে ইংরেজি ভাষার ব্যবহারে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'-এ তাঁর বাংলা রচনার ভাষা ছিল দুর্বোধ্য। Bengal social Science Association এর জন্য ইংরেজীতে প্রবন্ধ রচনা ছাড়াও তিনি Mookerjee's Magazine এ ''The confessions of a young Bengal'' (1872) and ''The study of Hindu Philosophy'' (1873) লেখেন। Rajmohan's Wife শীর্ষক উপন্যাস ছাড়াও Hastie র সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম ও ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় তাঁর তর্কযুক্ত ইংরেজী ভাষা ব্যবহারে তাঁর কুশলতার প্রমাণ দেয়। কিন্তু তাঁর সমাজবীক্ষায় তিনি বুঝেছিলেন কোনও জাতির বা জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য এবং উন্নতির জন্য তার ভাষার বিকাশ একান্ত প্রয়োজন। সমবেতভাবে বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য বাংলা ভাষাকে সবধরণের ভাবপ্রকাশের ও সর্বাধিক আলোচনার উপযুক্ত বাহন হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশের এই সূত্রটি সাহিত্যিক, সমালোচক ও সম্পাদক বঙ্কিমের সমাজদৃষ্টিতে ধরা দিয়েছিল বলেই বাঙালির ভাষা ও সাহিত্য আধুনিক যুগের আশা, আকাঙ্খা ও সমস্যাকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছিল।

ইতিহাস চর্চায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব

জীবনের প্রথম দিকের রচনা Confessions of a young Bengali-তে বঙ্কিম নিজেকে ইয়ং বেঙ্গল দলের সদস্য বলে পরিচয় দিয়েছেন। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত তরুণের পাশ্চাত্যের সবকিছুর প্রশংসা এবং হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি তীব্র বিরূপতার জন্য নাম কিনেছিলেন। যৌবনে এবং মধ্য বয়সের শুরুতে বঙ্কিমের মানসিকতা অনেকটা এই ধরণেরই ছিল এবং তাঁর রচনাবলীতে তা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু পরাধীনতার গ্লানিতে ক্লিষ্ট অন্যান্য ভারতবাসীর মত তিনিও তাঁর প্রাথমিক মনোভাব বজায় রাখতে পারেননি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইউরোপের থেকে উৎকর্ষ না হোক অন্তত সমতা বোধ করার মানসিক প্রয়োজনের কথা বঙ্কিম খোলাখুলি বলেছিলেন। আর এই প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্যই বাঙালির দ্বারা বাংলার ইতিহাস, ভারতীয়দের দ্বারা ভারতবর্ষের ইতিহাস-এর গুরুত্বের কথা বলেছিলেন তিনি। জাতিকে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে, জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে গেলে ইতিহাস অনুশীলন অত্যন্ত জরুরী। ইতিহাস চর্চ্চা আমাদের আত্মস্থ হতে সাহায্য করে। অতীতের গৌরব আমাদের উৎসাহিত করে। পশ্চিমী ঐতিহ্যের তুলনায় পরাধীন জাতির ঐতিহ্যের নিম্নমান সম্পর্কে দীর্ঘস্থায়ী বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি করেছিল পশ্চিমী পণ্ডিতের সৃষ্ট প্রাচ্যতত্ত্ব বা Orientalism। ভারতে জাতীয়তাবাদের অন্যতম স্থপতি বঙ্কিম তাই এই প্রাচ্যতত্ত্বের বৈধতা নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছিলেন। ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের ইতিহাস বিশ্লেষণ আত্মাভিমানপ্রসূত এবং সেই কারণে নিরপেক্ষ নয় বলে বঙ্কিম সমালোচনা করেছেন। ''মেকলে ক্লাইভের জীবনচরিত নামক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন'' বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন তিনি। পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্য তাঁর মতে সত্যের অপভ্রংশ। মার্সম্যান প্রমুখ ঐতিহাসিক ভারতের অতীত গৌরব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত। ইউরোপীয়দের প্রাচ্যতত্ত্বের গ্রহণযোগ্য অংশটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্যের ভারততত্ত্ব থেকে জ্ঞান অর্জন করতে হলে নিজের স্বাধীন বিচার বুদ্ধি অক্ষুন্ন রাখা প্রয়োজন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতের সমস্ত তথ্য ও তত্ত্বই অভ্রান্ত নয়। এই দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের যথার্থ জ্ঞানলাভের পথে অনেকগুলি অন্তরায় ছিল বলে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছিল।

প্রথমতঃ তাঁরা যে ভারতীয়দের থেকে ভাল সংস্কৃত শিখেছেন, এই ধারণাটাই ভুল। তাঁর মতে, প্রত্যেক ভাষাই গড়ে উঠেছে একটি দেশের জীবনযাত্রা ও ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়ে। এই কারণেই যে কোনও বিদেশী বিদগ্ধ পণ্ডিতের তুলনায় একজন সাধারণ দেশবাসীরও স্বদশীয় ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে এক ধরণের সহজাত সুবিধা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু দর্শন সঠিকভাবে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় আগ্রহ বা একাত্মতাবোধ, কোনটিই ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ছিলনা। এর ফলে মাক্স মুয়েলারের মত পণ্ডিতত্ত ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।

ভারত ও ইউরোপের তুলনা করতে গিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিত এবং অর্ধশিক্ষিত পাদ্রীরা একই মানদন্ড ব্যবহার করেননি বলে বঙ্কিম অভিযোগ করেছেন। দুই ভূখণ্ডের সমাজ ও সংস্কৃতিকে তারা দুই ভিন্ন মাপকাঠিতে বিচার করেছেন। তার ফলে তাঁরা ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত তথ্যগত এবং তত্ত্বগত ভুলের জন্ম দিয়েছেন। বহু ঈশ্বরবাদ নাকি হিন্দুধর্মের দুর্বলতা। অথচ খ্রীষ্টানদের দেবদূত, সাধুসন্ত এবং শয়তানে বিশ্বাসের থেকে বহু দেবদেবীতে এই বিশ্বাস আলাদাও নয়, বেশী অযৌক্তিক নয়। এই সত্যটা পশ্চিমীদের চোখে ধরা পড়ল না কেন ? তেমনই ইন্দ্র ও অহল্যার উপখ্যানকে রূপক হিসাবে বিবেচনা না করে এই ধরণের কাহিনীকে প্রাচীন হিন্দুদের ব্যভিচারের উদাহরণ হিসাবে পেশ করেন পশ্চিমের লোকেরা। কিন্তু পশ্চিমী সংস্কৃতিতে প্রচলিত এই ধরণের কাহিনীকে (যেমন গ্রীক পুরাণের ক্রিয়াকলাপ) রূপক হিসেবেই বিবেচনা করেন একই পণ্ডিতবর্গ। সতীদাহ প্রথার প্রতি সমর্থন দুর্নীতিগ্রস্ত পুরোহিতদের নৃশংসতা বলে সমালোচনা করেছেন মাক্স মুয়েলার। তিনি তলিয়ে দেখেননি এর পেছনে ব্রাহ্মণ্যবাদের শাস্ত্রীয় সমর্থন কতটা ছিল অথচ খ্রীষ্টানদের ইনকুউজিশন এবং অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কিত গণহত্যায় যে নৃশংসতা সংঘটিত হয়েছিল তার সম্পর্কে তিনি নীরব ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করেছেন "একশত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াও ভারতবাসীদিগের একটি কথাও বুঝিল না।" অজ্ঞ ইউরোপীয়দের লেখা ভারতীয় জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সমালোচনার বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা বাংলা ভাষায় কয়েকটি প্রহসনে ব্যক্ত হয়েছে। 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল' একটি চমৎকার উদাহরণ। নিস্পৃহ আত্মসমালোচনা এবং বিজিত জাতির সংস্কৃতির মূল্যায়নে ন্যূনতম বিচার বোধের অভাব সাম্রাজ্য বিস্তারী পশ্চিমী সভ্যতার একটি নৈতিক দুর্বলতা। পশ্চিমের মহত্তম ব্যক্তিত্ব ও পরাজিত জাতির ঐতিহ্যের প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করতে ছাড়েন না। পশ্চিমীদের লেখা কোনো প্রাচ্যদেশের ইতিহাস তাই একদেশদর্শী ও ভ্রান্ত। এই ভ্রান্তির সংশোধনের জন্য প্রাচ্যবাসীদেরই তাদের ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হতে হবে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে যথার্থ ইতিহাস বলতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও একই কথা বলেছেন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক উপাদানের সম্পর্ক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দ্বারাই যথার্থ ইতিহাস রচনা সম্ভব। উৎপাদন সম্পর্কের সাথে অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য সম্বন্ধীয় ইতিহাস বিশ্লেষণ বা ইতিহাস পর্যালোচনার অন্যান্য আধুনিক তত্ত্ব ও পদ্ধতি অবশ্যই বঙ্কিমের কাছে স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু কোনও জনগোষ্ঠীর লোকেদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যুক্তিশীল মন নিয়ে তাদের নিজেদের সমাজ, সংস্কৃতির ও অর্থনীতির ইতিহাস লেখার সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব তিনি বুঝেছিলেন। আর এই ইতিহাস রচনা যাতে খণ্ডিত না হয় তার জন্য সকলকে নিয়ে ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলেছিলেন — "আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর করুক। ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।" জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সকলকে নিয়ে চলার সূচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন-এ।

তুলনামূলক বিচারে ভারতীয় সমাজ ও ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য এবং সমস্যা

আত্মমর্যাদা বজায় রাখার জন্য কোনও কোনও বিষয়ে ভারতীয়দের ইউরোপীয়দের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করা উচিত। অবশ্য যুক্তিবাদী মূল্যায়নের দ্বারাই এই গৌরববোধ গড়ে তুলতে হবে। সনাতন ধর্মশাসিত ভারতীয় বা হিন্দু সমাজের পরম্পরাক্রমে আগত সব কিছুই ভালো বলে দেখানোর চেষ্টা মূর্খতা। "অপবিত্র কুলুষিত দেশাচার বা লোকাচার ছদ্মবশে হিন্দুধর্মের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।" এগুলিকে পরিত্যাগ করতে হবে। সুসংস্কারগ্রস্ত আচার-আচরণ সম্বলিত ধর্মমত পাশ্চাত্য শিক্ষায় লালিত ভারতীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের প্রয়োজন উন্নত মনের ধর্ম। প্রাচীন বৈদিক ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের জন্য স্বামী দয়ানন্দের প্রচেষ্টাকেও স্বাগত জানাননি বঙ্কিমচন্দ্র। হিন্দু ধর্মের আপাত বৈচিত্র্যের মধ্যে এমন কতকগুলি শাশ্বত সত্য আছে যেগুলির উপর আলোকপাত করলে হিন্দুধর্মের সংস্কার, পুনরুন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবন সম্ভব। হিন্দু ধর্মের এই অমলিন রূপটি তুলে ধরার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান, অলৌকিক তত্ত্ব, খ্রিষ্টিয় আলোচনা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস পাঠকে কাজে লাগিয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিধৃত ঐতিহ্যগত জ্ঞানের প্রতিই তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। ধর্মের লৌকিক দিকটি অবশ্য কখনই উপেক্ষা করেননি বঙ্কিমচন্দ্র।

হেষ্টির মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রথমে ছদ্মনামে এবং পরে লেখকের স্বাক্ষরে কলকাতার 'স্টেটসম্যান' কাগজে প্রকাশিত তীব্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একদা নাস্তিক বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থার প্রথম প্রকাশ। ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তুলে ধরেছেন তিনি এই তর্কযুদ্ধে। কোনও ব্যক্তি যত বড় পণ্ডিতই হোক না কেন যে ধর্মে তার আস্থা নেই, সেই ধর্মের যথার্থ্য তিনি বিচার করতে পারেন কি না, বঙ্কিম সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন।

Letters on Hindusm প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন "সর্ব্বাপেক্ষা ব্যপ্তি এবং উচিৎ অর্থে ধর্মই ঐতিহ্য।" "মানববৃত্তির উৎকর্ষনেই ধর্ম।" হিন্দুরা ধর্ম শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে। 'ধর্ম কখন রিলিজিয়নের প্রতি, কখন নীতির প্রতি, কখনও কখনও পুণ্যকর্মের প্রতি প্রযুক্ত হয়। এমনকি প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর মাধ্যমে বিজ্ঞানও ধর্ম শব্দটির অন্তর্গত। তাছাড়া সব ধর্মমতের অন্তঃস্থিত নিত্য পদার্থই হল ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী মানুষের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তির সম্যক অনুশীলন ও পরিচালনই ধর্ম। স্বার্থপরভাবে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি অথবা আত্মতৃপ্তির পথের অনুসন্ধানে তাঁর মতে সর্বপ্রকার সন্ন্যাসের মতই ব্যবহারের অযোগ্য। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে অনুশীলন বা কৃষ্টির মানে হলে জগতের সঙ্গে একাত্মতা, তার প্রতি বিমুখতা নয়। জাতিগঠনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় কর্মসংস্কৃতি বা work ethic এর উপর এই গুরুত্ব প্রদান বঙ্কিমের সমাজ ও ধর্মের মিথষ্ক্রিয়ার সচেতনতার পরিচায়ক। তিনি খোলাখুলি ঘোষণা করেছেন "সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম বলি না ... অন্ততঃ সম্পূর্ণ ধর্ম বলিনা। অনুশীলন প্রবৃত্তিমার্গ, সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গ। সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম, অনুশীলন কর্মাত্মক। নিস্পৃহা অনুশীলন তত্ত্বের পরিপূরক। কোঁৎ-এর মানবতাবাদের উন্নততর রূপ তিনি হিন্দুধর্মে দেখেছিলেন। মনুষ্যে প্রীতি হিন্দুশাস্ত্রের মতে ঈশ্বর ভক্তির অন্তর্গত। মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই ; ভক্তি ও প্রীতি হিন্দু ধর্মে অভিন্ন, অভেদ্য।"

এখানে একটা সমস্যা দেখা যায়। মানবজাতির সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই যদি ধর্মের উদ্দেশ্য হয় তাহলে দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধের উপর গুরুত্ব দেওয়া অর্থহীন হয়ে পড়ে। অথচ এই দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধের জাগরণের জন্যই হিন্দুধর্মে বিধৃত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগানোর প্রয়াস বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন। ধর্মতত্ত্ব-এ তাই খানিকটা খাপছাড়াভাবে হলেও বঙ্কিমচন্দ্র বলেন "স্বদেশ প্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।"

স্বদেশ রক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম বলে বঙ্কিমচন্দ্র দেশের প্রতি কর্তব্যের ভূমিকা সৃষ্টি করেছেন। পাশ্চাত্যের ইহলৌকিকতার প্রশংসা করলেও তিনি তার আগ্রাসী নীতি পরিত্যাগ করে "দেশপ্রীতি ও সার্বলৌকিক প্রীতি'র মধ্যে নূতন ভারসাম্য গঠনের পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর স্বদেশবাসীকে। প্রাচীন ভারতীয়রা "দেশপ্রীতি সার্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন।" এটা ছিল মস্ত বড় ভুল। বিশ্বহিতৈষণা যত বড় উচ্চ আদর্শই হোক না কেন তা দেশের প্রতি কর্তব্যকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণতার সঙ্গে শরীরচর্চা এবং অস্ত্রচালনা শিক্ষার মাধ্যমে দেশের স্বার্থরক্ষার মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থে বঙ্কিম বলেছেন "আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম অধর্ম। আমরা বাঙ্গালী জাতি, আজি শত শত বৎসর সেই অধর্মের ফল ভোগ করিতেছি। এই কারণেই তিনি পরাধীনতার গ্লানিতে ক্লিষ্ট বাঙ্গালী তথা ভারতীয়দের বাহুবল অর্জনের পরামর্শ দিয়েছেন। হিন্দু মেলার প্রেরণায় ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল তা নিঃশব্দে বঙ্কিমের নূতন ধর্মের ব্যাখ্যার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। শারীরিক শক্তির বিকাশকে তিনি "অনুশীলন" এর অন্যতম অঙ্গ বলেছেন। বাহুবল মানসিক শক্তিরও দ্যোতক। "উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় এই চারিটি একত্র করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল।"

হিন্দু ধর্মের এই অভিনব ব্যাখ্যার দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র হৃতগৌরব বাঙালি তথা ভারতীয়দের স্বাজাত্যাভিমানকে জাগ্রত করতে চেয়েচেন। হিন্দুধর্মের জন্য ভারতীয়দের শ্লাঘা বোধ করা উচিত। কারণ হিন্দুর কাছে কেবল ঈশ্বর ও পরকালই ধর্ম নয়, 'ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ সকল লইয়া ধর্ম।" গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শ ব্যবহারিক জীবনের মহত্তম আদর্শ। সমস্ত ভারতকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার প্রচেষ্টা আদর্শ পুরুষ কৃষ্ণের মহত্ত্বের মূখ্য কারণ। হিন্দু ধর্মের মধ্যে হিন্দু সমাজের উজ্জীবনের সূত্র সন্ধানের জন্য বঙ্কিমের এই প্রচেষ্টার সাথে পরবর্ত্তীকালের প্রখ্যাত জার্মান সমাজতাত্ত্বিক মাক্স ভেবারের প্রটেস্টান্ট ধর্মের নীতিবোধের মধ্যে আধুনিক পশ্চিমী সমাজের ঐহিক জীবননিষ্ঠা ও যুক্তিসিদ্ধ কর্মোদ্যোগের সূত্র সন্ধানের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

তাঁর কালে ভারতবর্ষ ও তার অধিবাসীরা যে হীনবল ও হৃতগৌরব হয়ে পড়েছিল একথা বঙ্কিমকে মানতেই হয়েছিল। ভারতীয় সভ্যতার বন্ধ্যাত্ব এবং অবক্ষয় প্রসঙ্গে বঙ্কিমের মতামত বাক্‌ল এবং লেকির বক্তেব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ঐ তত্ত্বের সাহায্যেই তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্রগতিকে ব্যাখ্যা করেন এবং ম্যালথাসের তত্ত্বকেও তিনি কাজে লাগান। বাক্‌লেকে অনুসরণ করে ভারতবর্ষের উষ্ণ আবহাওয়া এবং মাটির উর্বরশক্তি প্রসূত খাদ্যপ্রাচুর্যকে হিন্দুদের অন্তর্মুখীনতা এবং ঐহিক বিষয়ে উদ্যমহীনতার কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। লেকিকে অনুসরণ করে জ্ঞানতৃষ্ণা ও অর্থলিপ্সার মধ্যে দ্বিতীয়টিই "সভ্যতা বৃদ্ধির নিত্য কারণ" বলে বোঝাতে চেয়েছেন বঙ্কিম। সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নতুন নতুন উৎস খুঁজে বার করবার প্রচেষ্টাই ইউরোপের অগ্রগতির চাবিকাঠি। আর ভারতবাসীদের অল্পে সন্তুষ্টি তাদের অধিক থেকে অধিকতর ঐহিক সুখের অনুসন্ধানে পরান্মুখ করেছিল।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে ধনবৃদ্ধি এবং আয়বৃদ্ধির অনুপস্থিতি। জনসংখ্যা এবং ধনের তারতম্য দূরীকরণের উপায় জনবহুল দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশান্তর গমন এবং অধিবাসীদের বিবাহ প্রবৃত্তি দমন। ভারতে এই দুইটির কোনটিই না হওয়ায় ভারতের জনগণের দায়িত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের দার্শনিক মতবাদগুলি বিশেষতঃ সাংখ্যদর্শন এবং বৌদ্ধদর্শন মানবজীবনে দুঃখের নিবৃত্তি থেকে জ্ঞান এবং শেষ পর্যন্ত জ্ঞানের আধার আত্মায় নির্বাণই তাদের একমাত্র বিবেচ্য। এই কারণেই দেশে সন্ন্যাসের এত মাহাত্ম। জ্ঞান হল মুক্তির হাতিয়ার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংসারের মায়ার প্রতি ঔদাসীন্যই জ্ঞান। "হিন্দু সভ্যতার মূল কথা 'জ্ঞানেই মুক্তি', পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল 'জ্ঞানেই শক্তি'। পাশ্চাত্যে মানুষ শক্তি পেয়েছে কিন্তু আমরা কি মুক্তি

পেয়েছি বঙ্কিম প্রশ্ন তুলেছেন। "ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্য ঐহিক ; তাঁহারা ইহকালে জয়ী। আমাদের উদ্দেশ্য পারত্রিক তাই ইহকালে জয়ী হইলাম না। পরলোকে হইব কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে।"

এখানে মাক্স মূয়েলারের সঙ্গে বঙ্কিমের মতভেদ সুস্পষ্ট। মাক্স মূয়েলার হিন্দুদের পারত্রিক আগ্রহকে অতিরঞ্জিত করে দেখিয়েছেন এবং সেটিকে হিন্দুদের গর্বের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিম ভারতীয়দের পারত্রিক বিষয়ে ঝোঁক বেশী বলে মানলেও সেটাকে অবিমিশ্র হিতের উৎস বলে করেন নি। এ দিকে বরং পরবর্ত্তীকালের মাক্স ভেবারের মতের সঙ্গে তাঁর মতের খানিকটা সাদৃশ্য আছে। বস্তুতঃ মাক্স ভেবারের মতে বঙ্কিমও মনে করেছিলেন ইউরোপের জয়যাত্রায় একটি বড় কারণ তাদের যুক্তিবাদ এবং পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার মাধ্যমে আরোহ পদ্ধতি অবলম্বনে আবিষ্কৃত সত্যকে বুদ্ধি এবং যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করার স্বাভাবিক প্রবণতা। পূর্বকালের হিন্দুদের মধ্যে এই প্রবণতার একান্ত অভাব ছিল।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভারতীয়দের শক্তিলাভের উপায়েরও ইঙ্গিত দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। ঐহিক সাফল্য অর্জনের জন্য ভারতবাসীকে চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু পশ্চিমের অন্ধ অনুসরণে ঐহিক সুখের অনুসন্ধানে নিরন্তর ব্যস্ত স্বার্থপরতাকে তিনি সমর্থন করেননি। জীবনকে অস্বীকার করা হয় বলে তিনি সন্ন্যাসধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু তার বিকল্প পরিতৃপ্তিহীন অর্থলিপ্সা নয়। সহমর্মিতা এবং সদ্বৃত্তিগুলির যথাযথ বিকাশই মানুষের সুখলাভের একমাত্র পথ। উনবিংশ শতকে বস্তুবাদের নগ্নপ্রকাশ এবং ক্রমবর্ধমান সম্পদের অপরিমিত আকাঙ্খার পরিবর্ত্তে বঙ্কিমচন্দ্র "কার্যকারিণী বৃত্তির সম্যক অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধি এবং সম্পদাদিতে উপযুক্ত ঘৃণা" বোধ মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কার্যকারিণী বৃত্তি ছাড়া আধুনিক ভারতের গতি নেই। কিন্তু সেই বৃত্তি বল্গাহীন প্রবৃত্তির ক্রীড়নক হবে না, সংযত হবে, নিয়োজিত হবে দেশের ও জাতির কল্যাণে। ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের মর্ম উপলব্ধির প্রচেষ্টায় বঙ্কিমের এই যুগোপযোগী সমাজবীক্ষা।

বঙ্গদেশের কৃষকদের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও সাম্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা

পাশ্চাত্য সমাজের আর একটি ভালো দিকের কথা 'সাম্য' প্রবন্ধের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন। তা হল পাশ্চাত্যসমাজের সকলের সমান সুযোগ পাওয়ার সুবিধা। তুলনায় ভারতীয় সমাজের শিক্ষার অধিকার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত ছিল। হিন্দু সমাজব্যবস্থার এই সমালোচনা বঙ্কিম "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধেও বিস্তারিত ভাবে পেশ করেছেন। বস্তুতঃ 'বঙ্গ দর্শন'-এ প্রথম প্রকাশিত 'বঙ্গদেশের কৃষক' ও 'সাম্য' প্রবন্ধ দুটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উজ্জ্বল নজীর হিসাবে বিবেচনার যোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কালের মানুষ। তিনি অবশ্য জমিদার ছিলেন না বা কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না। চাকুরি সূত্রে তিনি বঙ্গদেশের কৃষকের দুরবস্থার কথা জানতে পেরেছিলেন। তিনি জোরালো ভাষায় এবং বাস্তবজীবন থেকে আহৃত বিপুল তথ্যের সাহায্যে কৃষকদের মর্মান্তিক দুঃখ দুর্দশার কথাকে লোকচক্ষে তুলে ধরেছিলেন। এই প্রবন্ধ বাস্তব জীবন থেকে তথ্য আহরণ (empirical) ও তার বিষয়নিষ্ঠ (objective) বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ ও কুশলতার পরিচায়ক এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেশহিতৈষণার ও সমানুভূতির (empathy) দ্যোতক। তিনি বলেছেন, "বঙ্গীয় কৃষকেরা নিঃসহায় মনুষ্যমধ্যে নিতান্ত দুর্দশাপন্ন এবং আপনাদিগের দুঃখ সমাজমধ্যে জানাইতেও জানে না। যদি মূকের দুঃখ দেখিয়া তাহা নিবারণের ভরসায় একবার বাক্যব্যয় না করিলাম, তবে মহাপাপ স্পর্শে।" সমাজবিজ্ঞানীর তথা বুদ্ধিজীবীরা সামাজিক দায় ও দায়িত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র সচেতনতা এই উক্তিতে জোরালো ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। জমিদার মণ্ডলী এবং তাদের সমর্থকদের তিরস্কারের আশঙ্কা তাঁকে টলাতে পারেনি। কৃষিকর্মের এবং জীবনযাপনের তথ্য উপস্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে উৎপন্ন শস্যের কিছুই

তো সে পায় না, বরং তাকে সহ্য করতে হয় লাঞ্ছনা, আর ঋণের দায়ে সে হয় সর্বস্বান্ত। এই প্রসঙ্গে জমিদারদের নির্মম ব্যবহারের যে চিত্র তিনি দিয়েছেন তা যেন 'নীলদর্পণ' নাটকের বিবরণকেও হার মানায়। তিনি লিখেছেন "জীবের শত্রু জীব, মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য, বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ...জমীদার নামক বড় মানুষ কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।"

ভারতের কৃষককুল তথা দরিদ্র শ্রমজীবীদের বঞ্চনার কারণ ছিল "জ্ঞানিক উন্নতির" বাহক ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য। এদেশে ভূমির স্বাভাবিক উর্বরতার জন্য শ্রমোপজীবীদের দ্বারা উৎপন্ন উদ্বৃত্তে প্রতিপালিত ব্রাহ্মণেরা "জ্ঞানালোচনায় তৎপর" হতে পেরেছিলেন। কিন্তু শুরতেই শ্রেণীবিভাগ হবার ফলে উপরে শ্রেণী বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানচর্চাকে নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কুক্ষিগত করে রেখে জনসাধারণের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব অব্যাহত রেখেছিলেন। ধন ও জ্ঞানের অসম বন্টনের ফলে সমাজে ক্ষমতা বিভাজনেও বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং স্মৃতির বিধানগুলি শূদ্রদের নিপীড়ণের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। শ্রমজীবী জনতার ভাগ্যে জুটেছিল। "দ্রারিদ্য, অজ্ঞাত এবং দাসত্ব।" রাজনীতিতে তাদের উৎসাহের অভাব ক্ষমতার বন্টনের প্রচলিত ব্যবস্থাকে দৃঢ় করেছিল, তাদের অজ্ঞতা ব্রাহ্মণসৃষ্ঠ কুসংস্কারকে দৃঢ়ীভূত করেছিল, ধর্মে ইহলোকের প্রতি বৈরাগ্যের মনোভাবকেই কায়েম করেছিল।

মানুষে মানুষে অসাম্যের কুফলগুলি বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' প্রবন্ধে বিশদ করেন। সমাজব্যবস্থায় সৃষ্টি শোষণ, অত্যচার, দুর্নীতি, স্বার্থপরতার বাস্তব রূপ তিনি উদঘাটিত করেন। জগতে মানুষেরই দ্বারা কৃত বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুগে যুগেই প্রতিবাদ হয়েছে। ফ্রান্সের সাম্য প্রচেষ্টায় রুশোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। "ফরাসী বিপ্লব শমিত হইল, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু 'ভূমি সাধারণের' এই কথা বলিয়া রুশো যে মহাবৃক্ষের বী রোপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্য নূতন ফল ফলিতে লাগিল। ইউরোপ তাহার ফলে পরিপূর্ণ। 'কম্যুনিজম' সেই বৃক্ষের ফল। 'ইন্টারন্যাশনাল' সেই বৃক্ষের ফল।" সেই যুগে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় প্রচলিত সাম্যবাদী তত্ত্বের সাথে বঙ্কিমের যথেষ্ঠ পরিচয় ছিল। মার্ক্স-এর শ্রেণীর ভিত্তিতে সমাজকাঠামোর বিশ্লেষণ বা শ্রেণী দ্বন্দ্বের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্ত্তনের তত্ত্ব অবশ্য তাঁর চিন্তায় ছিল না।

'সাম্য' গ্রন্থে ইংরেজ সমাজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল-এর subjection of women গ্রন্থের ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলেছেন তিনি। পশ্চিমের নারী সমস্যা এবং ভারতের নারী সমস্যার তুলনামূলক আলোচনায় তিনি স্পষ্টই বলেছেন "আমাদের দেশে যে পরিমাণে স্ত্রীগণ পুরুষাধীন, ইউরোপ বা আমেরিকায় তার শতাংশ ও নহে। আমাদের দেশ অধীনতার দেশ...এখানে প্রজা যেমন রাজার নিতান্ত অধীন, অন্যত্র তেমন নহে। এখানে যেমন শূদ্রাদি ব্রাহ্মণের পদানত, অন্যত্র কেহই ধর্মযাজকের অদৃশ বশবর্তী নহে। এখানে যেমন দরিদ্র ধনীর পদানত, অন্যত্র তত নহে। এখানে স্ত্রী যেমন পুরুষের আজ্ঞানুবর্তিনী অন্যত্র তত নহে।" বড় বেদনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী।" তাঁর সমাজজিজ্ঞাসা লক্ষ্য করে যে এ সমাজে নারীর ভূমিকা দাসীর। এমনকি স্বামীর সন্তোষের জন্য বঙ্কিমের সমকালে স্ত্রী তাঁর সপ-ীগণেরও পরিচর্যা করতে বাধ্য হত। বঞ্চনার অনেকগুলি দিক বঙ্কিম দেখিয়েছেন। পুরুষ বিদ্যাশিক্ষা করে, নারীর তা বারণ ; পুরুষ পুনর্বার বিবাহ করতে পারে, নারীর পক্ষে সেই সুযোগ নেই ; পুরুষ যেখানে খুশী সেখানে যেতে পারে, নারী গৃহবন্দিনী পুরুষ স্ত্রী বেঁচে থাকতেই যথেচ্ছ বহুবিবাহ করতে পারে, নারীর পতির মৃত্যুর পরেও সেই অধিকার নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র এই বৈষম্য দূর করে সাম্য স্থাপনের পক্ষে মত দিয়েছেন। বিধবাবিবাহ তার কাছে যুক্তি সিদ্ধ বলে

মনে হয়েছিল। তবে কোনও বিধবা নারী তাঁর স্বামীর স্মৃতি নিয়ে বাঁচতে চাইলে তাঁর ক্ষেত্রে বিধবাবিবাহের প্রয়োজন নেই বলে তিনি মনে করেছিলেন। তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তির দ্বারা অনেক শিক্ষিত বাঙালীর ক্ষেত্রে তিনি বিধবাবিবাহের মৌখিক সমর্থন ও বাস্তবে তা পরিহারের দ্বিচারিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। বঙ্কিচমন্দ্র এও বলেছেন নারীকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে সমাজ গুরুতর অন্যায় করেছে। এ বৈষম্য তাঁর কাছে ন্যায়বিরুদ্ধ এবং নীতিবিরুদ্ধ বলেও মনে হয়েছে।

'বঙ্গদেশে কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের বিচার ব্যবস্থারও তীব্র নিন্দা করেছেন। কিন্তু দুটি রচনাতেই তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন যে তিনি জমিদারবিদ্বেষী নন এবং তিনি ইংরাজবিদ্বেষকও নন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিচার

'জাতীয়তাবাদ' বিষয়টি নিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজতত্ত্ব গভীরভাবে আলোড়িত। বঙ্কিমচন্দ্রকে ভারতে উগ্র জাতীয়তাবাদের পুরোধা হিসাবে মনে করা হয়। সন্দেহ নেই ঔপনিবেশিক শাসনের নানাবিধ অবিচার ও অত্যাচার, যার কিছুটা নিজের কর্মজীবনেও তিনি সহ্য করেছিলেন, এই জাতীয়বাদের উৎস। ভারতের ঐতিহ্য বিচার করে তার মধ্যে ভারতীয় হিন্দুদের গর্বের উপাদনগুলি চিহ্নিত করার প্রয়াস এই জাতীয়তাবোধের প্রকাশ। কিন্তু যে জাতির কথা তিনি গভীর আবেগের সাথে বলেছেন, সে জাতি বা 'নৈশনের' নৃতাত্ত্বিক এবং সামাজিক পরিসীমা খুব স্পষ্ট নয়। কখনও তা ভারতের সব জাতির সংহতির রূপের সঙ্গে সমার্থক। আবার কিছু জায়গায় 'জাতি' বলতে তিনি কেবল হিন্দুদের বুঝিয়েছেন। অনেক সময়ে যেমন 'বন্দে মাতরম্' গানে তাঁর কল্পনায় বাঙালি জাতি, তার দুর্দশার সম্বন্ধে ক্ষোভ ও সেই দুর্দশার নিরাকরণের আশা ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের পরাধীনতার সমালোচনা ও সেই শাসন অবসানের ক্ষেত্রে হীনবীর্য ভারতীয়দের চেষ্টার অভাবের জন্য ক্ষোভে ব্যক্ত হয়েছে।

অবশ্য সমসামায়িক অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তির মত বঙ্কিমচন্দ্রও এদেশে ব্রিটিশশাসনের ঐহিক সুফল সম্বন্ধে প্রশংসার মনোভাবই দেখিয়েছেন। এর দ্বারা এদেশে ব্রিটিশ পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান শাসন সম্পর্কে হয়ত তাঁর অনাস্থা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে এলিয়ট ও ডসন এর **হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া বাই ইটন ওন হিস্টরিয়ানস্ : দ্য মহমেডান পিরিয়ড** (১৮৫৪) গ্রন্থের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে যবনদের সম্পর্কে রিবূপ মন্তব্যও আছে। এর থেকে অনেকে সিদ্ধান্ত বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক ছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর রচনাবলীতে মুসলমান সম্পর্কে কিছু অযৌক্তিক মন্তব্যও দেখা যায়। বিষয়টি কিন্তু জটিল। কেন না মুসমিলদের সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন জায়গায় অনুকুল মন্তব্যও করেছেন। এক জায়গায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় মুসলিমদের বাঙালীর তথা ভারতবাসীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতের ঐস্লামিক শাসনকে তিনি বিদেশী শাসন বলেন নি। তদুপরি তিনি লিখেছেন "চিত্তশুদ্ধি কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের সার এমন নহে, ইসলাম ধর্মেরও সার।" বুদ্ধিমার্গীয় ঔদার্য তাঁর পূর্ব্বাপর বজায় ছিল। তাছাড়া 'সীতারাম'-এর হিন্দু সাম্রাজ্যের মহম্মদপুর নামকরণের কথা বাদ দিলেও চাঁদ শাহ ফকির দিয়ে তিনি একথাও বলিয়েছেন "যে দেশে হিন্দু আছে, সে দেশে আর থাকিব না এ কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী হলে নিজ সম্প্রদায় সম্পর্কে এত তীব্র কঠোর তিরস্কার উচ্চারণ করতে পারতেন না। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বঙ্কিম লিখেছেন "হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না ...রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। ...অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই

নিকৃষ্ট।" 'সীতারাম'-এর প্রথম সংস্করণে ফকির সীতারামকে বলছেন "তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দু-মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্য ধর্ম্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে।"

গ্রন্থপঞ্জী

১। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম **বঙ্কিম রচনাবলী** ১ম খণ্ড (উপন্যাস) ও ২য় খণ্ড (প্রবন্ধ) কলকাতা, সাহিত্য সংসদ

২। পোদ্দার, অরবিন্দ **বঙ্কিম মানস** কলকাতা, উচ্চারণ

১৩.২ স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)

প্রস্তাবনা

সমাজবিজ্ঞানে বা সমাজসংস্কৃতির বিশ্লেষণে বাঙালি তথা ভারতীয়দের অবদান আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করা হয় নি। সমাজ-সংসারের ঘটনা ও প্রক্রিয়ার বিচার বিশ্লেষণে, তার খুঁটিনাটি বিচারের, একজন সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর নৈপুণ্য সম্বন্ধে হয়ত একটা সংশয় থাকে। কিন্তু এই জায়গাতেই বিবেকানন্দের সমাজচিন্তার বৈশিষ্ট্য। সন্ন্যাসী ছিলেন বলেই পক্ষপাতহীন নির্মোহ দৃষ্টিতে তিনি ভারতীয় ও প্রতীচ্য সমাজব্যবস্থার যুক্তিসিদ্ধ তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পেরেছিলেন। আর ধর্ম ও ধর্মমতের সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতির সম্পর্কের সয- পর্যবেক্ষণই এই বিশ্লেষণের ভিত্তি ছিল।

জীবনী ও পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে বিবেকানন্দ মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে সমাধিস্থ অবস্থায় লোকান্তরে গমন করেন। তাই তাঁর আপন কর্মের পরিবেশ ও পরিসর ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। ঊনবিংশ শতকের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ধর্ম জিজ্ঞাসা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ধর্ম জিজ্ঞাসা গড়ে উঠেছিল ধর্মপ্রাণতা, পার্থিব নীতিবোধ এবং সাংস্কৃতিক আত্মসচেতনতার সংমিশ্রণে। সাংস্কৃতিক আত্মসচেতনতা জরুরী হয়ে পড়েছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ইউরোপীয়দের ঐতিহ্যের সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায়। বিবেকানন্দ খ্রীষ্টান পাদ্রী এবং ইউরোপীয় সমালোচকদের প্রবল প্রতিস্পর্ধা জানান। তাঁর মধ্যে আমরা এমন এক অবিসংবাদী দেশপ্রেমী ভারতীয়কে দেখি যাঁর জীবনযাত্রার মূলসুরটি হিন্দু ঐতিহ্যের তারে বাঁধা ছিল। "ভারতের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বে" দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার সমাজের মূল্যায়ন করেছিলেন। সে যুগের ইউরোপ আফ্রো এশিয় সমাজের অধিবাসীদের মধ্যে যে হীনম্মন্যতার সমস্যা দেখা দিয়েছিল বিবেকানন্দের মধ্যে তার লেশমাত্র ছিল না।

হিন্দু-মুসলিম ও নব্য ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণের পারিবারিক ঐতিহ্য

বিবেকানন্দের পরিবার ছিল বর্ণে কায়স্থ। বহু পুরুষ যাবৎ তাঁরা মুসলিম শাসকদের অধীনে কর্মরত ছিলেন। পরে তাঁরা ঔপনিবেশিক যুগের প্রথম পর্বের এলিট সম্প্রদায়ের অংশ হিসাবে গণ্য হন। বিবেকানন্দের প্রপিতামহ রামমোহন দত্ত কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে ওকালতি করে প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য উপকরণ নিয়ে বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন তিনি। বিবেকানন্দের পিতামহ দুর্গপ্রাসাদও এ্যাটর্নী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বিবেকানন্দের বহু ভাষাবিদ্ পিতা বিশ্বনাথ দত্তও একজন সফলকাম ও খ্যাতনামা আইনজীবী ছিলেন। হিন্দু আধ্যাত্মিকতার চেয়ে নিজের এবং সকলের ঐহিক সুখেই তাঁর সমধিক আগ্রহ ছিল। বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কারের সমালোচনা করে গ্রন্থও রচনা করেছিলেন তিনি। বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। বিশ্বনাথের পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল হিন্দু মুসলিম ও নব্য ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণে।

সাংস্কৃতিক ঔদার্য ও হিন্দু ঐতিহ্যানুরাগের সহাবস্থান

সাংস্কৃতির ঔদার্যের পাশাপাশি প্রচলিত রীতিনীতি এবং পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম-এবং সহজ সরল ধার্মিকতা থেকে দত্তপরিবার বিচ্যুত হয় নি। পরিবারের মেয়েদের মধ্যেই এই হিন্দু ধার্মিকতার ঐতিহ্য বেশী প্রবল ছিল। শৈশবে

মায়ের কাছে শোনা গল্পের মাধ্যমে হিন্দু ভক্তিবাদ এবং নৈতিকতার সঙ্গে বিবেকানন্দের পরিচয় হয়েছিল। আবার এই মায়ের কাছেই তাঁর প্রথম ইংরাজী শিক্ষা।

শারীরিক ও বৌদ্ধিক প্রতিস্পর্ধা গ্রহণে পরিবার ও পরিবেশের উৎসাহ

রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত যুবক বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অন্যান্যদের মতই ছিলেন। তবে তাঁর পিতা তাঁকে সব ধরণের বৌদ্ধিক প্রতিস্পর্ধা গ্রহণে উৎসাহিত করেছিলেন। বস্তুতঃ মানুষ সম্বন্ধে কোন কিছুকেই সমীহ বা ভয় করা নরেনের চরিত্রে ছিল না। তাঁদের "সিমলে পাড়ার" যুবকদের প্রবল নির্ভীকতা তাঁর মানসিক গঠনকেও প্রভাবিত করেছিল ; দেশে বিদেশে সর্বত্র তর্কযুদ্ধে তিনি তার প্রমাণ রেখেছেন।

বিভিন্ন বিদ্যাচর্চার সাথে দেশের সমস্যার সমাধানের সন্ধান

নরেন্দ্রনাথ অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ইতিহাস ছিল তাঁর অন্যতম প্রিয় বিষয়। বিবেকানন্দের ইউরোপের ইতিহাস পঠন শুধুমাত্র জানার আগ্রহেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতীয় জীবনের নির্জীবতায় তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন এবং কে জানে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের মধ্যে তিনি তাঁর সঙ্কটের মুক্তি খুঁজছিলেন কি না ! সমকালীন আরও অনেকের মত তিনিও নিঃসন্দেহে ইউরোপের ইতিহাসের মধ্যে ভারতের সমস্যাবলীর সমাধানের পথ খুঁজে বার করতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্যের ইতিহাস থেকে তিনি যুগোপযোগী শিক্ষা নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোন প্রকার অনুকরণকে তিনি ঘৃণা করতেন। তবে তাঁর আনন্দময় প্রাণময় সত্ত্বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে, তার ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও সংগীতের মধ্যে যা পেয়েছিল গভীরভাবে তার রসস্বাদন করেছিল। পরাধীনতার গ্লানি এবং তজ্জনিত ছিদ্রান্বেষণের প্রবণতা সেই আনন্দকে ক্ষুন্ন করতে পারেনি।

পার্থিব বিষয়ে আগ্রহের পাশাপাশি অস্তিত্বের মৌল সমস্যার সমাধান অন্বেষণ

নরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে আধ্যাত্মিক ঐকান্তিকতার পাশাপাশি ছিল যে পরিবেশে তিনি মানুষ হয়েছিলেন তার আনুষঙ্গিক পার্থিব আশা-আকাঙ্খা। দর্শনে স্নাতক হওয়ার পর তিনি পিতৃবন্ধু অ্যাটর্নি নিমাই চন্দ্র বসুর প্রতিষ্ঠানে আর্টিক্‌ল্‌ড্ ক্লার্ক রূপে যোগদান করেন। সেই সময় তিনি আইনের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রও ছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল বড় ব্যারিষ্টার হবার। পিতার মৃত্যুতে বিলাতে গিয়ে পড়াশোনার আশা তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। অবশ্য তাঁর সমস্ত পার্থিব চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখত অস্তিত্বের মৌল সমস্যার সমাধানের চিন্তা।

যুগপুরুষ রামকৃষ্ণের প্রভাবে সন্ন্যাসের পথে অভিযাত্রা

এই সমাধানের খোঁজে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র তিনি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই সমধানের সন্ধান তিনি পেলেন রামকৃষ্ণদেবের ব্যক্তিত্বে ও বাণীতে। রামমোহনের কাল থেকে বাংলা তথা ভারতে নতুন সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলির ফলে ধর্মের প্রতি সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। তার ফলে যেমন একদিকে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনই ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে ভাবনা চিন্তার ও সূচনা হয়েছিল। সাথে সাথে সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার বিঘ্ন কিংবা সামাজিক-রাজনৈতিক উচ্চাশার পথে অন্তরায় নিয়ে শহুরে বুদ্ধিজীবীদের অনতিক্রম্য দুঃখবোধ থেকে বিদেশীদের বিরুদ্ধে এক ধরণের বিদ্বেষবোধের বাড়াবাড়ি দেখা দিয়েছিল।

ভারতীয় ঐতিহ্য ও ভারতীয় ধর্মগুলির উপরে খ্রীষ্টান পাদরি এবং ইউরোপীয় সমালোচকদের বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য তাঁকে তীব্র আঘাত করে। এই প্রেক্ষাপটে রামকৃষ্ণদেবের সর্ব ধর্মসমন্বয়ের মতবাদ সকলের সপ্রশংসা এবং সানুরাগ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভের পরেই নরেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে সংশয়াতীত বিশ্বাস জন্মায়। তাঁরই নির্দেশে তিনি সংসার জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেন। নরেন্দ্রনাথ রূপান্তরিত হন রামকৃষ্ণ শিষ্য বিবেকানন্দ রূপে।

বিবেকানন্দের বিচারধারায় রামকৃষ্ণের সর্ব ধর্ম সমন্বয়বাদের প্রভাব

বিবেকানন্দ এবং তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য বহুজনের মতে রামকষ্ণের জীবনে ধর্ম সমন্বয়ের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটেছে। সব ধর্মের সারমর্মই যে এক ঈশ্বরকে জানা ভারতের এই চিরপ্রচলিত বিশ্বাস রামকৃষ্ণদেবের বক্তব্যগুলির মধ্য দিয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিবেকানন্দ আপন পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে সারবাদী সহিষ্ণুতার শিক্ষা পেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর সেই শিক্ষা গভীর এবং সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল। অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁর মনোভাব শ্রদ্ধা এবং সহিষ্ণুতার চেয়েও উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়েছিল এবং **ধর্মান্ধতা-মুক্তির মাপকাঠিতে তিনি সব ঐতিহ্যের মূল্যায়ন করেছিলেন।**

পরিব্রাজনে দেশের মানুষের সমস্যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

রামকৃষ্ণের দেহাবসানের (১৮৮৬) পর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারত পর্যটনে বের হন। শিকাগো ধর্ম-সম্মেলনে (১৮৯৩) যোগদানের পূর্বাবধি পরিব্রাজক রূপেই তাঁর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। **ভারতের মাটির কাছের মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতা ও মননের পুষ্টি সাধন করে।** ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সিস্টার ক্রিষ্টিনকে তিনি ঐ সময়ের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করবার জন্য আমি ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তিজোট তৈরী করতে চেয়েছিলাম। ...আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। সেজন্যই আমি বন্দুক নির্মাতা স্যার হাইরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। কিন্তু দেশের কাছ থেকে আমি কোন সাড়া পাইনি।"

সর্বাত্মক নিরবচ্ছিন্ন সমাধির জন্য নরেনের আগ্রহকে স্বার্থপর বলে তিরস্কার করেছিলেন রামকৃষ্ণ ; মানবজাতির প্রতি নরেনের কর্ত্তব্য ছিল যে ! কর্ত্তব্য বলতে রামকৃষ্ণ দারিদ্রমোচন বুঝেছিলেন কি না তা বোঝা যায় না। পরিব্রাজক রূপেই বিবেকানন্দ প্রথম দেশের দরিদ্রশ্রেণীর বাস্তব অবস্থা প্রত্যক্ষ করলেন। দেশব্যাপী ভয়াবহ দারিদ্রের অভিজ্ঞতার ফলে ভারতীয় ঐতিহ্যের জন্য তাঁর গর্ববোধ ভীষণ রকম ধাক্কা খেয়েছিল। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ জীবরূপী শিবের সেবার যে মন্ত্রের অনুসরণ করেছিলেন আমরণ তার অন্যতম মূল এখানেই যদিও গুরুর কাছ থেকে তিনি জীবের মধ্যে শিবকে প্রত্যক্ষ করার শিক্ষা আগে পেয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের চিন্তা ও কর্মের দুই মূল সূত্র

বিবেকানন্দের চিন্তা ও কাজের দুটি মৌলিক সূত্র ছিল। প্রথম, আধ্যাত্মিকতা এবং তার সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি যে ধর্ম তাই ছিল তাঁর ব্যক্তিজীবনের এবং তাঁর বিদেশযাত্রার প্রধান উপলক্ষ। দ্বিতীয়টি হল বিবেকানন্দের গভীর জাতীয়তাবাদী মানসিকতাপ্রসূত দেশবাৎসল্য। পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে ভারতের সনাতন ধর্মের বাণী পৌঁছে শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে তাঁর যোগদানের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল। আর তাঁর বিদেশযাত্রার অন্তর্লীন উদ্দেশ্য ছিল দেশের জনসাধারণের সেবার্থে অর্থসংগ্রহ।

শিকাগো বিশ্বমেলায় (১৮৯৩) যোগদান

শিকাগোর বিশ্ব ধর্মসম্মেলনের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দের দ্বারা পশ্চিম ভারতের আধ্যাত্মিক বিজয়ের শুরু। একই সঙ্গে উদ্বোধনী অভিবেশনে ও বিভাগীয় অধিবেশনগুলিতে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাবলীতে এ-কথাই বেশী ফুটে ওঠে ধর্ম নয়, রুটিই ভারতীয়দের সর্বাগ্রে প্রয়োজন। স্বামীজীর তীব্র সমাজসচেতনতা তাঁকে ভারতীয় সমাজের বাস্তব অবস্থা কখনও ভুলতে দেয়নি। বেদান্তের বাণী বিশ্বজনীন হতে পারে এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকে সেই বাণী প্রচারের জন্য তিনি দীর্ঘ সময় বিদেশে খেকেছেন। প্রতীচ্যের অধিবাসীদের আধ্যাত্মিক মুক্তি মানবসমাজের নবদিগন্ত উন্মোচন করবে। এই আধ্যাত্মিক মুক্তি ভারতের বেদান্তর উপলব্ধির পথেই আসবে। এবং তারই ফলে ভারতের প্রতি পাশ্চাত্য দেশবাসীর গভীর অনুরাগের সৃষ্টি হবে এবং তারা ভারতের দারিদ্র্যমোচনে নানাবিধ সাহায্য প্রদান করবে। শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনের পরে তিনি লিখেছেন "তাদের আমরা আমাদের আধ্যাত্মিকতা শেখাবে এবং তাদের সমাজের যা কিছু ভাল তা আমরা গ্রহণ করব।" পরের মাসেই আর এক বন্ধুকে লেখেন, "এদের spirituality দিচ্ছি, এরা আমায় পয়সা দিচ্ছে।" এই অর্থ তিনি ব্যয় করেছিলেন তাঁর দ্বিমুখী উদ্দেশ্যের বাস্তব রূপায়ণের জন্য ১) শিক্ষাবিস্তার এবং ২) সমাজসেবার মাধ্যমে দরিদ্রের মঙ্গলবিধান।

আমেরিকা, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য পরিভ্রমণ

শিকাগো সম্মেলনের পরে তিনি আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় যান। মার্কিন দেশ সফরের (১৮৯৫) পর তিনি লন্ডনে যান। এখানে বহুসভায় অগণিত শ্রোতৃবৃন্দ তাঁর বর্ক্তৃতায় মুগ্ধ হয়। এখানেই আইরিশ বিপ্লবীদের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ মিস্ মার্গারেট নোবেলের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। তাঁর এই কন্যাসমা শিষ্যা গুরুর দীক্ষাগুণে নিরক্ষর ভারতীয়দের সামাজিক রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বনির্ভরতার উদ্বোধনের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। ইংল্যাণ্ড প্রবাসের মাস তিনেক পরে মার্কিন দেশে ফিরে গিয়ে একটি বেদান্ত সোসাইটী স্থাপন করেন বিবেকানন্দ। ঐ বছরেই স্বদেশে ফেরার পথে লণ্ডনেও একটি প্রাচরকেন্দ্র স্থাপন করেন তিনি। ১৮৯৭ সালে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করে কলম্বো এবং দক্ষিণ ভারতের পথে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করে বিবেকানন্দ কলকাতায় উপনীত হন। কলকাতায় ফিরে এসে তাঁর কাজ হল জনসাধারণের মানসিক ও বৈষয়িক কল্যাণ সাধনের উপযোগী শিক্ষাদানের জন্য এবং জনগণকে বেদান্ত ও ধর্মচিন্তায় উৎসাহিত করার জন্য একদল সন্ন্যাসী কর্মীকে শিক্ষিত করে তোলা।

১৮৯৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান দপ্তর বেলুড় মঠ স্থাপিত হয়। মিশন প্রতিষ্ঠার পর সমাজসেবাই হয় বিবেকানন্দের প্রধান কাজ। ১৮৯৭ সালের মে মাসে তিনি প্রচারের কাজে ভারত পরিভ্রমণে যান। ১৮৯৯ সালে তিনি দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গিয়ে বেদান্ত শিক্ষার তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। এরপর প্যারিসে Congress of History of Religons এর অধিবেশনে যোগ দেন। ফ্রান্সে তিন মাস কাটিয়ে গ্রীস, তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি দেশ পর্যটন করে তিনি বেলুড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন তাঁর দেহ ও মনে তীব্র ক্লান্তি। বেলুড়ে বন্ধু সেভিয়ারের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে স্বামীজী মায়াবতী চলে যান। সেখান থেকে যান পূর্ববঙ্গ ও আসাম পর্যটনে। শরীর ও স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য সুবিখ্যাত জাপানী প্রাচ্যবিদ্ ও শিল্পী ওকাকুরার আমন্ত্রণে তিনি টোকিও যেতে পারলেন না। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই তাঁর জীবনাবাসন হয়।

বিবেকানন্দের সমাজজিজ্ঞাসার মূল ও প্রকৃতি

বিবেকানন্দের ক্রিয়াকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে বিবেকানন্দের ধর্মচর্যা জীবন বিমুখ ও

সমাজবিমুখ ছিল না। **তাঁর মতে ধর্মচর্যার প্রকৃতি ব্যক্তি এবং দেশ ও সমাজের অবস্থাভেদে বিভিন্ন রকম হবে।** পার্থিব বৈভবে সমৃদ্ধ রজোগুণে বা প্রবল কর্মোদ্যোগে সমুজ্জ্বল প্রতীচ্যজনের পক্ষে ভোগবাদের থেকে উত্তরণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার অনুসরণ একপ্রকার ধর্মাচরণ। কিন্তু পরাধীন দারিদ্র্যপীড়ত ভারতবাসীর ধর্ম হবে তমোগুণ বা সর্বপ্রকারের নিশ্চেষ্টতা, দুর্বলতা পরিত্যাগ করে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুপ্রথার অবসনের জন্য রজোগুণ বা কর্মোন্মাদনার উদ্বোধন।

বিবেকানন্দের সমাজজিজ্ঞাসার সাথে পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানের পথিকৃৎদের এক বিস্ময়কর মিল পাওয়া যায়। সামন্ততান্ত্রিক ও সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিপর্যয় ও অবসান এবং আধুনিক ও অর্বাচীন শিল্প সভ্যতার জন্মের সন্ধিক্ষণে সামাজিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যে চরম অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল তার সমাধানের চেষ্টা থেকেই পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানের শুরু। তাঁর সুবিখ্যাত রচনা **প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-এ** পরিশিষ্টে বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন আমাদের দেশেও একই ধরণের সমস্যা দেখা গিয়েছিল আমাদের সংস্কৃতির ওপরে ঔপনিবেশিক শাসন ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অভিঘাতের ফলে। "পাশ্চাত্যদেশে লক্ষ্মী সরস্বতীর কৃপা একত্রে। শুধু ভোগের জিনিস সংযোগ হলেই এরা ক্ষান্ত নয়, কিন্তু সকল কাজেই একটু সুচ্ছবি চায়। খাওয়া দাওয়া ঘর-দোর সমস্ত [তে]ই একুট সুচ্ছবি দেখতে চায়। আমাদের দেশেও ঐ ভাব একদিন ছিল, যখন ধন ছিল। এখন একে দারিদ্র্য তার ওপর আমরাইতো নষ্ট ভ্রষ্ট [ইহা দ্বারা বা হইতে নষ্ট এবং তাহা দ্বারা বা হইতে ভ্রষ্ট] হয়ে যাচ্ছি। জাতীয় যে গুণগুলি ছিল তাও যাচ্ছে পাশ্চাত্য দেশেরও কিছু পাচ্ছি না। চলা-বলা কথাবার্ত্তায় একটা সেকেলে কায়দা ছিল, তা উৎসন্ন গেছে, অথচ পাশ্চাত্য কায়দা নেবারই সামর্থ্য নেই। **পূজাপাঠ প্রভৃতি যা কিছু ছিল, তা তো আমরা বানের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি, আর কালের উপযোগী একটা নতুন রকমের কিছু এখনও হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, আমরা এই মধ্যরেখার দুর্দশায় এখন পড়ে।**" মধ্যরেখার এই দুর্দশা যে অনিশ্চয়তা ও আত্মবিশ্বাসহীনতার জন্ম দিয়েছিল তার থেকে মুক্তির উপায় খোঁজার জন্যই সমাজ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক নির্মোহ বিশ্লেষণ দরকার ছিল।

বিবেকানন্দে সমাজ বিশ্লেষণ পদ্ধতি

সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের আপেক্ষিকতার উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাতে হীনবল প্রাচ্যের আপাত পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্তির পথ কিন্তু পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের মধ্যে পাওয়া যাবে ন। আবার পাশ্চাত্যের সমস্ত কিছুরই যুক্তিহীন বিরূপ সমালোচনা ও আপন সমাজের সবকিছুর প্রতি নির্বিচার আনুগত্যও সমাজের দুর্দশা থেকে মুক্তির উপায় নয়। যুক্তিভিত্তিক তুলনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে দুটি ভিন্ন সমাজ বা সংস্কৃতির বা জীবনাদর্শের বিশ্লেষণ করলে তুলনীয় দুটি সমাজ ও সংস্কৃতির প্রত্যেকটির দোষ ও গুণ বোঝা যেতে পারে এবং তার থেকেই তাদের বাঞ্ছিত পরিবর্ত্তনের দিশাও হয়ত মিলতে পারে। কিন্তু এই তুলনা বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন। এটা বোঝা দরকার যে "প্রত্যেক জাতির এক-একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে, সেইখানটা হতে সে জাতির রীতিনীতি বিচার করতে হবে। **তাদের চোখ তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের চোখে আমাদের দেখা—এ দুই ভুল।**" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পঃ ১৯৬) স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তিতে আধুনিক নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বহু অনুসৃত সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতার (Cultural Relativity) ধারণার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্ভর (Empirical) পদ্ধতির ওপরে গুরুত্ব প্রদান

যে কোন সামাজিক বা সাংস্কৃতিক তথ্য বা ঘটনা তার সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। এবং কোন তথ্য বা ধারণা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্য যথাসম্ভব সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যাক্ষানুভূতির উপর জোর দিয়েছেন বিবেকানন্দ। শোনা কথা নয় নিজের চোখে দেখা বা নিজের অভিজ্ঞতার উপর জোর দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। এবং যে কোন অনুমান বা সিদ্ধান্ত যাচাই করার জন্য তার **প্রায়োগিক সফলতার বিচার** তাঁর কাছে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁদের পরিবারে ভাগ্যবিপর্যয় ও দারিদ্র্য নেমে এসেছিল। সেই অভিজ্ঞতার পরেও নরেন্দ্রনাথ ভারতবাসীর দারিদ্র্যে ভয়াবহ প্রকৃতি সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারে নি। সন্ন্যাস নিয়ে পরিব্রাজক রূপেই কয়েক বছর ধরে দারিদ্র্যের নগ্নরূপ দেখার পরই বিবেকানন্দ ভারতের দরিদ্র শ্রেণীর বাস্তর অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি বারবার বুভুক্ষার জ্বালার কথা উল্লেখ করেছেন।

অন্যের আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা (Empathy)

সামাজিক সম্পর্ক বা ঘটনার যথাযথ অনুধাবনের জন্য আরও প্রয়োজন অবেক্ষণাধীন মানুষজনের বোধ এবং আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে একাত্মতা। ভিক্ষা বা দানের উপর নির্ভরশীল বিবেকানন্দের মত তাঁর অন্যান্য সতীর্থ সন্ন্যাসীরাও নিশ্চয়ই দারিদ্র্যের নগ্নরূপ দেখেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে বলা যায় যে তাঁর গভীর মানসিকতার উর্বর ক্ষেত্রে দারিদ্র্যপীড়িত ভারবাসীর প্রতি গভীর সহানূভূতি ও তাদের দুঃখ দূর করার জন্য সুদূরপ্রসারী কর্মধারার বীজ উপ্ত হয়েছিল। তাই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠার পর যখন তাঁর গুরুভাইরা তাঁর দেশব্যাপী সাংগঠনিক প্রচেষ্টা, জনসেবা, সমাজোন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে পশ্চিমী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভ্রমণেরই কুফল এবং গুরুদেব রামকৃষ্ণের নির্দেশিত ভক্তিমার্গ সাধনা থেকে বিচ্যুতি বলে সমালোচনা করেছিলেন, উত্তেজিত বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "আমি রামকৃষ্ণ বা অন্য কারুর চাকর নই। আমি কেবল তাঁরই দাস যিনি নিজের মুক্তির তোয়াক্কা না করে অপরের সেবা করেন, পরকে সাহায্য করেন।"

অন্যদিকে দারিদ্র্যের প্রতি সমবেদনা এবং শোষিতের হয়ে সওয়াল করা যে বিবেকানন্দের সমকালীন বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক চেতনায় ছিল না, তা নয়। নীলচাষীদের সম্বন্ধে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ঐকান্তিকতা এবং কৃষকদের দুর্দশা সম্বন্ধে বঙ্কিমের আবেগপূর্ণ বিহরণ এই ধরণের সমবেদনার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু এই মনোভাবকে কর্মসূচীতে রূপান্তরিত করার কোনও সাংগঠনিক প্রচেষ্টা তখনও দেখা যায় নি। আর উচ্চবর্ণের হিন্দু ভদ্রলোকের কাছে জনসাধারণ অবিসংবাদিত ভাবে "ওরা"। সেই জায়গায় বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন যে নূতন ভারতবর্ষের জন্ম হবে "চাষার কুটীর ভেদ করে, কারখানা থেকে।" এবং নিজে তিনি দেশে বিদেশে অনুক্ষণ চেষ্টা করেছেন কী করে ঐহিক সমৃদ্ধিতে বলীয়ান পশ্চিম থেকে ভারতীয়দের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য আর্থিক ও অন্যবিধ সক্রিয় সহযোগিতা আদায় করবেন সেখানকার মানুষজনের মধ্যে বেদান্তের জ্ঞান বিতরণের প্রতিদান হিসাবে।

ধর্ম ও সমাজের সম্পর্ক

ভারতীয় সন্ন্যাসীর ভূমিকা পরিবর্ধনে বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অবদান

প্রখ্যাত ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞানী গোবিন্দ সদাশিব ঘুরিয়ে যথার্থই বলেছেন যে বিবেকানন্দের মিশনারী কাজকর্মের ফলে ভারতীয় সন্ন্যাসীদের জীবনে এক নূতন দিগন্ত উন্মেচিত হয়েছিল। নানাবিধ সমাজ-সেবামূলক কর্ম ভারতীয় সন্ন্যাসী ও মঠবাসীদের একটি বৈধ এবং গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বলে বিবেচিত হল। নিজের ইহজাগতিক

সুখ-দুঃখে উদাসীন থেকেও জীবরূপী শিব সাধারণ মানুষের সেবার যে আদর্শ তিনি সন্ন্যাসীদের জন্য রেখেছিলেন তা তাঁর পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় সন্ন্যাসী সংগঠনগুলির আদর্শ হিসেবে কাজ করেছেন। ভারতবর্ষের সমাজজীবনে ধর্ম ও সন্ন্যাসীর ভূমিকা নতুন গুরুত্ব লাভ করেছে। সর্ব ধর্ম সমন্বয় সাধন পথের পথিক হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের উদাহরণের মধ্য দিয়ে হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায় যেমন বৈষ্ণব ও শৈবদের মধ্যে বেশভূষা এবং তিলকাদি নিয়ে যে ভেদাভেদ ছিল তার প্রশমনের সূচনা হয়। গেরুয়া বসন সফল হিন্দু সন্ন্যাসীরই সাধারণ বেশ হিসেবে গণ্য হয়।

ধর্মের বিশ্বজনীনতা ও সমাজভেদে ধর্মমতের বিভিন্নতা : দুরখ্যইম ও হ্বেবারের সঙ্গে তুলনা

বিবেকানন্দের চিন্তায় সমাজ এবং ধর্ম ও ধর্মমতের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের বিষয়ে পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম প্রথপ্রদর্শক এমিল দুরক্যইমের (Emile Durkheim) মতে পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। দুইজনেই হিতবাদীদের (Utilitarians) মতকে খণ্ডন করেছেন। হিতবাদীদের মতে ব্যক্তির স্বার্থ ও আপন হিত বা সুখের অন্বেষণ ও বিচার-বিবেচনাই সমাজ বন্ধনের মূল। বিবেকানন্দ দুরখাইমের পূর্বেই দেখিয়েছেন যে হিতবাদ এবং ব্যক্তিগত সুখ ভোগেচ্ছা কখনই সমাজবন্ধনের ভিত্তি হতে পারেনা। সমাজ বন্ধনের নীতি হল নীতিবোধ। ধর্ম এই নীতিবোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব নীতিশাস্ত্রই ব্যক্তিস্বার্থের গণ্ডীকে অতিক্রম করার নির্দেশ দেয়। "নীতিশাস্ত্রের উপদেশ 'স্বার্থ নয়, পরার্থ। ...নীতিশাস্ত্রের গণ্ডী, লক্ষ্য এবং অন্তর্নিহিত ভাবই হইল এই অহং এর নাশ, উহার বৃদ্ধি নয়।" দুরখাইম-এর সঙ্গে বিবেকানন্দের মৌলিক পার্থক্যও আছে। দুরখাইম ইহজাগতিক সমাজকেই ধর্মের ও ধর্মমতের ভিত্তি বলে বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেক সমাজই তার অস্তিত্বের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মূলবোধের সূচক পবিত্র বা sacred বিষয়সমূহ অন্যান্য আটপৌরে বা Profance বিষয় থেকে আলাদা করে রাখে। এবং Sacred সংক্রান্ত সামূহিক বিশ্বাস আচার-অনুষ্ঠান ও সংগঠন হচ্ছে ধর্মের ক্ষেত্র। অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দ কিন্তু পারমার্থিক এবং ইহজাগতিক চিন্তাভাবনা ও সেই সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে আলাদা করে দেখেননি এবং সেই কারণেই ইহজগতে মানবিক সম্পর্কের জটাজালকেই ধর্মের ভিত্তি বলে বিবেচনা করেন নি। 'ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রমণের চেষ্টা" তথা "ইন্দ্রিয় ও বিচার শক্তির সীমা অতিক্রম" করতে পারাকেই ধর্মের ভিত্তি বলেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সতত ক্রিয়াশীল চৈতন্যস্বরূপ অসীম সত্ত্বার সসীম মানুষের মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টাই ধর্ম। এই ঐক্যানুভূতির অভীপ্সা সব ধর্মের দেখা যায়। তাই সব ধর্মই মূলতঃ এক। অবশ্য সমাজভেদে ধর্মমত আলাদা আলাদা হতে পারে। "সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক, কিন্তু আচার্য [গণ] বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করেন।" ('ধর্ম কি' **বাণী ও রচনা** ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৬)। বিবেকানন্দ 'ধর্মমত বা সম্প্রদায় সমূহের উপাসক' হিসেবে আচরিত সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগের পরামর্শ দিয়েছেন।

একই সঙ্গে ধর্মমত ও সমাজের সম্পর্ক প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ ইউরোপের আর একজন পথপ্রদর্শক সমাজবিজ্ঞানী মাক্স হ্বেবারের (Max Weber) চিন্তাধারারও আগাম আভাস দিয়েছেন। হ্বেবারের মত বিবেকানন্দ কোনও বিশেষ সমাজের বিশেষ সময়ের ধর্মবোধ ও ধর্মমতের সঙ্গে সেই সমাজ ও সময়ের ঐহিক সমৃদ্ধির যোগসূত্রটিকে পরিস্ফুট করেছেন। ধর্মের বাণীর কীভাবে জীবনে আচরিত হয় তার ওপরেই সমাজের ঐহিক বিকাশ নির্ভর করে। "বুদ্ধই বলো আর যীশুই বলো.... তাঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী। বেশ কথা, উত্তম কথা। তবে জোর করে দুনিয়াসুদ্ধকে ঐ মোক্ষমার্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা কেন?.. বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্বনাশ ; যীশু করলেন গ্রীস-রোমের সর্বনাশ!! **তারপর ভাগ্যফলে ইউরোপীয়গণ প্রটেস্টান্ট** (Protestant) **হয়ে যীশুর ধর্ম ঝেড়ে**

ফেলে দিল, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ভারতবর্ষে কুমারিল্লফের কর্মমার্গ চালালেন, শঙ্কর আর রামানুজ চতুর্বর্গের সমন্বয়স্বরূপ সনাতন বৈদিক মতে ফের প্রবর্তন করলেন, দেশটার বাঁচবার আবার উপায় হল। তবে ভারতবর্ষে ত্রিশকোটি লোক, দেরি হচ্ছে। ত্রিশ কোটি লোককে চেতানো কি একদিনে হয়?" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাণী ও রচনা খণ্ড ৬ পৃঃ ১৫৬-১৫৭, নিম্নরেখ সংযোজিত। হ্বেবার ও বিবেকানন্দ উভয়েই পশ্চিমী দুনিয়ার ঐহিক উন্নতির সঙ্গে প্রচেষ্টান্টদের ইহজীবন-নিষ্ঠার ঘনিষ্ঠ যোগ লক্ষ্য করেছেন।

কিন্তু দুজনের মতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যও রয়েছে। হ্বেবার পশ্চিমী সভ্যতার আধুনিকতা ও ধনতন্ত্রের মূল আবিষ্কার করেছেন পরম্পরার অতিক্রমণে এবং মুনাফার জন্য যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও নূতন পথের ঝুঁকি গ্রহণের মধ্যে। তা সম্ভব হয়েছিল প্রটেষ্টান্ট নীতিবোধের ইহজাগতিক ব্যাপারে সাফল্য অর্জনের উপর গুরুত্ব প্রদানের জন্য। অন্যদিকে হ্বেবার দেখেছিলেন যে ভারতীয় তথা প্রাচ্যদেশীয়গণ পারমার্থিকতা এবং জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি বা মোক্ষলাভ ও পরলোক নিয়েই মগ্ন। এইটিই ভারতের ইহজগতে তাদের পশ্চাদ্‌গামিতার কারণ। তাই হ্বেবারের বিশ্লেষণে ভারতীয়দের মোক্ষাভিমুখী ধর্ম ও যুক্তিহীন মন্ত্রনির্ভর ধর্মাচরণের প্রতি অনুকম্পাই দেখানো হয়েছে। বিপরীত ক্রমে বিবেকানন্দ ভারতীয়দের উৎকর্ষ দেখেছিলেন তাদের আধ্যাত্মিকতা ও চতুবর্গসাধনাশ্রয়ী (ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ) ধর্মাচরণের মধ্যে। অবশ্য তার সমসাময়িক ভারতবর্ষের মানুষের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্যকে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব বিবেকানন্দ এড়িয়ে যান নি। তাঁর সমাজবিশ্লেষণে ইহজাগতিক ব্যাপারে ভারতীয়দের পিছিয়ে পড়ার কারণ দ্বিবিধ ১) ইংরাজদের রাজনৈতিক শাসন সাংস্কৃতিক প্রাধান্য এবং অর্থনৈতিক শাসন ও শোষণের ফলে পরাধানী ভারতবাসীরা হতোদ্যম, পরনির্ভরশীল ও পরানুচিকীর্ষু হয়ে পড়েছিল। ২) ভারতীয়দের হীন ঐহিক অবস্থার আর একটি বড় কারণ ছিল ধর্ম বিষয়ের প্রতি তাদের অতিরিক্ত অনুরাগের মধ্যে নয়, যথাযথ ধর্মানুষ্ঠানে তাদের ব্যর্থতায়।

বেদবিহিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় প্রত্যেকের গুণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী ধাপে ধাপে আধ্যাত্মিকতার অর্থাৎ অসীম ব্রহ্মের সাথে সসীম জীবাত্মার মিলনের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। "আজকাল ভারতে পূর্বোক্ত চারটি আশ্রম কেবল গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস- এই দুইটি আশ্রমে পর্যবসিত হইয়াছে।" আশ্রমগুলির কোনটিই অন্যটির চেয়ে বড় নয়। গৃহস্থ সামাজিক কর্তব্য করেন এবং সন্ন্যাসী কেবল ঈশ্বরোপসনা করেন। বিবেকানন্দ নিজে সন্ন্যাসী হয়েও বলেছেন (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৮) "সংসারী অপেক্ষা সংসারত্যাগী মহত্তর একথা বলা বৃথা। সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া স্বাধীন সহজ জীবন যাপন অপেক্ষা সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করা অনেক কঠিন কাজ।" বিবেকানন্দ মহানির্বাণ তন্ত্র থেকে শ্লোকের পর শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে কীভাবে শাস্ত্রে গৃহস্থকে তার স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, আত্মীয়-পরিজন, এমন কি অতিথির প্রতি তার দৈনন্দিন কর্তব্য পালন করতে বলা হয়েছে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে "যদি কোন গৃহস্থ অর্থোপার্জনের চেষ্টা না করে তাহাকে দুর্নীতিপরায়ণ বলিতে হইবে।" কেন না "গৃহস্থই **জীবন ও সমাজের** কেন্দ্র। অর্থোপার্জন এবং সৎকার্যে অর্থব্যয় করা তাঁহার পক্ষে উপাসনা। অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দের কথায় ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যে "সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ উভয়ের মধ্যেই আমরা ঈশ্বর ও তাহার সবকিছুর উপর ভক্তিভাব প্রণোদিত আত্মসর্ম্পণ ও ত্যাগরূপ একই ধর্মভাবের বিভিন্ন বিকাশমাত্র দেখিতেছি।" মহানির্বাণ তন্ত্রের ৮ম অধ্যায়ের ৫৬ তম শ্লোকে বলা হয়েছে "গৃহস্থ য-পূর্বক বিদ্যা, ধন, যশ, ধর্ম উপার্জন করবে এবং ব্যসন (দ্যূত ক্রীড়াদি), অসৎসঙ্গ, মিথ্যাবাক্য ও হিংসা, অনিষ্টাচরণ বা শত্রুতা পরিত্যাগ করবে।" এই গুণগুলিই তো হ্বেবার প্রটেষ্টান্ট নীতিবোধ এবং আধুনিক ধনতান্ত্রিক চেতনার একান্ত বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণনা করেছেন। তাই হ্বেবারের এই মত আদৌ ঠিক নয় যে ভারতীয় ঐতিহ্যে ইহজগৎকে তুচ্ছ করে পারমার্থিকতার সন্ধানকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

আধুনিককালে ভারতীয়দের ঐহিক সমৃদ্ধি নেই কেন?

বিবেকানন্দের মতে তাঁর সমসাময়িক ভারতবর্ষে অপরিসীম দারিদ্র্যের কারণ ধর্মসম্বন্ধে তাঁর সমকালীন দেশবাসীর সঠিক ধারণার অভাব ও সার্বিক দৌর্বল্য। "এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুনছ, ওটা ওই ধর্মের অভাব।?" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)। তিনি ধর্ম ও মোক্ষর মধ্যে তফাৎ করেছেন। "ধর্ম কি? যা ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।" আর "মোক্ষ কি?— যা শেখায় যে, ইহলোকের সুখ গোলামি, পরলোকেরও তাই।" মোক্ষ হল প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যাওয়া, শরীরবন্ধনের বাইরে যাওয়া, দাসত্ব হলে চলবে না। বিবেকানন্দের মতে "এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই।....তবে পরে অন্যত্রও হবে।" তাঁর বিবেচনায় "এককালে এই ভারতে, এই ভারতবর্ষে ধর্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, দুর্যোধন, ভীষ্ম প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্তমান ছিলেন।" (৬÷১৬২)। অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মের অর্থাৎ সাংসারিক কর্ত্তব্যপালন অপেক্ষা মোক্ষের উপরে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। "হিন্দুশাস্ত্র বলেছেন যে, 'ধর্মের' চেয়ে মোক্ষটা অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই।" ...বীরভোগ্যা বসুন্ধরা বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরকালেও তাই। এটাই শাস্ত্রের মত।" (৬÷১৫৩-১৫৪) ভারতবর্ষের মানুষ তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে বলেই তাদের পার্থিব দৈন্য ও আত্মিক অবনতি। বিবেকানন্দ বারবার বলেছেন "মহা উৎসাহে অর্থাপার্জন করে স্ত্রী পরিবার দশজনকে প্রতিপালন— দশটা হিতকর কার্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও— আবার মোক্ষ।"

তমোগুণের বদলে রজোগুণের অনুশীলন

বিবেকানন্দ তাঁর সমাজ বিশ্লেষণে এটাই দেখিয়েছেন যে ভারতবাসীদের ঐহিক পশ্চাদ্‌গামিতার কারণ তাদের মধ্যে তমস্ বা জাড্যের প্রাবল্য। সাংখ্য দর্শনের মতে মানবপ্রকৃতিতে তিনটি উপাদান রয়েছে— সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। তমস্-এর অন্ধকার। এর লক্ষণ কর্মহীনতা বা জড়তা। তামসিকতায় আচ্ছন্ন মানুষ কর্মবিমুখ, অকর্মণ্য ও অলস। রজোগুণের লক্ষণ কর্মশীলতা বা ক্রিয়াশীলতা যা আকর্ষণ বা বিকর্ষণরূপে প্রকাশিত। আর সত্ত্ব হচ্ছে সমতা বা আগের দুটি গুণের অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়তা ও ক্রিয়াশীলতার সামঞ্জস্য। প্রকৃত সত্ত্বগুণের বিকাশ হলেই আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ বিশ্বনিয়ন্তা অসীম সত্তার সঙ্গে সসীম মানুষের মিলনাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তখন আর জাগতিক ব্যাপারে স্পৃহা থাকে না। বিবেকানন্দ তাঁর সমসাময়িক ভারতীয়দের মধ্যে তমোগুণের আধিক্য দেখেছিলেন। তমোগুণের নিষ্ক্রিয়তাকে সত্ত্বগুণের স্পৃহাশূন্য এবং স্পৃহাযুক্তক্রিয়া শূন্য অবস্থার সঙ্গে দেশবাসীর গুলিয়ে ফেলেছে। তাই প্রথমেই দরকার রজোগুণের প্রবাহে এই তমসাবৃত অবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলা। প্রচণ্ড কর্মোদ্যোগ এমনকি ঐহিক সুখভোগেচ্ছা পূরণের জন্য অবিরত কর্মপ্রচেষ্টা ভারতের দরকার। এখানে পশ্চিমী জগৎ ভারতের উদাহরণ হতে পারে। তবে রজোগুণের উদ্দীপনায় আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্থাৎ স্বার্থশূন্যতার বোধ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হলে চলবে না।

বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় সমাজে এ পরিবর্তন সম্ভব। এক সময়ে রামায়ণ ও মহাভারতের কালে সংসার নিষ্ঠা বা ঐহিক জীবন নিষ্ঠা ও পারমার্থিকতার সন্ধানের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল। পরবর্ত্তীকালে মোক্ষের জন্য নিষ্ফল চেষ্টা করতে গিয়ে নিষ্ক্রিয়তার শিকার হয়ে পড়ে মানুষ। কিন্তু আবার এই অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব। পশ্চিমী দুনিয়ার প্রতিস্পর্ধা এই সুযোগ এনে দিয়েছে।

ভারতের জাতিব্যবস্থার বিশ্লেষণ

বিবেকানন্দের মতে ভারতের জাতিব্যবস্থা অচল, অনড় ছিল না। তিনি দেখিয়েছেন—

১) জাতি ব্যবস্থা একটা মস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করত। এক জাতিভুক্ত লোকেরা সম্মিলিতভাবে সমাজকর্তব্য স্থাপন করত।

২) জাতিব্যবস্থার দুক্রিয়া ছিল দ্বিবিধ।

ক) এই ব্যবস্থা ব্যক্তিগত কর্মোদ্যোগকে ব্যবাহত করেছিলেন। উদ্যমহীনতার ফলেই ভারতীয়রা রাজনৈতিক পরাধীনতার শিকার হয়েছিল।

খ) নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের ঘৃণা সমাজে ভাঙ্গন ধরিয়েছিল। অস্পৃশ্যাতার মত পাপের দুর্ভোগ থেকে মুক্তির জন্য নিম্নবর্ণের লোকেরা ধর্মান্তরিত হয়েছিল।

৩) অথচ জাতব্যবস্থা যে অপরিবর্তনীয় ছিল না নয়।

ক) বহু ক্ষেত্রে নিম্নজাতিবর্ণেভুক্ত লোকেরা ক্ষমতা অর্জন করে উচ্চবর্ণে আসীন হয়েছে।

খ) শাস্ত্রগুলিতেও দেখা গেছে যে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে নিম্নবর্ণের প্রতি কঠোরতা কমে গেছে।

বিশ্বসমাজ পরিবর্তনের সূত্র

বিবেকানন্দ জাতি ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য করেন নি। তিনি বর্ণব্যবস্থার রূপককে বিশ্বসমাজ পরিবর্তন ব্যাখ্যার কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর মতে মানবসমাজ ব্রাহ্মণদের শাসনের যুগ থেকে ক্ষত্রিয় ও শূদ্র অভ্যুত্থানের যুগে এসে পৌঁছেছে। যুগপুঞ্জিত অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে শূদ্রদের এই উত্থান অপ্রতিরোধ্য। তিনি দরিদ্রের দুঃখ মেটানোর জন্য অর্থনৈতিক সামাজিক সাম্য তীব্রভাবে কামনা করেছিলেন। তিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণাও করেন। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে এবং সর্বহারার দল নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রিক প্রশাসনের মাধ্যমেই এই সমাজতন্ত্র আসবে এমন কোন ইঙ্গিত তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না। বর্ণ বা জাতিকে শ্রেণী হিসেবেও দেখান নি তিনি।

উপসংহার

বিবেকানন্দ এক সন্ন্যাসী হলেও সমাজ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। মুক্তমন নিয়ে তিনি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন স্বদেশের ও বিদেশের সমাজ নিয়ে। এই তুলনায় পাশ্চাত্যের প্রতি মোহ বা বৌদ্ধিক অধীনতা ছিল না, আবার স্বদেশের সমাজের প্রতি অন্ধ অনুরাগও ছিল না। বিদেশে ভারতের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করে তিনি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। ভারতবাসীর আর স্বদেশীদের সমালোচনা করে তাদের সমস্যা উত্তরণের পথও দেখিয়েছিলেন। এই সব করাণেই তাঁর চিন্তা ভাবনা ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী

১। রায়চৌধুরী, তপন **ইউরোপ রিকন্সিডার্ড**

২। স্বামী বিবেকানন্দ **বাণী ও রচনা** ৬ষষ্ঠ খণ্ড

একক ১৪ ❐ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

প্রস্তাবনা : রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষী। দেশপ্রেমিক মানবদরদী এই কবি সমসাময়িক সমাজ ও বিশ্ব নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। একই সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের যুক্তিঋদ্ধ মূল্যায়নও করেছিলেন তিনি। তাঁর চিন্তা পরবর্ত্তী সমাজ বিশ্লেষক ও সমাজবিজ্ঞানীদের প্রভাবিত করেছে। এই একক পাঠে আপনারা জানতে পারবেন ÷

১. রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার প্রেক্ষাপট ÷ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পরিবেশ

২. রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সমাজ ও ব্যক্তিত্বের ধারণা

৩. রবীন্দ্রনাথের সমাজবিশ্লেষণ পদ্ধতি

৪. স্বদেশী সমাজ ÷ আত্মশক্তি ও সমূহ

৫. হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সমাধান সন্ধান

৬. জাতিভেদ প্রথার সমালোচনা

৭. সাম্য প্রতিষ্ঠায় সাম্যবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কার্যকারিতা

৮. সমবায় নীতি

৯. কৃষি ও শিল্পে বিজ্ঞান ও যন্ত্রের ব্যবহারর সমর্থন

১০. প্রকৃত শিক্ষা ও তার উপযুক্ত সংগঠন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্ম

১. রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার প্রেক্ষাপট : তাঁর জীবনী ও পরিবেশ

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয় জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে অর্থাৎ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের চার বৎসর পর। এই সংগ্রামে ভারতীয়দের ওপর বিদেশী শাসকদের অত্যাচার সত্ত্বেও একটি উল্লেখ্য পরিবর্ত্তন ভারতীয় সমাজের চেতনায় এসেছিল। সেটা হল বহু শতাব্দী পরে ভারতীয়দের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্যবোধের জাগরণ এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ সাধনের সমবেত প্রচেষ্টার একটা তাগিদ। এরই সঙ্গে মনে রাখা দরকার ঠাকুর পরিবারের উদার আবহাওয়ায় বিলিতি সংস্কৃতির ধারার পাশাপাশি দেশীয় ঐহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার ধারাও প্রবহমানা ছিল। রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোর এই সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠে। ফলে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চিন্তায় দেশজ সংস্কৃতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য কিংবা পশ্চিমী সংস্কৃতির নির্বিচার ও দাসসুলভ অনুকরণের কোনোটাই দেখা যায় না। পরিবর্ত্তে তাঁর বিশ্বদৃষ্টিতে বিশ্ব সংস্কৃতির প্রতি উদার মানবতান্ত্রিক মনোভাবের পাশাপাশি ভারতের মহান ঔপনিষদ অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর কাব্য সৃষ্টিতে ভারতের মর্মবাণীর সার্থক অনুরণনের

মাধ্যমেই তিনি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরষ্কার পান। বাঙালি তথা ভারতবাসী বিশ্বসভায় মর্যাদার আসন লাভ করে তাদের রাজনৈতিক পরাধীনতা সত্ত্বেও।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রধান কটি পর্যায়

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি, গল্পকার, প্রবন্ধলেখক, নট ও নাট্যকার, গীতিকার ও গায়ক, চিত্রশিল্পী রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিত্ব, সমাজকর্মী, শিক্ষাবিজ্ঞানী ও প্রতিষ্ঠান নির্মাতা সংগঠক। তিনি বিভিন্ন মহাদেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। ফলে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল প্রভূত। বিশ্বের নানান সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

তাঁর চিন্তাকে সঠিকভাবে বুঝতে গেলে তার জীবনকে মোটামুটি চারটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে।

প্রথম পর্যায় ১৯০০ সনের আগে পর্যন্ত ঃ ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সম্মিলিত প্রভাব

রবীন্দ্রনাথের শৈশব কেটেছে ধনীগৃহের যৌথ পরিবারের মধ্যে। শৈশবে মাতাপিতার স্নেহ ও প্রত্যক্ষ সাহচর্যের অভাব অনুভব করার জন্যই হয়ত পরবর্ত্তীকালে বৃহৎ পরিবারের মাঝে মাঝে সমালোচনা করেছেন তিনি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ধারাবাহিকতাও তাঁর জীবনে ছিল না। পরিণত বয়সে তিনি কখনও শিক্ষক, কখনও প্রতিষ্ঠান, কখনও পাঠ্যপুস্তকে দায়ী করেছেন তাঁর স্কুলের পাঠ শেষ না করতে পারার জন্য। কিন্তু এই খেদের জন্যই তিনি শিশুস্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে সজীব ও আকর্ষক করে তোলার ওপর জোর দেন। এবং নিজের স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সেই লক্ষ্যে পরিচালনা করেন। বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে তাঁর জ্ঞানার্জনের কোনও ত্রুটিই হয়নি। ইংরাজী সাহিত্যের পাশাপাশি সংস্কৃত সাহিত্যের সাথে তাঁর নিবিড় পরিচয় হয়। দেশজ ও পশ্চিমী শিক্ষায় এবং সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ঠাকুর বাড়ির পরিবেশে তিনি বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত ও অঙ্কন বিষয়েও পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য বিলেতে গেলেও পাঠ সমাপ্ত রেখে দেশে ফিরে আসেন পিতার আদেশে। কৈশোর থেকে প্রায় চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি মূলতঃ সাহিত্যচর্চায় মগ্ন থাকেন যার কেন্দ্রে ছিল কবিতা নিয়ে নানান সৃষ্টি। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পিতার আদেশে তিনি বিষয়কর্ম পরিদর্শনে নিযুক্ত হন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারী দেখতে গিয়ে তিনি একদিকে পল্লীপ্রকৃতির বিচিত্রসুন্দর পরিবেশ থেকে তাঁর সাহিত্য রচনার প্রেরণা ও উপাদান সংগ্রহ করেন। অন্যদিকে গ্রাম সমাজের সার্বিক উদ্যোগহীনতা ও আত্মশক্তির অভাব এবং সাধারণ মানুষের দুর্দশাও প্রত্যক্ষ করেন। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা তথা বিশ্বের অবস্থা নিয়ে তাঁর মনে আলোড়ন চলছিল বহুদিন ধরেই যদিও তার স্পষ্টরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাঁর জীবনের প্রথম চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হবার পরেই।

দ্বিতীয় পর্যায় ১৯০১-১৯১০ : স্বদেশপ্রেম

১৯০১ থেকে তাঁর জীবন স্বদেশ প্রেমের তীব্রতা পরিলক্ষিত হয়। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠান মাধ্যমে শিক্ষা নিয়ে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন — নেতৃত্বও দেন তিনি এই স্বাধীনতা আন্দোলনের (১৯০৫-১০) শুরুর দিকে। অজস্র লেখা ও বক্তৃতার রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর মতামত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন।

রবীন্দ্রনাথই প্রথম বলেন যে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সর্বাগ্রে দরকার সামূহিক শক্তির, সামাজিক সংহতির, পুনরুদ্বোধন ও পরিপুষ্টির। বিদেশীশাসনে এই শক্তি বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সমবায় ও সহযোগিতার

মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজের পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে জনগণের আত্মশক্তিকে যদি জাগানো যায় তবেই রাজনৈতিক পরাধীনতার প্রকৃত অবসান ঘটবে। এই কারণে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনে যা একদিকে পশ্চিমী শিক্ষার যান্ত্রিকতাকে পরিহার করে ব্যক্তিত্বের স্ফূরণে এবং আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনে সাহায্য করবে, অন্যদিকে দেশের জনগণের কল্যাণে লাগবে।

তৃতীয় পর্যায় ১৯১১-১৪ : হিংসাশ্রয়ী রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রতি বিরাগের স্পষ্টীকরণ ও আপন সাহিত্যকৃতির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাঁর বিভিন্ন বিষয় চিন্তাকে সুগ্রথিত করার একটা চেষ্টা দেখা যায়। কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন ও হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির প্রতি তিনি তাঁর বিরাগ ব্যক্ত করেন। ফলে অপরের বিরাগভাজনও হন তিনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অটল থাকেন তাঁর বিশ্বাসে। সে দেশপ্রেম সমাজের আপামর মানুষের স্বাতন্ত্র্যচেতনা, আত্মবিশ্বাসের ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রীতি ও সহযোগিতার ওপরে ভিত্তি করে বিশ্বমানবপ্রেম প্রসারিত হয় সেটাই তাঁর চিন্তায় প্রাধান্য পায়। ১৯১৩ সাল 'গীতাঞ্জলি'র (ইংরাজী সংস্করণ) জন্য নোবেল পুরস্কার কবিকে তাঁর মাতৃভাষা এবং দেশকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দেয়। কবির কথাও অধিকতর গুরুত্ব লাভ করতে থাকে।

চতুর্থ পর্যায় ১৯১৫-১৯৪১ : দেশপ্রেম থেকে বিশ্বমানবপ্রেম

জীবনের এই পর্বে কখনও বিশ্বভারতীয় জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্য নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে, কখনও বা বিভিন্ন দেশের মানুষের প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করেন। তাঁর দৃষ্টিদেশের সীমা থেকে আন্তর্জাতিক দিগন্তে প্রসারিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতায় বিচলিত কবি সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতা দেখান তাঁর Nationalism গ্রন্থে। চীন ভ্রমণের পর তিনি এশিয়ার মানুষের চিন্তা ও ঐতিহ্যের ঐক্যের কথা তুলে ধরেন। 'রাশিয়ার চিঠি'তে তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর যে নতুন পৃথিবী গড়ে উঠেছিল তার বৈশিষ্ট্যের মর্মগ্রাহী বিবরণ দেশবাসী তথা বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন। জীবনের প্রারম্ভিক পর্ব থেকে তিনি সৃষ্টিশীল মানবব্যক্তিত্বের গান শুনিয়েছিলেন। স্বার্থান্বেষণে নয়, অপরের সঙ্গে যোগই সৃষ্টিসুখের উল্লাস ও তার চরিতার্থতা সম্ভব। সেজন্যই প্রয়োজন পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতা। এই সহযোগিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে যুগযুগান্তব্যপী সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা সংস্কৃতি ও মূল্য বোধের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, যা কিনা ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষণের সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত রূপ, পশ্চিমে তথা সমগ্র বিশ্বে প্রবল হয়ে ওঠাতেই বারংবার বিশ্বযুদ্ধের রণহুংকার। এ পথ কল্যাণের পথ নয়। 'সভ্যতার সঙ্কট'-এ রবীন্দ্রনাথ একথাই বলেছেন। ১৯৪১ সালে তাঁর জীবনাবসানের আগে দুর্মর মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন 'মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ।' মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর সমগ্র চিন্তায় মানুষে সমস্যা উত্তরণের, সঙ্কীর্ণতার বন্ধন ছেদনের ক্ষমতায় এই অপরাজিত বিশ্বাস প্রবল।

২. রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সমাজ (society) ব্যক্তিত্বের (personality) ধারণা-রবীন্দ্রনাথের সমাজ চিন্তার ভিত্তি আধ্যাত্মিক মানবতন্ত্র

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ককে এবং ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তাকে পশ্চিমী সমাজ-বিজ্ঞানের বাঁধাধরা ছকের মাধ্যমে হয়ত পুরোপুরি বোঝা যাবে না। তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক মানবতন্ত্রী। তিনি সার্থকভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন রেনেসাঁসধর্মী মানবতন্ত্রী ঐতিহ্য যার প্রধান কথা হল সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে রয়েছে স্বয়ং মানুষ। গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরুসের উক্তি মানুষ সব কিছুর মূল্যায়নের মাপকাঠি কিংবা বাঙালীর

কবি, চণ্ডীদাসের উক্তি 'সবার উপরে মানুষ সত্য' মানবতন্ত্রের মূল কথা। মানবতন্ত্রে বুদ্ধির চর্চা ও মুক্তির সাধনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবে পশ্চিমী রেনেসাঁস প্রণোদিত মানবতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মানুষই মনুষ্যত্বের একমাত্র উৎস। এর পেছনে অন্য কোনও সত্তা বা কল্পিত শক্তি নেই। এই জায়গাতে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন মত পোষণ করেন। উপনিষদের ভাবধারায় পষ্ট রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মনুষ্যসমাজ তথা বিশ্বচরাচর এক কল্যাণকর সত্তার অভিব্যক্তি। সমগ্র সৃষ্টির পেছনে এমন এক চৈতন্যময় সত্তা বা বিশ্বাত্মা বিরাজ করেন যিনি বহু ও বিচিত্র সবকিছুকে সর্বদাই সুসমঞ্জস ও সংগতিপূর্ণ করে তোলেন। মানুষের ব্যক্তিত্ব বা মানবাত্মা এই পরমসত্তার আংশিক প্রকাশ যা ক্রমাগতই বিকাশশীল।

ব্যক্তিত্ব

রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা অনুসারে মানুষের ব্যক্তিত্ব তার ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনের সঙ্কীর্ণতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে না। সমাজের অন্যান্য মানুষ তথা সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতার বোধ ও সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে কোনও মানব-ব্যক্তিত্ব বিশ্বব্যাপী পরম সত্তার সঙ্গে মিলিত হতে পারে। মানুষের বক্তিত্বকে বোঝানোর জন্য তাঁর বিখ্যাত **Personality** (1917) **ব্যক্তিত্ব (১৯৬১)** গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'The Second Birth' বা 'দ্বিতীয় জন্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কেমন করে মানুষ প্রকৃতির জগতে জন্মলাভ করে প্রকৃতির জগতের বাইরে আপনার একটি নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করে। মানুষ যতক্ষণ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত ততক্ষণ সে গাছপালা ও পশুদের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। মুহূর্তে মানুষ প্রকৃতির অন্ধ অচেতন নিয়মের বাঁধন কাটিয়ে সচেতনভাবে কর্ম শুরু করল অমনি সে রচনা করতে শুরু করল তার নিজস্ব একটি জগৎ — চেতনানিয়ন্ত্রিত কর্মের জগৎ। 'যা-আছে'-র জগৎ থেকে মানুষ চলল উদ্দেশ্যের জগতের দিকে। মানুষের দ্বিতীয় জন্মলাভ হল। বাসনার জগতের সঙ্গে আদর্শের জগতের, যা চাচ্ছে মন তার সঙ্গে মনের যা চাওয়া উচিত, এ দু'য়ের সংঘাত শুরু হল মানুষের মনে। শুরু হয়ে গেল মানুষের জগৎ রচনা। প্রকৃতির বহির্ভূত এই জগতে মানুষ তার ব্যক্তি স্বতন্ত্রতাকে বিশ্বজনীনতার সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ করবার জন্য দুঃসহ সাধনা করে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথের কথায় "যা আছে ও যা হওয়া উচিত এই নিয়ে মানুষের চেতনার মধ্যে...দ্বৈততা বর্তমান। পশুর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য নেই কেননা পশুর মধ্যে বিরোধ যা চাওয়া হয়েছে ও যা চাওয়া উচিত তার মধ্যে। যা চাওয়া হয়েছে, তার অধিষ্ঠান প্রাকৃতিক জীবনে সেখানে আমরা পশুদের সহযাত্রী। কিন্তু যা চাওয়া উচিত, তার অধিষ্ঠান এমন এক জীবনে যা এই জীবন থেকে বহু দূরে। সুতরাং মানুষের দ্বিতীয় জন্ম ঘটেছে।" **(ব্যক্তিত্ব,** সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের Personality গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ; কলিকাতা ÷ বিশ্বভারতী ১৯৬১, পৃঃ ৬৬)। পশুজীবনের অভ্যাস ও প্রবৃত্তির সঙ্গে মানুষের দ্বিতীয় জন্মের জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের বিরোধ রয়েছে। এই বিরোধ মেটানোর জন্য মানুষ নিজের মধ্যে সংগ্রাম করে চলে। "নিজের মধ্যে এই সংগ্রামের আবশ্যকতা মানুষের **ব্যক্তিত্বে একটি নূতন উপাদান যুক্ত করেছে ; তা হল চরিত্র।** আকাঙ্ক্ষার জীবন থেকে এই চরিত্র মানুষকে উদ্দেশ্যের জীবনের পথে পরিচালনা করে। এই জীবন নৈতিক জগতের অন্তর্গত।" (তত্রত্য, পৃঃ ৬৬-৬৭, নিম্নরেখ সংযোজিত)

ব্যক্তিত্ব ও নৈতিকতা

এই নৈতিক জগতের ভিত্তি হল আত্মত্যাগ, আত্মসুখের চরিতার্থতা বা স্বার্থসিদ্ধি নয়। "সর্ব যুগের ও দেশের সংখ্যাতীত ব্যক্তি-মানুষের আত্মত্যাগের উপর এই জগতের ভিত্তি গড়ে উঠেছে।" (তত্রত্য, পৃঃ ৬৭) এটাই হল

মানুষের দ্বিতীয় জন্মের জগৎ ; অতিপ্রাকৃত জগৎ। "এখানে পশুজীবন ও নৈতিক জীবনের দ্বৈততা মানুষ হিসেবে আমাদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তোলে।" (তদেব)। নৈতিক জগতের সঙ্গে মানুষের জীবনের ত্রুটিহীন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এই ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন মানুষ প্রাকৃতিক জগতে বিজ্ঞানের সাহায্যে পদার্থ শক্তিসমূহের পীড়নকে আনুগত্যে পরিণত করার চেষ্টায় রত। "কিন্তু নৈতিক জগতে মানুষকে কঠিনতর কর্ম সাধন করতে হচ্ছে। মানুষকে তার নিজের প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষাসমূহের পীড়নকে আনুগত্যে, পরিণত করতে হচ্ছে। আর সর্বকালে ও সর্ব ঋতুতে মানুষের বিরামহীন সাধনা এই উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হচ্ছে। আমাদের সকল প্রতিষ্ঠানই এই সাধনার ফল।" (তদেব)।

পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানীদের থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্রতা

পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানীদের অন্যতম এমিল দুরখাইম বলেছেন সামাজিক বন্ধন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিত্তি হচ্ছে morality বা নীতিবোধ। ব্যক্তিগত সুখান্বেষণ-ভিত্তিক হিতবাদের দ্বারা সমাজের প্রকৃতি ও অস্তিত্ব ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু তিনি সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিমনের বাইরে অবস্থিত ব্যক্তির চিন্তা ও আচরণের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসেবে দেখেছেন। ব্যক্তিত্বের ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে নৈতিক জগতের সৃষ্টির সম্পর্ককে তিনি সম্যক বোঝাতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের মতে এই সম্পর্কের ভিত্তি বন্ধন বা নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে নেওয়ার বাধ্যবাধকতা নয়, মহত্তর উদ্দেশ্যে এই বন্ধন থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা। এর ভিত্তি প্রাথমিকভাবে সামগ্রিক কল্যাণবোধ, কিন্তু পরিণামে সকল বন্ধন বা নিয়ন্ত্রণমুক্তির অভীপ্সা। "অন্তরের মুক্তি হল স্বার্থ-সাধনের সংকীর্ণতার থেকে মুক্তি।" (তত্রত্য, পৃঃ ৬৮)। যখন ইচ্ছাশক্তি বাধামুক্ত ও সৎ হয়, অর্থাৎ এর ক্ষেত্রে সর্বমানবে ও সর্বকালে প্রসারিত হয়, তখন তা মানুষের নৈতিক জগৎকে অতিক্রম করে আর এক জগতের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করে।" (তদেব)

এমিল দুরখাইম ও মাক্স হ্বেবারের সমাজ বিশ্লেষণে মানুষের ইহজাগতিক বিচারবুদ্ধি ব্যতিরেকে অন্য কোনও কিছুর, যেমন কোনও পরম সত্তার, ধারণার সাহায্য নেওয়া সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার দুর্বলতারূপেই প্রতীয়মান হয়। অথচ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কোনও সমাজের তথা বিশ্বসমাজের পরিবর্তনের দিশা নির্ণয়ের জন্য ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক দিকটিও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিকের সম্মিলন

ব্যক্তিত্বের জগৎ গ্রন্থে (The world of Personality) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আত্মোপলব্ধির প্রচেষ্টাই ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। "আমাদের আত্মোপলব্ধির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক রয়েছে। নৈতিক দিকে রয়েছে স্বার্থহীনতার শিক্ষা, আকাঙ্ক্ষার নিয়ন্ত্রণ ; আধ্যাত্মিক দিকে রয়েছে সহানুভূতি ও ভালোবাসা। এদের একত্রে গ্রহণ করা উচিত ; কখনো স্বতন্ত্রভাবে দেখা উচিত নয়। কেবলমাত্র আমাদের প্রকৃতির নৈতিক দিকের চর্চা হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও কাঠিন্যের রাজ্যে আমাদের নিয়ে যায়, নিয়ে যায় ভালোত্বের অসহ্য দম্ভের পথে। আর কেবল আধ্যাত্মিক দিকের চর্চা আমাদের নিয়ে যায় কল্পনার অসংযমের অন্ধকার-তার আমোদের ক্ষেত্রে" (তত্রত্য, পৃঃ ৫৮)।

আধ্যাত্মিক দিক ও নৈতিক দিক দুটিই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মি দিকের উৎস বিশ্বব্যাপী বিরাজমান ঈশ্বরের সঙ্গে মানবহৃদয়ের একাত্ম হবার অভীপ্সা। সর্বেশ্বরবাদী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সৃষ্টি ও স্রষ্টা অভিন্ন ও এক। তাঁর কথায় "দেবতা দূরে নাই, গির্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন।....এই সংসারই

তাঁর চিরন্তন মন্দির। এই সজীবন সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইয়া উঠিতেছে।" তাই সংসার জীবনের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করার মাধ্যমে সংসারকে উপভোগ করাই ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ, সংসারকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা নয়। ব্যক্তিত্বের মূল সব কিছুতে বর্তমান এক সজীব সত্তা বা আত্মা। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের মতে জগৎ চরাচরের গভীরে আত্মার অবস্থান-কল্পনা সভ্যতার ভাণ্ডারে ভারতের একটি অনন্য অবদান। সকল কিছুতেই আত্মার অবস্থান সম্পর্কে এই প্রত্যয় তাঁকে উপনিষদ চিন্তা থেকে আধুনিক জড় বিজ্ঞানের ক্ষেত্র পর্যন্ত অনুসরণ করেছে। বৃক্ষের মর্মর স্বর, নদীর কলতান, পর্বতমালার গম্ভীর সৌন্দর্য ও বিহঙ্গের সঙ্গীতের মধ্যে সেই পরমসত্তার সৃষ্টিশীল সামঞ্জস্য বিধানের আনন্দময় প্রকাশ। ব্যক্তিত্ব সেই আনন্দ উপভোগের মধ্য দিয়েই অনন্তের সত্তাকে উপলব্ধি করে এবং নব নব সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করে। "বক্তিত্বে স্পর্শের এই উপলব্ধি মানুষের হৃদয়ে এক কেন্দ্রোপসারী ঝোঁক সৃষ্টি করেছে যার ফলে মানবহৃদয় এক বিরামহীন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। সংগীতে চিত্রে কাব্যে, মূর্তিতে উজাড় করে দেয় আপন সৃষ্টিতে। আর কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি মানুষকে আকর্ষণ করেছে নানা গোষ্ঠী, নিজেকে উজাড় করে দেয় আপন সৃষ্টিতে। আর কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি মানুষকে আকর্ষণ করেছে নানা গোষ্ঠী, গোত্র ও সাম্প্রদায়িক সংগঠনে।" (তদেব ; পৃঃ ৫৯)। কিন্তু ভূমি কর্ষণ, বস্ত্র বয়ন সন্তানদের লালনপালন, সম্পদের জন্য শ্রম ও শক্তির জন্য সংগ্রাম করার সময়ে মানুষ একথা ঘোষণা করতে কখনও ভোলে নি যে সে তার জগতের অন্তস্তলে মৃত্যুঞ্জয় পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করেছে। মানুষের ব্যক্তিত্ব তাই নৈরাশ্য ও বেদনার দ্বারা পর্যুদস্ত হয়েও বিনষ্ট হয় না, সে পরমপুরুষের স্পর্শ অনুভব করতে চায়।

সমাজ-একাধারে ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের উৎস ও সৃষ্টি

সমাজের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়, মানুষের আত্মোপলব্ধি হয়। নিজেকে সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে মানুষ সর্বমানবের মধ্যে ক্রিয়াশীল বিশ্বসত্তার সাথে এক নিগূঢ় ঐক্য অনুভব করে। "মানুষের এই উপলব্ধি ও চরিতার্থতার জন্য সর্বোত্তম উপায় মানুষের সমাজ। এই সমাজ মানুষের সম্মিলিত সৃষ্টি এবং এর মাধ্যমে মানুষের সামাজিক সত্তা নিজেকে সত্য ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে আবিষ্কারের চেষ্টা করে। ....সামাজিক ঐক্য ও আত্মীয়তার এই বৃহত্তর জীবনে মানুষ অনুভব করে ঐক্যের রহস্য, যেমনটি সে করে সঙ্গীতের মধ্যে।" ''[For man, the best opportunity for such a realization has been in man's society. It is a collective creation of lies, through which his social being tries to find itself in its truth and beauty....In this large life of social communion man feels mystery of unity, as he does in music." (Creative Unity. Madras Macmillan, 1988 (1922) pp. 21-22)]

রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজকেই অধিক প্রামান্য দিয়েছেন এবং আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় সমাজকে জৈব (organic) প্রত্যয়ে বিচার করেছেন। মানুষের দুটি মুখ্য প্রবণতা তিনি লক্ষ্য করেছেন ÷ একটি আত্মতৃপ্তি এবং অপরটি আত্মোন্নতি। মানুষ বিষয়সম্পত্তিতে সুখের সন্ধান করে আত্মকেন্দ্রিক জৈব প্রবৃত্তির তাড়নায়। কিন্তু মানুষের মধ্যে আরেকটি বৃত্তিও ক্রিয়াশীল সেটা হল সকলের শুভকামনা ও মঙ্গলচিন্তা। আবার বংশ ও জাতি রক্ষার জন্য এই পরার্থপরতার উৎস হল সহজাত জৈব প্রবৃত্তি। মনুষ্যপ্রকৃতির এই দ্বিবিধ ধারার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমাদের একটি বৃহত্তর শরীর রয়েছে, সেটা হল সমাজ শরীর। সমাজ হল একটা জৈব সত্তা যার অংশ হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা আছে। আমরা আমাদের নিজ নিজ সুখ চাই, যা খুশী তাই করতে চাই। আমাদের প্রত্যেকে অন্য বক্তিকে দিতে চাই কম অথচ অন্যের থেকে পেতে চাই বেশী। এই কারণে সামাজিক জীবনে ঝগড়াঝাঁটি ও লড়াই দেখা যায়। কিন্তু আমাদের মধ্যে অন্যতর ইচ্ছাও বর্ত্তমান, যা আমাদের সামাজিক সত্তার গভীরে কাজ করে যায়। এটা হচ্ছে সমাজের কল্যাণ কামনা।" [We have a greater body

which is the social body. Society is the organism, of which we as parts have our individual wishes. We want our own pleasure and license. We want to pay less and gain more than anybody else. This causes seramflings and fights. But there is that other wish in us which does its work in the depths of social being. It is the wish for the welfare of the society'' **(sadhana,** Madras : Macmillan, 1988 (1913), p. 68).

সমাজের প্রয়োজন মানুষের স্বভাবগত। মানুষর শুভ ও সুন্দর বোধের উৎস হল সমাজ। সামাজিক কাঠামোয় মানুষ বুদ্ধি ও বিবেককে সংযুক্ত করে এবং সেই কাঠামোটি সমাজের সভ্যদের পারস্পরিক চিন্তা ও অনুভূতির সাযুজ্য রক্ষা করে। মানুষের অহংভাবকে সমাজই অতিক্রম করে এবং তার প্রবৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ করে। সমাজের মধ্য দিয়েই সকল মানুষের মিলন ঘটে। রবীন্দ্রনাথের মতে, ''সমাজের নিজের কোনও দূরবর্ত্তী উদ্দেশ্য নেই। সমাজ নিজেই একটি উদ্দেশ্য। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ হল সমাজ। সমাজ মানবিক সম্পর্কের সেই স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ যার সাহায্যে ব্যক্তিরা পারস্পরিক সহযোগিতার পথে তাদের জীবনাদর্শের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। এর একটি রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক দিকও আছে, কিন্তু সেটি কেবল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের সাথে সম্পর্কিত তা হল নিজেকে টিকিয়ে রাখা। এই দিকটি শক্তি বা ক্ষমতার দিক, মানবিক আদর্শের নয়। এবং শুরুতে এই ক্ষমতার পৃথক একটি জায়গা ছিল সমাজে এবং সেটি বিশেষ বৃত্তির লোকেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।" [Society as such has no ulterior purpose. It is an end itself. It is a spontaneous self-expression of man as a social being. It is a natural regulation of human relationships, so that men can develop ideals of life in co-operation with one another. It has also a political side, but this is only for a special purpose. It is for self preservation. It is merely the side of power, not of human ideals. And in the early days it has its separate place in society, restricted to the professionals. (Nationalism; Madras : Macmillan 1985 p.5).

সমাজ ও রাষ্ট্র বা নেশন-স্টেট

রবীন্দ্রনাথ সমাজকে রাষ্ট্রের চেয়ে বড় বলে মনে করতেন। সামাজিক ঐক্যকে রাষ্ট্রিক বা ন্যশনাল ঐক্যের চেয়ে মহত্তর বলে মনে করতেন। ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ স্বাধীনতা সংগ্রামের রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে এবং তার একটা বিশিষ্টতাও লক্ষণীয়। এই জাতীয়তাবাদের ভাবধারা ইউরোপীয় প্রায় নেশন বা ন্যাশনালিজমের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন যে ইউরোপীয়দের এবং ভারতীয়দের ঐক্যের ধারণা একরকম নয়, কিন্তু তাই বলে ভারতীয়দের মধ্যে যে ঐক্য নেই তা বলা ঠিক হবে না। 'সে ঐক্যকে ন্যাশনাল না বলিতে পার কারণ নেশন এবং ন্যাশনাল কথাটা আমাদের নহে, ইউরোপীয় ভাবের দ্বারা তাহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে।" ('ভারতবর্ষীয় সমাজ' **রবীন্দ্ররচনাবলী,** খণ্ড ১২, পৃঃ ৬৭৯। 'নেশন কী' তত্রত্য, ৬৭৫-৬৭৮)। ন্যাশনাল ঐক্যের অর্থ ''রাষ্ট্রতন্ত্রমূলক ঐক্য"। (তত্রত্য পৃঃ ৬৭৯)।

বিচিত্রকে ঐক্যবদ্ধ করার শক্তিকেই রবীন্দ্রনাথ অন্যতম মানদণ্ড বলে বিবেচনা করেছিলেন। ইউরোপে ঐক্য অর্জিত হয়েছে নেশন স্টেট বা রাষ্ট্রের মাধ্যমে। তাই ইউরোপে রাষ্ট্রতান্ত্রিক ঐক্যই শ্রেয়। ভারত বিচিত্রকে একত্র করেছে সমাজের সূত্রে। নেশনের মধ্য দিয়ে ইউরোপ যাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে তারা সবর্ণ, ভারত যাদের একসূত্রে বেঁধেছে তারা কিন্তু অসবর্ণ। ভারতীয় সভ্যতার এটাই বৈশিষ্ট্য যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও এক সমাজবন্ধন স্বীকার করে নিয়েছে। এটা কখনই বাহুবল বা অস্ত্রশক্তি প্রয়োগের ফলে হয়নি। এর ভিত্তি ভারতীয় সমাজের সদস্যদের অতীত কাল থেকে মিলনের জন্য, সামূহিক কল্যাণের জন্য,

অপরের জন্য স্বার্থত্যাগ করার প্রস্তুতি ও তৎপরতার জন্য। রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যপ্রচেষ্টা উপেক্ষনীয় নয়। কিন্তু ভারতীয় সমাজে ঐক্যের দৃঢ়তার জন্য এই রাষ্ট্রতান্ত্রিক ঐক্য যথেষ্ট নয়। এই ঐক্যের জন্য প্রয়োজন সামাজিক ঐক্য। "আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়ো।" অন্য দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। ঐক্য বিধায়কদের শক্তিসংগ্রহ ও শক্তিপ্রয়োগই তার শক্তি। আর নেশন স্টেটই তাদের আশ্রয় বলে নেশন স্টেটসমূহের অধিবাসীরা নিজ নিজ নেশন স্টেটের শক্তিবৃদ্ধির জন্য অপরাপর নেশন স্টেটের ওপর, অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেছে। তাই "য়ুরোপের নেশনতন্ত্রে এই স্বার্থ বিরোধ ও বিদ্বেষের প্রাচীর প্রতিদিনই কঠিন ও উন্নত হইয়া উঠিতেছে। ...আগে আমার নেশন তার পরে বাকি আর সমস্ত কিছু, এই স্পর্ধা সমস্ত বিশ্ববিধানের প্রতি ভ্রূকুটি কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে।" ('বিরোধমূলক, আদেশ', তত্রত্য, পৃঃ ৮৮৪)। 'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি বলেছেন যে জাতীয়তাবাদ মানুষকে মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন ও তার মনুষ্যত্বকে অবরুদ্ধ করে। এই কারণে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন আমাদের ঐতিহ্যে ন্যাশনালিজম বা রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যের ধারণা ছিল না বলে আমাদের লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। কেননা এই ঐতিহ্য সমাজভিত্তিক ঐক্যের দ্বারা বিধৃত। আর এই ঐক্য আপন সুখ বিধানের ও স্বার্থসাধনের অবিশ্রান্ত চেষ্টার ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, এর ভিত্তিভূমি অপরের ব্যক্তিত্বের ও অন্য জনসমষ্টির স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নেওয়ার ক্ষমতা এবং অপরের কল্যাণের জন্য নিজেদের সংকীর্ণ সুখভোগৈষণা বিসর্জন দেওয়ার চিন্তা ও কর্ম। এরই জন্য ভারতীয় সমাজ বিচিত্রের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটিয়ে সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হতে পেরেছে এবং বহু শতাব্দীর মধ্য দিয়ে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। এই জন্যই ভারতীয় সমাজের আদর্শ যেমন একদিকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য বিকাশের পথে উন্মুক্ত রেখেছে তেমনই বিশ্বমানবের মিলনের সম্ভাবনাও অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে। কিন্তু ন্যাশনালিজম্-এ এই সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। ন্যাশনালিজমের প্রতিষ্ঠা নেশন বা কাল্পনিক এক সমষ্টির কাছে ব্যক্তিকে বলি দিয়ে মানুষের সৃষ্টিশীল সত্তার বিকাশকে ব্যাহত করে। অন্যদিকে একটি বিশেষ নেশন তার স্বার্থরক্ষায় অন্য একটি নেশনের উৎসাদনে পশ্চাৎপদ নয়। ভারতীয় সমাজ জীবনের আদর্শ কিন্তু সংঘাতের মধ্য দিয়ে অপরের বিনাশ নয় ; তার আদর্শ সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে অপরকে আপন করে নেওয়া। এবং সেজন্য ভারতীয় জীবনের আদর্শ বিশ্বকে পথ দেখাবে। বিবেকানন্দের মত রবীন্দ্রনাথের চিন্তাতেও ভারতীয় ঐতিহ্যের ও ভারতের সমাজ আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে। আবার বিবেকানন্দের মতই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের দেশের সমাজের দুর্বলতাগুলির তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ একটি যুক্তি নির্ভর সমাজ বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম ও শেষ পরিচয় ছিল তিনি আন্তরিকভাবে একজন কবি এবং সাহিত্যিক। তাঁর সত্যানুসন্ধান ও সত্যদর্শনের পথ সমাজ বিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। এই পার্থক্যের স্বরূপ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের মন্তব্যে সুপরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথ একবার মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ' পাঠ করেন যেখানে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যে ব্যক্তি, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও কল্যাণবোধ এবং রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে সম্পর্কটির সুনিপুণ বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠ শেষ হলে গুরুদাসবাবু বলেন, "কোনো ব্যক্তি একটি দেশ গজকাঠি লইয়া মাপিতে যান। প্রত্যেকটি স্থান, তাহার ভৌগোলিক সংস্থান, ইতিহাস প্রভৃতি তাঁহার নক্সায় পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। ইনি বৈজ্ঞানিক। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি সে-সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচিত্র তত্ত্বের দিকে না যাইয়া হয়ত একটি টিলার উপর দাঁড়াইয়া অঙ্গুলিসংকেতে দূর হইতে দেখাইয়া দেন, সেই আভাসে সমগ্র দেশটির একটি সংক্ষিপ্ত ও জীবন্ত চিত্র দর্শকের চক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইনি কবি। বৈজ্ঞানিক যেরূপভাবে আমাদের অভাব অভিযোগের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কথা বলিয়া উপায়গুলির ক্ষুদ্রতম

বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইতেন রবীন্দ্রনাথ তাহা না করিয়া তাঁহার অপূর্ব প্রতিভার সংকেতে যেন একটি চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। আমরা বিদেশমুখী ছিলাম, স্বদেশমুখী হইব।" (**আত্মশক্তি ও সমূহ রবীন্দ্ররচনাবলী খণ্ড ১২**, পৃঃ ৭৬৯)। দৃষ্টিভঙ্গী (macroview) থেকে ভারতবর্ষের সমাজ তথা মানবসমাজ এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস তথা বিশ্বের ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছিলেন যা থেকে আমরা সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাই। অবশ্যই পল্লীসমাজ সম্বন্ধে, দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রবন্ধাবলীতে, দেশের মানুষ ও মানুষের জীবন সম্পর্কে তাঁর উপন্যাস, বিশেষতঃ ছোট গল্পে, বাস্তবজীবন সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ ও সংবেদনশীল অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য আহরণ ও তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পেশ না করতে পারলেও সমাজ ও তার সংস্কৃতি যথার্থভাবে বোঝার জন্য বাস্তবজীবন সম্পর্কে মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে বিশদ তথ্য সংগ্রহ এবং তার বিজ্ঞান সম্মত বিচার বিশ্লেষণের গুরুত্ব সম্পর্কে তরুণ সমাজকে অবহিত করেছিলেন। যথার্থ সমাজ-বিজ্ঞান বা নৃবিজ্ঞানের ভিত্তি কী হওয়া উচিত এবং তার ফল কী হতে পারে তার সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত বিচার ব্যক্ত করেছিলেন তিনি।

ভারতে সমাজবিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কারের বিপুল সম্ভাবনা

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, "এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের যেমন বহুতর অবস্থা বৈচিত্র্য আছে, এমন বোধ হয় আর কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্বক ও অভিনিবেশপূর্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে **সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান** আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, এমন দূর দেশের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বই পড়িয়া কখনো হইতেই পারে না।" ('ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ', **রবীন্দ্ররচনাবলী,** পঃ বঃ সরকার, খণ্ড ১২, পৃঃ ৭২৭, নিম্নরেখ সংযোজিত)। বিচিত্র জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, আচার ব্যবহারের প্রকৃতি অনুধাবন করে, তাদের তুলনা করে তাদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের সাধারণ ধর্ম যে মানব ঐক্য সেটাকে প্রস্ফুটিত করাই সমাজবিজ্ঞানের কাজ। আর সে কাজের জন্য ভারতবর্ষ উপযুক্ত ক্ষেত্র।

সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের চাই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ

রবীন্দ্রনাথ নিজে যদিও তত্ত্বদর্শী ছিলেন, সমাজ সম্বন্ধে প্রকৃত ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি পুঁথিগত বা পুঁথি থেকে আহৃত তত্ত্বকে যথেষ্ট বলে মনে করেন নি। পুঁথিগত বিদ্যায় আবদ্ধ তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণী মনে করে যে দেশের সাধারণ মানুষ প্রথাবদ্ধ জীবনে আটকে আছে। তাদের জীবনে নিঃশব্দে যে পরিবর্ত্তন ঘটে যাচ্ছে তা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় এবং তার ফলে তারা দেশের পরিবর্ত্তনের গতি ও অভিমুখ বুঝতে পারে না। দেশ ও সমাজকে বুঝতে সাধারণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের (mutural relationship) ও মিথষ্ক্রিয়া (interaction)র প্রকৃতি বুঝতে হবে। এবং এটা করার জন্য তাদের কাছে যেতে হবে। বস্তুতঃ মানুষের কাছে গিয়ে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে জানার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়াটি সজীব ও আকর্ষক হয়ে ওঠে অনুসন্ধানকারীর কাছে। "দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য, তাহা আমি বলি না — যেখানেই হোক না কেন মানবসাধারণের মধ্যে যা কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে। পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে ; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে।" (তত্রব্য, পৃঃ ৭২৯)। সাহিত্য পরিষদ-এর মত সংস্থাগুলি যদি ছাত্র-ছাত্রীদের, তরুণ-তরুণীদের নিজের নিজের অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে ক্রিয়াশীল ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির বিবরণ সংগ্রহ করে আনতে উৎসাহ দেন তাহলে এই কাজ করতে

গিয়ে তারা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও কাজকর্মের প্রতি যথোচিত নজর দেওয়ার শিক্ষাও লাভ করবেন এবং দেশের কাজও করতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করছেন এই সাধারণ জীবনের একেবারে কাছে গিয়ে, তাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের ছাত্রদের মধ্যেও বিরল। তারই ফলে সাধারণ মানুষের আনন্দ-বেদনা, হর্ষ-বিষাদ অজানাই থেকে যায় শিক্ষিত জনের কাছে। তিনি দুঃখ করে বলেছেন "আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnollogy র বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুণ **আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম কৈবর্ত-বাগদি রহিয়াছে তাহাতের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে** পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি (তদেব)। সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানের উৎস সমাজ জীবনের শরিক খেটে-খাওয়া মানুষের বাস্তব জীবন। যদি তাদের একেবারে কাছে চলে যাওয়া যায় তাহলে সমাজ জীবন সম্বন্ধে উৎসুক্য বৃদ্ধিই পাবে। "আমাদের ছাত্রগণ যদি তাহাদের এই সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে ক্ষেত্রনিরীক্ষণ নির্ভর পদ্ধতির যে গুরুত্ব আজ সকলেই স্বীকার করেন তার প্রয়োজনীয়তার কথা রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন তাঁর লেখায়। উদাহরণস্বরূপ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত বিবিধ উপভাষা, আচরিত নানা ব্রতপার্বণ, বিচিত্র সামাজিক প্রথা, গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলোনো ছড়া, প্রচলিত গান এর কথা বলেছেন তিনি। এই সব বিষয় সম্বন্ধে উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য না থাকলে দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভ সম্ভব নয় আর সেই জ্ঞানের জন্য ক্ষেত্র নিরীক্ষার প্রয়োজন।

বাস্তব জীবনের পক্ষে এই ধরণের তথ্য প্রচেষ্টার অন্য এক গুরুত্বের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। এর মাধ্যমে অনুসন্ধানকারীর সাথে সাথে যাদের জীবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে তারাও শিক্ষিত হয়। **রাশিয়ার চিঠি**-তে তিনি সেদেশে সর্বত্র পরিব্যপ্ত "region study অর্থাৎ স্থানিক তথ্যসন্ধানের উদ্যোগ" এর সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। তাঁর সময়ে এরকম হাজার শিক্ষাকেন্দ্র ছিল এবং তার সদস্যসংখ্যা সত্তর হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। "এই সব কেন্দ্রে তত্তৎ স্থানের অতীত ইতিহাস এবং অতীত ও বর্তমানের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান হয়। তা ছাড়া সে-সব জায়গায় উৎপাদিকা শক্তি কিরকম শ্রেণীর, কিম্বা খনিজ পদার্থ সেখান প্রচ্ছন্ন আছে কিনা তার খোঁজ হয়ে থাকে। এই-সব কেন্দ্রের সঙ্গে যে-সব ম্যুজিয়ম আছে তারই যোগে সাধারণের শিক্ষা-বিস্তার একটা গুরুতর কর্তব্য।" সোভিয়েট রাষ্ট্রে জ্ঞানোন্নতির যে নবযুগ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন "এই স্থানিক চর্চা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ম্যুজিয়ম তার একটা প্রধান প্রণালী।"

(**রবীন্দ্ররচনাবলী,** খণ্ড ১০, পৃঃ ৭০০)। তাঁর নিজস্ব কর্মক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে কালীমোহনবাবু এইরকম নিকটবর্ত্তী স্থানের তথ্যানুসন্থান শুরু করেছিলেন, "কিন্তু এই কাজের সঙ্গে... ছাত্র ও শিক্ষকেরা যুক্ত না থাকাতে তাদের তাতে কোনো উপকার হয় নি।" তবুও **"সন্ধান করবার ফল পাওয়ার চেয়ে সন্ধান করা মন তৈরি করা কম কথা নয়।** কলেজ-বিভাগের ইকনমিক্স্ ক্লাসের ছাত্রদের নিয়ে প্রভাত এইরকম চর্চার পত্তন করেছেন শুনেছিলুম ; কিন্তু এ কাজটা আরো বেশি সাধারণভাবে করা দরকার..." (তদেব, নিম্নরেখ সংযোজিত)। বস্তুতঃ "বিজ্ঞানশিক্ষায় পুঁথির পড়ার সঙ্গে চোখের দেখার যোগ থাকা চাই, নইলে সে শিক্ষার বারো আনা ফাঁকি হয়। শুধু বিজ্ঞান কেন, অধিকাংশ শিক্ষাতেই এ কথা খাটে।" রাশিয়ার বড় বড় শহর থেকে পল্লীগ্রাম পর্যন্ত বিবিধ

বিষয়ে ম্যুজিয়মের সাহায্যে বই পড়ার বিদ্যা চোখে দেখার অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে দেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে দেশের মানুষকে জানা

চোখে দেখে শেখার আর একটা প্রণালী হচ্ছে ভ্রমণ। "ভারতবর্ষ এত বড়ো দেশ, সকল বিষয়েই তার বৈচিত্র্য এত বেশী যে তাকে সম্পুর্ণ করে উপলব্ধি করা হন্টারের গেজেটিয়র পড়ে হতে পারে না। একসময়ে পদব্রজে তীর্থভ্রমণ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল— আমাদের তীর্থগুলিও ভারতবর্ষের সকল অংশে ছড়ানো। ভারতবর্ষকে যথাসম্ভব সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার এই ছিল উপায়। (তত্রত্য, পৃঃ ৭০৮) রবীন্দ্রনাথ সেই ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে আধুনিককালে দেশভ্রমণের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচনা করেছেন। এর দ্বারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের জীবনধারা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবে ছাত্রছাত্রীরা। পুঁথিগত বিদ্যার সাথে চোখে দেখা বাস্তবকে মিলিয়ে নিজেদের দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান লাভ করবে তারা। ভ্রমণকালে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা প্রত্যক্ষ করে দেশের জনগণ ও সমাজের বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথের সমাজ বিশ্লেষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি হল

১) সমাজকে ও সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য মানুষের বাস্তব জীবন সম্বন্ধে তথা সংগ্রহ করতে হবে। এই তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে লোকের আচার ব্যবহারকে বাইরে থেকে দেখলেই চলবে না তাদের অর্থ বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এর জন্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সাথে সহানুভূতি বা এমপ্যাথিরও আশ্রয় নিতে হবে।

২) লোকসংস্কৃতির পরম্পরার নানা নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও তন্নিষ্ঠ অধ্যয়ন করতে হবে।

৩) সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণা গড়ে তুলতে হবে। কোন একটি গ্রাম বা অঞ্চলকে সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে।

৪) দেশের এক অংশের সাথে আর এক অংশের তুলনা করার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান ও বুদ্ধির যথাযথ বিকাশ প্রয়োজন।

৫) সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থবুদ্ধি ও সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে মানুষ কী করে সমগ্র বিশ্বের সাথে যোগ স্থাপন করছে ও করতে পার তা অনুধাবন করতে হবে।

৬) ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে কিন্তু অন্ধ আনুগত্য নয়। সমাজ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের জন্য বুদ্ধিদীপ্ত মন নিয়ে তার সমালোচনা প্রয়োজন।

৫. স্বদেশী সমাজ : আত্মসক্তি ও সমূহ

রবীন্দ্রনাথের যুক্তি ঋদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর সমসাময়িক সমাজের দুর্দশা ও দুর্গতির কারণ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন যে বিদেশী শাসনে আমাদের জাতীয় চরিত্রের এক ভয়ানক অবনতি ঘটেছিল। দেশের লোক, গ্রামীণ সমাজ, সমস্তভাবেই বিদেশী সরকারের সাহায্য, করুণা বা অনুদানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এই পরনির্ভরতা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ দেশের মানুষের পক্ষে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করা অসম্ভব।

তিনি বারবার বলেছেন যে, "ইংরাজিতে যাহাতে স্টেট বলে আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি আকারে ছিল। কিন্তু...বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে ; ভারতবর্ষ তাহার আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছে।" (**স্বদেশী সমাজ,** কলিকাতা ÷ বিশ্বভারতী ১৯৬২, পৃঃ ৬)।

দেশের যাঁরা গুরুস্থানীয় ছিলেন তাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করতেন। তাঁদের জীবনযাপনের ব্যয় নির্বাহ শুধু রাজা করতেন তা নয়, সমাজের সম্পন্ন প্রত্যেক গৃহীই সাধ্যমত সে কাজ সম্পন্ন করতেন। যুদ্ধবিগ্রহ বা অন্য কোনও কারণে রাজার সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা বন্ধ হয়ে যেত না। রাজা যেমন জলকষ্ট নিবারণের দিঘী খনন করে দিতেন সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই সেই কাজ করতেন। ফলে জলকষ্ট নিবারণের জন্য দেশের লোককে রাজশক্তির ওপরেই শুধু নির্ভর করে থাকতে হত না। ভারতে "সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্যরূপে বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে" (তত্রত্য, পৃঃ ৭)। তাই আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়।"

রবীন্দ্রনাথ এটা দেখে বিমর্ষ বোধ করেছিলেন যে ইংরেজ শাসনে ভারতের মর্মে অর্থাৎ সমাজের শক্তিতে প্রচণ্ড আঘাত এসেছিল। প্রত্যেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষার ও অর্থনীতির মোহে সমষ্টির স্বার্থ ভুলে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতার জন্য প্রয়াসী হয়েছিল। ফলে গ্রামপ্রধান ভারতে গ্রামসমাজ অবহেলিত হয়ে পড়ছিল। গ্রামগুলিতে যোগ্য লোকের ও আত্মবিশ্বাসের অভাব হয়ে পড়েছিল। সমাজের নানা সমস্যা যেমন শিক্ষার সুযোগের অভাব, জলকষ্ট ইত্যাদির জন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা বেড়েই চলেছিল। কিন্তু "যে কর্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম সম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিবে।" (তত্রত্য, পৃঃ ৯)।

রবীন্দ্রনাথ তাই মেলা ও উৎসবের মত দেশজ প্রতিষ্ঠানগুলির যথোচিত সংস্কার ও পুনঃ প্রবর্তনের ওপর জোর দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে কৃষি ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে তথ্যের সম্প্রচারের জন্য এবং সংগৃহীত অর্থের দ্বারা সমাজকল্যাণ মূলক কাজ নির্বাহ করার উদ্দেশ্যে। "স্বদেশী সমাজ" এর সমস্ত রচনাতেই রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাধির কথা বলেছিলেন স্বাধীন ভারতেও সেই ব্যাধির প্রকোপ আমাদের সামূহিক জীপনকে বিপন্ন করেছে। সমস্ত বিষয়েই "সরকার মা-বাপ, আমাদের নিজেদের সমস্যা মেটানোর জন্য আমাদের কিছুই করার নেই" এই মনোভাব সুকৌশলে বিদেশী শাসকরা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল যাতে দেশ চিরকাল তাদের ওপর নির্ভরশীল থাকে। অর্থ ও সম্পদে রিক্ত দরিদ্র ভারতবর্ষে তো এই মনোভাব অধিকতর অবাঞ্ছিত। এই ধরণের পরমুখাপেক্ষিতা সাধারণ মানুষের আত্মবিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয়। ফলে সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য সাধারণ মানুষেরও যে সাধ্যমত কিছু করার আছে এই বোধ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভিক্ষা ও অনুদানের উপর নির্ভরশীল সাধারণ মানুষ তাদের অধিকার বিস্মৃত হয়। তাদের কর্ত্তব্য বোধও জাগ্রত হয় না। বাইরের সাহায্যের সঙ্গে নিজের সম্মিলিত শক্তি, উদ্যম, প্রচেষ্টাকে যুক্ত করার মাধ্যমেই যে গ্রামীণ জনসমূহের উন্নতি ঘটতে পারে তা রবীন্দ্রনাথের সমাজবিশ্লেষণে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। সমূহের আত্মশক্তির বিকাশই তাঁর সমাজজীবনের মুখ্য উপজীব্য ছিল।

৬. হিন্দু মুসলমান বিরোধের সমাধান সন্ধান

রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিকতাকে অর্থাৎ এক বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলনের অভীপ্সা ও প্রচেষ্টাকে মানবব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করতেন। অর্থাৎ মানুষের ধর্মে তাঁর বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তিনি মনে করতেন "ধর্ম আর

ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আগুণ আর ছাই। ...মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র" ("কর্তার ইচ্ছায় কম" **রবীন্দ্ররচনাবলী,** খণ্ড ১৩ পৃঃ ২৩৯)। ধর্ম বলে যে মানুষকে শ্রদ্ধা না করলে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। ধর্মতন্ত্র কিন্তু মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করার নিয়মাবলী নিখুঁত করে বানায় আর হুমকি দেয় এই নিবমাবলী যে মানবে না সে ধর্মভ্রষ্ট হবে। ধর্মতন্ত্রে অযৌক্তিক আচারে, বাধা নিষেধের প্রাবল্য। আমাদে দেশে হিন্দু-মুসলমানদের ভেদাভেদের কারণ দুপক্ষের ধর্মতন্ত্রের বাড়াবাড়ি।

রবীন্দ্রনাথের মতে মধ্যযুগে মুসলমান রাজশক্তির সাথে হিন্দুদের ধর্মবিরোধ ঘটেছিল। সেই সময়ে এমন সকল সাধুসন্তের জন্ম হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অনেক মুসলমান ছিলেন যাঁরা আত্মীয়তার সত্যের দ্বারা ধর্মবিরোধের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে বসেছিলেন। ...আজও ভরতে প্রাণস্রোতের মধ্যে সেই সকল সাধকের অমর বাণী-ধারা প্রবাহিত আছে..." ("বৃহত্তর ভারত", **রবীন্দ্ররচনাবলী,** খণ্ড ১৩, পৃঃ ৩৫৪)। তারই ফলে "এতদিন গোড়ার দিকে একরকমের মিল ছিল। পরস্পরের তফাৎ মেনেও আমরা পরস্পরের কাছাকাছি ছিলুম। ...কিন্তু এক সময়ে যে কারণেই হোক ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে শুরু করল।" ("হিন্দু-মুসলমান" **রবীন্দ্ররচনাবলী,** খণ্ড ১৩, পৃঃ ৩৬৭)। এটা ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ দুর্ভাগ্যের কথা।

খৃষ্টানদের মতই মুসলমানদের "ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোন উপায় নেই।" হিন্দুজাতিও এক হিসেবে মুসলমানদেরই মত। অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সমর্থক নয় বটে — কিন্তু অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের অহিংস অসহযোগ। "হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরও কঠিন।" (তত্রত্য, পৃঃ ৩৫৭)।

রবীন্দ্রনাথের মতে, একতা মানতেই হবে ধর্মমত ও সমাজরীতির সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয়, বিরুদ্ধতা আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের ভালোরকম করে মেলা চাই— সেইটেই আমাদের সাধনার বিষয়। "সঙ্গের দিক ধেকে আজকাল হিন্দু-মুসলমান পৃথক হয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যকে বাড়িয়ে তুলেছে, মনুষ্যত্বের মিলটাকে দিয়েছে চাপা।" তবুও মনুষ্যত্বের খাতিরে আশা করতেই হবে, আমাদের মধ্যে মিল হবে। "পরস্পরকে দূরে না রাখলেই সে মিল আপনিই সহজ হতে পারবে" (তত্রত্য, পৃঃ ৩৬৭)।

৭. জাতিভেদ প্রথার সমালোচনা

ভারতীয় সমাজের অধিবাসীদের সামগ্রিক কল্যাণবোধ ও তার জন্যে বক্তির স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল ঐতিহ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু জাতিভেদ প্রথার মত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ফলে এই সামগ্রিক কল্যাণবোধ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ যেভাবে বাধা পেয়েছিল সেটাও তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখিয়েছেন। এর ফলে সমাজের যে কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাসের সৃষ্টি হয়েছিল তা সামাজিক উৎপীড়নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুপ্রাচীনকালে সামাজিক ঐক্য অক্ষুন্ন রেখে কাজের বিভাগের জাতিবিন্যাসের উৎপত্তি হয়েছিল। আর্য ও দ্রাবিড়দের সংঘর্ষ এড়িয়ে একটা সমন্বয় ও সংহতি সাধনে সেই প্রথা কার্যকর হয়েছিল। সময়ের পরিবর্ত্তনে ঐ প্রথায় ভাঙ্গন ধরেছিল। ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল মননের পুষ্টি সাধন, নিক্ষার্থীকে ধর্মশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষা দান করা। কিন্তু কালক্রমে তাঁরা সেই কাজে মৌরসী স্বত্ত্ব কায়েম করলেন। এবং অব্রাহ্মণদের জন্মগতভাবে পদানত করে রাখতে প্রয়াসী হলেন। তাতে মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটিয়ে ক্ষয়িষ্ণু শ্রেমীবিশেষের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের এবং তার সাথে রাজাদের ওপর দেবত্ব আরোপের নিষ্ফল চেষ্টা হয়। বর্ণাশ্রম তাই ক্রমে হৃদয়হীন ও ক্ষতিকর ব্যবস্থায় পর্যবসিত

হয়েছে। জাতপাতের গোঁড়ামির যুপকাষ্ঠে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ, অনুভূতি ও কর্মক্ষমতাকে বলি দেওয়া হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মুক্তির আস্বাদ গ্রহণে মানুষ তখনই সক্ষম হবে যখন সামাজিক ভেদাভেদ সংকীর্ণতার অবসান হবে। তিনি বলেছেন ÷ "এটা স্পষ্ট যে জাতিভেদের ধারণা (caste idea) সৃষ্টিশীল হতে পারে না ; এটা কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানগত। জাতিভেদ প্রথা মানুষকে যান্ত্রিকভাবে একটা ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চায়। এই বন্দোবস্ত ব্যক্তির নেতিবাচক দিকের ওপরে জোর দেয়— সেটা হল তার পৃথকত্ব। এই প্রথা মানুষরে মধ্যে নিহিত সম্পূর্ণ সত্যের পক্ষে হানিকর।" (Creative Unity পৃঃ ৯৬)। জাতপাত ব্যবস্থার সামূহিক বিধিনিষেধ মনুষ্যত্বের বিকাশের প্রতিবন্ধক। এই ব্যবস্থা পরিণামে এতটাই নির্দয় হয়ে পড়ে যে এর থেকে অস্পৃশ্যতার মত নিষ্ঠুর কলঙ্কজনক প্রথার সৃষ্টি হয়।

বেদনার্ত রবীন্দ্রনাথ তাই অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদপ্রথার বিরোধিতায় লিখেছেন ÷ "হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।" বংশানুক্রমিক মানমর্যাদার অধিকারের পরিবর্তে মানুষ নির্বিশেষে সর্বজনের সামাজিক সকল সুযোগসুবিধায় সমানাধিকার ব্যক্তিত্ব ও সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

৮. সাম্য প্রতিষ্ঠায় সাম্যবাদীরাষ্ট্রব্যবস্থার কার্যকারিতা

সর্বাঙ্গীন সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন তিনি। রাশিয়ার বিপ্লবের মহৎ উদ্দেশ্য তাঁর মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। পরশ্রমজীবী ও পরিশ্রমজীবীর সংগ্রামে তাঁর সহানুভূতি ছিল স্পষ্টতঃই শেষোক্ত শ্রেণীর অনুকূলে। অত্যাচার, অবিচার, দুর্নীতি ও জাতিগত বিদ্বেষবন্ধন থেকে মুক্তির বাণী রুশবিপ্লবে ধ্বনিত হয়েছিল। তাঁর সমসাময়িক "য়ুরোপে অন্য সকল দেশেরই সাধনা ব্যক্তির লাভকে ব্যক্তির ভোগকে নিয়ে। ...সুধার ভাগ কেবল একদলই পাচ্ছে, অধিকাংশই পাচ্ছে না এই নিয়ে অসুখ অশান্তির সীমা নেই। সবাই মেনে নিয়েছিল এইটেই অনিবার্য...।" (রাশিয়ার চিঠি, **রবীন্দ্ররচনাবলী,** খণ্ড ১০, পৃঃ ৬৯৯)। কিন্তু এই রাশিয়াতেই এক প্রবল ব্যতিক্রম ঘটেছিল। "যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্য দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।" (তত্রত্য, পৃঃ ৬৭৯)। রুশ বিপ্লবের পুরাতন ব্যবস্থা ভাঙ্গার কাজের চেয়েও যেটা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল তা হল ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাগাভাগিকে অস্বীকার করে ঐক্যের ভিত্তিতে নূতন সমাজ গড়ে তোলা। "বহুদূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নূতন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে আছে" (তদেব)।

৯. সমবায় নীতি

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে স্বতন্ত্র সম্পত্তি মানুষের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের একটি উপায়। "সাধারণ মানুষের কাছে আপন সম্পত্তি ব্যক্তিরূপের ভাষা— সেটা হারালে সে যেন বোবা হয়ে যায়।" অথচ ব্যক্তি গত সম্পতির অবাধ অধিকার ও তার নির্বিচার প্রয়োগ শোষণ, নিষ্ঠুরতা ও হানাহানির কারণ। "এর একটি মাঝামাঝি সমাধান ছাড়া উপায় আছে বলে মনে করি নে— অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্য ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তা হলেই সম্পত্তির মমত্ব লুব্ধতায় প্রতারণার বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না।" (তত্রত্য, পৃঃ ৬৯০)।

এই মাঝামাঝি পন্থা তিনি দেখেছিলেন সমবায়নীতির মধ্যে। **সমবায় নীতি** নামক পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ে

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "অনেক গৃহস্থ অনেক মানুষ একজোট হইয়া জীবিকানির্বাহ করিবার যে উপায় তাহাকেই য়ুরোপে আজাকাল কোঅপারেটিভ- প্রণালী এবং বাংলায় 'সমবায়' নাম দেওয়া হইয়াছে"। **(সমবায়নীতি, রবীন্দ্ররচনাবলী,** পৃঃ ৪১৮)। এই কোঅপারেটিভ প্রণালীকেই তিনি আমাদের দেশকে দারিদ্র্য থেকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় বলে মনে করেছিলেন। "আজ আমাদের দেশটা যে এমন গরিব তার প্রধান কারণ, আমরা ছাড়া ছাড়া হইয়া নিজের নিজের দায় একলা বহিতেছি।" (তত্রত্য, পৃঃ ৪১১)। য়ুরোপের গরীবদের জন্য যারা চিন্তা করছিলেন তাঁরা দেখলেন, "অনেক গরিব আপন সামর্থ্য এক জায়গায় মিলাইতে পারিলে সেই মিলনই মূলধন।" (তদেব) এই মিলনের পদ্ধতি, সমবায় প্রণালীই, ভারতকে, পৃথিবীর সকল দেশকেই উন্নতির পথ দেখাবে। "এখনকার ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষ পরস্পর জিতিতে চায় ঠকাইতে চায়, ধনী আপনার টাকার জোরে নির্ধনের শক্তিকে সস্তা দামে কিনিয়া লইতে চায়।" এটার প্রতিকার সমবায় নীতির তাৎপর্য উপলব্ধি ও তার বাস্তব রূপায়নে। "সমবায় প্রণালীতে চাতুরী কিম্বা বিশেষ একটা সুযোগে পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড়ো হইতে চাহিবে না। **মিলিয়া বড়ো হইবে।"** (তদেব, নিম্নরেখ সংযোজিত)। কেবলমাত্র অর্থনীতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ না রেকে সমবায়নীতিকে সর্বব্যাপী ও সুসংবদ্ধ সামাজিক কাঠামোর ভিত্তিরূপে কল্পনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সর্বক্ষেত্রেই সংঘাতের পরিবর্ত্তে তিনি চেয়েছিলেন সহযোগিতা বিভেদ ও শোষণের পরিবর্ত্তে সমবায়। "শক্তি উদ্ভাবনার জন্যে অহমকিা ও প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে" বলে মনে হয়েছিল তাঁর। কিন্তু মানুষের সহজাত যুক্তি ও নীতিবোধের দ্বারা তা সংযত হবে এবং পরিণামে কল্যাণকর সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে এইরকম বিশ্বাস তিনি লালন করেছেন।

১০. বিজ্ঞান ও যন্ত্রের ব্যবহারের সমর্থন

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ! আর কৃষিকর্মের উন্নতিবিধানের জন্য রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেছিলেন। কৃষিকর্মের দুটি দিক-প্রথম জমির স্বত্বের বন্টন ব্যবস্থা বা জমির মালিকানা এবং দ্বিতীয়টি হল উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদনের কলা কৌশল। প্রথম দিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লাঙল যার জমি তার নীতিকে সাবধানতার সঙ্গে রূপায়নের কথা বলেছিলেন। ক্ষুদ্র কৃষকের সার্বিক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতার জন্য তাদের হাতে জমির মালিকানা দেওয়া হলেও ধীরে ধীরে সেগুলি মহাজন ও বড় জোতদারের কুক্ষিগত হয়ে যাবে। এই জন্য তিনি সমবায় প্রথার প্রবর্তনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিকের একটি সুন্দর আলোচনা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের "ভূমিলক্ষ্মী" প্রবন্ধে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণেই কৃষি উৎপাদন বাড়ানো দরকার। সাবেকী পদ্ধতিতে সে কাজ সম্ভব নয়। "আজকাল চাষকে মূর্খের কাজ বলা চলে না, চাষের বিদ্যা এখন মস্ত বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে।" **(রবীন্দ্ররচনাবলী,** খণ্ড ১৩, পৃঃ ৫০৭)। এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাতে কলমে কিছু করে দেখানোর জন্য পুত্র রথীন্দ্রনাথকে তিনি মার্কিন মুলুকে পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য। এই কাজ কৃষক ও কৃষির উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক আগ্রহের পরিচায়ক। কৃষিকর্মে সমবায় প্রথার সঙ্গেই উন্নত প্রণালীতে উৎপাদনের তিনি সমর্থক ছিলেন। শ্রমের লাঘব ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষির যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন চেয়েছিলেন তিনি। গ্রামীণ সংস্কৃতি, কুটীর শিল্প ও সমবায় প্রণালীতে গুরুত্ব দিলেও ভারী শিল্পোন্নয়নেও তাঁর উৎসাহ ছিল। গান্ধীজির চরকানীতি এবং গ্রামনির্ভর অর্থনীতিকে তিনি সমর্থন জানাতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন,"প্রাচীনকালের গ্রাম্যতার গণ্ডিমধ্যে আর আমাদের ফিরিবার রাস্তা নাই।" **(রবীন্দ্ররচনাবলী** খণ্ড ১৩, পৃঃ ৫০৭)।

১১. প্রকৃত শিক্ষা ও তার উপযুক্ত সংগঠন

ভারতে দীর্ঘকালীন যাবতীয় দুর্গতির কারণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার অভাবকেই দায়ী করেছেন। মানুষের মুক্তির প্রকৃত রূপ হল অবিদ্যা ও অক্ষাত থেকে মুক্তি আর এই মুক্তির জন্য চাই শিক্ষা। মনের বিকাশ, মার্জিত সমাজাচার সুকুমার বৃত্তির উন্মেষ ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা।

প্রচলিত শিক্ষার সমস্ত কিছু গলদের প্রধান কারণ তা জীবন ও সমাজরে সঙ্গে প্রকৃত অর্থে যুক্ত নয়। তদুপরি বিদ্যালয়ের নিয়মনিগড় ও সিলেবাসের বজ্র আঁটুনি শিশুমনকে রুদ্ধ করা হয়। জনৈক শিক্ষাব্রতীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "বিদ্যালয়ে শিশুকাল থেকে আমরা বাঁধা খোরাকে অভ্যস্ত হই বলে আমাদের মননশক্তির সজীবতা হারাই বুদ্ধির ক্ষেত্রে নিজের চরে খাবার অভ্যাস যারা না করে তাদের চিত্ত কোনকালে সবল হয় না।"

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। ইংরেজী ভাষা শিক্ষাকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকলেও সাধারণ ও প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজী ভাষা এদেশে অনুপযোগী ও শিক্ষা বিস্তারে অন্তরায় বলে তিনি মনে করতেন।

পশ্চিমী জ্ঞান বিজ্ঞানকে আয়ত্ব করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন তিনি কিন্তু আত্মবিস্মৃত হয়ে অন্ধ অনুকরণ করার চেষ্টাকেও তিনি ধিক্কার জানিয়েছেন। নানা দেশ ও জাতির মিলন এবং চিন্তার আদানপ্রদানের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশ্বভারতীর মূল উদ্দেশ্য ছিল বৈচিত্র্যময় সত্যের উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে মানুষের মনকে জানা। প্রাচ্য সংস্কৃতির ঐক্যগত বিভিন্ন ধারার অধ্যয়ন ও গবেষণার সাহায্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন। প্রাচ্যের এই ঐক্যের দৃষ্টিতে পশ্চিমকে দেখা এবং উভয় গোলার্ধে মানব মনে শান্তি ও স্বাধীন চিন্তার মিলনক্ষেত্র গড়ে তোলা। নিয়নকানুনের বেড়াজাল, থেকে মুক্তি, মুক্ত আকাশের নীচে পড়াশোনা, যাতে শিক্ষার্থীর সাথে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয় তার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষাদান, পরীক্ষার ওপর অনাবশ্যক গুরুত্ব না দেওয়া, লেখাপড়ায় বৈচিত্র্য ও কৌতূহল প্রবণতায় উৎসাহ দেওয়া, ভ্রমণের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের সুযোগ সৃষ্টিশীল কাজে সহায়তা, বিশ্বজনীন মনোভাব গড়ে তোলা ইত্যাদি ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্য। শান্তিনিকেতন এর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ও বিশ্বভারতীতে তিনি এই শিক্ষাপদ্ধতিকে বাস্তবে রূপদানের চেষ্টা করেন।

স্বাধীনতার পরে গ্রামীণও সমষ্টি উন্নয়নের যে পরিকল্পনা (community Development Project) নেওয়া হয় তার উদ্ভাবনা ও পরীক্ষানিরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ বহূপূর্বেই করেছিলেন তাঁর শ্রীনিকেতন পরীক্ষা কেন্দ্রে। গ্রামীণ সংযোগ, গ্রামবাসীদের আত্মনির্ভরতা, সমবায় প্রথায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উপযোগী শিক্ষার প্রবর্তন এই পরীক্ষানিরীক্ষার মূল কথা ছিল।

উপসংহার

এই এককটি পাঠ করে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও কল্পনাবিলাসী সাহিত্যিক মাত্র ছিলেন না। ভারতীয় সমাজ ও তার বৈচিত্র্যের সুনিপুণ বিশ্লেষণ তাঁর বিভিন্ন রচনায় ছড়িয়ে আছে। ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রভাবে তাঁর মানবতাবাদের একটা আধ্যাত্মিক দিক রয়েছে। তাঁর মূল কথা হল ব্যক্তিমানুষ কেবল স্বার্থ অন্বেষণ না করে অপরের জন্য বিবেচনা করবে। ব্যক্তিত্বের ক্রমাগত বিকাশ মানুষের বৈশিষ্ট্য, আর তার জন্য সমাজের প্রয়োজন। বিভিন ধরণের গণ্ডী অতিক্রম করে বিশ্বমানবের সঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী পরমসত্তার সাথে ব্যক্তিমানুষ মিলিত হবে। তাঁর চিন্তায় দেশের ঐতিহ্যের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধার সাথে পশ্চিমী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ দেখা যায়। তাঁর সমাজ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বাস্তব জীবন সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ, সমগ্রের সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তোলা ও যুক্তিসিদ্ধ সমালোচনার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বদেশীয় সমাজের আচার সর্বস্বতা, উদ্যোগ হীনতা ও পরমুখাপেক্ষিতা দূর না করলে দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা ও উন্নতি অসম্ভব বলে তিনি মনে করেছেন। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও জাতিভেদ প্রথার মূলোচ্ছেদ করতে হলে ধর্মতন্ত্রকে পরিহার করতে হবে। সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্কের জন্য চাই ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সাম্যবাদী ব্যবস্থা। সোভিয়েট রাশিয়ায় তার আংশিক রূপ দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি শ্রেণীসংগ্রাম

ও রক্তাক্ত বিপ্লবের বদলে সমবায় প্রণালী ও সমন্বয় এবং সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে সমাজে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনা সম্ভব বলে মনে করেছিলেন। কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পের পাশাপাশি যন্ত্র, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ব্যববহারের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি। যে শিক্ষায় মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, সংকীর্ণতা এবং গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে বিশ্বমানবের সঙ্গে মিলনের পথ প্রশস্ত ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয় ঘটে, সেই শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি আজীবন পরীক্ষানিরীক্ষা করে গেছেন।

গ্রন্থ পঞ্জিকা

১. Benerjee, A "Rabindranath Tagore : A Poet's Response to the soceity" in Mukhopodhyay, A. K. **The Bengali Intellectual Tradition** 1979, K.P. Bagchi & co.

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ **রবীন্দ্ররচনাবলী,** ১১শ, ১২শ, ১৩শ খণ্ড। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ ÷ পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

একক ১৫ ❐ ঘুরিয়ে, বি. সরকার, ধূর্জটি প্রসাদ ও রাধাকমল

গঠন

১৫.১ জী. এস. ঘুরিয়ে
১৫.২ বিনয় কুমার সরকার
১৫.৩ ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
১৫.৪ রাধাকমল মুখার্জী

১৫.১ গোবিন্দ সদাশিব ঘুরিয়ে (১৮৯৩-১৯৮৪)

প্রস্তাবনা :

ভারতবর্ষে সমাজবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র পঠন-পাঠন শুরু হলে প্রথম যে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী তার সঙ্গে যুক্ত হন তিনি হলেন গোবিন্দ সদাশিব ঘুরিয়ে বা সংক্ষেপে জি.এস. ঘুরিয়ে। বোম্বে (আজকের মুম্বাই) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত ভাষায় এম.এ. পাশ করার পর ঘুরিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডব্লিউ. এইচ. আর. রিভার্সের কাছে যান সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য। ভারতবর্ষে সমাজবিজ্ঞান চর্চা শুরু হবার পর তিনিই প্রথম দেখান কিভাবে ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিকে ভারততত্ত্ব (Indology) এবং সমাজবিজ্ঞানে (Sociology) এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা যায়। এই অংশটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন ÷

১. ঘুরিয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

২. ভারতীয় সামাজিক ঘটনার বিশ্লেষণে সমাজ বিজ্ঞানের পদ্ধতির প্রয়োগ

৩. ভারতীয় জাতিভেদপ্রথা ও আত্মীয়তার বিশ্লেষণ

৪. উপজাতিদের সম্বন্ধে আলোচনা

৫. ভারতীয় ধর্মের সামাজিক বৈশিষ্ট্য

৬. নগর এবং গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা

১.১ ঘুরিয়ে সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে ১৮৯৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে ঘুরিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বম্বে বিশ্বদ্যিলায় থেকে তিনি সংস্কৃতে এম.এ. পাশ করেন। সংস্কৃত পড়ার সময় মনুস্মৃতি পড়তে গিয়ে ঘুরিয়ে ভারতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান-এর বিষয়ে আগ্রহী হয়ে পড়েন এবং স্কলারশিপ নিয়ে কেমব্রিজে যান নৃবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করার জন্য। প্রথমে তিনি ডব্লিউ, এইচ. আর. রিভার্স-এর কাছে কাজ করতে শুরু করেন। কিন্তু রিভার্স-এর মৃত্যুর পর তিনি এ.সি. হ্যাডন-এর কাছে তাঁর কাজ শেষ করেন।

কেমব্রিজ থেকে ফেরার পর ঘুরিয়ে কিছুদিন কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে তাঁর গবেষণার কাজ করেন। পরে ১৯২৪ সালে তিনি বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে রিডার এবং বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হন। দশ বছর

তিনি ওই বিভাগে প্রফেসর হিসাবে কাজ করেন এবং ওই পদ থেকে তিনি ৬৫ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এমেরিটাস প্রফেসর নিযুক্ত হন। ১৯৮৪ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর ৯০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ৩১টি বই লেখেন এবং বিভিন্ন জার্নাল ও পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য লেখা প্রকাশ করেন।

সমাজবিজ্ঞানের প্রসারে ঘুরিয়ের অবদান অপরিসীম। ভারতবর্ষের সমাজবিজ্ঞানে প্রথম যুগের অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী যেমন এম.এন. শ্রীনিবাস এ. আর দেশাই, ইরাবর্তী কার্ভে, ফে. এম. কাপাদিয়া প্রত্যেকেই ঘুরিয়ের ছাত্র ছিলেন তাছাড়া ১৯৬২ সালে ঘুরিয়ে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান সোসাইটী (Indian Sociological Society) স্থাপন করেন। এবং **সোসিওলজিকাল বুলেটীন** নামক জার্নাল বা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই দুটি মাধ্যমের সাহায্যে ভারতরে সমাজবিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন।

১.২ ভারতীয় সমাজিক ঘটনার বিশ্লেষণে সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতির প্রয়োগ

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় জ্ঞান থাকার ফলে ঘুরিয়ে খুব পরিষ্কারভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য-এর ধারাটিকে ধরতে পেরেছিলেন। এর সঙ্গে নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন যুক্ত হওয়াতে তিনি ভারতীয় সমাজের আলোচনাতে ভারততত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে এক মেলবন্ধন ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতীয় সামাজিক প্রতষ্ঠানগুলিকে তিনি ভারতবর্ষের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে জাতিভেদপ্রথা ভারতীয় সমাজে কি কি সামাজিক ক্রিয়া (function) থাকে তা ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন।

ভারতীয় সমাজকে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঘুরিয়ে দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেন। তিনি দেখান যে অধিকাংশ ভারতীয় বা হিন্দু সামাজিক প্রতিষ্ঠান দুটি কাজ করে থাকে — (১) সংস্কৃতির আদানপ্রদান (২) এই আদানপ্রদানের মাধ্যমে ঐক্য স্থাপন (Unity thorugh acculturation)। ভারতবর্ষে বৈদিক আর্যদের উত্থানের পর থেকেই সমস্ত ভারতবর্ষে উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত এই ঐক্য ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠতে থাকে এবং এর ফলে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা বিলুপ্ত হতে থাকে।

ঘুরিয়ের মতে এই ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ব্রাহ্মণ্য ধারণা এবং মূল্যবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

১.৩ ভারতীয় জাতিভেদপ্রথা ও আত্মীয়তার বিশ্লেষণ

জি.এস. ঘুরিয়ে তাঁর **কাস্ট এ্যাণ্ড রেস ইন ইণ্ডিয়া** (Cast and Race in India) (১৯৩২) গ্রন্থে জাতিভেদ প্রথা ও জাতিগোষ্ঠী বা রেস-কে ইতিহাস, নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান-এর পরিপ্রেক্ষিত থেকে আলোচনা করেছেন। প্রথমে তিনি জাতিভেদ প্রথার ঐতিহাসিক উৎপত্তি ও তার ভৌগোলিক প্রসার সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন। এর সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের ফলে এই প্রতিষ্ঠানটিতে যে পরিবর্ত্তন দেখা যায় তাও তিনি আলোচনা করেন। বইটির পরবর্ত্তী সংস্করণে তিনি স্বাধীনতা উত্তর ভারতে প্রথাটির মধ্যে যে পরিবর্ত্তন আসে তা দেখান। একজন যুক্তিবাদী সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে তিনি জাতিভেদপ্রথার বৈষম্যকে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি মনে করেছিলেন যে শহরের পরিবেশে এবং শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে নিজ নিজ জাতিকে একধরণের ঐকান্তিক

আনুগত্য জন্মাচ্ছে এবং তাঁর গ্রন্থের পরবর্ত্তী সংস্করণে তিনি দেখান জাতিভেদ প্রথা কিভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করে অনেক সময় বিচ্ছিন্নতামূলক ক্রিয়া শুরু করেছে। পরবর্ত্তীকালে ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতির মধ্যে আত্মীয়তার উপর একটি তুলনামূলক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। জাতিপ্রথা ও আত্মীয়তার তুলনামূলক আলোচনাতে ঘুরিয়ে দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন — ১) ভারতবর্ষের জাতি ও আত্মীয় ব্যবস্থার মত অনুরূপ প্রতিষ্ঠান অন্যান্য সমাজেরও ছিল ; এবং এই জায়গায় ঘুরিয়ে সমাজ শাস্ত্রের আলোচনায় তুলনামূলক পদ্ধতির ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ২) অতীতকালে আত্মীয়তার বন্ধন ও জাতিপ্রথা ভারতে ঐক্য স্থাপনে সহায়তা করেছিল। এই দুটি প্রতিষ্ঠান ভারতীয় সমাজের উদ্ভবের ইতিসে বিভিন্ন সংস্কৃতি ইতিহাস ভাষা বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর (racial and ethinie) মধ্যে ঐক্য স্থাপনে সহায়তা করেছে।

বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ ও পুরাণ ইত্যাদি অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন জাতিপ্রথা কখনই একটি বদ্ধ ব্যবস্থা (closed system) ছিল না। এই ব্যবস্থার মধ্যে সবসময়ই একটা সচলতা ছিল। তিনি ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন যে একসময় বৈশ্যরা শূদ্র হয়ে গিয়েছিলেন এবং শূদ্ররা বৈশ্যের মর্যাদা পেয়েছিল। ঘুরিয়ে দেখান যে জাতিপ্রথা হিন্দু সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করত। তিনি জাতিপ্রথার মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলেন—

i) **গোষ্ঠীভিত্তিক বিভাজন** (Segmental division)

ঘুরিয়ে জাতিপ্রথাকে কতকগুলি গোষ্ঠীর সমষ্টি হিসাবে দেখেছিলেন যে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে ও যেগুলির সদস্যপদ জন্ম থেকেই স্থিরীকৃত হয়ে যায়। এই প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর নিজস্ব নিয়ম-কানুন থাকে।

ii) **ক্রমাধিকারতন্ত্র** (Hierarcliy)

প্রত্যেকটি গোষ্ঠী বা জাতি ক্রমাধিকারতন্ত্রের নীতি দ্বারা বিভক্ত থাকে। ক্রমাধিকারিত্বের ফলে সামাজিক কাঠামোয় জাতিগোষ্ঠীগুলি উঁচু-নীচুস্থান অধিকার করে। এই উচ্চাবভোব ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে দেখা যায়। বিশেষ করে যে জাতিগোষ্ঠীরগুলি জাতি কাঠামোয় মধ্যবর্ত্তী স্থানে থাকে তাদের পারস্পরিক সামাজিক স্থান বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হয়। তবে সারা ভারতেই জাতিকাঠামোয় ব্রাহ্মণদের স্থান সবচেয়ে উপরে এবং অস্পৃশ্যদের সামাজিক অবস্থান সব চেয়ে নীচে থাকে।

iii) **পবিত্রতা ও অপবিত্রতার নিয়ম** (Principles of purity and pollution)

উপরের দুটি বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যায় যে জাতিগোষ্ঠীগুলি একে অপরের থেকে পৃথক বা দূরে অবস্থিত। এই পৃথকীকরণ বা দূরাবস্থান পবিত্রতা-অপবিত্রতা-র নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নিয়মগুলি স্থির করে দেয় কোন জাতি অন্য কোন জাতি থেকে কী ধরণের খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে প্রত্যেক জাতির সদস্যরা একে অপরের থেকে কাঁচা খাবার অর্থাৎ জল ও নুন এর ব্যবহারে তৈরী খাবার গ্রহণ করতে পারে। তবে উচ্চ জাতির লোকেরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণরা শুধুমাত্র পাকা খাবার অর্থাৎ ঘি দ্বারা রান্না করা ও লবণবর্জিত খারাব নীচু জাতিগোষ্ঠীর থেকে গ্রহণ করতে পারে। তবে কোনও জাতিই অস্পৃশ্যদের থেকে কোনও খাদ্য বা জল পর্যন্ত গ্রহণ করে না।

iv) **বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির সম্প্রদায়গত ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও সুযোগসুবিধা** (Civil and Religious Disabilities and privileges of Different Sections)

ক্রমাধিকারের অন্যতম ফল হল সামাজিক অধিকার ও সুযোগসুবিধাগুলি সমাজের প্রতিটি গোষ্ঠী সমভাবে

ভোগ করতে পারে না। উঁচু জাতিগোষ্ঠীগুলির ভাষা, পোষাক বা ব্যবহারপ্রণালী নীচু জাতি-গোষ্ঠীগুলি ব্যবহার করতে পারত না।

v) **পেশাগ্রহণের ব্যাপারে বেছে নেবার অধিকার-এর অভাব** (Lock of Choice of occupation)

প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠী বংশানুক্রমিক ভাবে একটি পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। পবিত্রতা-অপবিত্রতার নিয়ম থাকার ফলে কোনও একটি জাতির বংশানুক্রমিক পেশার দ্বারা সেই জাতির সামাজিক মর্যাদা নির্ণীত হয়। যেমন ব্রাহ্মণদের জাতিগত পেশা ছিল অধ্যয়ন ও পূজার্চনা অন্যদিকে নীচু জাতিরা চুল কাটা, কাপড় কাটা বা চামড়ার কাজ করত। অস্পৃশ্যরা সবচেয়ে অপরিষ্কার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অবশ্য হিন্দু সমাজে পেশা পরিবর্তনের উদহারণও পাওয়া যায়। আর তাছাড়া কখনও কখনও নতুন পেশা উদ্ভবের মাধ্যমে নতুন জাতিগোষ্ঠী তৈরী হত। তবে কোনও অবস্থাতেই শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং পূজার কাজ ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ করতে পারত না।

vi) **বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা (Restrictions on Marriage)**

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। সেই কারণে ব্যক্তিকে তার নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করতে হত, অর্থাৎ তারা অন্তর্বিবাহ (endogamy) মেনে চলত। ঘুরিয়ের মতে অন্তর্বিবাহ-ই জাতিভেদ প্রথার মূল বৈশিষ্ট্য।

জাতিগোষ্ঠীর যে কোনও অংশ এই অন্তর্বিবাহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

জাতি, গোত্র এবং আত্মীয়তা বন্ধনের পারস্পরিক সম্পর্ক (Interrelationship among caste, subcaste and kinship)

ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে জাতি-ভিত্তিক অন্তর্বিবাহ (endogamy) ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জাতিব্যবস্থা হিন্দু সমাজে জ্ঞাতি-কুটুম্ব সম্পর্ককে পরিচালিত করেছে।

তিনি দেখিয়েছেন যে একেকটি জাতি কালক্রমে অনুজাতি (subcaste)-তে বিভক্ত হয়েছে এবং একেকটি অনুজাতি আবার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের অনুজাতিতে বিভক্ত হয়ে গেছে নানা স্থানিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণের জন্য। প্রথমতঃ একটি জাতির লোকেরা তাদের নিজেদের মধ্যে বিয়ে করবে, অন্য জাতের লোকেদের সাথে বিয়ে করবে না। এর দ্বারা জাতিব্যবস্থার মধ্য উচ্চাবচ ক্রমাধিকারের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু একটি জাতি যখন দুটি অনুজাতিতে বিভক্ত হয় তখন আবার প্রত্যেকটি অনুজাতি তার নিজের মধ্যেই তার সদস্যদের বৈবাহিক সম্পর্ক সীমিত করে রাখে। আবার প্রথম স্তরের একটি অনুজাতি দ্বিতীয় স্তরের দুটি অনুজাতিতে বিভক্ত হয় তখনও এই অন্তর্বিবাহ নীতি অনুসৃত হয়। এইভাবে প্রতিটি অনুজাতির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য জাতিব্যবস্থার ঐক্যভিত্তিক বাতাবরণে সুনিশ্চিত হয়।

অন্তর্বিবাহ-এর পাশাপাশি গোত্রভিত্তিক বহির্বিবাহের নীতিও হিন্দু সমাজে প্রচলিত। ঘুরিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা দেখিয়েছেন এই নীতিটির কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই কেননা একই গোত্রের লোকেদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক কোনো ভাবেই প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

জাতি এবং রাজনীতি (Caste and politics)

জাতি, গোত্র এবং আত্মীয়তার মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যমে যে ঐক্য স্থাপিত হয় ঘুরিয়ে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন যে সেই ঐক্য নানাভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রাজনীতিতে জাতি আনুগত্য এই বিচ্ছিন্নতার একটি

অন্যতম কারণ বলে ঘুরিয়ে মনে করেছিলেন। এই ঐক্য নষ্ট করার পিছনে ব্রিটিশ নীতিও কাজ করেছিল বলে তিনি মনে করেছিলেন এবং তার সমালোচনাও করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তিন ধরনের পরিবর্ত্তন এনেছিলেন ১) তারা এমন কতকগুলি আইন সংক্রান্ত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্ত্তন এনেছিলেন যার ফলে আইনের কাছে প্রত্যেক ব্যক্তির সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ; ২) কারিগরী ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন এবং তার ফলে ৩) পেশার পরিবর্ত্তন। এর ফলে জাতির চিরাচরিত ভিত্তিতে পরিবর্ত্তন আসে কিন্তু প্রথাটির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকে কোনও পরিবর্ত্তন আসেনি। ঘুরিয়ের মতে ইংরেজ সরকার জাতি প্রথার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্ত্তনে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। উপরন্তু তারা চেয়েছিলেন যাতে এই পরিবর্ত্তন না আসে। অর্থাৎ পরিবর্ত্তনটা উপরে উপরে ছিল এবং এর ফলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে একধরণের অবিশ্বাস ও সন্দেহ তৈরী হয় জাতিপ্রথার ঐক্যতে ফাটল ধরাতে শুরু করে। এই সময়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী নিজের নিজের জাতির আনুগত্য দেখিয়ে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন যা এই অবিশ্বাস ও সন্দেহের পরিচায়ক। তাছাড়া ইংরেজ সরকার অস্পৃশ্যতার মত একটি বিশ্রী প্রথা বন্ধ করতেও কোনও রকম প্রয়াস নেননি বলে ঘুরিয়ে অভিযোগ করেছেন।

ব্রিটিশ সরকার অনুন্নত সম্প্রদায় ও উপজাতিদের জন্য উন্নত সম্প্রদায় থেকে আলাদা করে নথিভুক্ত করে অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা নেন। ঘুরিয়ে কিন্তু এই পৃথিকীকরণের এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে চিরকালের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা বহাল রাখলে অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রকৃত উন্নয়ণের লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না উপরন্তু অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি নিজেদের কায়েমী স্বার্থ তৈরী করে নিতে পারে। ঘুরিয়ের এই আশঙ্কা পুরোপুরি অমূলক বলে প্রমাণিত হয়নি। দেখা গিয়েছে যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সদস্যরা সকলে সমানভাবে সুযোগসুবিধার সুযোগ নিতে পারেনি বলে তাদের মধ্যে ও নানা ধরণের বৈষম্যমূলক গোষ্ঠী তৈরী হয়ে গেছে।

৪.৪ উপজাতিদের (Tribes) সম্বন্ধে আলোচনা

ঘুরিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে লক্ষ্য করেন যে কিছু সামাজিক নৃবিজ্ঞানী (social authropologist) এবং বৃটিশ প্রশাসক (Brititsh Administrators) ভারতবর্ষের উপজাতিদের সাধারণ ভারতীয় মূলস্রোত (mainstream of Indian tradition) থেকে আলাদা একটি গোষ্ঠী হিসাবে মনে করতে শুরু করেছেন। উপজাতিরা লোকালয় থেকে দূরে পাহাড়ে বা বনে জঙ্গলে বাস করত বলে এই নৃবিজ্ঞানী বা প্রশাসকেরা উপজাতিদের ভারতের অন্যান্য অধিবাসীদের থেকে পৃথক করে দেখছিলেন। ঘুরিয়ে কিন্তু উপজাতিদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন উপজাতিরা এমন একটি গোষ্ঠী যারা কিছু সময়ের জন্য সাধারণ ভারতীয় জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে (tribes have temporarily lost their contact with the rest of the Indian society-they are the aborigines so-called)। উপজাতিরা ভারতবর্ষের 'তথা-কথিত আদিবাসী'।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ঘুরিয়ের সঙ্গে বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ভেরিয়ার এলউইন-এর (Verrier Elwin) মতপার্থক্য উল্লেখযোগ্য। ভেরিয়ার এলউইন মনে করতেন উপজাতিরা সর্ব্ব প্রাণীবাদী (animists)। তাদের সামাজিক রীতি-নীতি, ভাষা সবকিছুই হিন্দুদের থেকে আলাদা। তাছাড়া বহু উপজাতি গোষ্ঠীর জমি হিন্দু বা অন্যান্য সম্প্রদায়রা নানাভাবে কেড়ে নেয়। সেই কারণে এলউইন উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা তৈরী করার কথা বলেন।

ঘুরিয়ে এলউইন-এর এই মতের সঙ্গে একেবারেই একমত ছিলেন না। তিনি মনে করেছিলেন যে উপজাতিদের এইভাবে আলাদা করে দেখা ভারতবর্ষের ঐক্যস্থাপনের পথে পরিপন্থী। তিনি প্রচুর সংখ্যক

ঐতিহাসিক তথ্য এবং সাম্প্রতিক ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে বহুদিন থেকেই উপজাতিরা অন্যান্য সম্প্রদায়ে বিশেষ করে হিন্দুদের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। উপজাদিতের মধ্যে জাতিভিত্তিক গোষ্ঠী নেই বলে তাদের মধ্যে পেশাগত কোনও বিভাজন নেই। ফলে উপজাতি সমাজে অর্থনৈতিক সুরক্ষার একান্ত অভাব। উল্টোদিকে হিন্দুদের মধ্যে পেশাগত বিভাজন থাকার ফলে প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক দিকটি সুরক্ষিত থাকে। এই অর্থনৈতিক সুরক্ষার জন্য উপজাতিরা বিভিন্ন সময়ে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে। পরবর্ত্তীকালে নির্মল কুমার বসু তাঁর হিন্দু ধর্মের মধ্যে উপজাতিদের আনয়নের পদ্ধতি-তে (Hindu Method of Tribal Absorption) এই ব্যাপারটি দেখান। সাধারণতঃ উপজাতিরা হিন্দু সম্প্রদায়ের নীচের দিকে স্তরভুক্ত হয় এবং এইভাবে গৃহীত হবার ফলে তারা কোনও একটি পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়। এবং পুরো ব্যাপারটির মধ্যে একটি অর্থনৈতিক সুরক্ষা থাকে। ঘুরিয়ে এই ব্যাপারটির মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সমাজের ঐক্য সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করেছেন। ঘুরিয়ে এখানে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সচলতা, সক্রিয় গতিশীলতা (dynamism) এবং উদার সর্ব্বজনীনতার (Catholicity) দিকগুলিকে বোঝাতে চেয়েছেন।

ঘুরিয়ে অবশ্য স্বীকার করেছেন যে উপজাতিরা অনেক ক্ষেত্রে প্রতারিত হয়েছে ভারতবর্ষের অন্যান্য সম্প্রদায় বা হিন্দু মহাজনদের দ্বারা। এইসব গোষ্ঠী অনেক সময় উপজাতিদের ঠকিয়ে তাদের জমিও কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু ঘুরিয়ে এখানেও দেখিয়েছেন যে এই ধরণের প্রতারণা বা ঠকানো শুধুমাত্র যে উপজাতিদের সঙ্গে হয়েছে তা নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য গোষ্ঠী এমন কি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সঙ্গেও হয়েছে যারা নানাবিধ সমস্যার কারণে সামাজিকভাবে দুর্বল। ঘুরিয়ে মনে করতেন এই প্রতারণার মূল প্রোথিত হয়ে আছে ব্রিটিশ সরকার প্রণীত আইন ব্যবস্থা ও করব্যবস্থার উপর। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকারের নীতি অনুযায়ী বনাঞ্চল ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্পত্তি ঘোষিত হবার ফলে বনে প্রবেশ করতে গেলেও সরকারের অনুমতি এবং সরকারের কাছে কর প্রদান করা বাধ্যতামমূলক হয়ে দাঁড়ায়। ঘুরিয়ে বলেন যে এর ফলে শুধু উপজাতি কেন অন্যান্য গোষ্ঠীর পক্ষেও বনাঞ্চল ব্যবহার করা অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রসাকেরা এবং নৃবিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র উপজাতিদের আলাদাভাবে অসুবিধা-আক্রান্ত গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করে এবং আলাদাভাবে তাঁদের উন্নয়নের কথা ভেবে সাধারণ ভারতীয় সামাজিক ধারাকে খণ্ডিত করার চেষ্টা করেছেন যা কিনা অবশেষে ভারতীয় সামাজিক সংহতিকেই ব্যাহত করবে বলে ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন।

৪.৫ ভারতীয় ধর্মের সামাজিক বৈশিষ্ট্য

ঘুরিয়ে ধর্মের সামাজিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ বিষয়ে কতকগুলি নতুন দিক উন্মোচন করেছিলেন। তিনি ধর্মের বিষয়ে মোট ছয়টি গ্রন্থ রচনা করেন i) indian Sadhus (1953), ii) Gods and Men (1962), iii) Religious Consciousness (1965), iv) Indian Acculturation (1977), v) Videc Indian (1979), vi) The Legacy of Ramayana (1979) প্রত্যেকটি বইতেই ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন ধর্মের সামাজিক ভূমিকা কী ? ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন, যে কোন সংস্কৃতি পাঁচটি মূল বিষয়ের উপর গ্রথিত ১) ধর্মীয় সচেতনতা (religious Consciousness), ২) নীতিচেতনা (Conscience), ৩) ন্যায়-পরায়ণতা ও যথাযথ আচরণ (justics), ৪) বাধাহীনভাবে বিদ্যাচর্চা (free pursuit of knowledge) এবং সহ্যশীলতা (tolerance)। তিনি দেখিয়েছেন ভারতীয় সমাজের অভ্যুত্থানের সঙ্গে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং ধর্ম ভারতীয় সমাজের একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। ঘুরিয়ে-র ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা প্রাচ্যবাদী (Orientalist) এমন কী প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী মাক্স হেবারের ধর্ম বিষয়ের আলোচনা থেকেও আলাদা।

ঘুরিয়ে প্রথমেই বলেছেন যে ব্যক্তি ও সমাজ দেব-দেবী সৃষ্টি করেছে (men and society are the creators of gods and goddesses)। তিনি দেখিয়েছেন যে ধর্মীয় ধারণাগুলি কখনই এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেনা। তারা সমাজজীবনের চাহিদা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সৃষ্ট হয় এবং পরিবর্ত্তিত ও হয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন যে হিন্দু ধর্মে প্রধানতঃ পাঁচজন মুখ্য দেবতার উল্লেখ্য পাওয়া যায়। সূর্য, শিব, বিষ্ণু, গণেশ এবং দেবী। এই মূল পাঁচজন দেব-দেবীর থেকেই ভারতবর্ষে অসংখ্য দেব-দেবীর সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে অসংখ্য দেবদেবীর উপস্থিতি ভারতীয় বৈচিত্র্য যেমন এনেছে, সেই বৈচিত্র্য কিন্তু বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি না করে ঐক্যস্থাপনেই সহায়তা করেছে কারণ এই অসংখ্য দেব-দেবীর উৎসস্থল ওই মূল পাঁচ দেব-দেবী। এবং উৎস থেকে এই বৈচিত্র্য ঘটেছে কারণ এ দেব-দেবীদের ধারণা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লৌকিক ধারণা, এমনকি অন্যান্য গোষ্ঠীর ধারণার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছেন কখনও নতুন নতুন ধারণা নিজেদের ধারণার মধ্যে গ্রহণ করে আবার কখনও নতুন ধারণার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার জন্য (Accommodation) নিজেদের পরিবর্ত্তন করে।

দ্বিতীয়তঃ তিনি দেখিয়েছেন যে ভারতীয় দেব-দেবীরা অনেক সময় পশু-পাখির আকৃতি নিয়েও পূজিত হয়ে থাকেন যেমন নৃসিংহ বা হনুমান। এর ফলে হিন্দুধর্মে বর্ণিত ঐক্য সামাজিক, নৈসর্গিক এবং পশুপাখির জগৎ পর্যন্ত বিস্তৃতও বটে।

ঘুরিয়ে-র ধর্ম বিষয়ে আলোচনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে তাঁর সাধুদের সামাজিক ভূমিকার বিশ্লেষণ। ঘুরিয়ে তাঁর Indians Sadhus গ্রন্থে দেখিয়েছেন ভারতীয় সাধুরা সমাজের নিয়মকানুনের থেকে বাইরে থেকেও সমাজ থেকে কিন্তু বিচ্ছিন্ন নন।

ঘুরিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের **আনন্দমঠ** কে দৃষ্টান্ত হিসাবে নিয়ে দেখিয়েছেন যে সন্ন্যাসীরা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কিভাবে সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। এখানেও ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন যে সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধু সন্ন্যাসীরাও তাঁদের কাজের লক্ষ্য পরিবর্ত্তন করেছেন। সাধুরা সংসারের মধ্যে না থেকেও সমাজের মঙ্গলার্থে নানাধরণের সেবামূলক কাজকর্ম করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বিশেষভাবে রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উল্লেখ করেছেন যারা সবসময়ই সমাজের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করে যাচ্ছেন। তাছাড়া তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় এই প্রাতিষ্ঠানিক সাধু-সন্ন্যাসীরাই সবচেয়ে আগে আর্ত্তদের সেবার কাজে এগিয়ে যান।

ঘুরিয়ে ভারতীয় ধর্ম ও ভারতীয় সাধুর আলোচনা— বিষয়গুলিকে একটি নতুন আঙ্গিকে হাজির করেছেন যা প্রাচ্যবাদীদের (orientalists) ধরণা এমনকি বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী মাক্স হেবারর-এর আলোচনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তবে মনে রাখতে হবে যে এখানেও ঘুরেয়ের মূল তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত ছিল কিভাবে ভারতীয় ধর্ম ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে ঐক্য স্থাপন করেছে।

৪.৬ গ্রামীণ এবং নগর সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা

ঘুরিয়ে সবসময় নগরায়নকে স্বাগত জানিয়েছেন। বস্তুতঃ ঘুরিয়ে-র নগরায়নের ধারণা থেকে এটা পরিষ্কার যে তিনি আধুনিকতা (modernity) এবং আধুনিকীকরণের (modernisation) বিপক্ষে তো ছিলেনই না বরং তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন কিভাবে নগরায়ন এবং আধুনিকতার গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী (traditional rural) ব্যবস্থার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানো যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ''rurfanization'' বা গ্রামভিত্তিক নগরায়নের কথা

বলেছেন। তিনি মনে করতেন যে নগর-সমাজে গ্রাম-সমাজের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ নগর তার উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান, গবেষণার, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা ও বিভিন্ন বিনোদন প্রকরণের মাধ্যমে যেমন একটি উন্নততর সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো তৈরী করে, নগরকে একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সেখানে পানীয় জল, মুক্ত বিশুদ্ধ হাওয়া এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ গাছপালা থাকে। সেই কারণেই ঘুরিয়ে মনে করতেন যে একজন নগর রূপকারের (urban planner) নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির প্রতি সবসময় খেয়াল রাখা উচিত এবং যাতে সমস্যাগুলি না হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত।

১) পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা।

২) অহেতুক মানুষের ভিড়ের সমস্যা (problem of human congestion).

৩) যান চলাচলে বিঘ্ন এবং যানজট সমস্যা (traffic congestion)

৪) সাধারণ যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ (regulation of public velicles)

৫) বম্বের মত শহরাঞ্চলগুলির রেলযোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা (insufficiency of railway transport)

৬) গাছ নষ্ট করা এবং কেটে ফেলা,

৭) শব্দ দূষণ এবং

৮) পথচারীদের চলাচলে বিঘ্ন ঘটা।

ঘুরিয়ে মনে করতেন যথাযথ পরিকল্পনা মাধ্যমে নগরের এই সমস্যাগুলি দূর করে নগর ও গ্রামে মধ্যে সুষ্ঠ ঐক্য সাধন করা যায় (organic unity)। ব্রিটিশ সরকার ঐক্য বিঘ্নিত করেছিল বলে মনে করতেন ঘুরিয়ে। এবং তাঁর মতে নগরায়ন শিল্পায়নের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ব্রিটিশ সরকার নগরায়নকে বা নগর সমাজকে দেখাতে শুরু করেছিলেন। ঘুরিয়ে মনে করতেন নগরকে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের একটি কেন্দ্র (towns are centres of cultural excellance) হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

উপসংহারে বলা যায়, আলাদা বিষয় হিসাবে সমাজবিজ্ঞানের পঠন পাঠন শুরু হবার পর ঘুরিয়ে দেখালেন যে আধুনিক সমাজবিজ্ঞান ভারতীয় সমাজের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বিশেষ সহায়তা করতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। ঘুরিয়ে, জি এস **Caste & Race in India.**

২। প্রামানিক, এস কে. **Sociology of G.S Ghurye Rawat Publications, Jaipur 1994.**

১৫.২ বিনয় কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯)

প্রস্তাবনা :

১৯১৭ সাল বোম্বাই (মুম্বাই) বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের পঠন পাঠন আলাদাভাবে শুরু হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৭ সাল থেকেই রাজনৈতিক অর্থনীতি (Political Economy)র একটি অংশ হিসাবে সমাজবিজ্ঞান পড়ানো শুরু হয়। এই বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে পরবর্তী সময়ে বিনয় কুমার সরকার একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বিনয় কুমার সরকার সংস্কৃতি ইংরাজী ও বাংলাভাষা ছাড়া নানা বিদেশী ভাষা অত্যন্ত ভালভাবে জানতেন। তাছাড়া তাঁর নানা বিষয়ে সুগভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল ভারতীয়দের যথা হিন্দুদের প্রত্যক্ষবাদ বা ইহজাগতিক বিষয় সংক্রান্ত ধারণাকে তুলে ধরা।

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে জানতে পারবেন

১) বিনয় কুমার সরকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

২) ভারতীয় সমাজ ও ইউরোপীয় সমাজের তুলনামূলক আলোচনার ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের তরফে দুক্ষেত্রে দুইরকম মানদণ্ডের ব্যবহার এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভুল ধারণা উপস্থাপন।

৩) প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) সম্বন্ধে তাঁর ধারণা

৪) সমাজের আলোচনা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

৫) বিনয় কুমার সরকারের প্রগতি (progress) সম্বন্ধে ধারণা।

৪.২.১ বিনয় কুমার সরকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৮৭ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর অবিভক্ত বাংলার মালদহ জেলায় বিনয় কুমার সরকারের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম ছিল সুধন্য কুমার সরকার। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিনয় কুমার এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডেয়েট পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করে সম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং ১৯০৫ সালে বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯০৫ সাল বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং বিনয়কুমার সরকারের শিক্ষাজীবনেরও একটি উল্লেখযোগ্য সময়। লর্ড কার্জনের নেতৃত্বে ১৯০৫ সালে অবিভক্ত বাংলা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং এই বিভাজন হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে। সমস্ত বাংলা এই সময় এক স্বদেশী আন্দোলনে মেতে ওঠে যার উদ্দেশ্য ছিল ১) দুই বাংলাকে এক করা এবং ২) ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইংরেজ শাসকদের দেশ থেকে হটানো। বিনয় সরকার এই আন্দোলনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। ফলতঃ আমরা দেখি তিনি স্টেট্স্ স্কলারশিপ (States Sclolarship) গ্রহণ করলেন না এবং ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরীও গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এই আন্দোলনের অন্যতম দিক হল বিদেশী সামগ্রী বর্জন করা ও স্বদেশী ধ্যান ধারণার ওপর গুরুত্ব প্রদান।

বিনয় সরকার ডন (Dawn) পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সতীশচন্দ্র ছিলেন একজন স্বদেশী শিক্ষাবিদ্। তিনি ইংরেজ প্রণীত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন এবং মনে করতেন যে এই বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় ধ্যানধারণার কোনও যোগ নেই।

বিনয় সরকার সতীশচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে দেশের যুবাসম্প্রদায়কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্জন করার আহ্বান জানান এবং নিজেও এই শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্জন করেন। অবশ্য পরে কিছু শুভানুধ্যায়ীর উপদেশে তিনি কলিকাতা বিশ্বদ্যিালয় থেকে ১৯০৭ সালে ইতিহাসে এম. এ. পরীক্ষা দেন এবং পঞ্চম স্থান অধিকার করে সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। এম. এ. পাশ করার পর তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। এই স্বদেশী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের জন্য কারিগরী বিদ্যাশিক্ষার উপর গুরুত্ব এবং ২) সাথে সাথে ভারতীয় ভাবধারার উপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। বিনয় সরকার বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরণের স্বদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন।

বেঙ্গল ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় সরকার কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন The Science of History and Hope of Mankind (1912) এবং Introduction of Science of Education (1913)। এছাড়াও তিনি বাংলাতে বহু পুস্তক পুস্তিকা রচনা করেন যার মাধ্যমে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সুবিধা ঘটে। ১৯১৪ সালে তাঁর "শুক্রনীতি"-র ইংরাজী অনুবাদ এবং The Positive Background of Hindu Sociology-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

উপরিউক্ত বিনয় সরকার প্রত্যেকটি গ্রন্থের একটি বিষয়ের উপর জোর দেন তা হল **ভারতীয়দের ইহজাগতিক ব্যাপারে আগ্রহ** এবং **ভারতীয় গুণগান বা প্রশংসা যা ভারতীয়দের তাদের নিজের সম্বন্ধে শুধু সচেতনই করবেনা, একই সঙ্গে তাদের ভারতীয়ত্ব সম্বন্ধে গর্বিত করে তুলবে।**

১৯১৪ সালে বিনয় সরকার বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় যান। এই সফরকালে তিনি চীন এবং আমেরিকাতেও গিয়েছিলেন। ১৯২৬ সালে দেশে ফিরে আসার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। অধ্যাপনা করতে করতে তিনি বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত **Creative India** এবং **Positive Background of Hindu Sociology**র পরিবর্ধিত সংস্করণ।

১৯৪৯ সালের ২৪ শে নভেম্বর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মাত্র দুই বৎসর পরে আমেরিকার ওয়াশিংটন ডি.সি.তে শিক্ষামূলক ভাষণ সংক্রান্ত সফলকালে তাঁর দেহাবসান ঘটে।

৪.২.২. ভারতীয় সমাজ ও ইউরোপীয় সমাজের তুলনামূলক আলোচনায় ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্ত মানদণ্ডের পার্থক্য ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভুল ধারণা উপস্থাপন

বিনয় সরকার ভারতবর্ষকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করবার জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গী (Perspective) গড়ে তোলার চেষ্টা করে গেছেন। ভারতবর্ষকে সেই সময় পর্যন্ত প্রাচ্যবাদীরা (orientalists), খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা (evangelists) এবং ব্রিটিশ প্রশাসকেরা উপস্থাপন করছিলেন। প্রাচ্যবাদীরা ভারতীয়দের আধ্যাত্মিকতা পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ই শুধু দেখলেন। অন্যদিকে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা ভারতীয়দের সব বিষয়কেই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলেন, কারণ তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টধর্মের গুণগান গাওয়া ও তার প্রসার ঘটানো। এবং তা সম্ভব শুধুমাত্র খ্রীষ্টধর্মের থেকে অন্য ধর্মকে খাটো করে দেখানোর মধ্য দিয়ে। প্রশাসনের চাহিদা মেটানোর জন্য তৈরী ব্যাখ্যাগুলিতে বেশীরভাগ সময়েই ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব ছিল না। এর উপরে ছিল বুগ্‌ল্, সেনার্টি, মাক্স মুয়েলার বা মাক্স হ্বোবারের মত ব্যক্তিদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ধারণা। তাঁরা বলেছেন যে ভারতীয়রা ইহজাগতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত, তারা সবসময়ই আধ্যাত্মিকতা, নির্বাণ ইত্যাদি পরাজাগতিক ব্যাপারে বেশী

আগ্রহী। সেই কারণে ভারতীয়রা অনগ্রসর এবং তারা ইউরোপীয়দের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে।

বিনয় কুমার সরকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই নেতিবাচক ধারণাগুলির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি দেখালেন যে ইউরোপ এবং আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা পাশ্চাত্য দর্শন আলোচনা করার সময় পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা আইন বিষয়ে ধারণাগুলির সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের ধর্ম, বিশ্বাস, দেব-দেবীর ধারণাও আলোচনা করেন। কিন্তু সেই একই বৈজ্ঞানিকেরা যখন ভারতবর্ষকে আলোচনা করতে বসেন তখন তাঁরা ভারতবর্ষের প্রাচীন এবং মধ্যযুগের মানব মন (mind), আত্মা (Soul), বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (universl) অন্তর্জ্ঞান (initution), ধ্যান (meditation) প্রভৃতি বিষয়ের উপরেই আলোকপাত করেন ; ভারতীয়দের বিষয় সম্পত্তি (property), রাষ্ট্র (state), সমাজ (society), আইন (law), বার্ত্তাশাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র এগুলির কোনওটিকেই বিশ্লেষণ করেন না। হিন্দু দর্শনের আধুনিক আলোচনাতেও এই ধরনের ত্রুটি দেখা যায় যখন শুধুমাত্র 'মোক্ষ'-র উপরে আলোচনা হয় ও চতুবর্গের অন্য তিনটি বর্গ যথা ধর্ম, অর্থ ও কাম বিষয়ে কোনও আলোচনাই হয় না। সুতরাং বিনয় সরকার দেখালেন যে এ সমস্ত আলোচনাগুলিই একপেশে (Partial), অন্যায্য (unjust) এবং ভ্রান্তিমূলক (errorneous)।

বিনয় কুমার সরকার তাঁর বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে দেখাবার চেষ্টা করলেন যে ভারতীয়রা শুধুমাত্র পরজাগতিক (otherworldly) ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন না, তারা ইহজাগতিক (material) বিষয়েও যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। তাছাড়া ইউরো-আমেরিকান পণ্ডিতেরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনা কালে তুলনার মানদন্ডের নির্ধারন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রেও যৈ বৈষম্য করে থাকেন তারও তীব্র নিন্দা করে বিনয় সরকার কিভাবে তুলনামূলক আলোচনা করা উচিত সেই পদ্ধতি নির্ধারণ করারও চেষ্টা করেন।

৪.২.৩ প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) সম্বন্ধে বিনয় সরকারের ধারণা

সমাজবিজ্ঞান বা যে কোনও সমাজ শাস্ত্রে বিনয় কুমার সরকারের প্রথম পরিচয় প্রত্যক্ষবাদের প্রবক্তা হিসাবে এখানে মনে রাখার দরকার যে বিনয় কুমার সরকারের প্রত্যক্ষবাদের ধারণা কোতের প্রত্যক্ষবাদ বা (Positivism) এর ধারণার থেকে আলাদা যদিও সরকার স্বীকার করেছেন যে প্রত্যক্ষবাদের ধারণাটি তিনি কোঁতের (Posittism) থেকে নিয়েছেন আর এই প্রত্যক্ষবাদের ধারণা সরকারের The Positive Background of Hindu Sociology নামক গ্রন্থে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। যদিও বিনয় সরকারের অন্যান্য গ্রন্থে বিশেষতঃ Chinese Religion through Hindu Eyes (1916) এবং The Science of History the Hope of Mankind (১৯২২) গ্রন্থ দুটিতেও এই প্রত্যক্ষবাদের সম্বন্ধে প্রাথমিক বা প্রারম্ভিক ধারণা কিছু দেখা যায়। প্রথম গ্রন্থটিতে তিনি দেখাচ্ছেন যে 'নির্বাণ' শুধুমাত্র এই শব্দটি দিয়ে তিন হাজার বছর ধরে বহমান কোনও সভ্যতাকে ধরা, বোঝা বা বিশ্লেষণ করা যায় না। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মানুষের মত এশিয়া তথা ভারতবর্ষের মানুষও শুধুমাত্র পরাজাগতিক বিষয় (otherworldliness) নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন নি, তাঁরা ইউরো-আমেরিকার অধিবাসীদের মত একই সঙ্গে ইহজাগতিক ব্যাপারেও সমান আগ্রহী ছিলেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে আমরা দেখি যে বিনয় সরকার বিভিন্ন সভ্যতা তুলনার মানদণ্ডকে কোনও একমাত্রিক বা একরৈখিক (unilinear) পদ্ধতিতে না দেখিয়ে বহুরৈখিক (multilinear) পদ্ধতিতে দেখাবার কথা বলছেন। The Positive Background of Hindu Sociology (১৯২১) গ্রন্থে তিনি দেখান যে ভারতীয়রা তথা হিন্দুরা ইহজাগতিক ব্যাপারে সবসময়েই আগ্রহী ছিলেন। বহু উদাহরণ দিয়ে তিনি ভারতীয়দের ইহজাগতিক ব্যাপার বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক (spiritual) কাজকর্মের মধ্যে বহু জাগতিক (mendane) সমস্যার সমাধান সূত্র রয়েছে।

৪.২.৪ সমাজের আলোচনা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রয়োগ

আগের বিভাগে আমরা দেখেছি যে বিনয় কুমার সরকার সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনায় বহুরেখ বিশিষ্ট (multilinear) পদ্ধতির প্রয়োগের কথা বলেছেন। তাঁর Positive Background of Hindu Sociology প্রকাশিত হবার পর থেকেই অর্থাৎ ১৯২১ সাল বা তারও আগে ১৯১৬ সাল থেকে শ্রীসরকার দেখালেন যে ইতিহাসের দীর্ঘকালব্যাপী ভারতবর্ষ ও ইউরোপে উন্নয়ন প্রায় সমানতালেই চলছিল। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ভারত এবং ইউরোপ সমান জায়গাতেই ছিল। কিন্তু একমাত্র শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই ভারতবর্ষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইউরোপ তথা সারা পশ্চিমী দুনিয়া থেকে পিছিয়ে পড়তে লাগল। তিনি নিম্নলিখিত সমীকরণ বা equation গুলির মাধ্যমে দেখালেন যে শিল্পবিপ্লবের পরে ইউরোপে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে ভারতবর্ষ **জাগতিক** বা বস্তুগত সভ্যতার তথা material civilization এর ক্ষেত্রে ইউরোপ থেকে মোটামুটিভাবে ১০০ বছর পিছিয়ে রইল।

১) নতুন এশিয়া (১৮৮০-১৮৯০)-আধুনিক ইউরো-আমেরিকা (১৭৭৬-১৮৩২)

২) তরুণ ভারত বা Young India (১৯৩০-৩৫)-ইউরো-আমেরিকা (১৮৪৮-১৮৭০)।

এই সঙ্গে তিনি ভারতীয়দের ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শেখার উপর গুরুত্ব দেন এবং বলেন যে এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে ভারত ইউরোপের সঙ্গে আবার সমান তালে চলতে পারবে।

এই সমীকরণগুলি বিনয় সরকারের সমাজ বিশ্লেষণের পদ্ধতি-র দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিনয় সরকার তুলনামূলক আলোচনায় বৈষম্যমূলক মানদণ্ডের ব্যবহারের বিরোধিতা করেছিলেন। এবারে তিনি দেখালেন যে সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনায় কতকগুলি জিনিস মনে রাখতে হবে। প্রথমতঃ সভ্যতা কখনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনা, তা সমসময়ই গতিময় এবং পরিবর্ত্তনশীল। সময় (time) এবং ব্যক্তিমানুষ (People) এর প্রেক্ষিতে তা সমসময়ই পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, পরিবর্ত্তনগুলি ধাপে ধাপে বা stage-by stage ঘটে থাকে এবং তৃতীয়তঃ প্রত্যেকটি ধাপ বা stage-এর চালিকাশক্তি বা চৈতন্য ও সময়ের প্রভাব (spirit) একটি অপরটির থেকে পৃথক। সমাজবিজ্ঞানীকে পরিবর্ত্তনের এ ধাপগুলির চালিকাশক্তি বা spirit বুঝতে হবে এবং সেই অনুযায়ী তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলেই তা প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ হয় ; অন্যথায় তা কল্পনাভিত্তিক একপেশে আলোচনায় (Onesided imaginary discussion) পর্যবসিত হয়।

পশ্চিমী সমাজ বিজ্ঞানীরা ভারতের ধর্ম্মোন্মাদনা বা আধ্যাত্মিকতার সাথে পশ্চিমী সমাজের আধ্যাত্মিকতার তুলনা না করে পশ্চিমী সমাজের ইহজগত নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতীয় সমাজের পরলোক সম্বন্ধে চিন্তার তুলনা করেন। দ্বিতীয়তঃ শিল্পবিপ্লবের আগে ভারতীয় সমাজের অবস্থার সঙ্গে সমসাময়িক পশ্চিমী সমাজের তুলনা না করে শিল্পবিপ্লবোত্তর পশ্চিমী সমাজের সঙ্গে শিল্পবিপ্লবের সুফল বঞ্চিত ভারতীয় সমাজের তুলনা করেন বা ভারতীয়দের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ভ্রান্তির কবলে পড়ে যান।

৪.২.৫ বিনয় কুমার সরকারের 'প্রগতি' বা Progress সম্বন্ধে ধারণা

সমাজবিজ্ঞানে বিনয় কুমার সরকারের অবদান আর একটি জায়গায় খুব গুরুত্বপূর্ণ যেখানে বিনয় সরকার প্রগতি বা অগ্রগতি-র ধারণা উপস্থাপন করলেন। এই ধারণাটির মধ্য দিয়ে তিনি একদিকে পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানী এবং সমাজিক বিজ্ঞানীদের প্রগতি সম্বন্ধে চিন্তাধারাকে সমালোচনা করলেন আর এক দিকে তিনি বললেন যে

ভারসাম্যহীনতা বা সামাজিক মানসিক অস্থিরতা (disequilibrium) সৃজনশীলতার দিকে ব্যক্তিমানুষ, গোষ্ঠী বা সমাজকে ঠেলে দেয়।

বিনয় সরকার দেখালেন যে পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানী বা সামাজিকবিজ্ঞানীরা (যেমন হেগেল, মার্ক্স এবং অন্যান্যরা) প্রগতির যে তত্ত্ব দিয়েছেন তার মধ্যে এক চূড়ান্ত অবস্থার ধারণা (finality) দেখা যায় যেন তারপরে আর কিছুই থাকে না। হেগেল ও মার্ক্স বর্ণিত তত্ত্ব-বৈপরীত্য-সংশ্লেষ-এর নৈরন্তর্যে হেগেল-এর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এবং মার্ক্স এর ক্ষেত্রে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার শ্রেণী দ্বন্দ্বের অবসানে চূড়ান্ত পর্যায়-এর ইঙ্গিত দেয়। বিনয় কুমার সরকারের কাছে এই চূড়ান্ত পর্যায়ের ধারণা গ্রহণীয় নয়। যেমন মার্ক্স যুক্তির দ্বারা সমর্থিত তত্ত্ব (thesis) এবং তার বৈপরীত্য (antithesis) এর সংঘাতে সংশ্লেষ (synthesis) পর্যায়-এ উন্নীত হবার কথা বললেন। বিনয় সরকারের প্রশ্ন হল দু'টি ১) এই সংশ্লেষ-এর পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার মধ্যে কি এক চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে না? ২) এই সংশ্লেষ পর্যায়ে পৌঁছানোর পর ব্যক্তিমানুষ কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে? বা এই সংশ্লেষ পর্যায়ে কি সবসময় সুব্যবস্থা বিরাজ করবে?

বিনয় সরকার বললেন, ব্যক্তিমানুষ-এর বা গোষ্ঠী বা সমাজ এর কাছে কোনও অবস্থাই চূড়ান্ত অবস্থা নয়। অর্থাৎ ব্যক্তিমানুষ কখনই একজায়গায় স্থির বা নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকে না। তাছাড়া সংশ্লেষ পর্যায়েও কিন্তু সবসময় সুব্যবস্থা থাকে না। তিনি আবার কতকগুলি সমীকরণের সাহায্যে এই অগ্রগতির ধারণাকে বোঝালেন। তিনি দেখালেন ১) a-not-a $\rightarrow$ b ২) b-not-b $\rightarrow$ c ৩) c-not-c $\rightarrow$ d.....n(infinity) অর্থাৎ প্রগতি বা অগ্রগতি ধাপে ধাপে এগিয়ে অন্তহীন ভাবে চলে। প্রত্যেকটি ধাপে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি থাকে, তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয় এবং ব্যক্তিমানুষের শুভবুদ্ধি প্রসূত প্রচেষ্টায় এই দ্বন্দ্ব নিরসন হয়ে পরের ধাপে গোষ্ঠী বা সমাজ এগিয়ে যায়। এই নতুন ধাপটি আগের ধাপ বা পর্যায় থেকে গুণগত এবং মানগত দিক দিয়ে আলাদা। কিন্তু এই ধাপে আবার নানা ধরণের অসুবিধা দেখা দেয় এবং পরস্পর বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আবার ব্যক্তিমানুষের শুভপ্রচেষ্টায় তার অবসান ঘটে ও সমাজ বা গোষ্ঠী এগিয়ে চলে। এইভাবে প্রগতি বা অগ্রগতি অবিশ্রান্তভাবে কাজ করে যায়। বিনয় সরকার প্রগতি-র এই ধারণাকে বলেছেন সৃজনশীল ভারসাম্যহীনতা প্রসূত প্রগতি (Progress as Creative disequilibrium)। অর্থাৎ ভারসাম্যজনিত স্থিতাবস্থা কোনও সমাজে কখনও থাকে না। এবং ভারসাম্যহীনতা, বিনয় সরকারের মতে, সৃজনশীল হয়ে ওঠে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিমানুষের প্রচেষ্টায়। সমাজ বা গোষ্ঠী সবসময় এগিয়ে চলে প্রথমে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার দিকে। কিন্তু ভারসাম্য কখনও চিরস্থায়ী নয় বলে তা সবসময়ই বিঘ্নিত হয় নতুন সমস্যার দ্বারা। ব্যক্তিমানুষের প্রচেষ্টায় সমস্যার সমাধান হয়, সমাজে আবার ভারসাম্য ফিরে আসে; কিন্তু এই ভারসাম্য আগের পর্যায়ের ভারসাম্যের থেকে আলাদা। বিনয় সরকার দেখিয়েছেন ছান্দোগ্য উপনিষদের 'চরৈবেতি' বা উপনিষদের "অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোর্দিগময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়"-র মধ্যে এই এগিয়ে চলার সুর চিরন্তন। আর এই থেকেই বোঝা যায় যে ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী কখনই প্রগতি বিমুখ নয়।

পরবর্ত্তী কালে বিনয় সরকার কিন্তু প্রগতির এই ধারণা থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরে গেলেন। বিনয় সরকার সবসময়ই পশ্চিমের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি-কে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন। এবং তিনি মনে করতেন ভারতবর্ষকে পশ্চিমের কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিখতে হবে। আর পশ্চিমের কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিখলেই ভারত পশ্চিমের সঙ্গে একতালে প্রগতি বা অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারবে। অর্থাৎ যে বিনয় সরকার এতদিন পর্যন্ত বহুরেখ বিশিষ্ট প্রগতি এবং পদ্ধতির কথা বললেন সেই বিনয় সরকারই শেষে গিয়ে

প্রগতির এক ঋজুরেখ (rectilinear) বিশিষ্ট ব্যাখ্যা দিলেন যেখানে প্রগতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ও প্রয়োগের মধ্যেই নিহিত।

গ্রন্থপঞ্জী

১। Bhattacharya, S. K. Indian Sociology. The Role of Benoy Kumar Sarkar. University of Burdwan 1990

২। মুখোপাধ্যায় হরিদাস (সং) **বিনয় সরকারের বৈঠকে** ১ম খণ্ড (কলিকাতা, দেজ পাব্লিশিং হাউস ২০০২)

৩। Sarkar, B.K. **The Positive Bacground of Hindu Sociology.** The Panini office, (Allahabad) 1937.

৪। Sarkar B. K. **Villages and Towns as social Patterns** Calcutta Chuckerburtty, Chatterjee & Co. 1949.

১৫.৩ ধূর্জটি প্রসাদ মুখার্জী (১৮৯৪-১৯৬২)

প্রস্তাবনা :

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু পরেই অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানে যৌথভাবে পঠন পাঠনের জন্য নূতন একটি বিভাগ খোলে। এবং এই বিভাগের অধ্যাপক ধূর্জটি প্রসাদ মুখার্জী ভারতবর্ষের সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য এবং জনপ্রিয়। আর তাঁর অনুরাগীদের কাছে তিনি ডি.পি. নামে বেশী আদৃত ছিলেন। ধূর্জটি প্রসাদ বা ডি.পি. সারা জীবন ভারতীয় ঐতিহ্য (tradition)-এর মধ্যে ভারতীয় জীবনধারা কিভাবে বিধৃত হয়ে আছে তার অনুসন্ধান যেমন করেছেন তেমনই একই সঙ্গে দেখাতে চেয়েছেন কিভাবে আধুনিকতা (modernity) এবং ঐতিহ্য (tradition) পরস্পরকে ঋদ্ধ করতে পারে। তিনি প্রধানতঃ অর্থনীতির লোক হলেও ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান নীতিবিজ্ঞান (ethics) এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর সুগভীর জ্ঞান ছিল। বস্তুতঃ মানবজীবন ও সমাজের সামগ্রিক বোধ গড়ে তুলতেই তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাই তিনি বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানগুলি পৃথকীকরণ (compartmentalization) সেই বিষয়গুলির উন্নতিতে বাধা দেবে বলেই মনে করতেন এবং তিনি এই ধরনের পৃথকীকরণের বিরোধিতা করেছেন।

ধূর্জটি প্রসাদ এর চিন্তাধারার মুখ্য জায়গা ছিল কল্যাণভিত্তিক উন্নয়ন বা (development with welfare)। এবং তিনি তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে এই উন্নয়ন কিভাবে হতে পারে তার পদ্ধতি খুঁজতে চেয়েছেন। অনেকে তাঁকে মার্ক্সবাদী (Marxologist) বলে মনে করলেও তিনি স্বয়ং নিজেকে মার্ক্সতাত্ত্বিক (?) বলে মনে করতেন। অর্থাৎ তিনি মার্ক্স এর দ্বান্দ্বিক তত্ত্বকে গ্রহণ করেছিলেন ভারতবর্ষের জন্য যদিও নিজেকে তিনি মার্ক্সবাদের রাজনীতির সঙ্গে জড়াতে চাননি। এই এককটি পড়ে আপনারা ধূর্জটি প্রসাদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন।

১) ধূর্জটি প্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জী

২) সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি এবং সমাজবিজ্ঞান চর্চার পদ্ধতি বিষয়ে ডি.পি.র ধারণা, মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণ ও ভারতীয় সমাজ পরিস্থিতির সাযুজ্য

৩) ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ডি.পি.র ধারণা

৪) ঐতিহ্য-এর অর্থ এবং তার গতিশীলতা

৪.৩.১ ধূর্জটি প্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জী

১৮৯৪ সালে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ধূর্জটি প্রসাদের জন্ম হয়। তাঁর বাড়ীতে সংস্কৃত চর্চার একটি আবহ সবসময়েই ছিল এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই তাঁর সমস্ত লেখাতে ভারতীয় এবং ঐতিহ্য-এর প্রতি এক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর জীবনে সবচেয়ে বেশী যে ঘটনা রেখাপাত করে গেছে তা হল পোর্ট আর্থার-এ জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয়। যার গূঢ়তর অর্থ ছিল যে পূর্ব-এশিয়া শক্তিশালী হতে পারে এবং পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। ভারতবর্ষও বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির শিক্ষালাভ করে একদিন বৃটিশদের এই দেশ থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হবে।

ডি.পি. প্রথমে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে বিজ্ঞান পড়া শুরু করলেও কিছুদিনের মধ্যে বিজ্ঞানের পড়াশুনা

তাঁর কাছে অত্যন্ত যান্ত্রিক বলে বোধ হয়। এবং ধূর্জটিপ্রসাদ আরও বিস্তৃত ও পরিব্যপ্ত জ্ঞানের স্বাদ গ্রহণ করার জন্য প্রথমে ইতিহাস ও পরে অর্থনীতি নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করেন।

১৯২২ সালে ডি.পি. লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি রাধাকমল মুখার্জির সহকর্মী ছিলেন। ধূর্জটি প্রসাদ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বহুমুখী অনুরাগ ও প্রতিভা এবং তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণধর্মী (analytic) চিন্তাধারা দিয়ে অগণিত ভক্ত সহকর্মী এবং ছাত্রদের মোহিত করে রেখেছিলেন। ধূর্জটি প্রসাদ সবশুদ্ধ ১৯টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যার মধ্যে ১০টি বাংলায় লেখা এবং ৯টি ইংরাজীতে রচিত। তাঁর Introduction to the Indian Music (1943) ভারতীয় সঙ্গীত জগতের বিশ্লেষণ ভিত্তিক একটি অসামান্য সৃষ্টি যাতে দেখানো হয়েছে যে ভারতীয় সঙ্গীত সঙ্গীত হিসাবে কিছু ধ্বনির এক বিন্যাস এবং ভারতীয় হিসাবে পরম্পরা বা ইতিহাসের একটি সৃষ্টি ("Indian Music, being music, is just an arrangement of sounds, being Indian, it is certainly a product of Indian history.")।

ধূর্জটি প্রসাদের সঙ্গীতের উপর সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক এই কাজটি মাক্স হেবারের Social and Rational Foundations of Music এর সঙ্গে তুলনীয়।

পেশাগত জীবনে ধূর্জটি প্রসাদের উন্নতি যথেষ্ট বিলম্বিত হলেও এ বিষয়ে তাঁর নিজের কোনও ক্ষোভ বা অনুযোগ ছিল না। তিনি ১৯৫১ সালে তাঁর চাকুরীতে যোগাদনের প্রায় ২৯ বছর পরে প্রফেসর পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের প্রধান পদ গ্রহণ করার জন্য তাঁকে আহ্বান জানান হয়। আলিগড়ে পাঁচ বছর থাকার পর তিনি হেগ-এর International Institute of social studies এর ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে যোগদান করেন।

ভারতবর্ষের সমাজ বিজ্ঞান সভা (Indian Sociological Society) র তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (foundermember) এবং প্রথম সভাপতি ছিলেন। আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সভা (International Sociological Society) তে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং উক্ত সভার উপসভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের যুক্তরাজ্যে (United Provinces) কংগ্রেস ক্ষমতাসীন থাকাকালে খুব অল্প সময়ের জন্য তিনি প্রাদেশিক সরকারের যোগাযোগ অধিকর্তা (Director of Information) নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালে তিনি উত্তর প্রদেশের শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি (Labour inquiry Committee)র সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৬২ সালে ৬৮ বছর বয়সে গলা কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

৪.৩.২ সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও সমাজবিজ্ঞান চর্চার পদ্ধতি বিষয়ে ডি.পি.র ধারণা, মার্ক্সবাদ ও ভারতীয় সমাজ পরিস্থিতির সাযুজ্য বিশ্লেষণ

ধূর্জটি প্রসাদ অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের চর্চা করলেও তিনি অর্থনীতির জ্ঞানচর্চা নিয়েই সমাজবিজ্ঞানে আসেন। এই কারণে অর্থনীতিবিদগণ কিভাবে তাঁদের বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা ও গবেষণা করছেন সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে অর্থনীতিবিদগণ পশ্চিমী কিছু অত্যাধুনিক কলাকৌশল (sophisticated Techniques) এবং বিমূর্ত বিবৃতি, যা কিনা খুব অল্প সংখ্যক দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে টানা হয়েছে (abstract generalization), রপ্ত করে সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক প্রগতি পর্যালোচনা করেন। ফলে ভারতীয় অর্থনীতির ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক বিন্যাস তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় এবং এই অর্থনীতিবিদ্‌গণ বিদেশী বিশেষতঃ পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মনে করেন ভারতীয় অর্থনীতি অত্যন্ত দুর্বল এবং

পশ্চাদপদ। ডি.পি অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে ভারতবর্ষের প্রগতিশীল গৌষ্ঠীগুলি ভারতের উন্নয়নের জন্য যে ধরণের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারা পোষণ করছেন বা যেভাবে এই চিন্তাধারা কার্যে পরিণত করছেন তা অত্যন্ত দুর্বল। এর কারণ এই গোষ্ঠীগুলির ভারতবর্ষের সামাজিক ও বাস্তব পরিস্থিতি (social reality) সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও সাধারণ সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা (of their ignorance of and unrootedness in India social reality)।

ভারতীয় সামাজিক ও বাস্তব পরিস্থিতির বহু বিভিন্ন দিক (many and different aspects) আছে এবং তার একটি নিজস্ব ঐতিহ্যও আছে যা আবার তার ভবিষ্যৎ (future) নির্ধারণ করে। এই সামাজিক ও বাস্তব পরিস্থিতিকে বুঝতে গেলে প্রয়োজন ১) এর বিভিন্ন দিকের মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে এবং ২) এর ঐতিহ্য ও যে শক্তিগুলি একে পরিবর্ত্তিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয় তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সমন্বিত এবং সাংক্ষেপিক জ্ঞান (Comprehensive and synoptic knowledge)। এবং ধূর্জটি প্রসাদ মনে করতেন যে এখানে সমাজবিজ্ঞানের এক বিশেষ অবদান আছে। কারণ সমাজবিজ্ঞান এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যার একটি কাঠামো বা ডি.পি. ভাষায় মেঝে এবং ছাদ আছে (Sociology has a floor and a ceiling like any other discipline)। কিন্তু অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মত সমাজবিজ্ঞানের ছাদ বা মেঝে কোনোটিই কিন্তু বাঁধাধরা গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয় সমাজবিজ্ঞানের মেঝে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের উৎসস্থল বা সংযোস্থল আর সমাজবিজ্ঞানে ছাদ আকাশ পর্যন্ত উন্মুক্ত (The speciallity of sociology 'consists in its floor being the ground floor of all types of social disciplines and its ceiling remaining open to the sky'')।

অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন সমাজবিজ্ঞান বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটাতে পারে বা প্রত্যেকটি সামাজিক বিজ্ঞান একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ডি.পি. বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং তিনি বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের বিশেষীকরণের (specializations) নামে পৃথকীকরণের (compartmentalizations) তীব্র সমালোচনা করতেন। এই পৃথকীকরণের ফলে তিনি মনে করতেন অর্থনীতি কতগুলি শুষ্ক বিমূর্ত ধারণা ছাড়া কিছুই দেখায় না এবং এ ধারণাগুলির সঙ্গে ভারতীয় জীবনধারার যোগ এতই ক্ষীণ বা দুর্বল যে তা নেই বললেই চলে। যার ফলে ভারতবর্ষে এগুলির প্রয়োগও অর্থহীন। আর অন্যদিকে নৃবিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞান এত সঙ্কীর্ণ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা (narrow empirical research) র উপর নির্ভরশীল যে এই সামাজিক বিজ্ঞানগুলি ভারতবর্ষে সাধারণ বা সার্বিক কোনও ছবি দিতে অক্ষম। ধূর্জটি প্রসাদ মনে করতেন সমাজবিজ্ঞান বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের এই অসুবিধা দূর করে ভারতীয় সমাজের একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে পারবে।

ধূর্জটি প্রসাদ সেই কারণে মনে করতেন যে সমাজ বিজ্ঞানের প্রথম কাজ হবে সেই সূত্রগুলিকে বা ব্যক্তিগুলিকে বোঝা যা বিশেষ একটি সমাজকে বহু সময় ধরে গ্রথিত করে রাখে বা টিঁকিয়ে রাখে। ধূর্জটি প্রসাদ মনে করতেন যে ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞানীদের ভারতীয় ঐতিহ্য (Indian tradition) সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা দরকার কারণ এই ঐতিহ্য ভারতীয় সমাজকে এত সহস্র বছর ধরে একসঙ্গে ধরে রেখেছে। তবে মনে রাখতে হবে যে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর সমাজবিজ্ঞানে শুধু স্থিতাবস্থা (statusquo)র উপর জোর দেননি, দিনি বলেছিলেন যে সমাজবিজ্ঞানকেই সামাজিক পরিবর্ত্তনের পন্থা খুঁজে বার করতে হবে এবং সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে (''Sociology should ultimately show the way out of the social system by analysing the processes of transformation'')।

বস্তুতঃ ধূর্জটি প্রসাদ তাঁর সমাজবিজ্ঞানে দেখিয়েছেন ভারতবর্ষে সমাজ কিভাবে কোনও বড় মাপের বিখণ্ডায়ন (disintegration) না ঘটিয়ে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। আর সেই কারণেই তিনি মনে করেন যে ভারতীয় সমাজকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞান কে চিরাচরিত পশ্চিমী ধাঁচে বা পদ্ধতিতে চললে চলবেনা। সমাজবিজ্ঞানকে আগে ভারতের ঐতিহ্য (tradition) কে এবং এর বিশেষ ধরণের সংস্কৃতি ও সামাজিক কার্যকলাপ (special patterns of calture and social action) কে। সেই কারণেই ডি.পি. বলেছেন, ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীকে শুধু সমাজবিজ্ঞানী হলেই চলবে না, তাঁকে হতে হবে ভারতীয়। অর্থাৎ তাঁকে ভারতীয় লোকাচার (flokways), লোকনীতি (mores) প্রথা (customs) এবং ঐতিহ্য বা পরম্পরা (tradition) সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত হতে হবে। আর সেই কারণেই ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞানীকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর মেলবন্ধন ঘটাতে হবে ১) প্রথমতঃ ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীকে একটি তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী (comparative approach) গ্রহণ করতে হবে। একটি প্রকৃত তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় সমাজের সঙ্গে অন্যান্য সমাজের মিল কোথায় আছে তা যেমন দেখাবে, সেইরকম একই সঙ্গে দেখাবে ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি-কে। সেই কারণেই, সমাজবিজ্ঞানীদের প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে যে তিনি যে সমাজটি বিশ্লেষণ করছেন সেই সমাজে-র এতিহ্য সেই সমাজের সদস্যদের কাছে কতটা এবং কীভাবে অর্থবহ।

২) ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীকে একই সঙ্গে একটি দ্বান্দিকতামূলক দৃষ্টিভঙ্গীও গ্রহণ করতে হবে যার মাধ্যমে তিনি ভারতীয় সমাজের সমন্বয় এবং বিচ্ছিন্নতা (synthesis and conflict) কে বুঝতে পারবেন ; কারণ ভাতীয় সমাজে এক দিকে যেমন পরিবর্ত্তন দৃশ্যমান আর একদিকে সংরক্ষণশীলতাও (conservation) সমানভাবে কার্যকরী।

মার্ক্সবাদ ও ভারতীয় ঐতিহ্য

মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে ধূর্জটি প্রসাদের এক বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ ছিল। ডি.পি. মনে করতেন মার্ক্সবাদ এক কাঙ্ক্ষিত উচ্চমানের সমাজ তৈরীর কৌশল শেখায়। সেই উচ্চমানের সমাজ এক ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল যেখানে ব্যক্তিসত্ত্বা সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিসত্ত্বার সঙ্গে পরিকল্পিত ভাবে মিলিত হয়ে একটি সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে। সেই সামাজিক উদ্দেশ্য হল সমাজবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে কোনও ধরণের শ্রেণী বিভাজন থাকবেনা। ডি.পি.-র সমসাময়িক কালে কিছু মার্ক্সবাদী পণ্ডিত ভারতবর্ষে দ্রুত বা রাতারাতি সমাজবাদী সমাজব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সামাজিক পরিবর্ত্তনের কথা ভাবছিলেন। ধূর্জটি প্রসাদের কিন্তু মনে হয়েছিল যে এই পরিবর্ত্তন উপযোগী নয়। এর জন্য তিনি তিনটি কারণ দেখিয়েছিলেন— ১) মার্ক্সবাদীরা প্রত্যেকটি সামাজিক ঘটনা বিশেষ করে সামাজিক পরিবর্ত্তন শ্রেণী সংগ্রাম (class conflict) এর মাধ্যমে সংঘটিত হয় বলে মনে করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন জাতি ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা প্রসূত সামাজিক রীতিনীতি প্রচলিত থাকার ফলে কোনও শ্রেণী গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে কোনও সুস্পষ্ট শ্রেণী-ভিত্তিক সমাজ বস্তুও ভারতবর্ষে অনুপস্থিত। ২) দ্বিতীয়তঃ, যে পণ্ডিতবর্গ ভারতবর্ষে শ্রেণীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার দ্বন্দ্বকে ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতবর্ষে পরিবর্ত্তন সাধন করবেন বলে মনে করতেন, ধূর্জটি প্রসাদের মতে, তাঁরা ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ভিত্তিক সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত। ৩) তৃতীয়তঃ ধূর্জটি প্রসাদ দেখালেন যে অর্থনৈতিক প্রভাব বা চাপ (pressure) কিন্তু কখনই কোনও জড় বা মৃত বিষয়কে পরিবর্ত্তন করেনা, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তো নয়ই। কারণ ভারতীয় ঐতিহ্যের এক প্রচণ্ড প্রতিরোধ (resistance) ক্ষমতা আছে। এই প্রতিরোধ ক্ষমতাকে মোকাবিলা করতে পারে একমাত্র উৎপাদন ব্যবস্থা (mode of production)-র পরিবর্ত্তন।